নীললোহিত — সমগ্র

নীললোহিত-সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

নীললোহিত-সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

NILLOHIT-SAMAGRAH (Volume II)
Collected prose writings of SUNIL GANGOPADHYAY
Published by SUDHANGSHU SEKHAR DEY
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

Rs. 130.00

একশো তিরিশ টাকা

ISBN-81-7612-236-X

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭৩

শব্দগ্রন্থক : অরিজিৎ কুমার । লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৪

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে । দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭৩

উ ৎ স র্গ

মোহর চট্টোপাধ্যায়-কে

সূচি

নীললোহিতের চেনা অচেনা

প্রভাতী ও দিলীপ দত্তকে

১

মাত্র দুটাকায় একটা কস্তুরী কিনে ফেললাম। কোন-কোন হরিণের পেটে যে জিনিস হয়, তীব্র যার গন্ধ, যে গন্ধের তাড়নায় হরিণ পাগলের মতো বনে-বনে ছুটে বেড়ায়।

জিনিসটা শক্ত, ছোটখাটো মুরগির ডিমের মতন সাইজ, হরিণের চামড়া দিয়ে মোড়া, নাকের কাছে আনলে বেশ মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়। জিনিসটা পেয়ে আমার বেশ আনন্দ হলো।

কস্তুরীর জন্য আমার যে খুব আগ্রহ ছিল কিংবা কস্তুরী কেনার জন্য ব্যগ্রভাবে খোঁজাখুঁজি করছিলাম, তা অবশ্য নয়। একটা থুত্থুরে বুড়ি জোর করে গছিয়ে দিয়ে গেল।

দুপুরবেলা, বাড়িতে আমি একা, দরজায় কড়া নাড়া। দরজা খুলে দেখি নোংরা, ধুলোয় ভরতি ঘাগরা ধরনের পোশাক-পরা এক বুড়ি। বুঝলাম ভিক্ষে চাইতে এসেছে। দরজার কড়া নেড়ে কিংবা কলিং বেল টিপে ভিক্ষে চাওয়ার ফ্যাশানটা চালু হয়েছে অল্পকিছুদিন ধরে। বুড়ি কিছু বলার আগেই আমি বিরক্তভাবে বললাম, এখন কিছু হবে না, হবে না, যাও।

বুড়ি দরজার কাছে বসে পড়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল, আমি বুঝতেই পারলাম না। ওকে দেখে কোন পাহাড়ি জাত মনে হয়। ঝুলির ভেতর থেকে কতকগুলো জন্তু-জানোয়ারের হাড়, শিং, দাঁত বার করে ভাঙা হিন্দি-বাংলা মেশানো ভাষায় জিজ্ঞেস করল, বাবু, এগুলো কিনবে?

আমি তো আর তন্ত্রসাধনা করি না যে ওসব জিনিস আমার কাজে লাগবে। বললাম, কিছু চাই না। তুমি যাও—অন্য জায়গায় দেখো।

—মাইজী বাড়িতে নেই?

বুঝলাম, আমার কাছে সুবিধে হবে না বলে বাড়ির মেয়েদের ডাকতে চায়। চুরি টুরির মতলবে আছে কিনা কে জানে! একটু রুক্ষভাবে বললাম, মাইজি টাইজি কেউ নেই। যাও হিঁয়াসে, দরজা বন্ধ করেগা—

বুড়ি এবার বলল, বাবু একটু জল খাওয়াবে? বড্ড তিয়াস লেগেছে। মাথা ঘুরছে আমার—!

যতই বিরক্ত হই, কেউ জল চাইলে না বলা যায় না। একথাও বলা যায়না

যে, রাস্তায় কল আছে সেখান থেকে খেয়ে নাও! আমি নিজেও কত অচেনা জায়গায় অচেনা বাড়িতে জল খেতে চেয়েছি। ভিক্ষে দেবার ব্যাপারে কঠোর হতে পারি, কিন্তু তৃষ্ণার্তকে জল দিতেই হয়। বুড়ি যাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে না-পড়ে, সেদিকে কড়া নজর রেখে আমি ওকে জল এনে দিলাম।

ঢকঢক করে একঘটি জল খেয়ে বুড়ি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, বাবু, তুমি এসব কিছু কিনবে না?

—না!

বুড়ি তখন তার ঝুলি থেকে সেই গোল চামড়া-মোড়া পদার্থটা বার করে বলল, এই নাও, কস্তুরী! এ তুমি বাজার ঢুঁড়লেও পাবে না।

কস্তুরীর কথা শুধু কবিতাতেই পড়েছি। আগে কখনো চোখে দেখিনি জিনিসটা। এমনকী সত্যি-সত্যি কস্তুরী বলে কিছু হয় কিনা—সাপের মাথার মণির মতনই অলীক রূপকথা কিনা তাও জানি না।

তবু একটু কৌতূহল হলোই। হাতে নিয়ে দেখলাম জিনিসটা। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কস্তুরী? যাঃ!

—হ্যা, বাবু, তুমি গন্ধ শুঁকে দেখো!—

নাকের কাছে এনে একটা মিষ্টি গন্ধ পেলাম ঠিকই। তবু সন্দেহ গেল না।

—তুমি কোথায় পেলে এ জিনিস?

—নেপালের জঙ্গল থেকে। এ চিজ হরবখত নেহি মিলতা। কভি-কভি দোঠো-একঠো মিল যায়। এটা তোমার ঘরে রেখে দিলে সবসময় ঘরে সুন্দর গন্ধ হয়ে থাকবে।

আমার ঘর সবসময় সুগন্ধে আমোদিত করে রাখার কোন দরকার নেই। তবু কস্তুরী শব্দটাই এমন রোমান্টিক যে খানিকটা আসক্তি হয়ই।

জিজ্ঞেস করলাম, কত দাম?

—পঞ্চাশ টাকা। সস্তামে ছোড় দেতা হ্যায়।

পঞ্চাশ কেন, পাচশো টাকা বললেও আমি অবাক হতাম না। কস্তুরী জিনিসটা দুর্লভ নিশ্চয়ই, আর তো কারুর কাছে দেখিনি। তবে, এরকম একটা দুর্লভ জিনিস নিউ মার্কেট ফার্কেটে না-নিয়ে গিয়ে দুপুরবেলা আমার কাছেই-বা এসেছে কেন, এই ব্যাপারে আমার একটু খটকা লাগল।

বুড়ি আমার মুখভঙ্গি লক্ষ করে বলল, বাবু, দেখবে কস্তুরী কীরকম? তোমার হাতটা নিয়ে এসো আমার সামনে—। এই যে, হাতের মধ্যে এটা এরকমভাবে মুঠো করে ধরো। আচ্ছা, ওটাকে এবার রেখে দাও, এখন হাতের গন্ধ শুঁকে দ্যাখো, দুদিকেই গন্ধ।

আমি এ ব্যাপারটায় সত্যিই হতবাক হয়ে পড়লাম। কোন একটা জিনিস হাতে মুঠো করে ধরলে, হাতে গন্ধ হয়ে যেতে পারে বটে, কিন্তু হাতের উলটো পিঠেও আমি সেই গন্ধ পাচ্ছি। কস্তুরীর সুবাস আমার রক্ত-মাংস-হাড় ভেদ করে আসছে। জিনিসটা সত্যিই অভূতপূর্ব।

সে যাই হোক, পঞ্চাশ টাকা আমার কাছে একটা বিরাট ব্যাপার। আমতা-আমতা করে বললাম, ইতনা ছোটা চিজকা দাম পঞ্চাশ রুপিয়া?

—ঠিক হ্যায়, আপ বিশ রুপিয়া দিজিয়ে!

এক ঝটকায় একেবারে তিরিশ টাকা কমে গেল, আমি একটু সতর্ক হয়ে উঠলাম! আবার বললাম, বিশ রুপিয়া?

—ঠিক হ্যায়, দশঠো রুপিয়া দে দিজিয়ে!

আমি অবাক। কস্তুরী সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ না-থাকতে পারে, কিন্তু এরকম একটা খ্যাতিসম্পন্ন জিনিসের দাম দশ টাকার বেশি নিশ্চয়ই! এই বুড়ি কি দরদাম জানে না? তা হতেই পারে না, মেয়েরা কোন জিনিস কিনতে বা বিক্রি করতে গিয়ে ঠকবে—এ ব্যাপার পৃথিবীতে কখনো ঘটেনি। তাহলে কী ও আমাকে এতই পছন্দ করে ফেলেছে যে, দামের পরোয়া না-করে ও ওই মূল্যবান জিনিসটা আমাকেই দিতে চায়!

আমি চুপ করে আছি বলে বুড়ি বলল, দশ টাকাও দেবে না? ঠিক আছে পাচ টাকা অন্তত দাও। তাও দেবে না, আচ্ছা আর আপত্তি কোবো না—দুটো টাকা দিয়ে দাও বাবু! এরকম বড়িয়া চীজ—

আমার তখন রীতিমতন ভয় করতে লাগল। পঞ্চাশ টাকা থেকে দুটাকায় নেমে আসা—এটা বড়ই বাড়াবাড়ি হচ্ছে! শেষটায় না আমাকে বিনাপয়সাতেই দিয়ে দেয়! অন্তত, চারআনা-আটআনায় যদি নেমে আসে, সেটা কস্তুরীর পক্ষে খুবই অপমানজনক হবে। তাড়াতাড়ি আমি দুটো টাকা ওর হাতে তুলে দিলাম। মনে একটু খচখচ করতে লাগল, কস্তুরীর মতন একটা জিনিসের বিনিময়ে আমার আরো কিছু বেশি দামই-দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কী করব, দুটাকার বেশি যে ছিল না! বাজার করার পয়সা মেরে আর কত রোজগার দেওয়া যায়!

বুড়ি চলে যাবার পর কস্তুরীটা হাতে নিয়ে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দারুণ খুশি খুশি লাগল মনটা। এক ঘন্টা আগেও ভাবিনি, হঠাৎ আমি একটা কস্তুরীর মালিক হয়ে গেলাম। এটা যদি কারুকে উপহার দিই, সে কীরকম খুশি হবে! কাকে দেব?

কস্তুরীটার মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে আমার তন্দ্রা এসে গেল। আমি স্বপ্ন দেখলাম, কোন্ এক অচেনা অরণ্যে হাজার-হাজার হরিণ ছুটে যাচ্ছে! ইস,

এত হরিণ কোন বনে থাকে! হরিণগুলো ছুটে যাবার সময় প্রত্যেকে আমার দিকে একবার তাকিয়ে যাচ্ছে। সে দৃষ্টিতে ঠিক ভয় নেই। ওরা বুঝি জেনে গেছে, আমার কাছে একটা কস্তুরী আছে। অর্থাৎ হাজার-হাজার 'কালো হরিণ চোখ' দেখছে আমাকে। হরিণগুলো মিলিয়ে যাবার পর দেখলাম, বনেব মধ্যে তকতকে-ঝকঝকে খানিকটা জায়গা, নরম ঘাস গালিচার মতো—সেখানে একটি মেয়ে বসে আছে, তার সারা গায়ে ফুলের গয়না—মেয়েটিকে যে কী অপূর্ব দেখতে, সে আর কী বলব! আমাব মনে হলো, আমি শকুন্তলাকে স্বপ্ন দেখছি, কারণ একটা হরিণ সেই মেয়েটির কাছে দাঁড়াল, মেয়েটি হরিণটার গলায় সুড়সুড়ি দিয়ে আদর করতে লাগল। কী আশ্চর্য, তার একটু দূরেই আমি দাড়িয়ে আছি। আমিই কী দুষ্মন্ত নাকি? বড়জোর দুশমন হতে পারি...কাছে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কী? মেয়েটি আমাকে অবাক করে উত্তর দিল, আমাব নাম কপালকুণ্ডলা। আমি ভাবলাম, কস্তুরীটা ওকেই উপহার দেওযা যায়—

স্বপ্নটা আরো অনেক বড় ছিল, সবটা বলার দরকাব নেই। আমাব ঘুম ভাঙাল আমার বন্ধু রজত। চোখ মেলেই বললাম, দ্যাখ, আজ সস্তায একটা কস্তুরী কিনেছি।

—কস্তুরী? ভ্যাট।

—দ্যাখ, শুঁকে দ্যাখ, কী অপূর্ব গন্ধ।

রজত সেটা নিয়ে শুঁকে বলল, হ্যাঁ, একটা গন্ধ আছে বটে। ফুটপাথে এক টাকা চারআনা করে শিশি যে সেন্ট বিক্রি হয, তার চেযেও পচা গন্ধ।

আমি একটু দুঃখিত হয়ে বললাম, তা হতে পারে! প্রকৃতির থেকেও মানুষ বেশি বুদ্ধিমান। প্রকৃতির তৈরি সুগন্ধের চেয়েও অনেক ভালো সেন্ট মানুষ তৈবি করতে পারে—

—ধ্যাৎ! প্রকৃতি না হাতি! এটা কস্তুরী তোকে কে বলেছে?

কথা বলতে-বলতেই রজত নোখ দিয়ে খুঁটে ওই জিনিসটার গা থেকে চামড়াটা তুলে ফেলেছে। আমি হাঁ-হাঁ করে উঠলাম। রজত বলল, এই দ্যাখ। দেখলাম, ভেতরে কয়েক টুকরো পাথর, খানিকটা খবরের কাগজ দিয়ে জড়ানো! হরিণের পেটে পাথর হলেও হতে পারে, কিন্তু বাংলা খবরের কাগজ সেখানে জন্মানো সত্যিই অসম্ভব।

রজত বলল, তুই এরকমভাবে ঠকলি? তুই যে দিন-দিন কী বোকা হয়ে যাচ্ছিস।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলাম। পুরোপুরি ঠকিয়ে যেতে পারেনি। দুটাকা দিয়ে ওটা কেনার ফলে আজ দুপুরে অমন চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখলাম। তাই-বা কম কী! দুটাকা দিয়ে কী স্বপ্ন কিনতে পাওয়া যায়?

২

বাথরুমে ঢোকার আগে বাঁদিকে সুইচ। কিছুতেই সেটা জ্বালতে পারি না। শক্ত আঁট হয়ে যাচ্ছে। যত জোর দিয়েই সেটা নাড়াচাড়া করতে চাই—এক চুল নড়ে না।

স্বপ্না জিজ্ঞেস করল, কী হলো?

—আলো জ্বালতে পারছি না! তোমাদের সুইচটা খারাপ!

স্বপ্না উঠে এসে বলল, ধ্যাৎ! খারাপ হবে কেন? এই তো—। স্বপ্না তার নরম আঙুলটা ছোঁয়াতে-না-ছোয়াতেই টুপ করে আলো জ্বলে উঠল। ভারী আশ্চর্য তো! আমার হাতে জ্বলল না কেন?

সুইচটা অফ করে আমি আবার নিজে জ্বালতে গেলাম। এবার বেশি জোরাজুরি না-করে, স্বপ্নার মতনই নরম ও আলতোভাবে। জ্বলল না—এবারও সেটা পাথরের মতন শক্ত! আমার হাতে ঐ আলো জ্বলবে না।

স্বপ্না তখন হাসতে-হাসতে সারা শরীরে ঢেউ খেলিয়ে ফেলেছে! আমি খানিকটা বিরক্ত হয়ে বললাম, এই সুইচটা শুধু মেয়েদের হাতেই জ্বলে। পুরুষদের জন্য নয় বোধ হয়!

তক্ষুণি রজত এগিয়ে এসে বলল, তুইও যেমন! এই দ্যাখ! রজত হাত দেওয়া মাত্র আবার আলো জ্বলে উঠল। এরপর আমি কতরকমভাবে চেষ্টা করলাম, নরমভাবে, গায়ের জোরে, এক আঙুল ছুঁইয়ে—কিছুতেই আমার হাতে জ্বলবে না সেটা।

এর একটাই মানে হতে পারে। ঐ সুইচটার কাছে একদিন আমি নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করেছিলাম, ও আমার ওপর খুব রেগে আছে। মনে-মনে হাত জোড় করে বললাম, হে সুইচ, না-জেনে তোমার প্রতি কখনো যদি কোন অন্যায় করে থাকি—আমায় ক্ষমা করো। আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। এই বলে বাথরুমে চলে গেলাম।

ফিরে এসে খটাখট করে যতবার ইচ্ছে সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম, নেভালাম, কোন অসুবিধে নেই। ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়ে গেছে।

ত্রিপুরার আগরতলা এয়ারপোর্টের রানওয়ের পাশে ঝাঁক-ঝাঁক লজ্জাবতী লতা। প্লেন ছাড়তে একটু দেরি হবে, আমি ঐ লজ্জাবতী লতা নিয়ে খেলা করছিলাম। লজ্জাবতী নামটা ভারী সুন্দর, আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁলেই পাতাগুলো বন্ধ হয়ে যায়—এটা দেখতে আমার বেশ ভালো লাগে। জগদীশ বসু যে প্রমাণ করেছিলেন গাছেরও প্রাণ আছে, তার তো এটাই সহজ আটপৌরে উদাহরণ!

প্রাণ তো আছেই, কিন্তু মন কী নেই?

আঙুল ছুঁইয়ে-ছুঁইয়ে আমি ওদের লজ্জা দিচ্ছিলাম, ওরাও লজ্জায় মুখ বন্ধ করে সঙ্গে-সঙ্গে নুয়ে পড়ছিল। হঠাৎ একটা গাছে হাত ছুঁইয়ে আমি অবাক। সে গাছটা লজ্জা পেল না, পাতাও গোটালো না। তবে কি এটা অন্য গাছ? না তো! বরং বলা যায়, একই লজ্জাবতী লতার একটা শাখা, অন্য শাখাটি লজ্জা পেয়ে মুখ বুজেছে, এর কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই! যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বরাবরই আমার মনে খটকা ছিল, লজ্জাবতীদের বংশে একজনও কী নির্লজ্জা নেই? পুরো বংশটাই ওদের লাজুক, এতদিনেও কেউ বিদ্রোহ করেনি? আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেই ওদের একজন সেটা দেখিয়ে দিল। লজ্জাবতীদের বংশে প্রথম নির্লজ্জা বেহায়া লতাটি আবিষ্কারের গৌরব আমার!

আমি আগে যে ঘরে থাকতাম, সে ঘরে ছিল একটিমাত্র জানলা। সে ঘরে হাওয়া ঢোকে না। বাইরে প্রবল হাওয়া দিলেও আমার সেই ঘরে গুমোট গরম। সবাই বলত, মুখোমুখি দুটো জানলা না-থাকলে সেই ঘরে হাওয়া ঢোকে না নাকি। হাওয়ারা বন্দী হয়ে থাকতে চায় না, তারা এক জানলা দিয়ে ঢুকে অন্য জানলা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তা তো হলো! কিন্তু আমার ঘরে যে দুটো জানলা নেই, সেটা হাওয়ারা ঘরে না-ঢুকেই জানল কী করে? তারা কী আমার একটিমাত্র জানলার বাইরে থেকে আগে উঁকি মেরে দেখে নেয় যে অন্য জানলা আছে কি না? নাকি, এ ঘর তৈরি হবার পরই প্রথমবার একদল হাওয়া ঐ ঘরে ঢুকে ভালো করে ইনসপেকশন করে গেছে এবং তারপর নানাজাতের সমস্ত হাওয়াকে জানিয়ে দিয়েছে, খবর্দার কেউ ঐ ঘরে ঢুকবে না, ও ঘরে একটিমাত্র জানলা! আশ্চর্য, কী ডিসিপ্লিন ঐ হাওয়াদের, এ পর্যন্ত আর কোন হাওয়া ভুল করেও একবারের জন্য ঢোকেনি এ ঘরে!

এখন যে-বাড়িতে থাকি, সে-বাড়িতে অবশ্য বেশ হাওয়া আছে, প্রত্যেক ঘরে তিন-চারটে জানলা। হাওয়া এবং বৃষ্টির জল দুই-ই সমানে ঢোকে। আমি লক্ষ করেছি, হাওয়া, বৃষ্টির জল এবং আমার টেবিলের কাগজপত্র—এই তিন ব্যাপারীর মধ্যে একটা গোপন চুক্তি আছে।

প্রথমে বেশ খানিকটা বৃষ্টির ছাট এল, ঘরের মধ্যে তিন-চারটে মিনিয়েচার সাইজের নদী বইতে লাগল। তারপর এক ঝলক দমকা হাওয়া, সেই হাওয়ায় উড়ে গেল আমার টেবিলের কাগজপত্র। এই কাগজগুলো উড়ে গিয়ে কোথায় পড়বে বলুন তো? ঘরের শুকনো জায়গাটুকুতে কক্ষনো না, ঠিক উড়তে-উড়তে গিয়ে পড়বে জলে। এতে কোন ভুল নেই।

কাগজেরও জাতিভেদ আছে। ধরা যাক, আমার একটা কবিতা লেখার দুরাকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। টেবিলে রয়েছে আমার সেই বহু উদ্বেগ ও পরিশ্রমের ফসল সেই কবিতা-লেখা কাগজটি, কয়েকটি চিঠি যার উত্তর না-দিলেও চলে, বিজ্ঞাপনের হ্যাণ্ডবিল, ডাইংক্লিনিং-এর রসিদ, আরো কিছু-কিছু।

কিন্তু দমকা হাওয়ায় ঠিক ঐ কবিতা-লেখা কাগজটি এবং ডাইংক্লিনিং-এর রসিদটাই উড়ে গিয়ে পড়বে জলে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গিয়ে সেগুলো তুলে নেবার আগেই জলে ভিজে সব অক্ষর একাকার। আর বাকি অপ্রয়োজনীয় কাগজগুলো মহানন্দে হাওয়ায় অনেকক্ষণ উড়বে, কিছুতেই পড়বে না জলে। অথবা তারা টেবিল থেকে স্থানত্যাগই করবে না।

কাগজপত্র চাপা দিয়ে রাখার কথা বলছেন? তাড়াতাড়িতে কালির দোয়াত কিংবা আঠার শিশি কিংবা কাচের গেলাস চাপা দিয়ে দেখুন, কী ফল হয়! কালির দোয়াত কিংবা আঠার শিশি ওল্টাবেই, কাচের গেলাসটা ভাঙবেই নিচে পড়ে। অথচ, এগুলোর চেয়ে অনেক হাল্কা, একটা ছোটদের খেলনা রবারের কুকুর দিয়ে কাগজ চাপা দিয়ে দেখেছি, কক্ষনো ওল্টায় না। রবারের জিনিস তো, ভাঙার চান্স নেই যে!

সেই জন্যই, এখন কোন ঘরে যদি দমকা হাওয়া বয়, বৃষ্টির ছাট আসে, আমি আর বৃথা কাগজপত্র সামাল দেবার চেষ্টা করি না। কবিতা লেখা কাগজটি উড়ে গিয়ে জলে পড়লে বুঝতে পারি, ওটার সদ্‌গতিই হয়েছে; ঐ পণ্ডশ্রমটুকু ছাপার যোগ্যই নয়। মনে-মনে বলি, হে পবন, হে বরুণ, আমি তো তোমাদের সঙ্গে কক্ষনো শত্রুতা করিনি! সুতরাং খেলাচ্ছলে যেটুকু নষ্ট করতে চাও করো, আমার বেশি ক্ষতি-টতি কোরো না। বাতাস এবং বৃষ্টির জলের যে প্রাণ আছে এবং তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বেশকিছুদিন আগে, আমি জড়পদার্থের খেয়ালখুশি নিয়ে একটা লেখা লিখেছিলাম। নিশ্চয়ই লেখাটাতে কিছু দোষের কথা ছিল। নইলে সেই লেখাটা লিখতে-লিখতেই আমার কলমটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে নিবটা বড়শি হয়ে যাবে কেন? কলমদের যে নিজস্ব অনেক অভিরুচি আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমার বেশিরভাগ লেখাই আমি নিজে লিখি না, আমার কলম লেখে। নইলে, একটা বিষয় ভেবে লিখতে শুরু করলে, সেটা সম্পূর্ণ অন্যদিকে নিয়ে যায় কে? আমার নিজেরই ডানহাত দিয়ে একই কলমে রোজ লিখছি, অথচ এক-একদিন হাতের লেখাটা যাচ্ছেতাই হয়ে যায়, এক-একদিন বেশ পরিচ্ছন্ন হয়—কী যুক্তি আছে এর? এক-একদিন কলমটা আবার ইচ্ছে করে কোথায় লুকিয়ে বসে থাকে।

আমরা চাবি হারাই, না চাবি আমাদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে লুকোচুরি খেলে? নইলে, যে ড্রয়ারটা আগে পাঁচবার খুঁজেছি, সেটারই এক কোণে কী করে চাবিটাকে খুঁজে পাওয়া যায়? আমরা অনেকে আরশোলা, চামচিকে বা টিকটিকিকে খুব ঘেন্না করি। এমনও হতে পারে, ওরাও কেউ-কেউ আমাদের ঘেন্না করে খুব! টিকটিকিরা সাধারণত মানুষের কাছে আসে না—ওরা মাংসাশী হলেও কোনদিন মানুষকে কামড়েছে, এমন শোনা যায়নি। দৈবাৎ কখনো-কখনো দেয়াল থেকে পা পিছলে দু-একটা টিকটিকি মানুষের গায়ে পড়ে—আমরা তখন ঘেন্নায় শিউরে উঠি। ওরাও তখন যেরকমভাবে কিলবিলিয়ে পালায়—তাতে একথা মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, মানুষ নামক অদ্ভুত জন্তুর শরীর স্পর্শ করার ফলে ওরা ঘেন্নায় গঙ্গায় চান করতে যায়!

অনেকে পলার আংটি পরে, অনেকের শুনেছি পলা সহ্য হয় না। গোমেদ, হীরে, রক্তমুখী নীলা—এগুলো নাকি ধারণ করলে কারুর-কারুর দারুণ উন্নতি হয়, কারুর আবার ভয়ংকর ক্ষতি হয়ে যায়। এসবই শোনা কথা, সত্যি কিনা জানি না। এসবের পক্ষে যে-যুক্তি দেওয়া হয়, তা অতি তুচ্ছ। তবে, একটা ব্যাপার আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। টাকা পয়সাও অনেকের সহ্য হয় না, যেমন আমার হয় না। টাকা পয়সা জাতীয় জিনিসগুলো আমাকে নিতান্ত অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, ওরা আমার ধারে কাছে ঘেঁষে না।

৩

রথীনদার সঙ্গে ওঁর অফিসে দেখা করতে গিয়ে আমি অবাক। এ কী চেহারা হয়েছে রথীনদার! মুখে দু-তিনদিনের খোচা-খোচা দাড়ি, জামার সবকটা বোতাম লাগানো নেই, এমনকী পায়ে চটি! রথীনদার এই পোশাক বিশ্বাসই করা যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম, রথীনদা, আপনার কী কেউ...

রথীনদা মুচকি হেসে বললেন, না, কেউ মারা যায়নি।

আমারও সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়ল, রথীনদার মা এবং বাবা দুজনেরই কেউই বেঁচে নেই। সুতরাং এটা তো অশৌচের পোশাক হতে পারে না।

—তাহলে আপনার কী হয়েছে রথীনদা?

—কী আবার হবে? কিছু হয়নি।

—তাহলে?

—তাহলে আবার কী? চুপ করে বোস। কফি খাবি?

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে কফি আনতে হুকুম দিয়ে আমাকে বললেন, একটু বোস, দু-একটা কাজ সেরে নিই।

অফিসে রথীনদার আলাদা এয়ার কণ্ডিশান করা ঘর। বিলেতফেরত ডাকসাইটে কস্ট-অ্যাকাউন্টেন্ট রথীনদা, প্রথমে একটা সাহেব কোম্পানিতে অফিসার হয়ে ঢুকেছিলেন, এখন সেই কোম্পানিই মারোয়াড়ি কিনে নিয়েছে, এখানে রথীনদা পদমর্যাদায় তৃতীয় ব্যক্তি। কোম্পানি ওঁকে গাড়ি দিয়েছে, এগারোশো টাকা বাড়িভাড়া দেয়। অফিসে ছ'দিন ছ'রকম স্যুট পরতেন রথীনদা, টাইয়ের গিঁট নিখুঁত, আর জুতোর পালিশের বাহার কী! পাইপ মুখে দিয়ে ঠিক সিনেমার সাহেবদের মতন ইংরিজি বলতেন।

কফি শেষ করে রথীনদা আমার দিকে একটা চার্মিনার বাড়িয়ে দিলেন। সেদিকে আমি চোখ গোল-গোল করে তাকিয়েছি দেখে রথীনদা হাসতে-হাসতে বললেন, তোরাই শুধু চার্মিনার খেতে পারিস, আমরা পারি না? এখনো লাংসের জোর আছে!

অফিস থেকে বেরিয়ে রথীনদা বললেন, চল, কফি হাউসে গিয়ে একটু আড্ডা মারি। গাড়ি নেই, বাসে উঠবি, না হেঁটে যাবি?

মানুষের স্বভাব হঠাৎ বদলাতে দেখলে একটু ভয়-ভয় করে। রথীনদার উল্টোপাল্টা কথা শুনে আমার কীরকম গা ছমছম করতে লাগল। দাড়ি কামানো নেই, কথাবার্তা অন্যধরনের, রথীনদার কী শেষে মাথার গোলমাল টোলমাল হলো নাকি? ইস, গোপা বউদির তাহলে কী হবে?

আমি বললাম, রথীনদা, ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো! কফি হাউসে আড্ডা মারার ইচ্ছে তো আপনার আগে কোনদিন হয়নি?

রথীনদা বললেন, কেন, তোরা আড্ডা মারতে পারিস, আর আমরা পারি না? আমাদের কী প্রবেশ নিষেধ? নাকি আমি খুব বুড়ো হয়ে গেছি?

রথীনদার বয়েস পয়তাল্লিশ, বুড়ো মোটেই বলা যায় না। তবে এতদিন রথীনদা ছিলেন, যাকে বলে বয়স্ক দায়িত্ববান পুরুষ, সমাজের একটা উজ্জ্বল রত্ন। আজ সব এলোমেলো। রথীনদা তাঁর ভাবান্তরের কাহিনী শোনালেন একটু বাদে।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে দিন দশেক আগে। ঠিক ন'টার সময় অফিসে বেরোন, সেদিনও সেজেগুজে অফিসে বেরুতে যাচ্ছেন, গাড়িটা কিছুতেই স্টার্ট নিল না। কলকব্জা নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি হলো, ঠেলাঠেলি হলো, গাড়ি তবু অনড় হয়ে রইল। অফিসের মেকানিককে টেলিফোন করে রথীনদা বিরক্ত হয়ে একটা ট্যাকসি ডাকতে পাঠালেন। অনেক খুঁজেও ট্যাকসি পাওয়া গেল না। অথচ অফিসে জরুরি কাজ আছে, দেরি করা যায় না। রথীনদা একটা বাসেই উঠে পড়লেন।

বোধহয় আট-নবছর বাদে বাসে উঠলেন। অফিসের সময় ভিড়ের বাসের কী অবস্থা হয় তা দূর থেকেই দেখেছেন—কিন্তু তার মধ্যে নিজে না-ঢুকলে ঠিক বোঝা যায় না। যারা নিয়মিত ঐসময় বাসে যায়, তারা তবুও কায়দা করে নিজেকে অটুট রাখতে পারে, কিন্তু যাদের অভ্যেস নেই...। রথীনদার আয়নার মতন পালিশ-করা জুতো ধুলোয় মাখামাখি, টাইটাতে গলায় ফাঁস লেগে যাবার অবস্থা, কোটের বোতাম ছিঁড়ে গেল, একহাতে অফিসের ব্যাগ, অন্যহাতে হ্যাণ্ডেল ধরা, এই অবস্থায় কণ্ডাকটার টিকিট চেয়ে বিরক্ত করতে লাগল, কী করে যে লোকে এইসময় পয়সা বার করে—

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, রথীনদা এতে বিরক্ত হলেন না। এই ভিড়ে চাপাচাপি বাস-জার্নি তাঁর ভালো লেগে গেল। আমায় বললেন, জানিস, সেই বাসে গোটা দশেক কলেজের ছেলে ছিল, নিজেদের মধ্যে চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল, কয়েকজন তো বিপজ্জনকভাবে ঝুলছিল পাদানি থেকে। আমার কীরকম ঈর্ষা হলো ওদের দেখে। কুড়ি-বাইশ বছর আগে আমিও তো ওদের মতন ছাত্র ছিলাম, আমিও ঐরকম হৈ-চৈ করেছি—সেইসব দিন আমি আর ফিরে পাব না। নাইন্টিন ফিফটি টু-তে যখন লণ্ডনে পড়তে গিয়েছিলাম—কী হুল্লোড়ই করেছি! আর এখন? জীবনটা একেবারে রুটিন বাধা!

শুনবি আমার রুটিন! সকালবেলা চা খাওয়া, দাড়ি কামানো আর কাগজ পড়া একসঙ্গে সারতে হয়। সময় নেই তো! সাড়ে আটটায় স্নান করতে ঢুকি, ন'টার সময় অফিস! অফিসে সারাক্ষণ একটা ঘেরাটোপের মধ্যে বসে থাকি—দু'-চারজন অফিসার আর মালিকদের সঙ্গে দেখা হয় শুধু—বাকি লোকজনের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই। আমরা অফিসার তো, সব স্টাফদের সঙ্গে মেলামেশা করা আমাদের মানায় না। সাহেবরা নেই, এখন আমরা দেশী সাহেব। অফিস থেকে সন্ধেবেলা ফিরে গা-টা ধুয়ে ঘরে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাই। কোনদিন একটু আধটু হুইস্কিতে চুমুক দিই। এর নাম রিলাকসেশান! আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে কদাচিৎ যাই, অফিসের সম্পর্কের লোকেরাই মাঝে-মাঝে বাড়িতে বেড়াতে আসে, তখনো এসেও অফিসের কথা। মাসে দু-একদিন বউকে নিয়ে সিনেমা, কিংবা কোন পার্টিতে গিয়ে মাতালদের সঙ্গে দেতো হাসি হেসে গল্প করা—এর নাম আনন্দ! ছুটি কাটাতে যাই দার্জিলিং বা পুরী, পৃথিবীটা কত ছোট হয়ে আসছে। একটা ইনসিওরেন্স কিছুদিন আগে মেচিওর করল, সেদিন বুঝতে পারলাম বুড়ো হয়ে যাচ্ছি! চাকরির উন্নতি, টাকা জমানো আর বউকে খুশি করা—শুধু এই ক'টি জিনিসের বিনিময়ে বাকি পৃথিবীটা তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, আর এর বদলে পাব হার্টের অসুখ কিংবা ডায়াবিটিস! দূর ছাই!

গাড়িটা সারাতে দিনসাতেক সময় লাগবে। রথীনদা অফিস থেকে আর-একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারতেন কিংবা কোন অফিস-বন্ধুকে বলে লিফট নিতে পারতেন, নিলেন না। পরের দিন আবার উঠলেন ভিড়ের বাসে। সেদিন আর স্যুট-টাই পরেননি, সেরকম যত্ন নিয়ে জুতো পালিশ করাননি। সেদিন ভিড়ের মধ্যে অনেক সহজভাবে মিশে গেলেন।

বুঝলি নীলু, আমার মনে হলো দশ বছর বয়েস কমে গেছে। ঐ ভিড়, ঠ্যালাঠেলি, চেঁচামেচি—এর মধ্যে মিশে গিয়ে মনে হলো, আমিও এদের একজন, অমনি পৃথিবীটা অনেক বড় হয়ে গেল। দুজন লোক বাসের মধ্যে ঝগড়া করছিল, আমি অমনি একজনের সাইড নিয়ে নিলাম, আর তক্ষুনি আমার মধ্যে একটা সেন্স অব বিলংগিং এসে গেল।

দু-চারদিন বাদে সকালবেলা দাড়ি কামাতে গিয়ে রথীনদার থুতনির কাছে খানিকটা কেটে গেল ঘচাং করে! পরের দিন সেখানটায় বেশ ব্যথা, দাড়ি কামানো অসুবিধাজনক। দাড়ি না-কামিয়ে অফিস যাওয়া তো দূরের কথা, রাস্তায় বেরুবার কথাও কয়েকদিন আগে কল্পনাই করতে পারতেন না। কিন্তু সেদিন মনে হলো, কী এমন রামায়ণ-মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এতে? গত পনেরো বছর ধরে প্রত্যেক দিন দাড়ি কামাচ্ছেন একটি দিনও বাদ পড়েনি—কে বলে মানুষ স্বাধীন হয়েছে, মানুষ তো এখনো নিয়মের ক্রীতদাস! দাড়ি না-কামিয়েই সেদিন অফিসে বেরিয়ে পড়লেন, সেদিন আর জুতো মোজাও পরলেন না, স্রেফ চটি। বুঝলি সেদিন আমি ভিড়ের বাসে খুব চমৎকার মানিয়ে গেলাম। নিজেকে মনে হলো সবারই মতন একজন সাধারণ মানুষ! নিজেকে সাধারণ মানুষ ভাবার মধ্যেও যে এত আনন্দ আছে—

—রথীনদা, অফিসে আপনাকে কেউ কিছু বলেনি?

—কে কী বলবে? কার কী বলার আছে? আমার কাজটা আসল না পোশাকটা? আমার যা খুশি আমি তাই পরব। একটা আর্দালি যদি বগল-ছেঁড়া জামা পরে অফিসে ঘুরতে পারে, আমি চটি পায়ে দিয়ে আসতে পারি না? কে এরকম নিয়ম করেছে?

—না, না, সেকথা বলছি না। আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন? মানে বলছিলাম কী, মালিকরা কেউ কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি?

রথীনদা একগাল হেসে বললেন, সবারই ধারণা আমার বাবা বা মা কেউ মারা গেছে। যেন শোকের জন্যই শুধু দাড়ি কামানো বন্ধ করতে পারে, আনন্দের জন্য পারে না! ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জিজ্ঞেস করেছিল, আমি তাকে বললাম, এটাই এখন লেটেস্ট ফ্যাশান! বড়জুলপি রাখা এখন পুরোনো হয়ে গেছে, এখন

ফ্যাশান হচ্ছে, দু-তিনদিন অন্তর দাড়ি কামানো আর রবারের চটি পরা!

—গোপা বউদি এ সম্বন্ধে কিছু বলছেন না?

—তোর বউদির ধারণা, আমার মাথার দু-একটা স্ক্রু বোধ হয় ঢিলে হয়ে গেছে। ডাক ছেড়ে কাঁদবে কিনা ভাবছে। আমি কিন্তু বেশ আছি, জানিস নীলু! এই কদিনে অনেক বয়েস কমে গেছে, মনে হয়—যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই, মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে চা খাই, অচেনা লোকের সঙ্গেও কথা বলি! কাল তো ট্রামের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে-ঝুলতে এলাম। অনেকে হয়তো বলবে, আমি শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভেড়ার চেষ্টা করছি। তা বলুক। আমি তো আনন্দ পাচ্ছি! চ, পার্কে গিয়ে আলুকাবলি খাই!

পরের রবিবার সকালবেলা রথীনদার বাড়িতে গেলাম। দরজা খুলে দিলেন গোপা বউদি, খুবই বিরস মুখ। ভেতরের একটা ঘরে ধুপধাপ করে আওয়াজ হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, বউদি, রথীনদা কোথায়? ওখানে আওয়াজ কিসের?

গোপা বউদি বললেন, যাও, ও ঘরে যাও! গিয়ে দ্যাখো তোমার দাদার কীর্তি।

ও ঘরে ঢুকেই থমকে গেলাম। রথীনদার ছ'বছরের ছেলে বিল্টুর হাত ধরে রথীনদা সারা ঘর জুড়ে লাফালাফি করছেন। পরনে অ্যাণ্ডারওয়ার আর গেঞ্জি। আমাকে দেখে বললেন, আয়! ওখানে চুপ করে বসে থাক!

—এটা কী করছেন কী?

—বিল্টুর সঙ্গে খেলা করছি!

—এইরকম নেচে-নেচে?

—বুঝলি না, খেলাও হচ্ছে, আবার একটু একসারসাইজও হয়ে যাচ্ছে। এই বয়েসে তো আর ডন-বৈঠক শুরু করতে পারি না—ওসব একঘেয়ে জিনিস করা সম্ভবও নয়! তার বদলে নাচটাই বা মন্দ কী! বেশ গা গরম হয়ে যায়, শরীর ঝরঝরে লাগে। ক'দিন ধরে এটা করছি। বিল্টু আগে একা-একা খেলা করে মনমরা হয়ে থাকত—কেন যে এটা আমার আগে মনে পড়েনি!

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসের একজন ধুমসো মতন লোককে হঠাৎ সারা ঘর জুড়ে নাচানাচি করতে দেখলে যে-কেউ ভাববে, লোকটি বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মনে হলো, মানুষের মধ্যে এরকম একটুআধটু পাগলামি থাকা বোধ হয় খারাপ নয়। অন্তত, একঘেয়েমির চেয়ে অনেক ভালো!

৪

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকে প্রিয়ব্রত। পিয়ন এসে প্রিয়ব্রতকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। খাঁকি রঙের খাম, রেজিস্টার্ড, সই করে নিতে হলো। প্রিয়ব্রত তিন বছর ধরে বেকার বসে আছে, আজ তার কাছে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠি এসেছে।

এখন, কোন গল্পলেখক এই দৃশ্যটা বর্ণনা করতে হলে কীভাবে লিখবেন? হয়তো, অনেকটা এইরকম। চিঠিটা খুলে পড়ার সময় প্রিয়ব্রত নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, সত্যিই চাকরি? তারই নামে? কোন ভুল হয়নি তো? দুবার তিনবার পড়ল চিঠিখানা আগাগোড়া, ঠিকানা লেখা খামখানা দেখল উল্টেপাল্টে—তারপর যখন নিঃসন্দেহ হলো, তখন এক ঝলক রক্তের মতন খুশি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে-চোখে।

তারপর চিঠিখানা হাতে নিয়ে সে ছুটে গেল বাড়ির মধ্যে। প্রিয়ব্রতর মা তখন বাথরুমে—তবু বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে বলল, মা, শিগগির এসো—চাকরি! চাকরি পেয়ে গেছি! সেই যেটা দুমাস আগে ইনটারভিউ দিয়েছিলাম—কোন আশাই ছিল না—একেবারে অ্যাপয়েনটমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দিয়েছে—সামনের সোমবার জয়েনিং—

প্রিয়ব্রতর দাদার ছেলে সন্তু এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে কাকু?

সন্তুকে আজ সকালেই এক চড় মেরেছিল প্রিয়ব্রত। এখন তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে-করতে বলল, কাকু, আমি চাকরি পেয়েছি! এবার থেকে আমিও তোমার বাবার মতন অফিস যাব!

প্রিয়ব্রতর দিদি ভেতরের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। খুশির চোটে প্রিয়ব্রত চিরুনি কেড়ে নিয়ে চুল এলোমেলো করে দিল দিদির। ওর দিদি চেঁচিয়ে উঠল এই-এই, কী হচ্ছে কী! হঠাৎ এত আনন্দ উথলে উঠল কেন?

প্রিয়ব্রত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, এবার আমি চাকরি পেয়ে গেছি! তোর সব ধার শোধ করে দেব!

—চাকরি পেয়েছিস? ইঃ! দেখি চিঠি দেখি!

—কেন চিঠি না-দেখলে বুঝি বিশ্বাস হয় না? আমি যে বলছি...তোর কাছে কত ধার আছে বল—

—ধারশোধের কথা পরে, কবে খাওয়াচ্ছিস বল?

নাঃ, ঠিক হচ্ছে না আমার। কোন গল্পলেখক লিখলে বানিয়ে-বানিয়ে আরো অনেক সুন্দর করে লিখতে পারতেন। আমি একদম বানাতে পারি না—তাই গল্প-উপন্যাস লেখা হল না আমার!

আসল ঘটনাটা যা ঘটল, তা এইরকম। পিয়নের কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে প্রিয়ব্রত দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খামটা ছিঁড়ল। পড়ল বেশ মনোযোগ দিয়ে। তারপর নিস্পৃহভাবে চিঠিখানা চিঠির বাক্সর ওপর রেখে কলমটা নিয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে ভাঙতে লাগল দরজার কোণায় একটা বোলতার বাসা।

আমি আমাদের ফ্ল্যাটের দরজার কাছে তখন দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি বললাম—প্রিয়ব্রত, দেখো, বোলতা যদি একবার হুল ফোটায়—

ও বলল, একদম দরজার কোণে বাসা করেছে, দরজা খুললেই বোলতাগুলো বেরিয়ে এসে মাথার কাছে এমন ভন-ভন করে— !

প্রিয়ব্রতর দাদা সুব্রত এই সময় এল বাইরে থেকে। লেটারবাক্সের ওপর খামখানা দেখে জিজ্ঞেস করল, কার চিঠি রে?

—আমার।

—আবার কোন জায়গা থেকে ইনটারভিউতে ডেকেছে নাকি?

—না, একটা অ্যাপয়েনটমেন্ট লেটার পাঠিয়েছে!

—কোথা থেকে? দেখি, দেখি!

প্রিয়ব্রতর ঐ নির্লিপ্ত ভঙ্গি দেখে আমি নিজেও না অবাক হয়ে পারলাম না। এই ক'বছর প্রিয়ব্রত চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছে, চেনাশুনো কোন লোকের কাছে অনুরোধ জানাতে বাকি রাখেনি। আর আজ চাকরি পেয়েও তার কোন ভাবান্তর নেই!

সুব্রত চিঠিখানা পড়ে বলল, বাঃ, এ তো বেশ ভালোই অফার দিয়েছে! তাড়াতাড়ি একটা উত্তর লিখে দে!

—আচ্ছা দেব।

—আজই দিয়ে দে। দেরি করিসনি! মাকে বলেছিস?

—বলব এখন! মা চান করতে গেছে।

সুব্রত ভেতরে চলে গেল, প্রিয়ব্রত আবার কলম দিয়ে বোলতার বাসা ভাঙতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, প্রিয়ব্রত, কোথায় চাকরি পেলে?

আমার দিকে না-তাকিয়েই উত্তর দিল, এই, এ. জি. বেঙ্গলে একটা ইনটারভিউ দিয়েছিলাম—ওরা অ্যাপয়েনটমেন্ট পাঠিয়েছে।

বাঃ, খুব ভালো জায়গাতেই তো পেয়েছো। কংগ্রাচুলেশনস! কবে খাওয়াচ্ছো বলো?

উত্তর না-দিয়ে প্রিয়ব্রত শুধু একটু ফ্যাকাশেভাবে হাসল।

এরপর দু-তিনদিন প্রিয়ব্রতকে আমি দূর থেকে লক্ষ করেছি। চাকরি পেয়েও তার কোন ভাবান্তর নেই, মুখে চোখে একটুকু উল্লাসের ছাপ নেই। বরং তাকে

আগের চেয়েও যেন একটু বেশি ম্লান দেখায়। এ ক'বছরে প্রিয়ব্রত অন্তত তেইশ-চব্বিশবার ইনটারভিউ দিয়েছে, দরখাস্ত পাঠিয়েছে অন্তত শ'খানেক—সেই তুলনায় যে চাকরি সে পেয়েছে, এমন কিছু খারাপ নয়—তবু এরকম কেন?

আমার তখন আরব্য উপন্যাসের একটা গল্প মনে পড়ল। সেই কলসীর দৈত্যের কাহিনী। কলসীর মধ্যে বন্দি অবস্থায় দৈত্য সমুদ্রে ডুবে ছিল। প্রথম একশো বছর সে মনে-মনে ঠিক করেছিল, যে তাকে উদ্ধার করবে, তাকে সে রাজা করে দেবে। কেউ উদ্ধার করল না। পরের একশো বছর ঠিক করল, যে তাকে উদ্ধার করবে, তাকে সে পৃথিবীর সব সম্পদ আহরণ করে এনে দেবে, তার সে ভৃত্য হয়ে থাকবে। কেউ তখনো তাকে উদ্ধার করল না। পরের একশো বছর দৈত্য মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করল, উদ্ধার পেলেই সে ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবে—এমনকী তার উদ্ধারকারীকেও সে হত্যা করবে।

মনে হলো, প্রিয়ব্রতর বোধ হয় সেই অবস্থা। এতদিন চাকরি না-পেয়ে-পেয়ে সে হিংস্র হয়ে উঠেছে—চাকরি জিনিসটার ওপরেই তার ঘৃণা জন্মে গেছে। ভয় পেলাম এই ভেবে যে, প্রিয়ব্রত না শেষ পর্যন্ত চাকরিটা প্রত্যাখ্যান করে দেয়।

আমাদেরই পাড়ার মেয়ে নবনীতার সঙ্গে প্রিয়ব্রত প্রেম ট্রেম করে, আমি জানতাম। সেদিন দুপুরবেলা দেখলাম লেকে একটা বেঞ্চিতে ওরা দুজনে বসে আছে। চারদিকে কাঠফাটা রোদ্দুর, কিন্তু ওদের মাথায় জামরুল গাছের ছায়া। যে-কোন লেখক এই দৃশ্যটা কী রকমভাবে আঁকতেন? নতুন চাকরি-পাওয়া একটি ছেলে দুপুরে দেখা করেছে তার প্রেমিকার সঙ্গে। ওরা এখন খুশিতে উচ্ছল, ওরা ভবিষ্যতের নানা পরিকল্পনা করছে। দিদির কাছ থেকে টাকা ধার করে এনেছে প্রিয়ব্রত, আজ সে নবনীতাকে নিয়ে শৌখিন কোন দোকানে খেতে যাবে।

আসল দৃশ্যটা কিন্তু সেরকম নয়। ওরা দুজনেই বসে আছে নীরস-গম্ভীর মুখে, দেখলেই বোঝা যায়, কী নিয়ে খুব একচোট ঝগড়া হয়েছে ওদের মধ্যে। থমথমে চোখে নবনীতা তাকিয়ে আছে জলের দিকে, আর প্রিয়ব্রত একমনে সিগারেট টেনে যাচ্ছে।

বড় রাস্তার মোড়ে প্রিয়ব্রত রোজ সন্ধেবেলা একদল বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেয়। ওরা সবাই বেকার, ওদের সবারই চমৎকার স্বাস্থ্য, বুদ্ধিমান সপ্রতিভ চেহারা, পড়াশুনোতেও মোটামুটি ভালো—কিন্তু কেউ চাকরি পায় না। প্রিয়ব্রতই ওদের মধ্যে সৌভাগ্যবান। সে তবু তিনবছরের মধ্যে চাকরি পেয়েছে।

সন্ধেবেলা আজও প্রিয়ব্রতকে দেখলাম সেই দলে। গল্প-লেখকরা হয়তো এখানে বর্ণনা করতেন যে প্রিয়ব্রত সগর্বে তার বন্ধুদের কাছে চাকরির গল্প করছে—তার আসল মাইনের চেয়েও বাড়িয়ে বলছে অনেক—। কিন্তু সেরকম

কিছুই হচ্ছে না এখন। ওর বন্ধুরা অন্য দিনের মতনই নানা গল্পে মশগুল—প্রিয়ব্রত একপাশে দাঁড়িয়ে আছে বিমর্ষ মুখে, তার চেহারায় একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব।

এবার আমি প্রিয়ব্রতর মন খারাপের কারণ বুঝতে পারলাম। সে একা চাকরি পেয়েছে, কিন্তু তার সমান যোগ্যতা সত্ত্বেও তার বন্ধুরা কেউ এখনো চাকরি পায়নি। চাকরি পেয়ে প্রিয়ব্রত ওদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এটা তার একধরনের স্বার্থপরতা। এইজন্যই তার মনের মধ্যে এরকম অপরাধবোধ। দেশে এখন এত বেকার—এর মধ্যে হঠাৎ একজন কেউ চাকরি পেলে, তার গর্বের বদলে লজ্জা পাবারই কথা।

৫

ছেলেটিকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, কী, মৃত্যুটাকে নেহাৎ ছেলেখেলা মনে হয় না? মাঝে-মাঝেই ইচ্ছে করে না, দুম করে হঠাৎ মরে গেলে কেমন হয়?

সেকথা অবশ্য জিজ্ঞেস করিনি, আমরা অন্যকথা বলছিলাম।

ছেলেটির বয়েস সতেরো-আঠারোর বেশি নয়, কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। অর্থাৎ ওর বয়েস আমার ঠিক অর্ধেক। সতেরো-আঠারো বছর আগে আমিও কলেজের ছাত্র ছিলাম। ওকে দেখে, আমার প্রথম কলেজ জীবনের কথা মনে পড়বেই। একটু মিলিয়ে দেখতেও ইচ্ছে করছিল।

একটা ব্যাপারে প্রথমেই মিল পেলাম। আমি ওকে আপনি বলে সম্বোধন করছিলাম, ও কোন আপত্তি করেনি। বয়স্কদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমাকে আপনি বলছেন কেন, আমি তো অনেক ছোট, আমাকে তুমি বলবেন—এধরনের কথা সেই প্রথম যৌবন থেকেই আমার পছন্দ হয় না। আমাকে সেই তখনই কেউ 'তুমি' বললে চটে যেতাম। আমিও এখনো কোন কলেজের ছেলেমেয়েকে তুমি বলি না। ষোলো বছর বয়েস হয়ে গেলে, চাণক্যের নীতি অনুযায়ী সবাই সাবালক, তখন সকলকেই সমান মানুষ হিশেবে সম্মান দেখানো উচিত। আপনি থেকে তুমি হবে বন্ধুত্ব গাঢ় হবার হিশেবে—তার সঙ্গে বয়েসের কী সম্পর্ক?

আর-একটা ব্যাপারেও ওর সঙ্গে আমার মিল আছে। আমার সামনে সিগারেট খাবার ব্যাপারে তার কোন দ্বিধা নেই। আমি অবশ্য কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম দুবছর একটাও সিগারেট খাইনি—তার কারণ, প্রথম-প্রথম দেখেছি, যতসব বাজে বখাটে ছেলেরাই সিগারেট খায়। আমার ধারণা ছিল, সিগারেট খাওয়া আজেবাজে ছেলেদেরই স্বভাব। থার্ড ইয়ারে উঠে যে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো সে ছিল চেইন

স্মোকার—এবং তার মতন মহৎ মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। যখন বুঝলাম, সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে ভালো ছেলে খারাপ ছেলে হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই, আমিও দু-একটা টানতে শিখলাম, তখন থেকে আমি আর গুরুজনদের দেখে সিগারেট লুকোই না। যেসব গুরুজন মনে করেন, ছোটরা তাঁদের সামনে সিগারেট টানলে তাঁদের সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে—তাদের সম্মানবোধ অত্যন্ত ঠুনকো, এবং সেই সম্মান তাঁদের প্রাপ্য নয়।

ছেলেটির সঙ্গে আমার অন্যান্য সাধারণ ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। কিন্তু আমি মনে-মনে তাকে কতকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলাম। তার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন, মৃত্যুটা নেহাৎ ছেলেখেলা মনে হয় না? আমাদের হতো। এতদিন যে বেচে আছি, সেটা নেহাৎ অ্যাকসিডেন্ট! স্কুল-কলেজে পড়ার সময় যে-কোনদিন মরে যেতে পারতাম! তাও, ভয় না-পেয়ে, দুঃখ না-পেয়ে, এমনিই হাসতে-হাসতে! প্রায়ই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হতো, অকারণে! তাছাড়া এমন সব কাজের ঝুঁকি নিতাম, মৃত্যু আসতে পারত যে-কোন সময়! কেন কলেজের চারতলায় বারান্দার রেলিং-এ উঠে দাঁড়িয়ে ব্যালান্স করে, বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে একটা চোদ্দ লাইনের পুরো কবিতা পড়েছিলাম? একটু পা হড়কালেই চিড়েচ্যাপ্টা হতাম! স্কুলে পড়ার সময় থেকে মিছিলে গেছি। স্কুলে পড়ার সময়েই গেছি ইউনিভার্সিটির সামনে বিক্ষোভ জানাতে—তখন ব্রিটিশ আমল, ঘোড়সওয়ার সাহেব-পুলিশ চার্জ করল একেবারে মিছিলের মধ্যে, আমরা ছুটতে-ছুটতে গিয়ে দাঁড়ালাম সিনেট হলের পাশে একটা ক্যান্টিন ছিল সেই গলিতে—দমাস করে একটা গুলি লালরঙের লোহার দরজা ফুটো করে দেয়ালে এসে লাগল। সেই দেয়ালে আমরা দশ-বারোজন দাঁড়িয়ে—আমরা যদি চার ইঞ্চি লম্বা হতাম—আমাদের একজনের মাথা ফুটো হয়ে যেত! কিন্তু ভয় পাইনি—তার পরের দিন আবার প্রতিবাদ মিছিলে গেছি।

স্বাধীনতার পর 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, ভুলো মাৎ!' স্লোগান দিয়েছি, ট্রাম আন্দোলনের সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে কী ইট মেরেছিলাম পুলিসের দিকে! বি-এ পরীক্ষার ঠিক দুদিন আগে আমাদের এক বন্ধুকে অ্যারেস্ট করল, তাকে ছাড়াবার জন্য থানায় গেছি, ও-সি বললেন, ধরো এটাকেও!

ছেলেটিকে মৃত্যুর কথাটা আমি জিজ্ঞেস করিনি, কিন্তু তার ব্যবহার ও ভাবভঙ্গীতেই আমি বুঝে গেলাম, মৃত্যুটা এখন ওর কাছেও ছেলেখেলা! খুব সম্ভবত, এখনকার ছাত্ররা আরো বেশি বেপরোয়া। এই বয়সে মৃত্যুর সঙ্গে সব ছেলেরই খুব প্রেম হয়। রবীন্দ্রনাথও তো এই বয়েসেই লিখেছিলেন, মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান!

ছেলেটিকে আর-একটি কথাও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল। কোন

মেয়েকে দেখে বুক কাঁপে? আমাদের তুলনায় এখনকার ছাত্ররা মেয়েদের সঙ্গে অনেক বেশি মেশার সুযোগ পায়। আলাপ করার ব্যাপারে দ্বিধা অনেক কম। আমি পাছে মেয়েদের সঙ্গে মিশে বখে যাই, সেইজন্য আমার বাবা আমাকে কো-এডুকেশনাল কলেজে পড়তেই দেননি। তাতেও কি তিনি মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা আটকাতে পেরেছিলেন? কোন বাবা মা'ই পারেন না, তবু ভুল করেন। পাড়ার মেয়ে, বন্ধুর বোন—এসব তো আছেই—তাছাড়াও কলেজের মর্নিং সেকশনে যে-মেয়েরা পড়ত, তাদেরও দু-একজনের সঙ্গে আলাপ করেছি। ওয়াল ম্যাগাজিন, কলেজ সোশ্যাল পার্টি মিটিং, থিয়েটার, সরস্বতী পুজো ইত্যাদি কত সুযোগ ছিল মেয়েদের সঙ্গে ভাব করার। সুতরাং, মেয়েদের দেখলেই বিগলিত হবার অবস্থা ছিল না। তবুও, কোন একটি বিশেষ মেয়েকে—দূর থেকে দেখলেই বুকটা কেঁপে উঠত, হঠাৎ তার হাতের লেখা কোথাও দেখলে সারা শরীর শিরশির করে উঠত। অনেক স্মার্টনেস সত্ত্বেও কখনো-কখনো সেই বিশেষ একটি মেয়ের মুখোমুখি হয়ে গেলে বোকা-বোকা হয়ে যেতাম।

এখন ছেলেমেয়েদের মেলামেশা অনেক সহজ, এখনো কারুর জন্য কারুর বুক কাঁপে? নাকি সবই সহজ ব্যাপার? এখন অনেক জায়গায় ছাত্ররা ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে তুই-তুই বলে কথা বলে। এটাও এমন কিছু নতুন নয় আমার কাছে। আমরাও কোন মেয়েকে আদর করার জন্য বা রাগাবার জন্য বলতাম, কিরে খুকি!

খিস্তিখাস্তা কিংবা রাস্তাঘাটে মেয়েদের আওয়াজ দেওয়ার ব্যাপারেও নতুনত্ব খুব বেশি নেই। আগেও ছেলেরা দিত, এখনো দেয়। তবে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে খিস্তি শ্ল্যাংয়ের মাত্রা কি বেড়েছে? যত রাজ্যের অশ্লীল রসিকতা তখন আমাদের মধ্যে চালু ছিল, কিন্তু রসিকতা ছাড়া নিছক খিস্তি আমাদের দলের বন্ধুরা কেউ দিত না। তবে, কয়েকদিন আগে, বাসের দোতলায় একদল ছাত্র মেয়েদের সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য করেছিল—কিন্তু দারুণ চতুর আর চোখা-চোখা মন্তব্য, আমার মোটেই খারাপ লাগেনি। ঐ বয়েসে মেয়েদের সম্পর্কে ছেলেরা একটু বেশি উৎসাহী হয়ে উঠবেই, দল বেঁধে থাকলে কিছু চ্যাংড়ামি করবেই—তবে সে ব্যাপারটাও যদি তারা বুদ্ধি[illegible] করে তবে জীবনের অন্যান্য ব্যাপারেও বুদ্ধির পরিচয় দেবে। [illegible] এঁচো[illegible] কিংবা [illegible]কারাই মেয়েদের দেখলে নিছক কুৎসিত কথা বলে [illegible]বা মুখ লুকোয়।

পড়াশুনো [illegible]কার তুলনায় এখন কেম[illegible]ছে, সে কথা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। পড়া[illegible] আমরাও করিনি, ওরা[illegible] করে না। কোনকালে আবার কলেজের ছেলের[illegible] মন দিয়ে লেখাপড়া করেছে[illegible] সেই গাছতলায় টোলফোল যখন
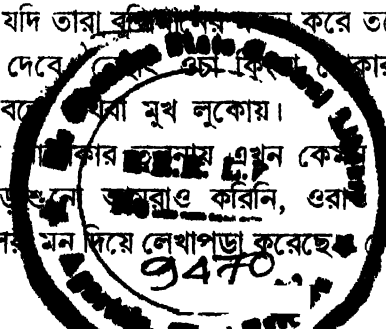
ছিল, তখন বোধ হয় সবাই মন দিয়ে পড়াশুনো করত—কলেজ বিল্ডিং যবে থেকে হয়েছে, তখন থেকেই পড়াশুনোর ব্যাপারটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। কলেজজীবনে পড়াশুনোর চেয়ে অন্যান্য অনেক ব্যাপারই বেশি জরুরি—সেই স্বদেশি আমল থেকে—শুধু-শুধু লোকে একালের ছাত্রদের দোষ দেয়। চিরকালই কয়েকজন করে ছাত্র অভ্যেসবশত বাড়িতে পড়াশুনো করে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়ে যায়, কিছু ছাত্র সারা বছর ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষার আগে প্রাণপণে ম্যানেজ দিয়ে ঠিক পাস করে যায় (আমরা ছিলাম এই দলে) আর কিছু বোকা ছেলে ফেল করে। ফেল করার জন্য বড্ড বেশি বোকা হওয়া দরকার। পরীক্ষার হলে টোকাটুকির ব্যাপারটাও নাকি অনেক বেড়েছে এখন, শুনতে পাই। আমাদের সময়ও কেউ-কেউ টুকত, কিন্তু আমরা জানতাম যাদের পাস করার কোন আশা নেই, তারাই টুকে সান্ত্বনা পায়। টুকে কেউ পাস করেছে কিংবা ভালো রেজাল্ট করেছে, একথা জীবনে শুনিনি! এখন করে শুনলে সত্যি আশ্চর্য হব!

এখন ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতির ঝোঁক বেড়েছে। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় না। এটাকেও স্বাভাবিক মনে হয়। তবে, আমাদের সময় রাজনীতি ছিল অনেক সরল—দল ছিল মাত্র দুটি, অর্থাৎ সব সময় আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল একটাই। এসটাব্লিশমেণ্টের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে, বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরাও অসহ্য রাগ পোষণ করতাম। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই ব্যবস্থা বদলাতে হবে। কিন্তু সেই বদলের পথ নিয়ে এত মতবিরোধ, এত দলাদলি ছিল না। এখন এত দলাদলির মর্ম বুঝতে পারি না, মনে হয়, আসল উদ্দেশ্যটাই পিছিয়ে যাচ্ছে।

তবে, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে খুব ইচ্ছে হয়। ছাত্ররা পরস্পরের মধ্যে খুনোখুনি করছে কী করে? এই ব্যাপারটা আমাদের সময়ের চেয়ে একেবারে আলাদা। আমাদের সময়, একজন ছাত্রের গায়ে যদি কেউ হাত দিত তৎক্ষণাৎ আমরা গোটা ছাত্রসমাজ একজোট্টা হয়ে যেতাম। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি থাকলেও ছাত্র বলতেই বোঝাত একটা দল। অন্য সবাই ছাত্রদের সাঙ্ঘাতিক ভয় করত এইজন্য। ছাত্রদের মধ্যে এত ভেদাভেদ, এত দলাদলি আমরা দেখিনি। নিজেদের মধ্যে মতের পার্থক্য ছিল, প্রচণ্ড তর্কাতর্কি কিংবা ঘুঁষোঘুঁষিও হতো—পরে আবার মিটমাট করে নেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক, মতের পার্থক্যটাকে আমরা ব্যক্তিগত রেষারেষির পর্যায়ে আনিনি। বোমা কিংবা ছোরাছুরির এত ব্যবহার ছিল না, তাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় একজন ছাত্র আর-একজন ছাত্রকে খুন করে ফেলেছে—এটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। আগে পুলিসের গুলিতে একটি ছাত্র মারা গেলে আমরা হরতাল ডেকে তুমুল কাণ্ড বাধাতাম! চাঁদা তুলে টাকা দিতাম তার

পরিবারকে, তার মাকে গিয়ে বলতাম, আমরাও আপনার ছেলের মতন। ও গেছে, কিন্তু আমরা আছি ! আর এখন ? প্রায়ই নিজেদের মধ্যে মারামারিতে দু'-একজন করে ছাত্র মারা যায়—কেউ পরের দিন তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাদের কথা অন্য ছাত্ররা ভুলে যায়—এ ব্যাপার আমরা কখনো দেখিনি, স্বীকার করছি, এটা সম্পূর্ণ নতুন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয়। খুব শৈশবে, আমরা সবাই প্রায় অকারণে অনেক নিষ্ঠুরতা করি। বেড়ালকে ছুড়ে ফেলেছি জলে, কুকুরের ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে হাততালি দিয়েছি, গুলতি দিয়ে মেরেছি শালিক পাখি, রাস্তার গরুর ল্যাজ মুড়িয়েছি, মাকড়সা ধরে ঠ্যাং ছিঁড়েছি, টিকটিকির ল্যাজ কেটে নিয়েছি, কুকুর-বেড়াল দেখলেই ক্যাঁৎ করে লাথি মেরেছি। এখন মানুষকে কষ্ট দেওয়া তো দূরের কথা, জন্তু জানোয়ারের প্রতি মায়া দয়া বেড়েছে। এখন আহত চড়াই পাখির সেবা করতে ভালো লাগে, মাকড়সাটাকেও আস্তে-আস্তে তাড়া দিয়ে দেয়ালের ওপর দিকে তুলে দিই। মনে হয়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যখন অপরিণত থাকে, তখনই সে অনাবশ্যক হিংসার আশ্রয় নেয়। বোধশক্তি যখন আসে, মানুষ তখন ভালোবাসতে শেখে, তখন নিষ্ঠুরতাটা নিতান্ত স্থূল হয়ে যায়। অপরিণত কিংবা বিকৃতমস্তিষ্করাই যুক্তিহীন হিংসার আশ্রয় নেয়। নিজের প্রাণ দিয়ে দেবার ইচ্ছের মধ্যে একটা তেজ ও দীপ্তির পরিচয় আছে, কিন্তু অন্যের প্রাণহরণের ইচ্ছেটা মানুষের এত কালের সভ্যতার পরিপন্থী।

তাছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই উদ্দেশ্য নিশ্চিত মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করা। এটা একটা ব্রতের মতন, এ কাজ যিনি নেবেন তাঁকে অনেক স্বার্থত্যাগ করতে হবে, অনেক সহিষ্ণু ও সংযমী হতে হবে—কারণ, তিনি তো আর-পাঁচজন মানুষের মতন নন—আর সবাই তো নিজের-নিজের ছোটখাটো স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। যিনি ঐ ব্রত নিয়েছেন, নরহত্যাকারীর ভূমিকায় আমি তাঁকে কিছুতেই মানাতে পারি না। যে আদর্শের জন্যই হোক, কোনো মানুষকে খুন করার গ্লানি কখনো মুছতে পারে না। খুনী কখনো আদর্শবাদী হতে পারে না।

কিংবা, আমি হয়তো এসব কিছুই বুঝি না।

৬

দূর ছাই, কিছু ভালো লাগে না !

এই একটা বাক্য যে জীবনে কতবার কত লোকের মুখে শুনলাম ! কেন যে ভালো

লাগে না, কিংবা কি হলে যে ভালো লাগতো, তা কেউ বলতে পারে না।

কফি হাউসে চারজন ছেলেমেয়ে অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা দিচ্ছিল। চারজনেরই পোশাক-টোশাক বেশ ভালো, সুলক্ষণযুক্ত মুখ, কাপের পর কাপ কফি আসছে, অনবরত পুড়ছে সিগারেট। সাহিত্য, সিনেমা, রাজনীতি, প্রফেসারের সমালোচনা ইত্যাদি কতরকম বিষয় আসছে, চলে যাচ্ছে, আমি শুনছি পাশের টেবিল থেকে। দারুণ উৎসাহে ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর। হঠাৎ ওদের মধ্যে থেকে একটি মেয়ে চেয়ারটা পেছনদিকে হেলিয়ে বলে উঠল, দর ছাই, কিচ্ছু ভালো লাগে না!

আমি মেয়েটির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালাম, ওকে বোঝার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছু বোঝা গেল না।

মনে পড়ল, এই কথাটা আমি গতকালই শুনেছি। গতকাল বসন্তদা আমাকে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বসন্তদা মস্ত বড় চাকরি করেন। একটা বিলিতি কোম্পানিতে দুনম্বর বস। মাঝে-মাঝে ওর বাইরে খাওয়ার শখ হয়, বিশেষতঃ বউদি বাপের বাড়ি গেলে। তখন আর বাড়িতে বাবুর্চির রান্না ওর মুখে রোচে না, হোটেলের বাবুর্চির রান্নাই পছন্দ হয়।

পার্ক স্ট্রিটে একটা জমকালো হোটেলে নিয়ে এলেন আমাকে—যেরকম হোটেলে আমি একা-একা ঢোকার সাহসই পাব না কখনো, তাছাড়া পকেটে অত পয়সা থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না।

খাবারের অর্ডার দেবার আগে বসন্তদা হুইস্কির অর্ডার দিয়ে বসলেন। ঠাণ্ডা ঘর, মৃদু আলো, সুবেশ নরনারী—বাইরের গোলমাল বা চিটচিটে গরম—কিছুই এখানে টের পাওয়া যায় না। বসন্তদা হুইস্কির গেলাসে মৃদু চুমুক দিতে লাগলেন—আর আমি, ইয়ে, আমি খাচ্ছিলাম লেবুর রস—সাধারণত লেখকদের ওটাই খেতে হয় কিনা!

বেয়ারাকে ডেকে সিগারেট আনতে দেবার জন্য বসন্তদা মানিব্যাগ বার করলেন—আমি দেখলাম, সেখানে থরে-থরে নোট সাজানো। বসন্তদাকে বেশ সার্থক মানুষ বলা যায়—অর্থাৎ সাধারণ জীবনে সার্থকতা বলতে যা বোঝায়। যোধপুরে ফ্ল্যাট কিনেছেন, ফুটফুটে দুটি ছেলেমেয়ে, দুবছরে একবার বিদেশে যান অফিসের কাজে। বসন্তদা কলকাতা শহরের দোষ গুণ নিয়ে আলোচনা করতে-করতে বললেন, যাই বলিস, এ শহরটার একটা নেশা আছে, আমি তো বিদেশে গেলেও—

কথায়-কথায় বেশ রাত হয়ে গেল। খাদ্যদ্রব্য শেষ হবার পর বসন্তদা আবার পানীয়ের অর্ডার দিয়েছিলেন। ঘড়ি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে আমি বললাম, বসন্তদা, চলুন, এবার বাড়ি যাওয়া যাক!

—দাঁড়া, দাঁড়া, এত ব্যস্ত হবার কী আছে?

—না, চলুন, বেশ রাত হয়ে গেল!

বসন্তদা সিগারেটটা বেশ বড় অবস্থাতেই অ্যাশট্রেতে গুঁজলেন, চশমাটা খুলে চোখটা মুছলেন, তারপর ভুরুদুটো কুঁচকে অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, দূর ছাই, কিচ্ছু ভালো লাগে না!

চশমা খুললে অনেক লোকেরই মুখের চেহারাটা বদলে যায়। তখন স্বাভাবিক মুখটাই মনে হয় অস্বাভাবিক—চশমাটা যেন শরীরেরই অঙ্গ। আমি বসন্তদার পরিবর্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, কী ভালো লাগে না, কেন ভালো লাগে না? আর কী চান বসন্তদা? কিছুই বুঝতে পারলাম না!

একজন বেকার ছেলে কিংবা কোন দুঃখী বিধবা নারী যদি এরকম বলে, তাহলে একটা মানে বোঝা যায়। কিন্তু বসন্তদা কিংবা কফি হাউসের সেই প্রাণোচ্ছল সুরূপা মেয়েটি কেন এরকম কথা বলে?

হতে পারে এটা একটা সাময়িক ব্যাপার, এটা একধরনের ভাববিলাস। কিন্তু কথাটা আজকাল বড্ড বেশি শুনি। কোথাও কোন তৃপ্তি নেই। কথাটা শোনার পরই আমি তীক্ষ্ণভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি। কফি হাউসের সেই অচেনা মেয়েটি কিংবা বসন্তদার মুখে সেই মুহূর্তটায় কিন্তু আমি কোন ভাববিলাসের চিহ্ন দেখিনি, দেখেছি একটা অদ্ভুত রহস্যময় রেখা। সেই রেখাটার নামই ভালো-না-লাগা।

বেশ কিছুদিন আগে আমি রাঁচির কাছে নেতার হাটে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম। নেতার হাটে আমি পরেও একবার গেছি, কিন্তু প্রথমবারের ভালো লাগার কোন তুলনা হয় না। পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সেই এক অপরূপ জায়গা। ডাকবাংলোর সামনের চত্বরটায় দাঁড়ালে যতদূর চোখ যায়—বিশাল উপত্যকা—স্পষ্ট দেখা যায় পৃথিবীর কোন এক সীমানায় আকাশ এসে মিশে গেছে—ডানদিকের পাহাড়গুলোর মাথায় হাল্কা-হাল্কা মেঘ—এক-একটুকরো ছেলেবেলার স্বপ্নের মতন। রাত্রিবেলা দেখা যায়, দূরের জঙ্গলে কারা যেন আগুন জ্বালিয়েছে, কিংবা দাবাগ্নি,—বিরাট একটা মালার মতন আলো। মাইকেলের অনুকরণ করে বলা যায়, কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, বনানী! যাই হোক, প্রকৃতিবর্ণনা আমার হাতে একদম আসে না, পাঠক-পাঠিকারা কল্পনা করে নিন!

নেতার হাটের মতন জায়গায় হাসিখুশি মানুষরাই যায়। কিংবা মুখগোমড়া মানুষরা গিয়েও হাসিখুশি বইয়ের মলাট হয়ে পড়ে। নানারঙের শৌখিন পোশাক, ঝলমলে মুখ—এইসবই স্বাভাবিক দৃশ্য। নবদম্পতিদেরও দেখা যায় খুব।

রাঁচি থেকে একটা ভাড়া করা জিপে আরো কয়েকজনের সঙ্গে শেয়ার করে

এসেছিলাম আমি। সেই জিপেই একটি দম্পতির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাদেরও নববিবাহিত-যুগল মনে করে, নেতার হাটে পৌঁছে আমি তাদের এড়িয়ে চলতাম। নবদম্পতিদের নির্জনতার সুযোগ দেওয়া উচিত, তাদের পাশে-পাশে ঘুরে বকবক করার মতন মূর্খতা আর হয় না।

কিন্তু ওরা দুজনেই বারবার আমার সঙ্গে ডেকে কথা বলতেন। শুধু আমার সঙ্গে নয়, প্রায় সবার সঙ্গেই; ভারী আলাপী ও মিশুক ওরা দুজনেই, তাছাড়া একেবারে নবদম্পতি নয়—দুবছর আগে বিয়ে হয়েছে। কী যেন নাম ছিল ওদের ? হ্যাঁ, মনে আছে, সমীপেন্দ্র আর ভাস্বতী—ওদের নাম বা চেহারা একটুও ভুলিনি।

এমন প্রাণখোলা আর সহজ-সরল স্বামী-স্ত্রী আমি আগে কখনো দেখিনি—দুজনেই যেমন সুস্থ স্বাস্থ্যবান, তেমনি যে-কোন ঘটনা থেকেই ওরা একটা কিছু আনন্দ খুঁজে নিতে পারে। বেশ আলাপ হয়ে যাবার পর জানলাম, ওদের দুজনেরই খুব ঘুরে বেড়ানোর নেশা—দু-তিনমাস অন্তর-অন্তরই ওরা কোথাও বেড়াতে চলে আসে। কী যেন একটা পারিবারিক ব্যবসা আছে, ছুটিছাটির অসুবিধে হয় না।

ডাকবাংলোর চত্বরের আলসেতে বসে আছে সমীপেন্দ্র আর ভাস্বতী, আমি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি। সামান্য-সামান্য শীত, ভারী মনোরম হাওয়া দিচ্ছে, আকাশে একটুও মেঘ নেই তখন—অতদূর পর্যন্ত অতখানি আকাশ আগে কখনো দেখিনি—সেখানে যুঁই ফুলের মতন তারা ফুটে আছে—আর, এর চেয়ে বেশি আনন্দের—

আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, সমীপেন্দ্রর কী একটা যেন কথার উত্তরে ভাস্বতী বলল, দূর ছাই, কিচ্ছু ভালো লাগে না ! আজও কানে ভেসে আসে সেই গলা। আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। এইরকম পরিবেশে, ভাস্বতীর মতন মেয়ের মুখে এরকম কথা শুনব, কল্পনাই করিনি। অন্ধকারে আমি ভাস্বতীর মুখ দেখতে পাইনি—কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে, 'কিচ্ছু' শব্দটার ওপর সে বেশি জোর দিয়েছিল—আর কণ্ঠস্বর ঠিক কান্না মেশানো নয়, একধরনের অভিমান ও অতৃপ্তিতে ভরা। কী চায় ভাস্বতী ? আর কোন ভালোলাগার জন্য তার এত অতৃপ্তি ? কিন্তু সে 'কিচ্ছু' শব্দটার ওপর জোর দিয়েছিল।

ভাস্বতীর সঙ্গে আলাপ কখনো এতটা গাঢ় হয়নি যে তাকে এই ব্যাপারে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারি। আমি তখন সেখান থেকে সরে গিয়েছিলাম, পরদিন সকালেই ওরা নেতার হাট ত্যাগ করল। আর কখনো দেখা হয়নি। তবু, প্রায়ই, অন্ধকারে হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বলা ভাস্বতীর ঐ কথাটার রহস্য বহুদিন আমাকে ভাবিয়েছিল।

এখন তো এই কথাটা প্রত্যেক দিনই ট্রামে-বাসে, পথচলতি মানুষের মুখে শুনতে পাই—সার্থক, ব্যর্থ—কোন লোক বাদ নেই। এমনকী, একটা তিন বছরের বাচ্চার মুখ থেকে শুনলেও বোধ হয় আর অবাক হব না!

৭

এবার পুজোয় কোথায় যাচ্ছেন?

প্রতিদিন গড়ে অন্তত চারবার করে এই প্রশ্নটা শুনতে হয় এখন। এমনকী আমিও হঠাৎ কারুর সঙ্গে দেখা হলে, প্রথমে কোন কথা খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলি, কি, পুজোয় কোথাও যাচ্ছেন নাকি? যদিও আমার কিছু যায় আসে না তাতে, অন্য কেউ কাশ্মীর বা কন্যাকুমারিকা, যেখানেই যাক, তাতে আমার কী?

আমি কোথাও যাচ্ছি না।

শোনা যাচ্ছে, এবার পুজোয় নাকি কলকাতায় বিশেষ কেউ থাকছেই না। এবার দলকে দল বাইরে পালাচ্ছে। পুরী, মধুপুর, দার্জিলিং, রাজগীর টাইপের জায়গাগুলো এবার কলকাতার বাঙালিতে ছেয়ে যাবে। কারণ, কলকাতায় টানা মাসের পর মাস ধরে যে খুন-জখম, বোমা-গুলি চলছে রোজ, এর কবলে যারা পড়েনি, তাদেরও এইসব খবর শুনে-শুনে নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হবার মতন অবস্থা। পুজোর ক'টা দিন তাই তারা একটু শান্তিতে থাকতে চায়, প্রকৃতির সজলতার দিকে তাকিয়ে জুড়োতে চায় চোখ।

আমি কলকাতাতেই থাকব, কলকাতা যদি ফাঁকা হয়ে যায়, সেই দুর্লভ দৃশ্য দেখার সুযোগ ছাড়ব না। যখন যেখান থেকে খুশি ট্রামে-বাসে উঠতে পারব, এটা কী কম কথা নাকি? এমনকী পকেটে যদি টাকা থাকে, তাহলে হয়তো ট্যাকসি চাইলে ট্যাকসিও পেয়ে যেতে পারি। এসব অভিজ্ঞতা তো বহুদিন হয়নি।

ট্রাফিক জ্যামে বাসটা থেমে আছে, আমি হ্যাণ্ডেলটা ধরে ঝুলছি, হাত টনটন করছে, তবু হাত ছেড়ে পা মাটিতে রেখে বিশ্রাম করার ভরসা নেই, কারণ, বাসের হ্যাণ্ডেলে যে চার ইঞ্চি জায়গা আমার জন্য বরাদ্দ, সেটা যদি ফস্কে যায়! সেই অবস্থায় তাকিয়ে দেখছি পাশের আলো-ঝলমল দোকানগুলোর দিকে।

একটা পোশাকের দোকান থেকে বেরিয়ে এল দুটি মেয়ে। দুজনেরই হাতে অনেকগুলো শাড়ির প্যাকেট। খুশিতে টসটস করছে মুখ। শুধু শাড়ি কেনার জন্যই নয়, টাকা খরচ করতে পারলেই মেয়েদের মুখে একটা স্বর্গীয় হাসি ফোটে। নিয়নের আলোয় তাদের মুখদুটি সত্যিই দিব্য।

দু-একটা টুকরো-টুকরো কথা শুনতে পেলাম। তোরা কার্সিয়াং যাচ্ছিস? কবে স্টার্ট করছিস? দার্জিলিং-এ আসবি নিশ্চয়ই!

আমরা জলপাইগুড়িতে মামার বাড়ি যাচ্ছি—ওখান থেকে দার্জিলিং-এ আসব...তোদের ওখানকার ঠিকানা...

বাস ছেড়ে দিল। ঐ মেয়েদুটি জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং যাবে। আমি কোথাও যাব না, কলকাতাতেই থাকব। তবে, এবার সত্যি কথাটা বলা যায়, আমি যে নিছক কলকাতার প্রেমেই কলকাতা থেকে যাচ্ছি, তা নয়। এবার আমার পকেট গড়ের মাঠ। এবার পুজোতে আমি গড়ের মাঠেই ঘুরব একা-একা। এবার আমার খুবই খারাপ দিন কাটবে। কারণ, বোমার আওয়াজের থেকেও পুজো প্যান্ডেলের বিকট হিন্দি গানের চিৎকার আমার অসহ্য লাগে।

তরুণীদুটির কথা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। দার্জিলিং ম্যালে একদিন ঐ দুই তরুণীর আবার দেখা হবে। একজন আসবে কার্সিয়াং থেকে, আর-একজন জলপাইগুড়ি—রোমাঞ্চকর শীত, উজ্জ্বল লাল-হলদ রঙের গরম পোশাক...শৌখিন ঘোড়ায় চড়া—যে মেয়েটির রং খুব ফর্সা, তার একটা গোলাপী রঙের কোট আছে, যে-মেয়েটি একটু কালো, সে গায়ে জড়িয়েছে একটা কাজ করা শাদা শাল—কী একটা কথায় যেন ওরা হাসছে, আমি একটা দোকানের দরজার পাশ দিয়ে ওদের দেখছি।

আমি? হ্যাঁ, আমিই তো আমার টুইডের কোটটা গায়ে দিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চালিয়াৎ ছোকরার মতন দাঁড়িয়ে আছি। মেয়েদুটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি হাসলাম। ওরা অবাক হলো, ওরা চোখ নিচু করল, পরস্পরের দিকে তাকাল, নীরব প্রশ্নের পর আবার দেখল আমার দিকে।

এবার আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, কী চিনতে পারছেন?

—না তো!

—চিনতে পারছেন না? উই মেট বিফোর?

ফর্সা মেয়েটি এবার মিহি গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি কাকে বলছেন বলুন তো?

আমি হেসে বললাম, আপনাদের দুজনের সঙ্গেই আমার আগে দেখা হয়েছে। অবশ্য, আপনাদের সেটা মনে থাকবার কথা নয়। আমি একটা বাসের পা-দানি থেকে দেখেছিলাম আপনাদের। ভবানীপুরের কাছে আপনারা একটা শাড়ির দোকান থেকে বেরুচ্ছিলেন—

এরপর কী আলাপ জমবে না? পাঁচ মিনিট বাদে কী বলা যাবে না, চলুন, কোথাও বসে একটু চা খাওয়া যাক?

কে এসব কথা বলছে ? আমি ? নাকি, কোন সিনেমায় এরকম দৃশ্য দেখেছি ? না, কোন সিনেমায় নয়, সিনেমা হলে দুটো মেয়ের বদলে একটা মেয়ে থাকত। তবে, বলাই বাহুল্য, হঠাৎ ওভাবে কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমানো আমার ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু মনে-মনে কথা বলায় কে আটকাচ্ছে ? আহা, পুজোর মধ্যে ঐ মেয়েদুটি যখন আবার দার্জিলিং-এ মিলিত হবে,তখন ওরা জানতেও পারবে না, একটি অনুপস্থিত আত্মা দূর থেকে লক্ষ করছে ওদের। ওদের সঙ্গে কথাও বলছে। কোন অসাফল্য নেই।

এই খেলাটায় আমি মেতে উঠলাম। পরদিন বাসের দোতলায় তিনটি ছেলে তুমুল আলোচনা করছিল, ওরা এবার পুজোয় পায়ে হেঁটে সারা ত্রিপুরা ঘুরে বেড়াবে। আগরতলা পর্যন্ত যাবে প্লেনে, তারপর পায়ে হেঁটে—। আমিও ওদের সঙ্গী হয়ে পড়লাম মনে-মনে।

দল বেঁধে কোথাও বেড়াতে গেলে, তিনজনের বদলে চারজনে যাওয়াই সুবিধেজনক। তাস খেলার পার্টনারের অভাব হয় না। বিছানা বা জিনিসপত্র ভাগাভাগি করার সুবিধে হয়। কোথাও সাইকেল-রিকশা ভাড়া করতে গেলে—তিনজনে এক রিকশায় চাপতে পারবে না, দুটো রিকশা নিলে একজনের ভাড়া বেশি পড়ে যাবে।

এবার পুজোয় আমি ওদের সঙ্গে-সঙ্গে ত্রিপুরায় ঘুরব। ওদের সঙ্গে পাশাপাশি শোব এক বিছানায়, সিগারেট ভাগাভাগি করে খাব। ওরা যখন ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির কিংবা উদয় সাগর দেখতে যাবে, তখন আমিও ওদের সঙ্গী। ওরা জানতেও পারবে না—অশরীরী একজন ওদের সঙ্গে চতুর্থ হয়ে ঘুরছে।

রত্নামাসিরা যাচ্ছেন গোপালপুর-অন-সী। রত্নামাসি বললেন, তুইও যাবি আমাদের সঙ্গে, চল না ? আমরা তো অনেকে মিলে যাচ্ছি, কোন অসুবিধে হবে না।

আমি বললাম, ওরে বাবা, না, না, আমি যেতে পারব না ! কলকাতায় আমার অনেক কাজ !

রত্নামাসি বললেন, এমনিই তো কত কাজ করে উল্টে দিচ্ছিস ! পুজোর মধ্যে আবার কাজ কী রে ?

—দারুণ জরুরি কাজ আছে আমার !

দূর সম্পর্কের মাসি বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলে হুট করে রাজি হয়ে যেতে নেই। তাতে প্রেস্টিজ থাকে না। কিন্তু আমার গোপালপুর যাওয়ায় কেউ বাধা দিতে পারবে না।

বেহরামপুরে রত্নামাসিরা যখন গোপালপুরের বাসে উঠবেন, তখন আমিও কী বাসের জানলার ধারে একটা সীটে বসে নেই ? কল্পনায় ভ্রমণের সুবিধে এই,

তাতে ঠিক জানলার ধারের সীটটা পাওয়া যায়—বাস্তবে বরং অনেক সময় জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। আমি সাঁতার জানি, ওখানকার সমুদ্রে সাঁতার কাটব সারাদিন। রত্নামাসির ছোট ছেলে রঞ্জুকে সাঁতার শিখিয়ে দিয়ে ক্রেডিট নেব। আর কেউ যদি দৈবাৎ বেশি জলে চলে গিয়ে হাবুডুবু খায়—তাকে উদ্ধার করে আমি সিনেমার হীরোর মতন...। দেব নাকি সেরকম একটা সিচুয়েশন? সন্ধেবেলায় বালুকাবেলায় বসে দেখব দূরে অন্ধকারে ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাসের খেলা—কাছেই কে যেন রিনরিনে গলায় গাইছে রবীন্দ্রসঙ্গীত—।

এবার পুজোয় আমি কোথাও যাব না, আমি অনেক জায়গায় যাব।

এবার পুজোয় আমার মতন যাদের পকেট গড়ের মাঠ, তারা আমার মতন এই খেলাটা খেলে দেখুন-না!

৮

সব চেয়ে স্বাভাবিক ছিল কী, জলপাইগুড়ির সর্বনাশা বন্যার সময় যেমন কলকাতার পথে পথে মিছিল বেরিয়েছে, দেশের অন্য অঞ্চলের অগণিত মানুষ যথাসাধ্য টাকা পয়সা, চাল ডাল, কাপড় চোপড়, কম্বল দিয়ে সাহায্য করেছে, দলে-দলে যুবকেরা গেছে জলপাইগুড়িতে ত্রাণকার্যে—তেমনি এবারেও ঢাকা-বরিশাল-ভোলার ভয়ংকর বন্যার পরও এখানকার মানুষ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। কলকাতার পথে-পথে আবার বেরুবে আবেদনময় মিছিল, যথাসম্ভব সাহায্য নিয়ে এখানকার ছেলেরা চলে যাবে সীমান্তের ওপারে, এখানকার সাংবাদিকরা ওখানে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিখবে। এখন কিছুদিনের জন্য আর-সব কোলাহল, দাপাদাপি বন্ধ থাকবে। কেননা, আমাদেরই ঘরের পাশে তেইশ লক্ষ মানুষ আজ বিপন্ন, মৃতের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। কথাটার ওপর জোর দেবার জন্য আমি আবার বলছি, তেইশ লক্ষ মানুষ আজ বিপন্ন। একই ভাষা, একই সংস্কৃতির খুব চেনাশুনো মানুষ।

কিন্তু যা স্বাভাবিক, তা আর এখন হয় না। আমাদের নেতৃস্থানীয় কারুর মনে এই বন্যার জন্য কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছে—এরকম চিহ্ন আমার চোখে পড়েনি। দিল্লিতে অবশ্য কিছু মামুলি ঠোঁটবার্তা দেখানো হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এখন রাশি-রাশি সাহায্য উড়ে আসবে, বর্বর শ্বেতাঙ্গ দেশগুলি থেকে দলে-দলে ছেলেমেয়ে প্রাণ বিপন্ন করে ওদের সাহায্যের জন্য ছুটে যাবে। শুধু বাঙালির বিপদে বাঙালি যাবে না। এবং এরকম একটা সাংঘাতিক ঘটনার পরও সীমান্তের

দরজা খুলবে না। কিংবা তাও ঠিক বলা যায় না, এখানকার ছেলেরা যদি সাহায্য নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিত, তাহলেও সীমান্তে তাদের আটকানো হতো কিনা আমি জানি না। বন্যা তো সীমান্ত মানে না—বন্যায় ভেসে আসা পাকিস্তানী জেলেরা এখানে এসে আশ্রয় নেয়—যেমন জলপাইগুড়ি থেকে অসংখ্য মৃতদেহ পাকিস্তানে ভেসে গিয়েছিল।

ভিয়েৎনামের নিপীড়িত কিন্তু অদম্য সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশ্যে সমর্থন ও সহানুভূতি জানানো যেমন একটা স্বাভাবিক ঘটনা, তেমনি প্রতিবেশীর এই বিরাট প্রাকৃতিক বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াও একটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্বাস ছাড়া আর কোন বিশ্বাসেরই দাম নেই, এটা আমি বুঝতে পারি না। মাসখানেক আগেও আমি নিজেকে বেশ আধুনিক মনে করতাম। এখন আর আধুনিক নই। মানবতাবোধ যদি একটা নিছক প্রাচীন সংস্কার হয়, তাহলে আমিও প্রাচীনপন্থী।

জলপাইগুড়ির সাংঘাতিক বন্যা যখন হয়, তখন আমি দিল্লি ছিলাম। ওখানে বসেই খবরের কাগজে প্রথম খবরটা দেখি। বলাই বাহুল্য, কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতেই সেই সংবাদ বিস্তৃতভাবে বেরিয়েছিল, দিল্লির বা সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে এ ঘটনার স্থান ছিল সৎসামান্য। দিল্লির প্রবাসী বাঙালিরা এ খবরে দারুণ বিচলিত হয়েছিলেন, অনেকে যথাসাধ্য সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লির অবাঙালি অধিবাসীদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখিনি। কেউ-কেউ অবশ্য জিব দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করেছেন। পেরু বা টার্কির ভূমিকম্পের সংবাদ শুনলে যেমনটা হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের এই বিপর্যয়, কারুরই নিজের ব্যাপার নয়—প্রায় যেন বিদেশের ঘটনা। তবে, কলকাতার খুনোখুনির খবর কিংবা শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় অনেকে বিচলিত হয়—কারণ, এর সঙ্গে সর্বভারতীয় ব্যবসায়িক প্রশ্ন জড়িত। রাজনীতি কিংবা ব্যবসার সম্পর্ক ছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে কোন আত্মীয়তার বন্ধন নেই। বিলেতের আচার ব্যবহার বা সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের আচার ব্যবহার-সংস্কৃতির যতটা তফাৎ—দিল্লির সঙ্গেও প্রায় ততটাই।

কিন্তু বাংলাদেশের এক খণ্ডের জন্য বাংলাদেশের আর-একখণ্ডের সাধারণ মানুষের মনের ভাব একরকম হতেই পারে না। পশ্চিম বাংলার অন্তত অর্ধেক মানুষের মনে এখনো পূর্ব বাংলার স্মৃতি জাগরূক। রাজনীতির ছুরি এখনো হৃদয়ের সেই অংশটা কেটে বাদ দিতে পারেনি। এবার কয়েকটা ছোট-ছোট ঘটনা বলি।

সকালবেলা বাজারে গিয়েছিলাম। এবার পুজোর আগে হাওড়া-হুগলী-চব্বিশ পরগণায় যে বন্যা হয়ে গেল তার জন্য তরকারির বাজারে এখন দারুণ টান।

জিনিসপত্রের এত দাম বাড়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেই দোকানীরা বন্যার কথা বলত খেদের সঙ্গে। আজ দেখলাম অন্যধরনের ছবি।

তরকারির দোকানে খবরের কাগজ থাকাটা খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সকালবেলার দিকে বেশ ভিড়, দোকানদারদের কাগজ পড়ার সময় কোথায়? কিন্তু আজ আমার চেনা তরকারির দোকানে একটা খবরের কাগজ ঘিরে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে চার-পাঁচজন। একজন গলা চড়িয়ে বলল, এই দেখেছিস, তোদের বরিশালে কী অবস্থা!

সঙ্গে-সঙ্গে লাউকুমড়োর দোকানের দোকানী তার দোকান ছেড়ে উঠে এসে বলল, কই দেখি, দেখি! বরিশালের কোন-কোন থানা? আরে সর্বনাশ! পটুয়াখালিতে যে আমাগো মামাবাড়ি ছিল! সব ভেসে গেছে!

একজন জিজ্ঞেস করল, তোর মামাবাড়িতে কেউ আছে এখনো?

সে বিষণ্ণভাবে বলল, না! কেউ নাই!

একজন বলল, আমাগো ফরিদপুরে বিশেষ কিছু হয় নাই বোধ হয়। কাগজে তো ল্যাখে নাই।

লাউ-কুমড়োওয়ালা তখন মনোযোগ দিয়ে কাগজ পড়ছে। আমি বাজারের থলি হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। অন্য দু'-চারজন খদ্দের বিরক্তি প্রকাশ করছে বা চলে যাচ্ছে অন্য দোকানে। সে হঠাৎ আর্তভাবে চেঁচিয়ে উঠল, এই তো, কলাবাড়ি! কলাবাড়িতে আমাগো নিজের বাড়ি! হায় হায়, হায়, সব গ্যাছে! একজনও নাকি বাইচ্যা নাই! কলাবাড়ি, গোপপাড়া, ভোলা—এইসব জায়গা আমি কতবার—

—তোদের বাড়ি এখনো ছিল ওখানে?

—না।

—আত্মীয়স্বজন কেউ আছে?

—না।

—তাহলে ওরকম করিস কেন?

—ওখানকার কত মানুষরে চেনতাম।

সে ফিরে এল নিজের দোকানে। মুখখানি ম্লান, বিবর্ণ। আমি তার কাছে গিয়ে জিনিস কেনার জন্য দাঁড়াতেই সে বলল, বাবু, আমাদের দ্যাশের সর্বনাশ হয়ে গেছে! বন্যায় একেবারে—

যে দেশ সে ছেড়ে এসেছে, সেটাকেও সে এখনো বলছে, আমাদের দেশ। যেখানে তার কোন ঘরবাড়ি নেই, আত্মীয় নেই—সেখানকার বন্যার জন্যও সে বুকে এখনো শেল অনুভব করে।

দুপুরে ট্রামে যাচ্ছিলাম। সামনের সীটের দুজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথাবার্তা কানে এল। দুজনেরই বয়েস ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল খুব বেশি পাকেনি, ধুতি পাঞ্জাবি পরা।

একজন প্রৌঢ় বললেন, উনিশশো তেত্রিশ ঈস্টবেঙ্গলে একবার এইরকম বন্যা হয়েছিল। এতটা বেশি নয়—কিন্তু আমরা খুব সাফার করেছিলাম। আমি তখন বরিশালের বি এম কলেজে পড়ি—

দ্বিতীয় প্রৌঢ় বললেন, ও, আপনি তখন বরিশালে ছিলেন নাকি? আমিও ছিলাম তো। আমার বাড়ি যদিও বাঁকুড়ায়—কিন্তু আমি তখন পোস্টঅফিসের চাকরিতে সদ্য ঢুকিছি, ট্রান্সফার করল বরিশালে—অজানা অচেনা জায়গা—কিন্তু মাসতিনেকের মধ্যেই মানিয়ে নিয়েছিলাম—

—সেই বন্যার কথা আপনার মনে আছে?

—ওরেব্বাবা, মনে নেই আবার! তিনদিন ধরে বাড়ির চালে বসে থাকা, তারপর রিলিফ এল যখন—কলকাতা থেকে আমার দাদাও গিয়েছিলেন আমায় আনতে—

—আমাদের কলেজেও হাজার-হাজার লোক আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা তখন ছাত্র তো, খুব উৎসাহের সঙ্গে রিলিফ পার্টিতে, ওঃ সে কী সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা —জলে ভেসে-ভেসে মড়া আসছে!

—সেবার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকেও ছাত্রদের একটা বিরাট দল ভলান্টিয়ার হয়ে গিয়েছিল।

ঢাকায় তখন একটা রাজনৈতিক সম্মেলন হবার কথা। সব বন্ধ রেখে সবাই তখন রিলিফের কাজে—এমনকী বড়বড় নেতারাও।

আমার স্টপ এসে গেছে, আমি নেমে পড়লাম। এইসব সাধারণ মানুষের কথা আর আজকাল বড় কানে পৌঁছোয় না। কোনো দেশের রাজনৈতিক মতামতও আজকাল সাধারণ মানুষের মতামতের ওপর নির্ভর করে না।

৯

আমাদের পাশের বাড়ির একটি ছেলের অসুখ, তার জন্য রোজ ছাগলের দুধ নেওয়া হয়। একজন সুঠাম চেহারার বিহারী রমণী প্রত্যেক দিন ভোরবেলা এসে বাড়ির সামনে ছাগলের দুধ দুইয়ে দিয়ে যায়। ঘুম থেকে আমি যখন বারান্দায় খবরের কাগজের জন্য হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকি, তখন ঐ দৃশ্যটি আমি দেখি।

ফুল-ফুল-ছাপ রঙিন শাড়ি-পরা রমণীটির বেশ শক্তপোক্ত চেহারা, গলার আওয়াজ শুনলে বোঝা যায় বেশ দজ্জাল। বিহারের কোন সুদূর গ্রাম থেকে কলকাতার মতন গোলমেলে শহরে ব্যবসা করতে এসেছে বটে, কিন্তু সহজে কেউ তাকে ঠকাতে পারবে না। তার ব্যবসার ধরনটিও প্রিমিটিভ। সের বা কিলোর ধার ধারে না—সোনার মতন চকচকে একটা ছোট্ট পেতলের ঘটি আছে, সেইটা তার পউয়া, সেটা ভর্তি করে দুধ দেবে—দাম বারো আনা, নেবে তো নাও, না নেবে না নেবে! তার ছাগলীটির চেহারাও বেশ গাঁট্টাগোট্টা। বোঝা যায়, ঐ পেতলের ঘটি ও ছাগলটির প্রতি ওর বেশ যত্ন আছে।

ক'দিন ধরে দেখছি, ছাগলীটির সঙ্গে তিনটে বাচ্চাও আসছে। গরুর দুধ দুইবার সময় একটা বাছুর বা বাছুরের কঙ্কাল সঙ্গে রাখতে হয়—ছাগলের বেলায় তার দরকার হয় না। ছাগলছানাগুলো এমনিই বেড়াতে আসে। স্ত্রীলোকটি যখন চ্যা চোঁ চ্যা চো শব্দে দুধ দোয়—ছানাগুলো তখন মনের সুখে লাফিয়ে বেড়ায়। ছাগলছানাগুলোর বেশ কচি-কচি ফুরফুরে ভাব, তিড়িং-বিড়িং করে যখন লাফায়—তখন দেখতে ভারী ভালো লাগে। তখন বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে করে না যে এমন সুন্দর একটা প্রাণী বড় হওয়া মাত্রই আমরা কেটেকুটে খেয়ে ফেলি।

যাই হোক, রোজ ঐ দৃশ্য দেখতে-দেখতে হঠাৎ এই সরল সত্যটি উপলব্ধি করলাম যে, পৃথিবীতে কোন জিনিসই প্রত্যেকদিন একরকমভাবে চলে না।

আজ সকালবেলা, খবরের কাগজওয়ালার এখনো পাত্তা নেই—আমি দাঁড়িয়ে ছাগলের দুধ দোওয়া দেখছি, হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। দুধ দোওয়া হয়ে গেছে, স্ত্রীলোকটি পয়সার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই ছাগলটি দুপায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে রীতিমতন জোরে তার মালিকানীকে এক ঢ মারল। কোনদিন সেরকম বিদ্রোহ করে না। আজও দুধ দুইবার সময় রীতি-মতন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছিল, হঠাৎ এখন তার কেন এইরকম ইচ্ছে হলো কে জানে!

আচমকা ঢুঁ খেয়ে স্ত্রীলোকটি হাউমাউ চিৎকার করে দৌড়ে গেল সামনের দিকে, সে ভেবেছিল অন্যকিছু। দৃশ্যটা এমনই মজার যে আমি ওপরে দাঁড়িয়ে ফিক করে হেসে ফেললাম। রাস্তার লোকরাও পথ চলতে-চলতে হেসে দাঁড়িয়ে গেল। ছাগলের গুঁতো মারার মধ্যে একটা হাস্যকর ব্যাপার আছেই। স্ত্রীলোকটি প্রথমটায় অপ্রস্তুত হয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে ছাগলীটার দিকে ফিরে ঠেট হিন্দিতে খুব একচোট গালাগালি দিলে। তারপর তাকে যেই ধরতে গেছে, সে আবার দু'পা তুলে ঢুঁ মারার জন্য তৈরি হয়েছে। ছাগলীটার এইরকম মতিভ্রম দেখে সবাই হাসছে।

কিন্তু আগে বলেছি, রমণীটি যথেষ্ট তেজি। সে ওতে ঘাবড়াল না—খুব একচোট ধমক দিয়ে সে খপ করে ছাগলীর শিংদুটো চেপে ধরল। তখন ঘটল আর-একটা মজার ব্যাপার। ছাগলছানা তিনটে এতক্ষণ অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল, এখন তারা মায়ের অনুকরণে কিংবা মায়ের অপমান সহ্য করতে না-পেরে, তারাও কচি-কচি দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ঢুঁসোতে লাগল স্ত্রীলোকটিকে। কতকগুলো বাচ্চা ছেলে তখন সেখানে জড়ো হয়ে সানন্দে হাততালি দিচ্ছে। অনেক বাড়ির জানলা খুলে গেছে, অনেক বারান্দায় নারী-পুরুষ দেখছে মজা।

স্ত্রীলোকটি ছাগলটাকে ছেড়ে ছানাগুলোকে সামলাতে যেতেই সবাই মিলে দিল পো পো ছুট। তারপর শুরু হলো এক লুকোচুরি খেলা। ছাগলী কিংবা ছাগলছানা একবার দৌড়োলে তাদের ধরা সহজ নয়। আমাদের পাড়ার রাস্তায় ছাগলীটা তার বাচ্চাদের নিয়ে মালিকানীর হাত এড়িয়ে দৌড়োতে লাগল এদিক-ওদিক। স্ত্রীলোকটিও শাড়িটা গাছকোমর করে বেঁধে চোখ পাকিয়ে তাড়া করছে ওদের। মা-টাকে ধরতে যায় তো বাচ্চাগুলো সটকে পালিয়ে যায়—আবার বাচ্চাগুলোকে ধরতে এলে মা কাছে এগিয়ে এসে লোভ দেখায়। হাসতে-হাসতে আমাদের দম বেরিয়ে যাবার অবস্থা।

না, বিদ্রোহ নয় সত্যি-সত্যি। স্ত্রীলোকটি শেষ পর্যন্ত বড় ছাগলীটার গলার দড়ি ধরে ফেলল, বাচ্চাগুলোও তখন সুড়সুড় করে চলে এল কাছে। স্ত্রীলোকটি ছাগলীটার মাথায় কৃত্রিম কোপে একটা চাপড় মারল, সে আর মাথা তুলল না, মাথা নিচু করে গেল। এ যেন মায়ের সঙ্গে ছেলেদের দুষ্টুমি। ছাগলগুলো অন্যদিন একরকম থাকে, আজ তাদের একটু খেলা করার ইচ্ছে হয়েছিল শুধু। স্ত্রীলোকটি তার দলবল নিয়ে চলে গেল, মিনিট দশেক আমরা নির্মল আনন্দ পেলাম!

আজ সকালেরই আর-একটা ঘটনা। বাজার থেকে বেরিয়ে রিকশা নিতে গিয়ে দেখি রিকশাওয়ালার চোখে একটা সানগ্লাস। এ পর্যন্ত আমি চশমা পরা রিকশাওয়ালাই কখনো দেখিনি, তার ওপর গগলস-পরা রিকশাওয়ালার কথা তো কল্পনাই করা যায় না। তাও যা-তা গগলস নয়, রীতিমতন দামি সানগ্লাস—আজকাল শৌখিন মেয়েরা যেরকম পরে।

রিকশাওয়ালাটির বয়েস তেইশ-চব্বিশ বছর হবে, রীতিমতন জোয়ান পুরুষ। মুখে একটা ভারী কমনীয় লজ্জা-লজ্জা ভাব। ওর পোশাক, যেরকমটি হয়, অত্যন্ত ময়লা এক টুকরো কাপড় কোমরে জড়ানো—এবং গেঞ্জিটা এতরকমভাবে ছেঁড়া যে সেটা একবার খুলে আবার পরতে গেলে রীতিমতন ম্যাজিকের দরকার হয়। সেই সঙ্গে একটা দামি সানগ্লাস—ভাবুন একবার দৃশ্যটা!

অন্যান্য রিকশাওয়ালা ওকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করছে। সব কথা আমি ঠিক

বুঝতে পারছি না। তবে অনুমান করছি, বাসরঘরে বরকে নিয়ে যেমন অনেকে ক্ষ্যাপায়, ওর অবস্থাও অনেকটা সেইরকম। ও অবশ্য খুব একটা গ্র্যাভিটি নেবার চেষ্টা করছে। কালো চশমা-পরা ফিল্‌মস্টার যেমন আশেপাশে ভক্তদের চেঁচামেচিতেও ভ্রুক্ষেপ করে না, রিকশাওয়ালাটিও তেমনি কারুর কথার উত্তর দিচ্ছে না, কারুর দিকে তাকাচ্ছে না, লাজুক মুখটাকে গম্ভীর করে রাখতে চাইছে।

রিকশা ঠুনঠুন করে ও আমার কাছে এসে বলল, চলিয়ে বাবু! আমি উঠে বসতেই ও জোরে ছুটতে লাগল। অন্যদিনের চেয়ে বেশি জোরে। ও আমার অনেক দিনের চেনা—আমাকে দেখলেই এগিয়ে আসে—অনেক সময় আমার রিকশায় ওঠার দরকার না-থাকলেও জোরাজুরি করে। সরলভাবে বলে, আপনারা রিকশায় না-উঠলে আমরা খাব কী? ভিখ মাংব?

ওর রিকশায় উঠেই আমি বুঝতে পারলাম, আমি রীতিমতন একটা দর্শনীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছি। পথচলতি অন্য রিকশাওয়ালারা ওর দিকে হাঁ করে তাকাচ্ছে, অনেকে রাস্তার ওপার থেকে এপারে চলে এসে মুখ নেড়ে বলছে, বাবু বনগইলি? রাস্তার লোকও অবাক হয়ে দেখছে ওকে। ও কিন্তু নির্বিকার।

ভারতের কিছু-কিছু গ্রামে আমি ঘুরেছি। দেখেছি যে সাধারণ গরীব-দুঃখী মানুষের ধারণা চশমা জিনিসটা বাবুদের পোশাকের অঙ্গ। বাবু না-হলে কেউ চশমা পরে না। গরীব লোকদেরও নিশ্চয়ই চোখ খারাপ হয়, এবং কোনক্রমে কেনার ক্ষমতা থাকলেও, ওটা তাদের মানায় না। আর সানগ্লাস!

কিন্তু আজ আমার মনে হলো, রিকশাওয়ালাদেরই তো সানগ্লাস পরার কথা। এটাই তো সব চেয়ে স্বাভাবিক। যারা দুপুর রোদে টো-টো করে পায়ে হেঁটে ঘুরছে, তারা সানগ্লাস পরবে না তো কে পরবে? হাতে টানা রিকশা উঠে যাওয়া উচিত। এর মধ্যে একটা গ্লানি আছে। কিন্তু কলকাতা শহর থেকে রিকশা যখন তুলে দেওয়া যাচ্ছে না, কিংবা যতদিন-না তুলে দেওয়া হয়—ততদিন রিকশাওয়ালাদের জন্য কেডস জুতো আর সানগ্লাসের ব্যবস্থা তো করা যেত অন্তত!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, শিউপূজন, ইয়ে কাঁহা সে মিলা হ্যায়?

শিউপূজন গম্ভীরভাবে বলল, চশমা? একঠো দিদিমণি দিয়া।

—একঠো দিদিমণি এমনি-এমনি একটা এত ভালো চশমা দিয়ে দিল?

—দিদিমণির হাত নিকালকে পড়ে গেল! একটা ডাণ্ডা টুটে গেল। দিমাগ খারাপ হয়ে গেল উনকা—ফেক দিতে যাচ্ছিল, হামি নিয়ে নিলাম!

খুলে দেখাল যে সত্যিই একটা ডাঁটি ভাঙা, সেটাকে ও ঝাঁটার কাঠি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। আমি বললাম, বাঃ! বেশ মানিয়েছে তোমায়!

নেমে পড়ার পর পয়সা দিতে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই চশমা পরলে কেমন লাগে?

একমুখ হেসে তরুণ রিকশাওয়ালাটি বলল, ঠাণ্ডা! দুনিয়া বিলকুল ঠাণ্ডা!

এইসময় আর-একটি তরুণ রিকশাওয়ালা কাছে এসে দাঁড়াল। সে বোধহয় ওর বন্ধুটন্ধু হবে। সে বলল, দে তো, আমি একবার পরি! তারপর সে চোখে দিল সানগ্লাসটা, সেও বলল, আঃ, কেয়া ঠাণ্ডা রে! দুজনে শিশুর মতন আনন্দে হাসতে লাগল। এই মুহূর্তে ওদের কোন অভাববোধ নেই।

আজ সকালের এই দুটি ঘটনায় আমার মনে হলো, কলকাতা শহরে এত দাঙ্গাহাঙ্গামা, গণ্ডগোল—কিন্তু তবুও ছোটখাটো মজার ব্যাপারগুলো এখনো নষ্ট হয়ে যায়নি। শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও মানুষ এখনো আনন্দের উৎস খুঁজে নিতে পারে।

১০

দাদাশ্রেণীর একজন চেনা লোকের কাছে দশটা টাকা ধার চাইতে গিয়েছিলাম। তিনি টাকাটা দিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু মোলায়েম উপদেশও শুনিয়ে দিলেন। ধার চাইতে গেলে ওরকম একটুআধটু শুনতেই হয়, আমিও শুনে গেলাম গদগদভাবে, কিন্তু মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। তিনি বললেন, বুঝলে, একটু হিসেব করে চলতে হয়, নইলে টাকাপয়সার অভাব কোনদিন ঘোচে না। দেখছো তো আমাকে, টু দি পাই পর্যন্ত হিসেব করে চলি—তাবলে কৃপণতা করার প্রয়োজন নেই, যখন যেটা দরকার, কিন্তু হিসেবটাই হলো আসল। হিসেব থাকলে—

চাইতে গেছি মাত্র দশটা টাকা, এর মধ্যে এত কথা আসে কোথা থেকে? হাজার-হাজার লাখ-লাখ টাকা হলে না হয়—তাও অবশ্য আমি হিসেব রাখতে পারতাম না—কেননা আমি অঙ্কে এতই কাচা যে পায়ের জুতো না-খুলে কুড়ি পর্যন্তও গুনতে পারি না। (এই রসিকতাটা আমি ঐ দাদার সামনেই একদিন বলেছিলাম, উনি বুঝতে পারেননি। ভাবলেন, ওকে আমি অপমান করার চেষ্টা করছি। কী বিপদ!)

যাই হোক, হিসেবের কথাটা আমার খুব মনে লেগে গেল। দশটা টাকা খরচ হয়ে যাবার পর মনে পড়ল, এবার একটা হিসেব করা যাক। টাকা পয়সার হিসেব আমার কাছে নিছক বিড়ম্বনা মাত্র, তবে জীবনে এ পর্যন্ত কী-কী হারিয়েছি, তার একটা হিসেব নিলে মন্দ হয় না।

প্রত্যেকেই জীবনে অনেক কিছু হারায়। কিন্তু সে সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে প্রথমটায় কিছুই মনে পড়ে না। আমার এক অভিন্নহৃদয় বন্ধু একসময় বলেছিল, সে তার জীবনে যতকিছু হারিয়েছে, তার মধ্যে একটা চন্দন কাঠের বোতামের কথাই তার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে। ছেলেবেলায় পপলিনের শার্টে যে চন্দন কাঠের বোতাম লাগিয়ে পরত—সেই বোতাম হারানোর দুঃখ সে আজও ভুলতে পারে না। এখন সে ইচ্ছে করলে ডজন-ডজন চন্দন কাঠের বোতাম কিনতে পারে, কিন্তু ছেলেবেলার সেই হারানোর দুঃখ আর যাবে না। আমার কাছে অবশ্য ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না, একটু যেন কবিতা-কবিতা মনে হয়।

আমি কী কী হারিয়েছি, তাই ভাবতে বসি। প্রথমেই মনে পড়ে, সময়। অনেক সময় যে হারিয়েছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতের কথা জানি না, ভবিষ্যতে কী রকম সময় আসবে, সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, কিন্তু অতীতে যে অনেক সুসময় চলে গেছে তা তো নিশ্চিত। ইস্কুল কলেজের দিনগুলো তো একেবারে নষ্টই করেছি বলা যায়। আর একটু মন দিয়ে যদি পড়াশুনা করতাম, তাহলে কী আজ আমার এই অবস্থা হতো! আমাকে অনেকেই মূর্খ বলে। কিন্তু আমি সরলভাবে স্বীকার করছি, আমার মূর্খতা বেশি পড়াশুনো করার জন্য নয়, পড়াশুনো না-করার জন্য!

আর কী হারিয়েছি? ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রেমে পড়া স্বভাব। তিন-চারটি মেয়েকে দারুণ ভালোবাসতাম নানা বয়সে। তাদের কারুকেই পাইনি বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভালোবাসা হারায় না, ভালোবাসা জমা থাকে। আমার বুকের মধ্যে তাদের কিছুই তো হারায়নি।

তবে, এই প্রসঙ্গে একটা খাতা হারাবার কথা মনে পড়ে। সাধারণ একটা চার নম্বরের বাঁধানো খাতা, মলাটের রং ছিল লাল। খাতাটার বিশেষত্ব কিছুই ছিল না, সেটাতে আমি জ্যামিতি লিখতাম, অনেকগুলো 'একস্ট্রা' করা ছিল। স্কুলে পড়ার সময় এরকম অনেক খাতাই অনেকের হারিয়ে যায়। আমাদের পাড়ারই একটি মেয়ে, তার নাম সুনন্দা, খাতাটা চেয়ে নিয়েছিল, বলেছিল, তোমার খাতাটা একটু দাও তো, 'একস্ট্রাগুলো আমি লিখে নেব।' খাতাটা যখন ফেরত দিল শেষ পাতায় সবুজ কালি দিয়ে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা আছে কয়েকটি কবিতার লাইন :

> আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
> বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে
> এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
> জীবন ভরে!

ঐ লেখাটা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। সবুজ কালিতে মেয়েলি হাতের লেখা ঐ লাইনগুলো চুম্বকের মতন আমায় টানল, কতবার যে পড়লাম তার ইয়ত্তা নেই। ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু এঁচোড়ে পাকা, অনেক গল্প-উপন্যাস-কবিতা লুকিয়ে পড়েছি, কিন্তু ঐ লাইনগুলো যে রবীন্দ্রনাথের তা ধরতে পারিনি। আমার ধারণা হয়েছিল, ওটা সুনন্দারই রচনা এবং আমারই উদ্দেশ্যে।

সুনন্দা ছিল পাড়ার মধ্যে খুব ডাঁটিয়াল মেয়ে। অর্থাৎ বড়দের ভাষায় 'রহস্যময়ী'। কখনো সে খুব গম্ভীর, কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলত না, আবার কখনো খুব হাসিখুশি। মাঝে-মাঝে ওদের বাড়ির উঠোনে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলতে যেতাম। বড়রা অবশ্য আমাদের তখন নেহাত ছোট মনে করত, আমরা কিন্তু নিজেদের মধ্যে অনেক সময়ই বড়দের মতন আলোচনা করতাম। সুনন্দার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই, কেউ যদি কোন মিথ্যে কথা বা অসভ্য কথা বলত, অমনি সুনন্দার মুখখানা সত্যিকারের রাগে কঠিন হয়ে যেত, ঝাঝালোভাবে বলত, এই, তাহলে কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

সেই সুনন্দা আমার উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছে? ইস্কুলের ছেলের পক্ষে ঐ লাইনগুলো বেশ শক্ত, তবু আমি ওর থেকে অনেকরকম মানে আবিষ্কার করলাম। এবং ওর নিচে লিখলাম—

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্র মাঝে আমি হব নাকো পথহারা

আমার কবিতা বানাবার ক্ষমতা নেই, তবে দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, সুনন্দা কিছুতেই বুঝতে পারবে না, এ দুটো রবীন্দ্রনাথের লাইন। তারপর একদিন সুনন্দাকে ডেকে বললাম, আমার খাতায় আরো কিছু 'এক্সট্রা' করেছি, তুমি নেবে? খাতাটা দেবার সময় কেন জানি না আমার বুক টিপটিপ করছিল। সুনন্দা কিন্তু খাতাটা নিয়ে নিল অম্লানবদনে এবং দুদিন বাদে আবার ফেরত দিল নির্বিকারভাবে। একটি কথাও হলো না। বাড়িতে গিয়ে খুলে দেখি, আমার লেখার তলায় আবার লেখা—

ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল
তিয়াস আসি অন্তরে মম?

আজও মনে আছে, নিভৃত ঘরে সেই খাতা খুলে হৃদয় কী রকম উদ্বেলিত হয়েছিল। আমার এবং সুনন্দার লেখা লাইনগুলোর মধ্যে খুব যে একটা সামঞ্জস্য ছিল, তা বলা যায় না; কবিতার রোমাঞ্চকর মাদকতাই আমাদের অভিভূত করেছিল। আমি আবার কয়েক লাইন লিখে সুনন্দাকে খাতাটা ফেরত পাঠালাম।

এইভাবে শুরু হলো এক কিশোর ও কিশোরীর খেলা, মাঝখানে সেতু রইলেন রবীন্দ্রনাথ। কোনদিন কিন্তু আমরা সামনাসামনি এ সম্পর্কে একটা কথাও বলিনি। বড়রা কেউ আমাদের খাতাটা দেখে ফেললে কিছুই বুঝতে পারত না। বড়রা তো আর কবিতা পড়ে না!

কথা নেই বার্তা নেই সুনন্দা হঠাৎ চলে গেল এলাহাবাদে ওর মামার বাড়িতে। যাওয়ার আগে খাতাটা দিয়ে গেল না। হয়তো সুনন্দা খাতাটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, হয়তো ওর তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু শুনলাম, এলাহাবাদে গিয়ে সুনন্দার দারুণ কঠিন টাইফয়েড হয়েছে। দারুণ উৎকণ্ঠা আর বিষাদের মধ্যে কাটল আমার কয়েকটা দিন।

ঘটনাটা ঠিক বিয়োগান্ত নয়। সুনন্দা সেরে উঠেছিল। কিন্তু এলাহাবাদে অনেকদিন রয়ে গেল, ফিরল প্রায় এক বছর বাদে। সেই বয়েসটাতে, এক বছরে অনেককিছুই বদলে যায়। তখন আমি অন্য ক্লাসে উঠে গেছি, জ্যামিতির খাতাটা ফেরত চাওয়ার কোন মানে হয় না। সেই প্রসঙ্গে আর কোনদিন উচ্চবাচ্য করিনি সুনন্দার কাছে।

হারিয়ে গিয়েছিল বলেই সেই লাল খাতাটার কথা এখনো আমার মনে আছে। এখনো সবুজ কালিতে সুনন্দার গোটা-গোটা হাতের লেখা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। জীবনে অনেক কবিতা ভুলে গেছি, ঐ কবিতার লাইনগুলো ভুলিনি। খাতাটা যদি আমার কাছেই থাকত, এতদিন কী আর সেটা যত্ন করে রেখে দিতাম! পুরোনো কাগজপত্তরের সঙ্গে কবে বিক্রি করে দিতাম সেটা, দোকানের ঠোঙা হয়ে চলে যেত কোথায়!

খুব বেশি দামি জিনিস আমার কখনো ছিলই না, সুতরাং সেগুলো হারাবার দুঃখও পেতে হয়নি। তবে দামি না-হলেও অনেককিছু প্রিয় হয়, সেগুলো হারাবার কথা মনে পড়ে। গিরিডিতে গিয়ে উশ্রী জলপ্রপাত থেকে জল ভরতে গিয়ে আমার ওয়াটার-বটলটা ভেসে চলে গিয়েছিল। প্রায় পনেরো বছর আগের কথা, এখনো দেখতে পাচ্ছি জলের প্রবল তোড়ে ভেসে যাচ্ছে ওয়াটার-বটলটা, আমি অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছি। আর সেই ফ্লাস্কের ঢাকনাটা?

দুই বন্ধু মিলে ট্রেনে বেড়াতে যাচ্ছিলাম কোথায় যেন। বাঙ্কে উঠে বসে আছি, সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিচ্ছি! সঙ্গে ফ্লাস্ক ছিল, তার ঢাকনাটাই আমাদের গেলাস। সেটাকে একবার ধুতে হবে, ধোওয়ার পর ময়লা জলটুকু ফেলা দরকার, কিন্তু ওপর থেকে জানলা পর্যন্ত হাত যায় না। হিন্দি জ্ঞানের অভাবে সেবার কী কাণ্ড হলো—জলসুদ্ধু ফ্লাস্কের ঢাকনাটা নিচের দিকে বাড়িয়ে একজন হিন্দুস্থানীকে বললাম, ইয়ে ফেক দিজিয়ে তো! লোকটি আমার মুখের দিকে একটু তাকাল,

কী যেন বোঝবার চেষ্টা করল, তারপর ঢাকনাটা ফেলে দিল জানলা দিয়ে।

একটা ওয়াটারম্যান কলম ছিল একসময়, খুব গর্ব ছিল সেটাকে নিয়ে। ওরকম মডেলের কলম এখন দেখা যায় না। তখন বাড়ি থেকে হাতখরচ বিশেষ কিছু পেতাম না, ট্রামের একটা মান্থলি টিকিট দেওয়া হতো আমাকে। একদিন দোতলা বাসের জানলায় একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখে মাথা ঘুরে গেল, ট্রামের বদলে বাসে উঠে পড়লাম। সেইদিনই পকেট মারা গেল কলমটা।

টাকাপয়সার হিসেব করতে বসলে, হিসেব না-মিললে শুনেছি লোকের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু কী কী জিনিস হারিয়েছি তার হিসেব নিতে গিয়ে দেখলাম, একটুও কষ্ট হচ্ছে না সেই সব উধাও দ্রব্যের জন্য। বরং ঘটনাগুলো মনে পড়ায় স্মৃতির একধরনের মধুর শিরশিরানি বোধ করছি। কখনো-কখনো হাসি পাচ্ছে।

শুধু একটি কথা ভেবে দুঃখ হয়। জীবনে এ পর্যন্ত অনেক বন্ধু হারিয়েছি। কত প্রিয় বন্ধু দূরে চলে গেছে, কতজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে। তিরিশ বছর বয়েস হয়ে গেলে সহজে আর নতুন বন্ধু হতে চায় না। এখন শুধু একে-একে বন্ধু হারাবার পালা। সেইকথা মনে পড়লেই বুকের মধ্যে টনটন করে।

১১

আপনাদের এখান থেকে তো পাকিস্তানের বর্ডার খুব কাছে, তাই না?

—এই তো, মাইলখানেক। ঐ যে তালগাছগুলো দেখছ, ওর ওপাশেই।

—লোকজন বর্ডার পেরিয়ে যাতায়াত করে না?

—হরদম হরদম! পাঁচটা টাকা দিলেই দালালরা ওপারে নিয়ে গিয়ে বাসে তুলে দেয়। এপারেও সেই সিস্টেম। আর স্মাগলিংও হচ্ছে প্রচুর। হবে নাই-বা কেন, সারা বর্ডার জুড়ে তো আর পুলিস বসিয়ে রাখতে পারে না! পুলিস থাকলেই বা কী, ডানহাত-বাঁহাতের ব্যাপার—

—এদিকে রিফিউজি আসেনি?

—আসেনি আবার!

হালদার মশাই চোখ ছোট করে আমার দিকে তাকালেন। তারপর ফিসফিস করে গোপন কথা বলার মতন বললেন, আরে ভাই, কী বলব তোমাকে! কী সুন্দর নিরিবিলি ছিল জায়গাটা আগে। এই বাঙালরা আসবার পর একেবারে

ছারখার করে দিল! জায়গাটা নোংরা করেছে কি রকম, ওদের একগাদা কাচ্চা-বাচ্চা, তার ওপর আবার দল পাকানো—

আমি একটুও দমে না গিয়ে বললুম, হ্যাঁ সত্যি, বাঙালরা আসবার পর পপুলেশন এমন বেড়ে গেছে হঠাৎ এক-একটা জায়গায়!

—শুধু পপুলেশন বেড়েছে নাকি? দ্যাখো তো পাঞ্জাবে, ওখানকার রেফুজিরা কি রকম অ্যাকটিভ! গায়ে খেটে দুদিনের মধ্যে কি রকম দাঁড়িয়ে গেছে সবাই! আর বাঙালরা, কাজকর্ম করার দিকে মন নেই, খালি বাকতাল্লা আর চেঁচামেচি। এক-একজনের আবার তেজ কি! এসেছিস আমাদের গাঁয়ে—কোথায় একটু ভদ্র হয়ে থাকবি, তা না—এই জন্যই তো বাঙালদের—

—অর্থাৎ কিনা এখানকার বাঙালদের চেয়ে পাঞ্জাবের বাঙালরা অনেক ভালো!

—পাঞ্জাবের বাঙাল? হাঃ হাঃ হাঃ—রিফুজি মানেই বাঙাল বলছো? তা মন্দ নয়।

কথা হচ্ছিল মালদার এক গ্রামে। আমার মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ানোর বাতিক আছে। এদিকটায় কখনো আসিনি শুনে আমার এক বন্ধু তার কাকাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে।

হালদার মশাই অতি সজ্জন লোক, এক সময় ছোটখাটো জমিদার ছিলেন, এখন সব জমিজমা গেছে, এখন চিনির ব্যবসা করছেন। মাঝারি অবস্থা কিন্তু অতিথি-আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি নেই। আমি ওর ভাইপোর বন্ধু এবং শহুরে লেখাপড়া শেখা ছেলে হয়েও গ্রামে এসেছি—আমাকে এমন বেশি খাতির করতে লাগলেন যে রীতিমতন অস্বস্তি বোধ করতে হয়। আমার স্নান করার জন্য গরম জলও দিতে চান—আমার ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও।

হালদার মশাই প্রায় সারাটা জীবন গ্রামে কাটালেও এমনিতে বিশেষ গোঁড়ামি নেই। আমি ওর ছেলের বয়েসী হওয়া সত্ত্বেও বললেন, সিগারেট-টিগারেট খাওয়ার যদি অভ্যেস থাকে আমার সামনে লজ্জা ক'রো না। লজ্জা করে শুধু শুধু দম আটকে থাকবে কেন? আমার নিজের তো একদিন বিড়ি না হলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। উনি নিজে ব্রাহ্মণ, কিন্তু জাতের বিচার তেমন নেই, গাঁয়ের হিন্দু মুসলমান অনেকেই তাকে মানে।

কিন্তু মুস্কিল হলো এই বাঙালদের বিষয়ে। বাঙালদের ওপর ওঁর বেশ একটা চাপা রাগ আছে। আমার সামনে একগঙ্গা বাঙালদের নিন্দে করে ফেললেন। আমি হুঁ-হাঁ দিয়ে গেলাম। হালদার মশাই আমাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করেননি—ধরেই নিয়েছেন, আমিও একজন ঘটি। এখন আমি মহা ফ্যাসাদে পড়লাম। নিজে বাঙাল

হয়ে অন্য বাঙালদের নিন্দে অনবরত শোনা যায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে একটা অদ্ভুত ভদ্রতাবোধে পেয়ে বসে। আমার মনে হলো, এখন যদি হালদার মশাইয়ের কাছে আমি আত্মপরিচয় দিই, তাহলে উনি দারুণ লজ্জায় পড়ে যাবেন—আমার দিকে আর তাকাতে পারবেন না। সেই লজ্জায় ওঁকে ফেলতে আমার ইচ্ছে হলো না। আবার ওঁর কথায় সায় দিয়ে গেলে মনে হবে, আমি বাঙালত্ব অস্বীকার করে ঘটিদের দলে ভিড়তে চাইছি। যদিও আমি প্রকৃত অর্থেই বাঙাল এবং রেফিউজি। আমার বাবা ঠাকুর্দা ছিলেন পূর্ববঙ্গে আমিও বাল্যকালে ছিলাম, এবং ওখানে আমাদের বাড়ি ছিল, এখানে এক টুকরো জমিও নেই।

হালদার মশাই আমার কাছে খুব অন্তরঙ্গভাবে গোপনে বাঙালদের নিন্দে করেছিলেন, বাড়ির বাইরে অবশ্য তিনি প্রকাশ্যে আর বাঙাল বলেন না' বলেন ইস্টবেঙ্গলের লোক। একটু রেগে গেলে 'রিফিউজিগুলো'!

হালদার মশাইয়ের সাত-আট বছরের ছেলেকে একজন যুবক বাড়িতে পড়াতে আসে। রোগা চেহারার লাজুক ছেলেটি। সে একদিন পড়িয়ে চলে যাচ্ছে, হালদার মশাই আমাকে বললেন, ঐ যে ছেলেটি দেখলে, খুব ভালো ছেলে, মন দিয়ে পড়ায় রতনকে। ছেলেটি বাঙাল হলেও খুব সিনসিয়ার—পড়াশুনোয় খুব আগ্রহ। বাঙালদের মধ্যে এরকম ভালো ছেলেও দুটো-একটা আছে, আই মাস্ট অ্যাডমিট—

হালদার মশাইয়ের বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি, তার মা এখনো বেঁচে আছেন। তিনি এসে হালদার মশাইকে বললেন, ও খোকন, দুটো বাঙাল ছোঁড়াকে ডেকে নে আয়, নারকেলগুলো পেড়ে দেবে। ওরা এমন তড়বড়িয়ে গাছে উঠতে পারে—

হালদার মশাই আমার দিকে তাকিয়ে বিগলিত হাস্যে বললেন, 'লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে, ল্যাজ নাই কিন্তু!' আমি হাসবো না কি করবো বুঝতে পারলুম না।

এই রকম অবস্থা আমার আগে আরো দু'একবার হয়েছে। অন্য ধরনেরও। কফি হাউসে একবার এক মাড়োয়ারী বন্ধুর সঙ্গে বসেছিলাম। মাড়োয়ারী মাত্রেই তো আর কুটিল ব্যবসায়ী নয়। আমার সেই বন্ধুটি সেবার বি-এ পরীক্ষায় ইংলিশ অনার্সে ফার্স্ট হয়েছিল, বেশ গরীব এবং জলের মতন বাংলা বলে। হঠাৎ আর এক বন্ধু আমাদের টেবিলে উপস্থিত হয়েই বলা শুরু করল, আরে ভাই, মাড়োয়ারীদের জ্বালায় আর পারা গেল না। আজ বড়বাজারে গিয়েছিলাম, এক ব্যাটা ভুঁড়িদাস—। আমি বন্ধুটিকে যতই চোখ টিপছি, সে কিছুতেই বোঝে না। মাড়োয়ারী বন্ধুটি মিটিমিটি হাসতে লাগলো আর বলল, যা বলেছেন! মাড়োয়ারীর জাতটাই দেশটাকে...

হালদার মশাইয়ের মেয়ে কলেজে পড়ে, ছুটিতে এই সময়েই গ্রামের বাড়িতে এসেছে। মেয়েটির নাম অর্চনা, নেহাত মন্দ নয় গোছের চেহারা—তবে শহরের কলেজে পড়ে বেশ স্মার্ট হয়েছে। আমাকে দেখে অন্তঃপুরিকা হয়ে রইল না, সপ্রতিভভাবে গল্প করতে লাগল। বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে, অর্চনাকে আমার ভালোই লাগছিল। মালদার কলেজে পড়ে অর্চনা, কলকাতা সম্পর্কে দারুণ কৌতূহল, আমাকে বার বার কলকাতার কথা জিজ্ঞেস করছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

এদিকে হালদার মশাইয়ের বাঙাল ফিক্সেশন—যে-কোনো কথাতেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি বাঙালদের কথা আনবেনই। গভর্নমেন্ট তার কিছু জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে রেফিউজিদের দিয়েছে, এই হলো প্রথম রাগের বিষয়। রেফিউজিদের দিতে না হলেও যে গভর্নমেন্ট অতিরিক্ত জমি কেড়ে নিতই—সেটা ভুলে যান। বাঙালদের সম্পর্কে তাঁর আর একটা রাগের কারণ, বাঙালরা নাকি বড্ড বেশি রগচটা, কথায় কথায় ঝগড়া করতে আসে। আর খাইছি, শুইছি ধরনের ভাষা তাঁর দু'কানের বিষ।

অর্চনা বলল, জানো বাবা, আমাদের ক্লাসে দুটো বাঙাল মেয়ে আছে, তাদের কথা শুনে কিন্তু একদম বোঝা যায় না। আমি তো কিছু বুঝতে পারিনি। তারপর ওরা ওদের বাড়িতে একদিন আমাকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করল—প্রত্যেকটা খাবারেই এত ঝাল না, উঃ, জিভ জ্বলে গিয়েছিল, তখনই বুঝলাম— ! তার ওপর আবার শুঁটকি মাছ, আমার তো এমন বমি পেয়ে গেল...

হালদার মশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ও কথা শুনলে ঠিকই বোঝা যায়, যতই লুকোবার চেষ্টা করুক, বাঙালদের কি চেনা যায় না?

আমি কাটা হয়ে বসে রইলাম। হালদার মশাই আমাকে বুঝতে পারেননি। এখন বুঝতে পারলে চোর ধরা পড়ার অবস্থা হবে। আমি আর আমার আত্মপরিচয় দেবার সুযোগ কিছুতেই পাচ্ছি না। এমনকি এ কথাও আমার মনে হলো, আহা, ওরা নিজেদের বাড়িতে বসে নিরিবিলিতে একটু বাঙালদের নিন্দে করছে—তাতে আমি বাগড়া দিই কেন? পরনিন্দার মতন মুখরোচক জিনিস আর নেই—ক'জনই বা এ জিনিস করে না?

অর্চনা আমাকে বলল, আমাদের গ্রামটা ঘুরে দেখেছেন সব? চলুন, নদীর পাড়টায় যাবেন?

—নদীর পাড় খুব সুন্দর বুঝি?

—আগে খুব সুন্দর ছিল—ফাঁকা মাঠ, ঝপঝপ করে পাড় ভেঙে পড়ত—এখন আর বেশি যাই না—এখন ওদিকটা রিফুজি কলোনি হয়েছে তো! বাঙাল ছেলেগুলো এমন প্যাট প্যাট করে তাকায়—যেন কোনোদিন মেয়ে দেখেনি—

আমি আমার চোখে হাত বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, আমারও দৃষ্টি প্যাটপেটে কিনা।

হালদার মশাইকে আমি বললুম, কাকাবাবু, কাল তো চলে যাব, আমাকে একটু পাকিস্তানের বর্ডারটা দেখিয়ে দিন।

তিনি বললেন, ও আর দেখার কি আছে? দেখে কি কিছু বোঝা যাবে?

—তবু চলুন।

ধানক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, ঐ যে ঐ তালগাছের লাইন, ওখানেই পাকিস্তানের শুরু।

আমি চুপ।

উনি আবার বললেন, ঐ একটা খড়ের বাড়ি দেখছ? বাড়িটা পড়েছে পাকিস্তানে, আর উঠোনটা ইণ্ডিয়ায়। হেঃ হেঃ হেঃ—

আমি চুপ।

—এরকম ভাগাভাগির কোন মানে হয়? সাহেবরা একটা দাগ টেনে দিল—আর অমনি দেশটা দু'ভাগ হয়ে গেল! আর আমাদের ন্যাতারাও সব যেমন!

আমি চুপ।

—কিহে, চুপ করে আছ যে?

—এমনি, মনটা খারাপ লাগছে।

—কেন?

—এমনিই আর কি! আচ্ছা কাকাবাবু, যদি মনে করেন, পার্টিশানের দাগটা আরো দেড় দু' মাইল এদিকে পড়ত, তাহলে আপনার বাড়িটাও পাকিস্তানে পড়ে যেত। আপনিও তাহলে রিফিউজি হয়ে—লোকে আপনাকে বাঙাল বলত—

—ইঃ, বললেই হলো? আমার এখানে সাত পুরুষের বাস—

—ওখানেও অনেক বাঙালের—

হঠাৎ হালদার মশাই একটু চুপসে গেলেন। তারপর বিষণ্ণভাবে বললেন, ওরে বাবা, বুঝি, বুঝি, ঠিকই বুঝি। ভিটেমাটি ছেড়ে এতগুলো লোক এসে কত দুঃখে পড়েছে—আমাদেরই মতন তো সব কিছু—তবু মাঝে মাঝে মনে থাকে না। বুঝলে না, মানুষ ছোটখাটো স্বার্থ নিয়েই বেশির ভাগ সময়—তবু মনের ভেতরে—

আমি আর কিছু বললাম না। চুপ করে গেলাম আবার।

১২

দারুণ বৃষ্টিতে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে, কলকাতায় এখন আর কিছুই ঠিকঠাক নেই। জলেডোবা ট্রামগুলো এখন স্টিমারের মতন, বাসের পাত্তা নেই, মাঝে-মাঝে যে দু-একটি আসছে, সেগুলোকে বাস না-বলে ভিজে আলুর বস্তা বলাই ভালো। আজ যার যে-সময়ে বাড়ি ফেরার কথা ছিল, ফিরতে পারবে না, অনেক অ্যাপয়েনটমেন্ট আজ অপূর্ণ থাকবে, অনেক মুমূর্ষু রোগী ঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছুবে না, অনেক বস্তিতে এখন মিনি-বন্যা।

টানা দুঘণ্টা ধরে দুর্দান্ত তেজের সঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছে, চৌরঙ্গীতে পর্যন্ত হাঁটুসমান জল।

অধিকাংশ মানুষই নিমকহারাম। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড গরমে যারা প্রার্থনা করে কবে বৃষ্টি আসবে, তারাই আবার বর্ষাকাল এসে গেলে বলে, ধ্যাৎ, বৃষ্টি যে কবে শেষ হবে! অনেকে চায়, অফিস টাইমে বৃষ্টি হবে না, বৃষ্টি হওয়া উচিত শুধু রাত্তিরে, ঘুমের আরামের জন্য। যথেষ্ট বৃষ্টি না-হলে চাষবাসের অত্যন্ত ক্ষতি হয়, একথা সবাই জানে, তবু বৃষ্টির বাহুল্যে অনেকের ক্রোধ। কেউ-কেউ আবার বলে, কলকাতা শহরে তো আর চাষ বাস হচ্ছে না, সুতরাং কলকাতা শহরটা বাদ দিয়ে গ্রামে ট্রামে বেশি বৃষ্টি হলেই তো পারে। অর্থাৎ রেডিমেড জামার মতন প্রকৃতিও ঠিকঠাক ফিট করে যাক জীবনের সঙ্গে।

বৃষ্টির সময়টা আমার খারাপ লাগে না। মানুষ তো আর সবসময় দেশের অবস্থা কিংবা সামগ্রিক সামাজিক ভালো মন্দ নিয়ে চিন্তা করে না, অনেক সময়ই সে ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দলাগা নিয়ে মগ্ন থাকে। ব্যক্তিগতভাবে বর্ষা আমি বেশি ভালোবাসি। জামা প্যান্ট নষ্ট হয় বটে, অনেক কাজ অসমাপ্ত থাকে—কিন্তু আমি তো আর তেমন ব্যস্ত কেজো মানুষ নই, বৃষ্টির সময় দিনের আলোটা যেরকম নরম আর চাপা হয়ে আসে, সেটা আমার খুব পছন্দ। তাছাড়া, শহুরে মানুষের সবসময় এত তাড়াহুড়ো আর ব্যস্ততা, কোথাও পরের বাড়ি জলের দামে নীলাম হয়ে যাচ্ছে শুনে ছুটে যাওয়ার মতন ব্যস্ত ভঙ্গি—এসবই থেমে থাকে ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে, আমার বেশ লাগে।

জুতোর মায়া না-করেই জলের মধ্যেই ছপছপ করে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম, চৌরঙ্গীর একটা সিনেমা হলের সামনে থেকে কে যেন আমাকে ব্যাকুলভাবে ডাকল, এই নীলুদা, নীলুদা—।

তাকিয়ে দেখি, আমার মাসতুতো বোন টুমপা। খুব সেজেগুজে অসহায় মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধে সাড়ে সাতটা বাজে, তখনো বৃষ্টি পড়ছে সমানে।

জিজ্ঞেস করলাম, তুই এখানে একা-একা দাঁড়িয়ে কী করছিস?

—দ্যাখো না, একটা সিনেমা দেখতে এসেছিলাম, কী রকম আটকে গেছি! কী করে বাড়ি যাব?

—একা সিনেমায় এসেছিলি কেন?

—একা নয়, সঙ্গে আমার এক বন্ধু আছে।

তাকিয়ে দেখি, বন্ধু নয়, বান্ধবী। টুমপারই সমবয়েসি একটি মেয়ে, এ-ও সেজেছে খুব, তবে মুখটা বিষণ্ণ।

টুমপা বলল, এর নাম ইন্দ্রাণী, আমরা একসঙ্গে গান শিখি। তুমি আমাদের একটু বাড়ি পৌঁছে দাওনা!

—আমি তো এখন বাড়ি যাব না!

—এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাবে?

—যেখানেই যাই না! তোরা এই বৃষ্টির মধ্যে একা-একা সিনেমায় এসেছিলি কেন? এখন নিজেরা বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা কর!

—দুপুরে কী বৃষ্টি ছিল নাকি?

—মেঘ তো ছিল! তাছাড়া সঙ্গে কোন ছেলেবন্ধুকে নিয়ে আসিসনি কেন? তোর বয়েসের মেয়েদের উচিত সবসময় ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় আসা—অথবা বাড়ির লোকের সঙ্গে, নিজেরা নিজেদের ব্যবস্থা করতে পারিস না; আমি পৌঁছে দিতে পারব না।

—তুমি যদি আমাদের ফেলে চলে যাও, তাহলে আমি ছোট মাসিকে ঠিক বলে দেব কিন্তু।

ইন্দ্রাণী নামের মেয়েটি এবার বলল, আপনি একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিন। ফিরতে দেরি হলে আমার বাড়িতে ভীষণ চিন্তা করবে!

মেয়েটির দিকে আমি একটুক্ষণ চেয়ে রইলাম। মাসতুতো বোনের বান্ধবীকে কী আপনি বলে কথা বলা উচিত? সরাসরি তুই-ও বলা যায় না। দুজনের দিকেই সমানভাবে তাকিয়ে আমি বললাম, ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে।

টুমপা বলল, এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাব?

—হাঁটবে। হাঁটা ছাড়া আর তো কোনো যাওয়ার উপায় নেই।

—এই বৃষ্টির মধ্যে হাঁটব? সেই সাদার্ন এভিনিউ পর্যন্ত? অসম্ভব! ব্রঙ্কাইটিস অথবা নিউমোনিয়া হয়ে যাবে!

—তাহলে দাঁড়িয়ে থাক। এইসব বাসে উঠতে পারবি? আমি এরকম ভিড়ের বাসে কক্ষনো উঠি না। দাঁড়া তাহলে, বৃষ্টি থামুক, তার এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বাদে রাস্তায় জল কমলে...অন্তত সাড়ে নটা-দশটার আগে তো নয়ই।

—আহা-হা, এত কিপ্টে কেন তুমি? একটা ট্যাকসি ডাকতে পারছ না? না-হয় আমরাই ভাড়া দেব!

মেয়েদের অবুঝপনা বলে একেই! এটা কী কিপ্টেমীর কথা হলো? এমনি দিনেই কথা নেই, আর আজ এই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে সব রাস্তায় এককোমর জল—এখন চৌরঙ্গী থেকে একটা ট্যাকসি জোগাড় করার চেয়ে একটা নতুন মোটরগাড়ি কিনে ফেলা অনেক সহজ। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আপন মনে বৃষ্টিটা উপভোগ করতে-করতে যাব ভাবছিলাম, তার মধ্যে এ কী বাধা!

ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এখন বাড়ি না-ফিরলে খুব অসুবিধে হবে?

মেয়েটি শুকনো মুখে বলল, খুব। মা আমাকে আসতেই বারণ করছিলেন আজ।

—বাড়িতে খুব কড়া শাসন বুঝি?

—না না, সেজন্য নয়। কিন্তু আজ একটা অন্য ব্যাপার আছে।

নিজের মাসতুতো বোনের জন্য যতটা কষ্ট স্বীকার করা যায়, তার বান্ধবীর জন্য খানিকটা বেশি করতেই হয়। সদ্য-পরিচিতা যুবতীর জন্য খানিকটা শিভালরি না-দেখালে পুরুষ সমাজের কাছেই আমি নিন্দিত হব।

তারপর মিনিট পনেরোর চেষ্টায় কী করে যে আমি একটা ট্যাকসি জোগাড় করলাম, সে কাহিনী না-বলাই ভালো। সবাই ভাববেন, আমি নিজের কীর্তি নিয়ে অহংকার করছি।

ট্যাকসিতে উঠে টুমপা বলল, ইন্দ্রাণী এবার এম. এস-সি পরীক্ষা দিয়েছে, দারুণ ভালো ছাত্রী, বুঝলে নীলুদা, আমার খুব বন্ধু—।

ইন্দ্রাণী কিন্তু একটি কথাও বলল না, মুখখানা ম্লান, হয়তো কোন ব্যাপারে চিন্তিত। টুমপা খুব সরল আর ছেলেমানুষ ধরনের, একাই অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল।

আমি একসময় টুমপার মাথায় একটা গাট্টা মেরে বললাম, এত কষ্ট করে ট্যাকসি ধরে দিলাম, আমাকে ধন্যবাদও জানালি না? আমার সঙ্গে দেখা না-হলে এতক্ষণ তোরা কী করতিস?

—ইস, তোমাকে আবার ধন্যবাদ জানাব কী!

যে রাস্তা দিয়ে এখন ট্যাকসিটা যাচ্ছে, সেটা জলে থৈ-থৈ করছে, কিন্তু মানুষজন প্রায় নেই বললেই চলে। রাস্তার আলোও নিভে গেছে। হঠাৎ তিন-চারজন লোক জল ছপছপিয়ে বিপজ্জনকভাবে আমাদের ট্যাকসির সামনে দিয়ে এমনভাবে ছুটে গেল যে, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল আমাদের ট্যাকসি। আমরা হুমড়ি

খেয়ে পড়লাম। সামনে তাকিয়ে দেখি, তিনজন লোক মিলে একটি লোককে ধুপধাপ করে ঘুঁষি মারতে শুরু করেছে। মনে হয় নিজেদের দলের মধ্যেই ঝগড়া, যদিও আক্রান্ত লোকটি চিৎকার করছে তারস্বরে।

আজকাল এইসব ক্ষেত্রে যা হয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থানত্যাগ করার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। আমাকে কিছু বলতে হলো না, ট্যাকসি-ড্রাইভারই স্পিড বাড়িয়ে দিল।

ঘাড় ফিরিয়ে আমরা তখনো পিছনের মারামারি দেখছি, ইন্দ্রাণী বলল, আগেকার দিন হলে রাস্তায় এরকম মারামারি দেখলে সবাই গাড়ি থামাত, নেমে মারামারি ছাড়িয়ে দিত।

কথাটা কী আমাকে উদ্দেশ করে বলা? আমার উচিত ছিল ঐ আক্রান্ত লোকটিকে বাচানো? এই নির্জন রাস্তায়, এককোমর জলের মধ্যে ট্যাকসিতে দুজন মেয়েকে বসিয়ে রেখে? আমি অবাক হয়ে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকালাম।

টুমপা বলল, পাগল নাকি! ঐসব গুণ্ডাদের মারামারির মধ্যে কেউ যায়?

আমি ঈষৎ ঠাট্টার সুরে ইন্দ্রাণীকে বললাম, তুমি বুঝি সিনেমায় এইমাত্র এরকম একটা দৃশ্য দেখে এলে? বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার কিংবা জেমস বণ্ড একাই দশজন লোককে ঘুঁষি মেরে ফ্ল্যাট করে দেয়।

ইন্দ্রাণী আর কিছু বলল না! একটু বাদেই তার বাড়ি এসে গেল। নামার সময় শুধু শুকনো মুখে বলল, চলি।

টুমপাকে বাড়ি পৌঁছুতে গিয়ে ওর সঙ্গে নামতেই হলো, বাড়ি পৌঁছে দেবার কৃতজ্ঞতা হিসেবে টুমপা আমাকে ভালো এক কাপ কফি খাইয়ে দিল!

বাড়ি ফিরে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বর্ষার রাত্রিটা তো মাঠে মারা গেলই, তারপরও দুটো দিন মেজাজ ভালো হলো না। ইন্দ্রাণী মেয়েটি ভারী সুন্দর, সে তো আমার সঙ্গে একটু হেসে কথা বলতেও পারত, কিন্তু ওরকম গঞ্জনা দিয়ে গেল কেন? অন্যায়-অবিচার দেখলে সব পুরুষমানুষের মনের মধ্যেই খচখচ করে, প্রতিকার করতে না-পারলে মনের মধ্যে একটা গ্লানি আসে—বিরলে আমরা দুঃখ বোধ করি। কোন মেয়ের মুখ থেকে সেকথা শুনতে কী আর ভালো লাগে? গ্লানিবোধ দ্বিগুণ হয়ে যায়।

দিনকয়েক বাদে টুমপার সঙ্গে আবার দেখা। বিরাট উৎসাহের সঙ্গে একমুখ হাসি নিয়ে বলল, নীলুদা, জানো তো, দারুণ ব্যাপার! ইন্দ্রাণী এম. এস-সিতে ফার্স্টক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে...! আমি বলেছি, তোমাকে একদিন খাওয়াতে।

—আমাকে কেন?

—বাঃ, ইন্দ্রাণী কী বলেছে জানো না? তুমি নাকি দারুণ লাকি লোক!

সেদিনই ওর পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার কথা তো, ও খুব মন খারাপ করে ছিল। আমিই ওকে জোর করে সিনেমা দেখতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ঐরকম বৃষ্টি, বাড়ি ফেরার উপায় নেই—এমন সময় তোমার সঙ্গে দেখা। বাড়ি ফেরার ব্যবস্থাও হয়ে গেল, আর বাড়ি ফিরেই ও গুড নিউজ শুনল। তোমার সম্পর্কে তো ও একেবারে উচ্ছ্বসিত। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলেই—

আমি সামান্য হাসলাম। এই ব্যাপার! পরীক্ষার রেজাল্টের দুশ্চিন্তায় মুখ শুকনো করে ছিল ইন্দ্রাণী। আমার সঙ্গে সেইজন্যই ভালোভাবে কথা বলেনি—খুবই স্বাভাবিক। রাস্তায় মারামারি দেখে ও হয়তো এমনিই একটা মন্তব্য করেছিল, ভাবেনি যে সেটাতে আমি কোন আঘাত পাব। অথচ আমি দুদিন মন খারাপ করে রইলাম।

মেয়েরা যে না-জেনে কত আঘাত দেয় পুরুষদের!

১৩

সমুদ্রের ওপরে যে গোপালপুর, সেখানে আমি দুবার বেড়াতে গিয়েছি। একই জায়গা, একই সমুদ্র অথচ দুবার আমার কাছে ঠিক বিপরীত দুরকম লেগেছিল। এমনকী, প্রথমবার সমুদ্রের প্রায় ওপরেই এক বাড়িতে ছিলাম যদিও, কিন্তু সমুদ্র প্রায় দেখিইনি বলা যায়।

প্রথমবার গিয়েছিলাম পাঁচ বন্ধু মিলে। পাঁচজনেরই বয়স প্রায় সমান, কিন্তু রুচি আলাদা-আলাদা, চেহারা নানাধরনের। আমার রোগা-পটকা চেহারা বলে আমিই ছিলাম দলের মধ্যে সব চেয়ে অনুল্লেখযোগ্য সদস্য, কোন ব্যাপারেই আমার মতামত গ্রাহ্য হতো না।

সেবার কোথায় গিয়ে থাকব ঠিক ছিল না কিছু। ট্রেনে বহরমপুর পর্যন্ত গিয়ে তারপর বাসে গোপালপুর। বাস থেকে নামামাত্রই নুলিয়ারা ঘিরে ধরেছিল—ওখানকার নুলিয়ারা অনেকটা পাণ্ডা আর নুলিয়ার সমাহার, অর্থাৎ তারাই বাড়ি ঠিক করে দেবে, খাবারদাবারের ব্যবস্থা করবে, আবার সমুদ্রসাঁতারে সঙ্গী হবে। আমরা প্রত্যেকেই সাঁতার জানি, সমুদ্রে সাঁতার কাটাও অভ্যেস আছে এবং জীবনসমুদ্রে আমাদের কোন কর্ণধার রাখার প্রয়োজন বোধ করিনি। এইজন্য প্রথমেই নুলিয়াদের সঙ্গে একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। নুলিয়ারা প্রথমে নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া করছিল কে আমাদের দখলে নেবে এই জন্য। আমরা কারুকেই নিলাম না বলে ওরা এককাট্টা হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে গেল, শাসানি দিল যে ওদের

সাহায্য ছাড়া আমরা বাড়ি পাব না। খাবার দাবার পাব না।

সবই পাওয়া গেল অবশ্য। বেলাভূমির ঠিক পাশেই একটা গোটা বাড়ি পেলাম, ভাড়াও সস্তা। বাজারহাট করে দেওয়া ও খাবার জল এনে দেবারও লোক জুটে গেল। রাস্তায় বেরুলে কখনো-কখনো নুলিয়ারা দল বেঁধে আমাদের পিছনে-পিছনে এসে দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব আওয়াজ দিত, তবে ওদের সাহস বেশি ছিল না, আমরা একটু রুখে দাঁড়ালেই ওরা পালাত, এই পর্যন্ত। ওখানে কোন বাঙালিবিদ্বেষ বা প্রাদেশিকতা অবশ্য চোখে পড়েনি—সাধারণ অধিবাসীরা বেশির ভাগই তেলেঙ্গি, তারা বেশ সরল ও ভালো মানুষ।

আমি ভ্রমণকাহিনী লিখতে বসিনি। তাহলে বানিয়ে-বানিয়ে কোন রোমান্সের ঘটনা লিখতে হয়। আমি গল্প একদম বানাতে পারি না, একটু আধটু বানাতে গেলেই ধরা পড়ে যাই। সেবার কোন রোমহর্ষক ঘটনাও ঘটেনি।

মোটামুটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচজন ছেলে বাইরে বেড়াতে গেলে যা হয়। দলের মধ্যে একজন নিজে-নিজেই ক্যাপ্টেন হয়ে যায়। একজন একটু গোঁয়ার ধরনের, যার-তার সঙ্গে মারামারি বাধাতে গেলে অন্য বন্ধুরা তাকে থামায়। একজন একটু বেশি স্বার্থপর, একজন ভালোমানুষ কিংবা ক্যাবলা, একজন মিটমিটে পাজী। অর্থাৎ গোটা মধ্যবিত্ত সমাজটারই প্রতিনিধিবর্গ।

দল বেঁধে বাইরে যাবার আনন্দও যেমন, তেমনি তাতে অনেক ফাঁকও থেকে যায়। এক হিসেবে আমরা কলকাতারই একটা বৈঠকখানা তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম গোপালপুরে, সারাদিন সেই ধরনেরই আড্ডা। সমুদ্র একটা ছিল বটে, তবে সেটা নেহাতই ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসেবে, বৈঠকখানার ক্যালেণ্ডারেও তো সমুদ্রের ছবি থাকে, কখনো-কখনো তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, বাঃ, বেশ ছবিটা তো! সমুদ্রে স্নান করতামও দু-তিনঘণ্টা ধরে, তবে যে ধরনের রসিকতা ও হাস্য-পরিহাস হতো তখন—তাতে কলকাতার গঙ্গায় স্নানের সঙ্গে বিশেষ তফাত নেই।

আমাদের রুটিন ছিল, পেট ভরে ঘুমোনো, মন ভরে খাওয়া আর দম ভরে আড্ডা। মাছ ওখানে খুব সস্তা বলে আমরা বাঙালির ছেলে বেশি বেশি সমুদ্রের মাছ খেয়ে সবাই পেট খারাপ করে ফেললাম। আর একটা প্রধান কাজ ছিল, সকাল-সন্ধেতে বেড়াতে বেরিয়ে মেয়েদের সম্পর্কে চাপা মন্তব্য ও কিছুদূর ব্যর্থ অনুসরণ। কাচা বয়স তো, ঐ দোষ তো থাকবেই। কিন্তু যেহেতু বানিয়ে গল্প লিখতে বসিনি তাই স্বীকার করতে দোষ নেই যে, শেষ পর্যন্ত কোন মেয়ের সঙ্গেই আমাদের আলাপ হয়নি। সুন্দরী মেয়ের অভাব ছিল না, বাঙালি রূপগরবিনী মেয়েও ছিল, কিন্তু কেউ আমাদের পাত্তা দেয়নি। আমাদের দলের মধ্যে দু-একজন বলেছে বটে ঐ লাল শাড়ি-পরা মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছে কিংবা

ঐ মেয়েটা এমনভাবে আমার দিকে চাইছে না, নিশ্চয়ই আমাকে চেনে কিংবা ঐ সবুজ শাড়িকে দ্যাখো, ডেফিনিট কেস, একটু এগুলেই হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি অবশ্য।

সাতদিন থাকার কথা ছিল, ছদিনের মাথায় আমরা ফিরে এলাম। তার কারণ, তিনদিন পরেই আমাদের একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছিল। দ্বিতীয়ত, অনেকেরই পেটখারাপ সারছিল না, তৃতীয়ত টাকা পয়সা ফুরিয়ে এসেছিল। চতুর্থত, আমাদের বাড়ির ছাদটায় রোজ রাত্রে বিশ্রী ধরনের ধুপধাপ আওয়াজ হতো। দল মিলে ছাদে উঠে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম, কিছুই দেখতে পাইনি—কিন্তু আওয়াজ রোজই বাড়ছিল। ভূত বিশ্বাস করা আমাদের চরিত্রে মানায় না—কিন্তু অস্বস্তি বাড়ছিল ঠিকই—এটা নুলিয়াদের উৎপাত বলে ধরে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। কলকাতায় ফিরে এসে অন্যদের কাছে গোপালপুরের বর্ণনা দিতে বললাম, ওখানে মাছ সস্তা, সহজে বাড়িভাড়া পাওয়া যায়, আশেপাশে আর দেখবার কিছুই নেই অবশ্য—পুরীর মতন। আর সমুদ্র, হ্যাঁ, সমুদ্র তো আছেই, সে আর নতুনত্ব কী, সমুদ্রের পারে গেলে তো সমুদ্র দেখা যাবেই।

দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম একা। তাও দৈবক্রমে। আমার এক বন্ধুর দাদা বিদেশ থেকে মেমবউ নিয়ে এসেছেন। মেমবউদির এদেশের গরম একেবারে সহ্য হচ্ছে না—তাকে পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা হচ্ছিল। পাহাড়ের বদলে সমুদ্রই ঠিক হলো, পুরী কিংবা দীঘা এই নিয়ে দোনামনা হচ্ছিল, আমি হঠাৎ বললাম গোপালপুর-অন-সী যান-না। বেশ নিরিবিলি। বন্ধুর দাদা বললেন, ঠিক আছে, গোপালপুরই যাওয়া যাক, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। বেশ একটা বড় দল মিলে গেলে...

হাওড়া স্টেশনে সবার দেখা করার কথা ছিল কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তেও ওঁরা কেউ এসে পৌঁছলেন না—আমার টিকিট আমার কাছেই ছিল, সেটা নষ্ট না-করে আমি একাই ট্রেনে চেপে বসলাম। পরে অবশ্য শুনেছিলাম, কলেজস্ট্রিটে একটা সাংঘাতিক বাস অ্যাকসিডেন্টে এমন ট্রাফিকজ্যাম হয়েছিল যে সেদিন ঐ রাস্তায় অনেকেই ট্রেন ধরতে পারেনি।

পাকেচক্রে আমি একা হাজির হলাম গোপালপুরে। এবার আর পুরো বাড়ি ভাড়া করিনি, উঠেছিলাম মিসেস সোম-এর লজে। মিসেস সোম বাঙালি ক্রিশ্চান, ষাটের ওপর বয়েস, একা এই লজটি চালান। ছোটখাটো পরিবার কিংবা একা কেউ গেলে ওঁর ওখানে বেশ সুন্দরভাবে থাকা যায়। ওখানে খাওয়া-দাওয়ারও বন্দোবস্ত আছে, আবার ইচ্ছে করলে কেউ রান্না করেও খেতে পারে।

গোলাপখাস আমের মতন টুকটুকে গায়ের রং মিসেস সোমের, মাথার

চুলগুলোও ধপধপে সাদা, মুখের হাসিটা খুব মা-মা ধরনের। সাধারণত ইংরেজিতে কথা বলেন, কিন্তু আমাকে দেখে সরাসরি বাংলায় বললেন, সাতদিন চুপচাপ থাকো, খাও দাও, দেখবে একেবারে স্বাস্থ্য ফিরে যাবে।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছিল, প্লুরিসি না টি. বি?

আমার রোগাপটকা চেহারা দেখে উনি ধরেই নিয়েছেন যে আমি ঐধরনের কোন অসুখ থেকে উঠে শরীর সারাতে এসেছি। তাছাড়া একা-একা বোধ হয় আর কেউ আসে না। আমার পক্ষে এখন আর অস্বীকার করেও লাভ নেই। মৃদু-মৃদু হেসে চুপ করে রইলাম।

একদিন বাদে বন্ধুর দাদার টেলিগ্রাম পেলাম যে, সেদিন ওরা ট্রেন মিস করে গোপালপুরকে অপয়া বলে ধরে নিয়েছেন এবং পরদিন সকালেই দীঘা চলে গেছেন। আমি যেন সেখানে চলে যাই। গেলাম না, আমি গোপালপুরেই রইলাম।

সারাদিন আমার কিছুই করার নেই। একা-একা ঘুরে বেড়াই অথবা সমুদ্রের মুখোমুখি বসে থাকি। সেই একই গোপালপুর, কিন্তু এবার যেন অন্য একটা জায়গায় এসেছি। এখন আমি জেনেছি এই সমুদ্রের চরিত্র, এর জোয়ার-ভাটা ও রং বদলানো। এখন আমি দেখছি এখানকার মানুষদের, এখন আমি দেখতে পাচ্ছি নিজেকে।

একটা জিনিস লক্ষ করলাম, দলবলের সঙ্গে যখন মিশে থাকি তখন যথেষ্ট হৈ-হল্লায় মেতে উঠতে পারি কিন্তু একা যখন থাকি তখন অচেনা লোকের সঙ্গে মেশার যোগ্যতা আমার একটুও নেই! অতিরিক্ত লাজুক হয়ে পড়ি। সাত-আটদিনের মধ্যে গোপালপুরে আমার কারুর সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হলো না। মিসেস সোম প্রায়ই আমার খোজ খবর নিতে আসতেন, কিন্তু তিনি আমাকে অসুখের কথা বলেছিলেন বলে ওর সঙ্গে আর বেশি কথা বলার উৎসাহ পাইনি। মিসেস সোমের লজে পাচটি পরিবারের থাকার ব্যবস্থা, একটি ঘর খালি, একটিতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবার, অন্যটিতে এক পাঞ্জাবি দম্পতি সব সময় নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আর-একটিতে এক বাঙালি প্রৌঢ় দম্পতি আর তাদের আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে। সেই পরিবারের ভদ্রলোকটি নিজে থেকে মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে কথা বলতেন, তাঁর স্ত্রীও দু-চারটে কথা বলেছেন, কিন্তু ওদের মেয়ের সঙ্গে আমার একবারটিও আলাপ করিয়ে দিলেন না। পাশাপাশি ঘর, মেয়েটির সঙ্গে অনেকবারই দেখা হয়েছে, কথা হয়নি একবারও।

বিকেলে হাটতে-হাটতে আমি চলে যেতাম অনেক দূরে। জেলেবস্তির কাছাকাছি। এবার আর মাছ কেনার গরজ নেই। গতবার এসে বন্ধুরা সবাই দল মিলে এখানে এক-আধবার এসে সস্তায় মাছ কেনার জন্য দরাদরি করেছি,

আর-কিছুই দেখিনি। এবার অনেক কিছুই চোখে পড়ল।

এই জেলেরা সবাই তেলেঙ্গি, কালো কুচকুচে বার্নিশ করা রং, ভাষা একবর্ণ বোঝা যায় না—দু-একজন ভাঙা-ভাঙা হিন্দি বলতে পারে। সন্ধের সময় চারজন জেলে সমুদ্রের পারে বালিতে বসে মাটির ভাঁড়ে করে কী যেন খাচ্ছিল, সম্ভবত দিশি মদ। আমাকে দেখে একজন জিজ্ঞেস করল, কী চাই বাবু আপনার?

আমি বললাম, কিছু চাই না। মাছ কিনতেও আসিনি। তোমরা তো সমুদ্রের অনেক দূরে মাছ ধরতে যাও, সেই মাছ ধরার গল্প শোনাবে?

গল্পের কথা শুনে ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল। এ তো ওদের জীবন, এ তো গল্প নয়। ওদের সেই সাংঘাতিক জীবনের কথা লেখার মতন ভাষা আমার জানা নেই। সূর্য ওঠার আগে ওরা নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, ফেরে সূর্য অস্ত যাবার সময়। সারাটা দিন ওরা সমুদ্রের ওপর কাটায় মোচার খোলার মতন নৌকোতে। প্রচণ্ড রোদ, কখনো প্রচণ্ড বৃষ্টি, ঝড়—সবই যায় ওদের শরীরের ওপর দিয়ে। প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরুবার সময় ওরা জানে না, ওরা আবার বেঁচে ফিরবে কিনা। প্রত্যেক বছরই দু-চারটে নৌকো জেলেদের নিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে যায়। যারা বেঁচে থাকে, তাদেরই-বা কী আছে জীবনের কিংবা বেঁচে থাকার আনন্দ? ভারতবর্ষে জেলেরাই বোধ হয় সব চেয়ে গরীব, সব চেয়ে বেশি শোষিত, বঞ্চিত। আমি দেখেছিলাম, সারাদিন পর জেলেরা ফিরেছে, রোদ্দুরে পুড়ে জলে ভিজে ওদের শরীরগুলো যেন কাঠের মতন, ওদের স্ত্রীরা ওদের গায়ে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে, লোকগুলি যেন বোধহীন, অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জেলেদের কথা শুনে খানিকটা ভারী অবসন্ন মনে ফিরি আমি বেলাভূমি ধরে। রাত হয়ে গেছে। সমুদ্রের অশ্রান্ত আওয়াজ, ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাসের উজ্জ্বল রেখা, ঠিক মালার মতন। হঠাৎ মনে পড়ে মাইকেলের লাইন, 'কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেত! হে জলদলপতি—।' মনে হয়, এই সমুদ্র যেন সত্যিই একটা প্রবল ব্যক্তিত্ব, কী রাশভারী, কী বিপুল গাম্ভীর্য! তাকিয়ে-তাকিয়ে আর চোখ ফেরে না!

লজে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরেও তক্ষুনি ঘুম আসে না। সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় গিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসি। আগেরবার এসে সমুদ্র দেখার সময়ই পাইনি এবার এত দেখেও ক্লান্তি লাগছে না। আগেরবার সারাক্ষণ কী দারুণ আড্ডা দিয়েছি, এবার আমি প্রায় বোবা। দুবার যেন দুজায়গায় এসেছি।

হঠাৎ চোখ পড়ে, পাশের বারান্দায় সেই বাঙালি মেয়েটিও একা-একা বসে সমুদ্রকে দেখছে। ঐ মেয়েটিও নিঃসঙ্গ। বাবা-মার সঙ্গে আর কত গল্প করবে। মেয়েটিও নিঃসঙ্গ, আমিও তাই; যদি দুজনের...

আমি রসালো ভ্রমণকাহিনী কিংবা কাল্পনিক রোমান্স লিখতে বসিনি। একই জায়গায় দুবার দুরকমভাবে এলে দৃষ্টি কেমন পাল্টে যায়, শুধু সেইটুকুই বলা উদ্দেশ্য। মেয়েটির সঙ্গে আমার শেষ পর্যন্ত আলাপ হয়নি। ক'দিন বাদে ফিরে এলাম। ফিরে এলাম একটা বিশাল ব্যক্তিত্বময় সমুদ্রের স্মৃতি, একদল নিপীড়িত মানুষের দুঃখবোধ আর ব্যক্তিগত বিষাদ নিয়ে।

১৪

আজকের ফুল কাল শুকিয়ে যায়। কিন্তু পরশুদিন তার কী অবস্থা হয়? আজ যে-গোলাপ শুকিয়ে গেছে, এক সপ্তাহ বাদে সেটা আরো কতখানি শুকনো হবে—সাধারণত লক্ষ করে দেখা হয় না।

কেউ বিশ্বাস করে কিনা জানি না, আমার কাছে একটা বারো বছরের পুরোনো যুঁই ফুলের মালা আছে। বারো বছর যদি এক যুগ ধরা হয়, তাহলে মালাটিকে বলা যায় আমার গত যুগের। ফুলগুলো কিন্তু পচে নষ্ট হয়নি, শুকিয়ে শক্ত হয়ে এখনো সুতোর সঙ্গে গাঁথা। হালকা খয়েরি রং এখন, তবুও যুঁই ফুল বলে চেনা যায়। নাকের কাছে নিয়ে এলে এখনো একটু-একটু গন্ধ পাওয়া যায়—কিংবা সেটা আমার কল্পনাও হতে পারে।

এক যুগ আগে, নাইট শোতে সিনেমা দেখে ফেরার পথে শম্পা আমাকে এই মালাটা দিয়েছিল। তখন কলেজ-টলেজে পড়ি, সব সময় বুক ফুলিয়ে খুব একটা বীরত্বের ভাব দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতাম যদিও, কিন্তু মেয়েদের দেখলেই কাচুমাচু হয়ে যেতাম। শম্পা ছিল আমার বন্ধু বিমানের মাসতুতো বোন। দারুণ স্মার্ট মেয়ে। একদিন সে কফি হাউসে ফস করে চেচিয়ে গান গেয়ে উঠে সবাইকে চমৎকৃত করে দিয়েছিল।

শম্পাকে আমি মনে-মনে দেবীর আসনে বসিয়েছিলাম বটে, কিন্তু এমনিতে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কফি হাউসে-টাউসে ওর চারপাশে অনেক মৌমাছি গুনগুন করত—আমি বরাবরই বেশ লাজুক, ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে কথা বলতে পারি না। দূর থেকে শম্পার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে কথা বলতাম।

নাইট শো-তে দল বেধে হ্যামলেট দেখতে গিয়েছিলাম, টিকিট কেটেছিল বিমান, শম্পাও যে যাবে আমি জানতাম না। অন্ধকারে ঢুকে একেবারে শম্পার পাশে বসে পড়ার পর একটা চাপা আনন্দে আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলাম। শরীরটা হাল্কা হয়ে গেল, অন্ধকারের মধ্যেও যেন একটা স্নিগ্ধ স্পর্শ।

—শম্পা, তুমি আসবে, জানতাম না তো!

—স স্ স, বই আরম্ভ হয়ে গেছে—

আমি মনে-মনে বললাম, সত্যি হোরেশিও, স্বর্গ এবং পৃথিবীতে এখনো এমন অনেক ব্যাপার আছে, যা তোমার দর্শনে কল্পনাও করতে পারোনি। কল্পনা করতে পেরেছিলে, আজ রাত নটায় তুমি শম্পার পাশে বসার দুর্লভ সৌভাগ্য পেয়ে যাবে! কী অপরূপ গন্ধ আসছে শম্পার শরীর থেকে! মনে হচ্ছে, আমি যেন চেয়ারে বসে নেই, একটা ঝর্নার পাশে শুয়ে আছি।

শো ভাঙবার পর বেরিয়ে ট্যাক্সি খোঁজাখুঁজি করছি— আমরা দু-তিনজন যাব উত্তরে, শম্পা আর বিমান যাবে দক্ষিণে। এক্ষুনি আমরা আলাদা হয়ে যাব—তার আগে আমরা দ্রুত আলোচনা সেরে নিচ্ছি, কার কেমন লেগেছে ছবিটা। আমি চুপ করেই ছিলাম। শম্পা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিছু বলছেন না যে? আপনার ভালো লাগেনি?

আমি হঠাৎ অতিরিক্ত স্মার্ট হয়ে গিয়ে বললাম, আমি তো ছবিটা মন দিয়ে দেখতেই পারিনি! দেখব কী, তোমার সারা গা দিয়ে এমন সুন্দর একটা গন্ধ বেরুচ্ছিল—

শম্পা খিলখিল করে হাসতে-হাসতে বলল, সারা গা দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে? ওমা, সে কী!

—হ্যাঁ, সত্যি, একটা খুব সুন্দর গন্ধ! আগে কখনো এরকম গন্ধ কোন মেয়ের গা থেকে পাইনি!

শম্পার খোঁপায় যে মালা জড়ানো ছিল, আমি লক্ষ করিনি। শম্পা চুলে হাত দিয়ে একছড়া যুঁই ফুলের মালা খুলে এনে বলল, এইটা? এর গন্ধটা খুব ভালো লাগল আপনার? আগে কখনো যুঁই ফুলের গন্ধ শোঁকেননি?

অনেক ছেলে মেয়েদের সামনে বেশ টকটক স্মার্ট কথা বলে যায়, কোনকিছুতে ভুল হয় না। আমার পক্ষে লাজুকতাই ভালো দেখছি, হঠাৎ একটা কিছু বলে ফেলেও আর তাল সামলাতে পারি না। সত্যিই তো যুঁই ফুলের গন্ধ কী আমার চেনা উচিত ছিল না!

ট্যাক্সির জানলায় শম্পার মুখ, ওদের ট্যাক্সিটা তখন ছেড়ে দিয়েছে। শম্পা ইয়ার্কি করে বলল, এই নিন, মালাটা আপনিই নিয়ে যান। সারা রাত ধরে শুঁকবেন।

সত্যি-সত্যি মালাটা আমার হাতে দিয়ে গেল, ওদের ট্যাক্সি চলে গেছে। মালাটা হাতে নিয়ে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বন্ধুরা তো একচোট ঠাট্টা যা করার তা করলই, কিন্তু সমস্যা হলো বাড়ি পৌঁছে। মালাটা নিয়ে আমি করব কী? রাত্তির বারোটার সময় আমি একটা যুঁই

ফুলের মালা নিয়ে বাড়ি ফিরছি—এ দৃশ্য কল্পনাই করা যায় না। আমাদের বাড়িতে তখন খুব কড়া শাসন। কোন মেয়ে চিঠি লিখতে চাইলে বাড়ির ঠিকানা না-দিয়ে এক বন্ধুর ঠিকানা দিতাম। সেই আমি যুঁই ফুলের মালা নিয়ে মাঝরাতে...

অথচ মালাটা ফেলে দিতে একটুও ইচ্ছে করল না। শম্পা তার খোঁপা থেকে মালাটা খুলে দিয়েছে, সেটা আমি রাস্তার ধুলোবালির মধ্যে ফেলে দেব—এ কখনো হতে পারে? এ শুধু শম্পাকে নয়, পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্যকে অপমান করা। তাছাড়া, আগেকার দিনে রানীরা যেমন কখনো কোন ভক্তের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে গলা থেকে বহুমূল্য হার খুলে দিতেন, আমার এটাও যেন সেই রকম উপহার।

মালাটা আমি পকেটে লুকিয়ে এনে বাড়িতে ফিরলাম। সারারাত সেটা মাথার পাশে নিয়ে জেগে থাকিনি ঠিকই, তবে ঘুমোতে যাবার আগে বেশ কিছুক্ষণ সেটার গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে মনে হয়েছিল, আমি যেন শম্পার হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি, শম্পা যেন আমার সামনেই বসে আছে।

মালাটা পরদিন সকালেও ফেলতে পারিনি কিছুতেই। মনের মধ্যে এই কথাটাই বারবার আসছিল, মুক্তোর মালা হলে যত্ন করে রেখে দিতাম আর ফুলের মালা বলেই ফেলে দেব? ফুল কী মুক্তোর চেয়ে কম দামি? (বাইশ-তেইশবছর বয়সেই শুধু এই ধরনের চমকপ্রদ কথা মনে আসে।) মালাটা আমি নিজস্ব সুটকেসের একেবারে তলায়, কাগজের ভাঁজে লুকিয়ে রেখে দিলাম।

এক বছর দুবছর অন্তর সকলেই একবার করে সুটকেস কিংবা টেবিলের ড্রয়ার গুছোয়। কত চিঠি বা কাগজ—যা একসময় দারুণ দরকারি ছিল, এক বছর পর তার আর কোন মূল্যই থাকে না— মুড়ে-মুড়ে সেগুলো ফেলে দিই। মালাটা ফেলতে পারি না।

তারপর এতগুলো বছর কেটে গেল, শম্পার জীবন আর আমার জীবন সম্পূর্ণ দুদিকে ঘুরে গেছে, তবু মালাটির বিষয়ে মনঃস্থির করতে পারি না এখনো। সুটকেসের তলার কাগজ মাঝে-মাঝে বদলাতে হয়, মালাটা তখন ফেলে দিতে গিয়েও আবার নতুন কাগজের ভাঁজে রেখে দিই, আছে, থাক না!

শম্পার সঙ্গে আমি বেশি ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি। তার চারপাশের উজ্জ্বল যুবকদের মধ্যে আমি পাত্তা পাইনি। তাছাড়া, শম্পার স্বভাব ছিল—একজন কারুর সঙ্গে নিভৃতে গল্প করার বদলে, বেশ কয়েকজন স্তাবক-ঘেরাও অবস্থায় থাকা। তার পর দুম করে একদিন শম্পার বিয়ে হয়ে গেল শান্তনুর সঙ্গে—এলাহাবাদে চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। শম্পাকে কোনদিন আমি চিঠিপত্র লিখিনি, শম্পা হয়তো আমার কথা মনেও রাখেনি।

তিন-চারবছর বাদেই শুনলাম শম্পা সিনেমায় নামছে—তাও বাংলায় নয়,

এক লাফে হিন্দিতে। দু-একখানা ফিল্ম ম্যাগাজিনে ওর ছবিটবিও দেখা গেল, তবে ফিল্মটা শেষ পর্যন্ত রিলিজড হয়নি। শম্পার সিনেমায় নামার খবরে আমরা খুব ছি-ছি করেছিলাম। যদিও আমরা সিনেমাকে এখন আর্ট বলে মনে করি, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সবাই শিল্পী—তবুও চেনাশুনো মেয়েদের ফিল্মে অভিনয় করা আমরা অনেকেই পছন্দ করি না। পছন্দ করি না, আবার লোকজনের কাছে একথা বলার লোভও সম্বরণ করতে পারি না যে, ঐ যে অমুক বইতে নায়িকার পার্ট করেছে, ওকে তো আমি ছেলেবেলা থেকেই চিনি। এখনো ওর সঙ্গে দেখা হলে...

হিন্দি ফিল্মে ব্যর্থ হয়ে শম্পা চলে এল কলকাতায়, একটা বাংলা ফিল্মে সুযোগও পেয়ে গেল। শুনলাম, শান্তনুর সঙ্গে শম্পার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, শান্তনু একা-একা চলে গেছে বিলেতে। আমরা এজন্য শম্পা সম্পর্কে যুগপৎ দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হলাম—ওর সম্পর্কে রীতিমতন আপত্তিকর গুজব শোনা যেতে লাগল। বিমান তো আর শম্পার নাম মুখেও আনে না।

শম্পা যে-ছবির নায়িকা, সে ছবি মুক্তি পাবার পর দুসপ্তাহও চলল না, দর্শকরা টিকিটের দাম ফেরত চেয়ে চেয়ার-টেবিল ভাঙল। শম্পা দেখতে খুবই সুন্দরী-সপ্রতিভ-চালাক-চতুর মেয়ে—ফিল্মে তার সার্থক হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ছবিতে দেখলাম তার অভিনয় পুতুলের মতন কাঠ-কাঠ। শম্পা সম্পর্কে আমরা নিস্পৃহ হয়ে গেলাম। অবশ্য সে যদি দারুণ জনপ্রিয় নায়িকা হতো, এরকম নিস্পৃহ হতে পারতাম কিনা সন্দেহ। শম্পা আরো চার-পাঁচটা ফিল্মে ছোটখাটো পার্ট করল, তারপর একেবারে হারিয়ে গেল। কানাঘুষোয় শুনতাম, শম্পা এখন অফিসের থিয়েটারে 'অ্যামেচার অ্যাকট্রেস'।

দিন দশেক আগে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটা চীনে রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম, শম্পা দোতলার সিঁড়ি দিয়ে দুজন কমীরধরনের চেহারার লোকের সঙ্গে নামছে। তার পোশাক ও পদক্ষেপ অসংবৃত। পাছে শম্পা আমায় চিনতে পারে কিংবা ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়—এইজন্য আমি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম।

শম্পার কোন মূল্যই নেই আমার কাছে, তবু সেই মালাটা আমি রেখে দিয়েছি কেন? ঐ মালাটা কোন মেয়ের স্মৃতি নয় আমার কাছে। সেই একটি রাত্রির সৌন্দর্য, চেনা ফুলের রহস্যময় সৌরভ আর ছেলেমানুষের মোহময় ভালোলাগা—যা আর কোনদিন ফিরে পাব না, এটা তার স্মৃতি।

১৫

ড্রয়ারের কাগজপত্র ঘাঁটতে-ঘাটতে হঠাৎ নন্দিতার ঠিকানা পেয়ে গেলাম। রেলের ডাইনিং কারের খাবার স্লিপে ঠিকানাটা লেখা। কাগজটা হাতে নিয়ে প্রথমে ভাবতে হলো, কে এই নন্দিতা অধিকারী? আমার স্মৃতির কোন অংশের অধিকারিণী? এক মিনিটের মধ্যেই অবশ্য মনে পড়ল নন্দিতার পুরো চেহারা, রহস্যময় হাসিসমেত তার ঝলমলে মুখ।

একবার ভাবলাম, ঠিকানা-লেখা কাগজটা গোল্লা পাকিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেব। কিন্তু ফেলা হলো না—হঠাৎ আমার মনে হলো, এইটাই তো নন্দিতার সঙ্গে দেখা করার সময়!

নন্দিতার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল দুবছর আগে, ট্রেনের কামরায়। রাজধানী এক্সপ্রেসে নয়, যে ট্রেন কলকাতা থেকে দিল্লিতে সাঁইত্রিশ ঘণ্টায় পৌঁছোবার কথা—কিন্তু চল্লিশ ঘণ্টার আগে পৌঁছোয় না—সেই ট্রেনে। আপদ বিপদের সময় খুব অল্প কারণেই ঘন বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সেবার মোগলসরাই-এর কাছে আমাদের ট্রেনে দুটি কামরায় আগুন লেগে গিয়েছিল, আমাদের কামরায় নয়, আমাদের পাশের কামরায়—কিন্তু আমাদের এখানকার নারী-যাত্রিণীরা দারুণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

মাঝপথে ট্রেন থেমে গিয়ে আমাদের পাশের কামরা থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। কী ব্যাপার বোঝার আগেই সবাই চেঁচামেচি হুড়োহুড়ি করতে লাগল। নন্দিতা বসেছিল আমার পাশে—তার মুখখানা বিবর্ণ, রক্তহীন। তারপর যখন ধোঁয়ার হলকা আমাদের কামরাতেও ঢোকে, সে তখন পাগলের মতন দরজা খুলে লাফ দিতে চায়—আমি ওর হাত চেপে না-ধরলে পড়েই যেত। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল ন্যাকামি। পরে আমাকে নন্দিতা বলল, আগুন সম্পর্কে ওর দারুণ ভয়। আগুন দেখলেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়।

সেই থেকে আলাপ। নন্দিতা তার এক বান্ধবীর সঙ্গে দিল্লি যাচ্ছিল। সেই বান্ধবী তার নাম-ঠিকানা লিখে দেয়নি, সুতরাং নাম ভুলে গেছি। চেহারাও মনে আছে অস্পষ্ট। দিল্লিতে ওরা উঠেছিল চাণক্যপুরীতে, আমি ডিফেন্স কলোনিতে। বারবার বলে দিয়েছিল দিল্লিতে দেখা করতে। আমি অবশ্য দেখা করিনি। ট্রেনে আলাপ ট্রেনেই বেশি জমে, পরে তেমন জমে না। বন্যার সময় মানুষে-মানুষে যেরকম আত্মীয়তা হয়, অন্য কোন সময় সেরকম হয় না।

তবুও অবশ্য নন্দিতা আর তার বান্ধবীর সঙ্গে দিল্লিতে দু-একবার দেখা হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে দিল্লিতে বেড়াতে গেলে—কে কোথায় যাবে, তা তো

বাঁধাধরা। কুতুবমিনার কিংবা লালকেল্লায়, সঁ এ লুমিয়ের (নাকি সন-এ লুমিয়ের—কী জানি কী উচ্চারণ, তার চেয়ে বাংলায় 'শব্দ ও আলো' বলাই ভালো) —এসব জায়গায় দেখা হবেই। দেখা হয়েছে, কিন্তু বেশি কথা হয়নি। তবে, প্রত্যেকবারই নন্দিতা বলেছে, কলকাতায় ফিরে দেখা করবেন কিন্তু। আমার চেহারার মধ্যে একটা গোবেচারা ভাব আছে বলে অনেকেই আমাকে দয়া করতে চায়।

দবছর কেটে গেছে, নন্দিতার সঙ্গে আমি দেখা করিনি। বস্তুত, নন্দিতার ঠিকানাটা আমার কাছে ছিল কিনা তাও মনে ছিল না। জামার পকেট থেকে কাগজপত্র সব ড্রয়ারে জমা করে দিই—তারপর এক বছর-দবছর অন্তর ড্রয়ার পরিষ্কার করি। তবে, ঠিকানার জন্য শুধু নয়, এমনিই আমি দেখা করার জন্য তেমন উৎসাহ বোধ করিনি। দার্জিলিং-এর গোলাপ ফুল কলকাতায় এনে শুকলে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না।

কিন্তু এখন হঠাৎ নন্দিতার ঠিকানাটা খুঁজে পেয়ে মনে হলো, একবার দেখা করা যাক না! এই তো সময়!

ঠিকানা খুঁজে পেতে বেশ অসুবিধে হলো। কারণ নন্দিতার হাতের লেখা সেই ঠিকানায় গিয়ে দেখলাম, ঐ নম্বরের ঐ রাস্তায় কোন বাড়ি নেই। এক বছর আগে ঐ রাস্তার সব বাড়ির নম্বর অদল বদল করা হয়েছে। প্রথমটা আমার মনে হয়েছিল, নন্দিতা আমাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছে। কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না। দুবছর আগে সামান্য আলাপ, এতদিন দেখা করিনি, এখন হঠাৎ ঠিকানা খোঁজার সত্যিই হয়তো কোন মানে হয় না। কিন্তু নন্দিতার সঙ্গে এক ট্রেনের কামরায় পাশাপাশি চল্লিশ ঘন্টা বসেছিলাম—আর কোন মেয়ের সঙ্গে এত দীর্ঘক্ষণ কী একসঙ্গে থেকেছি! আমি নির্লজ্জের মতন ঠিক খুঁজে বার করলাম ওদের বাড়ি।

আমার সঙ্গে আলাপের সময় নন্দিতা ছিল কুমারী, এখন তার পক্ষে বিবাহিতা হওয়া কিছুই আশ্চর্যের নয়। তখন সে বি. এ পরীক্ষা দিয়েছিল, এম. এ পড়ার আগেই প্রেমে পড়া কি অসম্ভব?

বেশ বড় বাড়ি ওদের। একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রৌঢ় জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চাই? আমি নির্ভয়ে নন্দিতার নাম বললাম। উনি আর জিজ্ঞেস করলেন না, আমি কোথা থেকে আসছি, বা আমার কী দরকার। বসতে বলে ভেতরে চলে গেলেন।

প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করতে হলো আমার। বসে-বসে ভাবছি, এতদিন বাদে নন্দিতা আমাকে চিনতে পারবে কিনা! ও ঘরে ঢুকলেই আমি বলব, চিনতে পারেন? তারপরও যদি নন্দিতা আমাকে চিনতে না-পারে, তখন আমি কী করব? সবিস্তারে বলব সেই ট্রেনের ঘটনা, দিল্লি যাবার পথে চল্লিশ

ঘণ্টা—সেই কামরায় আগুন লাগা ও চেঁচামেচি—তাও যদি ওর মনে না-পড়ে? যদি ওর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়? মেয়েদের স্মৃতিশক্তি সাধারণত খারাপ হয় না—কিন্তু যদি ইচ্ছে করে মনে করতে না-চায়? তাহলে কী ওর বাড়ির লোক আমাকে চ্যাংড়া ছোঁড়া ভাববে না কি?

আমি এতদিন বাদে এসেছি কেন ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য? ট্রেনে সেই ঘটনার পর নন্দিতা আমার ওপর খুব কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। আমি এসেছি আজ সেই কৃতজ্ঞতার প্রতিদান নিতে। আমি নন্দিতাকে জিজ্ঞেস করব, এবার পুজোয় কোথায় যাচ্ছে। যেখানেই যাবার কথা থাক, আমি বলব, ওকে যেতে হবে না। আমি এবার পুজোয় কোথাও যাচ্ছি না—আমার চেনাশুনো কেউ যাক, তা-ও চাই না। আর কিছু না, পুজোর সময় আমার সঙ্গে কলকাতায় যে বেড়াতে যেতে হবে, তা-ও নয়।

দরজার পাশে দু-একজনের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। কে যেন ঘরে ঢুকতে চাইছে না, কে যেন বলছে, যা না, যা—। তারপর আস্তে-আস্তে একটি মেয়ে এসে ঢুকল ঘরে। নন্দিতার মতনই হাঁটার ভঙ্গি, তার মতনই উচ্চতা। কিন্তু এই মেয়েটি কে?

মেয়েটির মুখের একটা পাশ পুড়ে ঝলসে গেছে। নষ্ট হয়ে গেছে মুখের একপাশের চামড়া, তাকালে গা শিরশির করে।

আমি কিছু বলার আগে সে-ই বলল, চিনতে পারছেন? স্পষ্ট নন্দিতার গলা। আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। শুকনোভাবে বললাম হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!

আমার সন্দেহ ছিল নন্দিতা আমাকে চিনতে পারবে কিনা, অথচ আমিই তাকে প্রথমটা চিনতে পারিনি।

নন্দিতা বলল, আপনি এতদিনে একবারও এলেন না—

আমি নিচু গলায় বললাম, কবে হলো?

—গত বছর...জনতা স্টোভ নেভাতে গিয়ে...আপনি আর এলেন না—

নন্দিতা দুবার 'আপনি আর এলেন না' বলায় মনে হলো, ও বোধহয় বলতে চাইছে, সত্যিই যখন ওর আগুন লাগল তখন আমি কোন সাহায্য করতে পারিনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এবার কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, শিলং যাবার কথা—

এবার আমি খুব উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, বাঃ, শিলং খুব ভালো জায়গা। আমিও হয়তো ওখানেই যাব। দেখা হবে।

১৬

আমার বাড়ির ঠিক উল্টোদিকেই একটা নার্সিং হোম, হিরণ্ময়ের স্ত্রী কাজল সেখানে ভর্তি হয়েছে প্রায় দিন দশেক আগে। ডিউ ডেট পেরিয়ে গেছে, দশদিন আগে সেই যে কাজলের একবার ব্যথা উঠেছিল, তারপর ব্যথা ট্যথা কোথায় মিলিয়ে গেছে, এখন সে বেশ হাসিখুশি মুখে জানলায় বসে থাকে। হিরণ্ময়ের খুব মুস্কিল, ইয়ার ক্লোজিং-এর সময় অফিসে খুব কাজ, পাটনায় জরুরি কনফারেন্স আছে, জন্মক্ষণেই প্রথম সন্তানের মুখ দেখার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারল না, পাটনায় চলে গেল। আমাকে বলে গেল, একটু খোঁজখবর নিস, বাড়ির পাশেই তো—। যদিও কাজলের বাপের বাড়ির লোক দুবেলা আসে, দুপুরে কিংবা মাঝরাত্তিরে ব্যথা উঠলেও খবর জানানোর জন্য টেলিফোন নম্বর দেওয়া আছে, তবু যেহেতু নার্সিং হোমের পাশেই আমার বাড়ি—সুতরাং আমার ওপর একটা দায়িত্ব এসেই যায়।

হাসপাতাল আমার সহ্য হয় না। পারতপক্ষে ওর থেকে দূরে থাকি, আত্মীয়স্বজন হাসপাতালে ভর্তি হলেও কক্ষনো দেখা করতে যাই না। হাসপাতালে ঢুকলেই যে গন্ধ নাকে আসে, ঠিক ডেটলের গন্ধ বলা যায় না—বলা যায় অসুখের গন্ধ, সেটা আমি ঠিক সইতে পারি না। তবে নার্সিং হোমে অতটা মনে হয় না, তাছাড়া কাজলের তো অসুখ করেনি ! সুতরাং কাজলের মন প্রফুল্ল রাখার জন্য যখন-তখন ওর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আসি। অনেক সময় কাজল জানলা দিয়ে আমাকে ডেকে গল্পের বই চায়।

সাত বছর আগে বিয়ে হয়েছে, এই প্রথম সন্তান হবে। সন্তানের জন্য হিরণ্ময় আর কাজল দুজনেই খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সারা দেশে বেশি ছেলেপুলে জন্মাচ্ছে বলে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর এত ঢাক-ঢোল, অথচ ওদের একটিমাত্র সন্তানও হলো না, এ কী অবিচার ! ডাক্তারী পরীক্ষা, জ্যোতিষী, নয়ানপুরের অলৌকিক শক্তিধর সাধুবাবুকে দেখানো—সবই হয়ে গেছে, এমনকী হিরণ্ময়ের মতন সপ্রতিভ বুদ্ধিমান ছেলে গোপনে তাবিজ-মাদুলি ধারণ করেছে কিনা তারও ঠিক নেই। যাই হোক, এতদিন বাদে—। আমি কাজলকে ঠাট্টা করে বললাম, তোমার বোধ হয় যমজ সন্তান হবে, তাই এত দেরি হচ্ছে ! কাজল ছদ্মকোপে তর্জনী তুলে আমাকে বলে, এই, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি !

লোহার খাটে চাদর গায়ে শুয়ে কাজল, তাকে একটুও অসুস্থ দেখায় না, গালদুটিতে স্বাস্থ্যের আভা, মাথার কোঁকড়া চুল কী গভীর কালো। হাসির কথা শুনলে হাসতে-হাসতে সারা শরীর কাঁপায়। তবে ভালো করে লক্ষ করলে বোঝা যায়, প্রতীক্ষা আর উৎকণ্ঠা সে চাপতে পারছে না। আশেপাশের ক্যাবিনের

অন্য-অন্য বউদের টপাটপ বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে, চার-পাঁচদিন বাদে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে তারা। কাজল তার পেটের মধ্যে সন্তান নড়াচড়া টের পায়। কিন্তু এখনো সেই সন্তান পৃথিবীর আলো দেখতে চাইছে না।

আরো একটু লক্ষ করে বুঝতে পারলাম, কাজলের উত্তেজনার আর একটি কারণ আছে। দু-এক বছর ধরে কাজল খুব অসুখী ছিল—কারণ হিরণ্ময় বিশ্বাস করত যে কাজলের সন্তানধারণের ক্ষমতা নেই। স্পষ্ট করে না-বললেও হিরণ্ময়ের ভাবভঙ্গিতে এই কথাটা প্রকাশ পেত। বুদ্ধিমতী মেয়ে কাজল, সেটা বুঝতে পেরে আঘাত পেয়েছিল খুব। প্রকৃতি নিজের নিয়মে চলেছে, সাত বছর বাদে কাজল তার শরীরে দ্বিতীয় আত্মা ধারণ করেছে। পেটের মধ্যে নড়ছে সেই বাচ্চা, কতক্ষণে তার মুখ দেখবে, কাজলের সেই প্রতীক্ষা।

—ছেলে-না-মেয়ে, তোমার কী শখ?

কাজল হাসতে-হাসতে বলল, আমি আগে থেকে কিছু ভাবিনি। ছেলে বা মেয়ে যাই হোক—

—তবু, মনে-মনে ইচ্ছা একটা নিশ্চয়ই আছে। সবারই থাকে।

—মেয়ে। আমি মেয়ে চাই, বেশ সাজাব-গোজাব।

—বুঝতে পেরেছি। সাধারণত যেটা আশা করা যায়, তার উল্টো হয় তো, তাই তুমি মেয়ে আশা করছ। আসলে সবার মতন তোমারও ছেলের শখ।

—মোটেই না!

রোজ রাত্তিরে পাটনা থেকে ট্রাঙ্ককল করে হিরণ্ময় রোজই হতাশ হয়। নার্সিং হোমের আরামে থেকে কাজলের চেহারা আরো ভালো হয়ে যাচ্ছে।

আমার পাশের বাড়িতে থাকে বাদল, বেশ কিছুদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি, হঠাৎ সকালবেলা ডেকে বলল, আর সাতদিন পরেই ও বিয়ে করছে। হাতে একেবারে ছাপানো নেমন্তন্নর চিঠি।

একটু অবাক হয়েছিলাম। হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কী রে, সব মিটমাট হয়ে গেল কী করে?

বাদল বিগলিত মুখে বলল, মাকে সব খুলে বললাম, বুঝলি না, মা কী আর শেষ পর্যন্ত রাগ করে থাকতে পারে!

—কীরকম বিয়ে হচ্ছে? ম্যারাপ ট্যারাপ বেঁধে? লুচি টুচি সব হবে?

—হ্যাঁ, মায়ের তাই ইচ্ছে। এ সিজনে এটাই শেষ তারিখ, তাই একটু তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে।

—ঠিক আছে, আমার তিরিশ টাকা ধার শোধ করে দিস এবার। অনেকদিন হয়ে গেল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেব, দেব, নিশ্চয়ই দেব। শোন তোকে কিন্তু ভাই বিয়ের দিন একটু দেখাশুনো করতে হবে। ওদের বাড়ির লোকজনকে তো তুই চিনিস।

—সে দেখব এখন! আমার এক বন্ধুর স্ত্রী আবার এই নার্সিং হোমে, তার যদি সেদিনই কিছু হয়—

অনীতার সঙ্গে বাদলের ছবছর ধরে চেনাশুনো—কিন্তু অনীতার সঙ্গে বাদলের বিয়ের প্রস্তাবে বাদলের বাবা-মা কিছুতেই রাজি নয়। মন কষাকষি, রাগারাগি থেকে ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। ওদের জেদও বেড়ে গেল। অবশ্য রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা থাকার সাহসও নেই বাদলের। অনেকে বাদলকে বুদ্ধি দিল, অনীতার সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিয়ে সেরে ফেলতে—একবার বিয়ে হয়ে গেলে বাবা-মায়েরা শেষ পর্যন্ত মেনেই নেয়।

বাদল আর অনীতার রেজিস্ট্রি বিয়েতে আমি ছিলাম একজন সাক্ষি—ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারকে দেবার টাকা আমার কাছ থেকেই ধার নিয়েছিল বাদল। কিন্তু এমন ছেলে যে, রেজিস্ট্রি হবার ছমাসের মধ্যেও বাড়িতে বলতে সাহস পেল না। ওদিকে অনীতার বাড়ি থেকে নানা কথা বলছে, শেষ পর্যন্ত বাদলের ওপর রাগ করে আমি ওর সঙ্গে কথা বলতাম না। যাক, শেষ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক হয়ে গেল—এখন বাড়ির সুপুত্র হয়ে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করবে, দু-তিনবছরের মধ্যেই অনীতার সঙ্গে রীতিমতন ঝগড়া করবে।

বাদলের যেদিন বিয়ে, ঠিক সেদিনই সকালে কাজলের প্রসব হয়ে গেল। সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে, কাজলের একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। সকালবেলা আমাকেই প্রথম খবর দেয় নার্সিং হোম থেকে, আমি কাজলের বাপের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে হিরণ্ময়কে ট্রাঙ্ককল করলাম। সবই নির্বিঘ্নে হয়ে গেল, বিকেলের মধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেছে কাজলের, এখন তার মুখে সেই হাসির লেখা—যার বর্ণনা হয় না।

সন্ধেবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। এখান থেকে উল্টোদিকের নার্সিং হোমে কাজলের ঘরটা দেখা যায়। জানলার পর্দা তুলে দিয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি ঘর ভর্তি কাজলের আত্মীয়স্বজন, নার্স কোলে করে এসে বাচ্চাটাকে দেখাল—কাজল উঠে বসার চেষ্টা করল একবার।

পাশের বাড়ির ব্যালকনি থেকে বাদল আমাকে ডেকে বলল, এই, তুই কখন আসবি? সাড়ে সাতটার মধ্যে কিন্তু বেরুতে হবে, তুই যাবি আমার গাড়িতে—

বাদলকে আমি কিছু বলবার আগেই নিচে রাস্তায় ধ্বনি উঠল, বল হরি, হরি বোল—! বিরাট শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—আমাদের পাড়ার এম. এল.

এ. দীনবন্ধুবাবুর মৃতদেহ। বিপুল ভোটে ইলেকশানে জিতেছিলেন দীনবন্ধুবাবু, নির্ঘাৎ মন্ত্রী হতেন—কিন্তু রেজাল্ট বেরুবার পরের দিনই স্ট্রোক হল। প্রায় দেড় মাস জীবন্মৃত ছিলেন, এখন আমি বারান্দা থেকে দেখতে পাচ্ছি প্রচুর ফুলমালার মধ্যে শয়ান তাঁর হাঁ-করা বিবর্ণ মুখ। একটা নীল মাছি উড়ছে চোখের ওপরে। সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পাশের বারান্দা ও সামনের নার্সিং হোমের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে আমি অকারণে একবার হাসলাম।

হঠাৎ ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম। এ তো একই সঙ্গে আমি জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ—জীবনের এই প্রধান তিনটে দৃশ্য দেখছি। পাশের বাড়িতে বাদল, সামনের বাড়িতে কাজলের হাসিমাখা মুখ, নিচে দীনবন্ধুবাবুর শব—এই ত্রয়ী দৃশ্যে আমার কোন দার্শনিক চিন্তা আসা উচিত ছিল। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি মিটিমিটি হাসতে লাগলাম। যাঃ বাবা, এর মধ্যে হাসির কী আছে!

মানুষের ধারণা, সে তার নিজের সব ব্যবহারের মানে বোঝে। কিন্তু সেই তিন দৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেন আমার হাসি পেল, তার কারণ আমি কিছুই জানি না।

১৭

বিমান আমাকে বলল, টেলিফোন অফিসে তোর কেউ চেনাশুনো আছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, একজন অপারেটরকে চিনি। বহুকাল আগে যখন ডায়াল সিস্টেম হয়নি, তখন একজন অপারেটরের সঙ্গে ঝগড়া করতে-করতে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির গলার আওয়াজটা ভারী মিষ্টি, ঝগড়া করলেও শুনতে ভালো লাগে। সেই মেয়েটি এখনো আমাকে মাঝে-মাঝে অফিসে টেলিফোনে ডেকে আড্ডা দেয়। তবে তাকে আমি চোখেও দেখিনি, সেও আমাকে দেখেনি।

বিমান বলল, না, অপারেটর চেনা থাকলে হবে না। কর্তাব্যক্তিদের কেউ চেনা নেই?

—পাগল! বড়বড় লোকেদের সঙ্গে আমার মতন চুনোপুঁটির কী করে চেনা থাকবে! কেন বল তো?

—বাড়িতে একটা টেলিফোন নেওয়া বিষম দরকার। বাবার হার্টের অসুখ, হঠাৎ মাঝরাত্তিরে শরীর খারাপ হলে—শুনেছি ভেতরে চেনাশুনো লোককে ধরতে পারলে অনেক সময় পাওয়া যায়। দেখি হীরেনদাকে বলে। হীরেনদার তো অনেকরকম কানেকশানস আছে।

—ঠিক আছে, যদি পাস তো আমাকেও একটা খবর দিস। আমার খুব শখ হয় বাড়িতে একটা টেলিফোন নেবার—

সুকান্ত একদিন কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করল, ইলেকট্রিক কোম্পানির হেড অফিসে তোর জানাশুনো কেউ কাজ করে নাকি রে?

—না তো। কেন?

—বাড়িতে একটা সাব-মিটার আনতে হবে।

—এর জন্য চেনাশুনো থাকার কী দরকার? কোম্পানিতে টাকা জমা দিবি, তারপর কোম্পানির লোক এসে মিটার বসিয়ে যাবে। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার, এর মধ্যে ধরাধরির কী আছে?

—তুই জানিস না। রেগুলার কোর্সে হলে টাকা জমা দেবার ক'মাস বাদে যে পাবে, তার ঠিক নেই। আমাদের বাড়িতে মিটার নেবার সময় কী হলো জানিস না! টাকা জমা দিয়ে তো বসে আছি, সপ্তাহ দুয়েক বাদে চিঠি এল, অমুক দিন সকাল ঠিক পৌনে দশটার সময় কোম্পানির লোক যাবে লাইন ইন্সপেকশনে —সেই লোক যাতে ফিরে না-যায়, তুমি বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে থাকবে। রইলাম। লোক এল না, আমার অফিসের দেরি হয়ে গেল। আবার এল ঐরকম চিঠি, অমুক তারিখে ঠিক নটা বাহান্নর সময় কোম্পানির লোক যাবে—। সে-ও এল না। পর-পর চারখানা চিঠি আসার পর পঞ্চমবারে চিঠি না-দিয়ে লোক এসে ঘুরে গেল, তখন আমি অফিসে।

—যাঃ! আমি তো শুনেছি, বাদলদা টাকা জমা দিয়েই সপ্তাহখানেকের মধ্যে মিটার পেয়ে গেছে।

—কারুকে ধরেছিল নিশ্চয়ই।

—কারুকে ধরেনি!

—তাহলে সেটা অবিশ্বাস্যরকমের ব্যতিক্রম। সব ব্যাপারেই তো ব্যতিক্রম থাকে। ঠিক আছে, আমি টাকা জমা দিচ্ছি। যদি এক মাসের মধ্যেও পাই, তোকে জানিয়ে যাব—

নীতা বউদি বললেন, ইউনাইটেড মিশনারি স্কুলে তোমার কেউ জানাশুনো আছে?

—না তো! স্কুলটা কোথায়, তাই জানি না!

—সার্কুলার রোডে, বিরাট স্কুল।

—সেখানে চেনাশুনো দিয়ে কী হবে? তুমি কী স্কুলে চাকরি করবে নাকি?

—চাকরি কী রে! ছেলেটাকে ভর্তি করাবো!

—স্কুলে ভর্তি করতেও চেনাশুনো লাগে?

—তুই কিছু খবর রাখিস না। ভালো স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তি করা কী ঝকমারি—

—তোমার ছেলে তো খুব স্মার্ট। ওকে নিয়ে যাও, নিশ্চয়ই একটা কিছু পরীক্ষা টরীক্ষা নেবে—তোমার ছেলে ঠিক পাস করে যাবে।

—পরীক্ষা তো দূরের কথা, ফর্মই দেবে না। জানুয়ারিতে সেশান, সেপ্টেম্বরের মধ্যেই নাকি—। নামটাম লিখে রাখা সব শেষ। আর নেবে না। আমি কী ছাই অত জানি, আমি ভেবেছি স্কুল খোলার আগে ভর্তি হলেই হবে! তাই আমার দেরি হয়ে গেছে—

—তা ঐ স্কুলেই দিতে হবে, এমন কী কথা আছে? অমুক স্কুলে দাওনা—সেও তো খুব ভালো স্কুল শুনেছি—

—ওরেব্বাবা! ওরা আরো কড়া। এখানে তবু শুনেছি, কোন টিচারকে ধরলে টরলে হয়। ঐ স্কুলটায় কোন মিনিস্টারের অনুরোধও গ্রাহ্য করে না।

মিনিস্টারের নামে আর-একটা গল্প মনে পড়ল।

কোন-এক আমলে কোন-এক মিনিস্টার একই সঙ্গে খুব সদাশয় আর চালাক ছিলেন। সব মিনিস্টারের কাছেই বহু কৃপাপ্রার্থী আসে। অমুক লাইসেন্স, অমুক পারমিট, অমুক জায়গায় সরকারি ফ্ল্যাট ইত্যাদি নানারকমের আবদার। নিজের কনস্টিটিউয়েন্সির বিশেষ লোকদের এরকম আবদার সহ্য করেননা—এমন মিনিস্টার ভূভারতে ক'জন আছেন কে জানে! যাই হোক, আমাদের গল্পের এই মিনিস্টার মহোদয়ের কাছে এইরকম প্রার্থীর সংখ্যা একটু বেশিই ছিল। তিনি একটা বুদ্ধি বার করেছিলেন। তিনি সব আবেদনপত্রের ওপরই সুপারিশ লিখে দিতেন। দিয়ে বলতেন, আমি তো লিখে দিচ্ছি বাপু, কিন্তু যে ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছো, সেখানকার লোকরা যদি তোমার আবেদন ন্যায্য মনে করে দেবে, না-হলে দেবে না—সে বিষয়ে আর আমি কিছু করতে পারব না।

আসলে মিনিস্টারের টেবিলে একটা মোটা পেন্সিল থাকত, তার একদিকটা নীল, অন্য দিকটা লাল। সব বিভাগে তাঁর নির্দেশ দেওয়া ছিল, নীল রঙের লেখা সুপারিশ দেখলেই অগ্রাহ্য করতে হবে, আর লাল রঙের সুপারিশ ভেরি-ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। লোক বুঝে লাল-নীলের ব্যবহার।

একদিন হয়েছে কী, মিনিস্টারের ভাগনে, যে নিজেও ভবিষ্যতে মিনিস্টার হতে চায়—এবং তখন সুপারিশ কীভাবে লিখতে হবে তার হাতমক্স করার জন্য, লাল-নীল পেন্সিলটা চুরি করে নিয়ে গেল। কাজের সময় মিনিস্টার সেটা খুঁজে পেলেন না—প্রার্থীর সামনে রাগারাগিও করতে পারেন না, হাসিমুখে থাকতে হয়—তাই অগত্যা ফাউন্টেন পেন দিয়েই দুলাইন লিখে দিলেন।

বিভাগীয় কেরানিটি তো সেটা পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা। পেনের কালি সম্পর্কে তো কোন নির্দেশ নেই! ফেরাতেও সাহস হয় না, আবার এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মিনিস্টারকে বিব্রত করতেও সাহস হয় না। তিনি তখন গেলেন তাঁর বিভাগীয় বড় অফিসারের কাছে। অফিসার ভুরু কুঁচকে বললেন, পেন দিয়ে লেখা? কী রঙের কালি?

—কালো স্যার। একেবারে জেটব্ল্যাক।

—কালো? তাহলে আর চিন্তা কী! দিয়ে দিন, দিয়ে দিন! সবই তো কালাকানুনের ব্যাপার, কালো রং সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

আজকাল ঠাকুর-দেবতাদের খুব বাজার খারাপ। ওনাদের কাছে কেউ আর বিশেষ মানত করে না, হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে না। এখন মন্ত্রী বা বড়বড় নেতা বা বড়বড় অফিসাররাই ঠাকুর-দেবতার আসন নিয়েছেন। আমাদের এই ধরাধরির ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। অনেক দিনের ট্রাডিশন।

প্রাইমারি শিক্ষকদের প্রধান দাবি মাইনে বাড়ানো নয়, ঠিক সময়ে মাইনে পাওয়া; লাখ কথা না-হলে যেমন বিয়ে হয় না, সেইরকম কয়েক লক্ষ বার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, মিথ্যে আশ্বাস, মাইল-মাইল লম্বা বক্তৃতা ও কুমীরকে হার মানানো সহানুভূতি ইত্যাদি শেষ না-হলে শিক্ষকদের মাইনে বাড়ে না। কিন্তু প্রত্যেক চাকুরিজীবীই যেমন মাসের প্রথম মাইনে পান, তেমনি শিক্ষকদেরও প্রতি মাসে মাইনে পাবার ন্যায্য অধিকার আছে। কিন্তু শিক্ষকদের মাইনের বেশি অংশই সরকারের কাছ থেকে আসে, সেইজন্য বহু স্কুলের শিক্ষক, বিশেষত দূর গ্রামাঞ্চলের, পাঁচ-ছমাসের আগে প্রাপ্য মাইনেটুকুও পান না।

এজন্য তো তাঁরা সরকারকে দায়ী করবেনই। কারণ, চাল-ডাল-তেল-নুন কিনতে গেলে, তারা তো আর পাঁচ-ছমাস বাদে দাম নেবার কথায় রাজি হবে না। কোন বাড়িওয়ালা ছমাস ভাড়া বাকি রাখে? শিক্ষক কি তাঁর ছেলেকে বলবেন, আজ মাছ খেতে চেও না, পাঁচ মাস বাদে মাইনে পেয়ে তোমাকে মাছ খাওয়াব! এজন্য সরকারের প্রতি শিক্ষক পরিবারের ক্রোধ হওয়া যুক্তিসঙ্গত। কাগজ খুললেই এরকম চিঠি চোখে পড়ে।

আসল ব্যাপারটা কী? মাইনে না-বাড়ানোর জন্য সরকারি নীতি দায়ী। কিন্তু যে-মাইনে ধার্য আছে, তা না-দেবার ক্ষমতা সরকারেরও নেই। মাইনে ঠিক সময়ে দেওয়া-না-দেওয়ার হর্তা কর্তা কয়েকটি অফিসের কয়েকজন কর্মচারী, যাঁরা এ-টেবিলে ও-টেবিলে ফাইল চালাচালির খেলা খেলতে খুব ভালোবাসেন, যাঁরা নিজেরাও নিজেদের মাইনে বাড়াবার সুখস্বপ্ন দেখছেন।

দোষ অবশ্য ঠিক ঐসব কর্মচারীদেরও নয়। দোষ এই প্রথার, ব্রিটিশ আমল

থেকে যা চলে আসছে, আজও বদলানো হয়নি। ব্রিটিশ আমলে, কোন একজন কর্মচারীর ওপর বিশ্বাস করে কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হতো না—দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হত পাঁচজনের ওপর, এক ফাইলে পাঁচজনের সই না-হলে চলত না। অর্থাৎ যে-প্রথা তৈরি হয়েছিল একটা দেশকে শোষণ করার জন্য, সেই প্রথাই চলছে একটি স্বাধীন দেশে। এখন অবশ্য আর দায়িত্ব ভাগাভাগির ব্যাপারও নেই। এখন একজনের দায়িত্ব আরেকজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। কোনরকমে একটা আপত্তি তুলে নোট দিয়ে ফাইলটা অন্য টেবিলে চাপিয়ে দিতে পারলেই কয়েকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

ধরা যাক, কোন মফস্বল স্কুলের সেক্রেটারি পাঁচ মাস তাঁর শিক্ষকদের মাইনে দিতে না-পেরে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কলকাতায় চলে এসে ধরলেন একজন চেনা লোককে। তাঁর চেনা আবার আর-একজন ফাইল চালাচালির অন্যতম খেলোয়াড়। তাঁকে ধরে কাঁচুমাচু মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, দেশের সাম্প্রতিক অবস্থা বিষয়ক আলোচনা শেষ হলে দমবন্ধ অন্ধকার থেকে বন্দি ফাইলটি উদ্ধার করা হলো। জয় হলো ধরাধরির। টাকা স্যাংকশান হয়ে গেল। তখন, সেই মুহূর্তে কর্মচারীটিই স্বয়ং গভর্নমেন্ট বা স্বয়ং ভগবান।

১৮

হীরেনদার বড়ছেলে হিরণ্যাভর বয়েস এখন দশ বছর। ভারী নম্র আর লাজুক ছেলে, বড়রা যেখানে কথা বলে—সেখানে মোটেই আসে না। অঙ্ক আর ইংরেজিতে একটু কাচা, কিন্তু পড়াশুনোয় খুব মন।

খুব ছেলেবেলায় এই হিরণ্যাভ ছিল দারুণ প্রতিভাবান। তার যখন আড়াই বছর বয়েস, সে তখন 'টুইংকিল টুইংকিল লিটিল স্টার' পুরো মুখস্থ বলতে পারত। হীরেনদার বাড়িতে গেলেই নীতা বউদি ছেলেকে ডেকে এনে বলতেন, দাও তো, কাকুকে তোমার সেই ইংরেজি কবিতাটা শুনিয়ে দাও তো! তক্ষুণি দম-লাগানো পুতুলের মতন সে হাত-পা ছুঁড়ে আরম্ভ করে দিত। বস্তুত, ঐ পদ্যটা আমাদের এতবার শুনতে হয়েছে হিরণ্যাভর মুখে যে আমাদেরই আবার নতুন করে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

তিন বছর বয়েসে হিরণ্যাভ 'বন্দী বীর' পুরো আবৃত্তি করতে শেখে। নীতা বউদি আমাদের খুব পীড়াপীড়ি করতেন ওকে একদিন রেডিওর শিশুমহলে নিয়ে যাবার জন্য। নীতা বউদির ধারণা—ওরকম ছেলে আর ভূভারতে জন্মায়নি—এবং

আমরাও ঐ বয়েসে হিরণ্যাভর যেরকম প্রতিভার স্ফুরণ দেখেছিলাম, তাতে আমাদেরও মাঝে-মাঝে সন্দেহ হতো, ও ছেলে বড় হলে ডেপুটি হবেই।

যাই হোক, এ লেখা হিরণ্যাভ সম্পর্কে নয়। হিরণ্যাভর সেই অল্প বয়েসে, ও-বাড়িতে গেলেই নীতা বউদি আমাদের ধরে বেঁধে চা-ফা খাইয়ে তাঁর ছেলের নবনব প্রতিভার বিকাশ দেখতে বাধ্য করতেন, আর হীরেনদা মৃদু-মৃদু হাসতেন। একদিন অত্যন্ত বেশি বিরক্ত হয়ে আমি আর বিমান বেরিয়ে এসে বাইরে প্রবল হাসতে লাগলাম। তারপর বিমানকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, হীরেনদার ব্যাপারটা কী বল তো? নীতা বউদি না হয় ছেলের জন্য ডগমগ, কিন্তু হীরেনদারও কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? বিমান বলল, আমরা যাতে বেশিক্ষণ বসে আড্ডা না-মারি, সেইজন্যই বোধহয় হীরেনদা ঐ ব্যাপারটার প্রশ্রয় দেয়।

হীরেনদাকে ঐ সম্পর্কে এরকম সন্দেহ করা যায় কিনা—এ ব্যাপারে আমরা ঠিক মনঃস্থির করতে পারিনি—তাই অনেক দিন আর হীরেনদার বাড়িতে যাইনি। ইদানীং হীরেনদা আমাদের আবার প্রায়ই ডাকাডাকি করেন, রাস্তায় দেখা হলেই বলেন, বাড়িতে আসিস না কেন আর? আড্ডা না-মারতে পারলে কারুর ভালো লাগে?

আগেই বলেছি, হিরণ্যাভর এখন দশ বছর বয়েস হয়ে গেছে, লাজুক ও শান্ত, কাছে আসে না—এবং ছেলের কৃতিত্ব বিষয়ে গর্ব করার বদলে পড়াশুনোয় তার প্রতিভার অভাব বিষয়েই অনুযোগ শোনালেন নীতা বউদি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু আশ্চর্য হলাম অন্য একটা ব্যাপার দেখে। ওঁদের আর-একটি ছেলে হয়েছে, তার নাম অরুণাভ, বয়স পৌনে তিন। বেশ স্বাস্থ্যবান, দুরন্ত ছেলে, সারা ঘরে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। অথচ তার সম্পর্কে একটাও কথা বললেন না নীতা বউদি। নীতা বউদির কি স্বভাব বদলে গেল? অথবা এ ছেলেটির কি কোনই প্রতিভা নেই? নিতান্ত টুইস্ট নাচ বা এক থেকে তিরিশ গোনা বা বড়মামা কী করে কথা বলে তা অনুকরণ করে দেখানোর ক্ষমতাও তার নেই? নীতা বউদি একেবারে নির্বিকার।

সেই প্রথম আবিষ্কার করলাম, ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবা-মায়েরা বেশি আদিখ্যেতা দেখালে যেমন অন্যদের খারাপ লাগতে পারে, তেমনি ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কোনরকম উৎসাহ না-দেখালেও আবার অস্বস্তি বোধ হয়। কোন বাচ্চা ছেলের অস্বাভাবিক গুণপনা দেখলে যেমন একটু আনক্যানি লাগে, তেমনি আবার তাদের স্বাভাবিক দুষ্টুমি বা মজার ব্যাপারগুলো শুনতে বেশ ভালোই লাগে। বড়দের আড্ডায় ছোটদের উপস্থিতি বেশিক্ষণ ভালো লাগে না, কিন্তু কোন বাড়িতে প্রাণবন্ত বাচ্চা থাকলে তাদের সম্পর্কে নিরাসক্ত থাকাটাও অস্বাভাবিক ব্যাপার। নীতা বউদি এ কী করছেন?

একটা খেলনা বন্দুক নিয়ে ছোটাছুটি করছিল অরুণাভ, আমি তাকে ধরে একটু আদর করতে গেলাম, সে কিছুতেই থাকবে না—ছটফট করে পালাল। আবার ঘুরে আসবার পর আমি তাকে খপ করে ধরে ফেললাম, বন্দি করে ফেললামই বলা যায়। তার রেশমের মতন সুন্দর চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে নাম টাম জিজ্ঞেস করলাম, সে চটপট উত্তর দিয়ে দিল। নীতা বউদির দিকে তাকিয়ে নিরীহ ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, ও কোন ছড়া টড়া শেখেনি?

নীতা বউদি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, না।

হীরেনদা এবার হাসতে-হাসতে বললেন, কেন, ও যা শিখেছে, তাই ওদের শুনিয়ে দাও না!

নীতা বউদি গোমড়ামুখে বললেন, থাক! আর শোনাতে হবে না, ওরা অনেক শুনেছে।

নিজেকে বেশ অপরাধী বোধ হতে লাগল—। নীতা বউদি কী বুঝে ফেলেছেন যে হিরণ্যাভর বেলায় আমরা—। ঘটনাটা অবশ্য তা নয়, পরেই বুঝতে পারলাম।

হীরেনদা নিজেই উদ্যোগী হয়ে বললেন, শোননা, আমার ছেলে কী কী শিখেছে। পৌনে তিন বছর বয়েস, এর মধ্যেই একেবারে...। বুবুল, এদিকে এসো তো, কাকুদের শুনিয়ে দাও তো কাল রাত্তিরে যাদবপুরে কী হয়েছে?

আবৃত্তি করার ভঙ্গিতেই মুখ চোখ সীরিয়াস করে অরুণাভ বলল, কাল যাদবপুরে গুণ্ডারা বোমা ফাটিয়েছে!

—কীরকম করে বোমা ফাটে?

—বুম বাম, বুম ববাম,.বুম ববাম--

—আচ্ছা! এবার বলো তো, বিবেকানন্দ রোডে কী হয়েছে?

—একটা বাস, আর একটা ট্রাম না, যাচ্ছিল তো, আর অমনি তাতে অনেক ছেলে এসে আগুন লাগিয়ে দিল! আর আগুন, আগুন না, এমন জ্বলতে লাগল যে, ধোঁয়া-ধোঁয়া-ধোঁয়া—আকাশ পর্যন্ত ধোঁয়া—আগুন জ্বলছে পিরি-পিরি-পিরি—

আগুন কেন পিরিভাবে জ্বলে সেটা অবশ্য ওরই আবিষ্কার, কিন্তু বাকি দৃশ্যবর্ণনায় কোন ভুল নেই। নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলেছে ঐ পৌনে তিন বছরের ছেলে।

হীরেনদা আবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, এবার বলো তো পুলিশ কী করে?

—পুলিস এইরকমভাবে গুলি! গুড়ুম-গুড়ুম—

একথা বলেই অরুণাভ তার খেলনা পিস্তলটা তুলে আমাদের সব্বাইকে গুলি করে দিল, এমনকী দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের ছবিও বাদ রাখল না—তারপর

বারান্দা দিয়ে রাস্তার লোককে গুলি করতে গেল।

হীরেনদা হাসতে-হাসতে বললেন, আমার বড় ছেলেকে নীতা অনেক ছড়াটড়া শেখাত। আমার ছোট ছেলেকে এসব কিন্তু কেউ শেখায়নি।

নীতা বউদি বললেন, এসব আবার শেখাতে হয় নাকি!

হীরেনদা বললেন,—সবসময় শুনছে তো। ঝি-চাকররা বলাবলি করে, রাস্তার লোক, পাশের বাড়ি, রেডিও—ছেলেদের এসব একেবারে মুখস্থ!

হীরেনদা হঠাৎ সীরিয়াস হয়ে গিয়ে বললেন, একটা কথা ভেবে দেখেছিস? আজ থেকে তিরিশ বছর বাদে, আমার এই ছেলের বাল্যস্মৃতি কী হবে? আমরা আমাদের ছেলেবেলার কত মধুর স্মৃতি নিয়ে এখনো জল্পনাকল্পনা করি। আমি পাড়াগাঁয়ে মানুষ—সেসব কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম—কিন্তু এই কলকাতার ব্যাপারেও, দু-একজন মাস্টারমশাইয়ের কথা, রথের মেলা, পরেশনাথের মিছিল দেখতে যাওয়া—এইসব টুকরো-টুকরোভাবে মনে পড়ে। আর ওরা কী মনে করবে? গোলাগুলি, বোমা, খুন—এই বাল্যস্মৃতি!

আমি বললাম, আজ থেকে তিরিশ বছর বাদে তো দেশের অবস্থা এরকম থাকবে না। গোলাগুলি, পথেঘাটে মারামারি তখন ইতিহাস শুধু—তখন ওরা ভাববে, আমাদের ছেলেবেলায় লোকগুলি কী বোকা ছিল, সত্যিকারের কোন কাজ না-করে শুধু নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেছে—

হীরেনদা তিক্তহাস্যে বললেন, তোর কী ধারণা, আজ থেকে তিরিশ বছর বাদে দেশের অবস্থা বদলে যাবে? বদলে ভালোর দিকে যাবে?

—নিশ্চয়ই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তখন সমাজে এরকম শোষণ থাকবে না, প্রত্যেকের সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে—কেউ কারুর ওপরে জোর করে মতামত চাপাবে না—

—তুই খুব আশাবাদী দেখছি!

আমি লঘুভাবে হাসতে-হাসতে বললাম, হ্যাঁ হীরেনদা, আমি একটা যাচ্ছেতাই-রকমের আশাবাদী। চিকিৎসার অতীত আশাবাদীও বলতে পারেন। নইলে এখন আর বেঁচে থাকার পয়েন্ট কী?

১৯

আমাদের ছেলেবেলায় কত ভালো-ভালো ভূত ছিল এই কলকাতা শহরে! সেইসব ভূতেরা এখন কোথায় গেল?

কলকাতায় এখন একটাও 'ভূতুড়ে বাড়ি' নেই, কোথাও কারুকে 'ভূতে ধরে' না; এমনকী মায়েরাও আজকাল ছেলেমেয়েদের দুষ্টুমির সময় ভূতের ভয় দেখান না। ওতে নাকি ছোটছেলে-মেয়েদের মনে কুসংস্কার দানা বেঁধে যায়।

আমাদের তো গোটা বাল্য ও কৈশোরই কেটেছে ভূতের ভয়ে। ছুটির দিনে দুপুরবেলা ছাদে ওঠার উপায় ছিল না, কেননা, 'ঠিক দুপুর বেলা ভূতে মারে ঠেলা!' আর রাত্তিরে? উঃ, ভাবলে এখনো বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়!

উত্তর কলকাতায় আগে প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার রাত্রে হীরামতী রাক্ষসী বেরুত। হীরামতী রাক্ষুসী দেড়তলার সমান উঁচু, মুলোর মতো দাঁত, তার হাত পৌঁছোত তিনতলা পর্যন্ত। কালো লোহার মতন দেহ, হাঁটার সময় ঝনঝন শব্দ, আর বিকট গলায় চেঁচিয়ে বলত, 'হীরামতী রাক্ষুসী, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরি! যে-ছেলেটা বদমাইসি করে, তাকে ধরে খাই!' আর তিনতলার বারান্দা থেকে মা আমাকে বলতেন, আর কোনদিন কাচের গেলাস ভাঙবি? আর কক্ষনো জিজ্ঞেস না-করে আলমারি খুলবি? ধরিয়ে দিচ্ছি! হীরামতী একে নিয়ে যাও তো? হীরামতী সড়াক করে তার হাতটা বাড়িয়ে দিত বারান্দার দিকে, আমার তখন এমন গলা শুকিয়ে গেছে যে কাঁদতেও পারছি না—শক্ত করে চেপে আছি মায়ের আঁচল! তারপর মা যখন বললেন, থাক, এবারকার মতন ছেড়ে দাও—তখনও হীরামতী হাত সরায় না। মা তখন একটা দোআনি এনে তার হাতে দিয়ে বলতেন, নাও, খেয়ে নাও এটা। হীরামতী টক করে খেয়ে ফেলত পয়সাটা!

সেই ছেলেবেলায় মনে হতো, মা-বাবারা কী ভীষণ বীর, অতবড় রাক্ষসীর সামনেও তাঁরা কী রকম অনায়াসে হাসতে পারেন!

একটু বড় হয়ে শুনেছিলাম, হীরামতী আসলে একজন পানওয়ালা। শ্যামবাজারে তার পানের দোকান। প্রতি শনি আর মঙ্গলবার ঐ টিনের পোশাক পরে বেরিয়ে ঘুরত। ছেলেমেয়েরা ঠাণ্ডা থাকত তার ভয়ে। হীরামতীর শেষ অবস্থাটা খুব করুণ। খেলা দেখিয়ে, বেশ কিছু পয়সা উপার্জন করে সে ফিরত অনেক রাত্রে। এক রাত্রে একজন গুণ্ডা তাকে মেরে পয়সাকড়ি কেড়ে নেয়, মারের চোটে একটা পা ভেঙে গিয়েছিল তার, তাই আর রাক্ষুসী সাজতে পারেনি। কলকাতার গুণ্ডারা ভূতের চেয়েও শক্তিশালী।

এখনো আমার মন কেমন করে হীরামতী রাক্ষসীর জন্য।

খুব ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরেই একটা তিনতলা বাড়ি সারা বছর খালি পড়ে থাকত। সবাই বলত ওটা ভূতের বাড়ি। বাড়িটা ভাঙাচোরা কিছুই না—বেশ মজবুত ধরনের, এখন ওধরনের কোন বাড়ি খালি পড়ে থাকার কথা কল্পনাই করা যায় না। আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যেত ঐ

বাড়িটা—আমরা শুনতাম যে সন্ধের দিকে ঐ বাড়ির জানালায় ভূতের বাচ্চাদের দেখা যায়। বাচ্চা ভূত কখনো দেখিনি—বড় ভূতও দেখিনি অবশ্য, কিন্তু বড় ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহই ছিল না—বাচ্চা ভূতই একটু দুষ্প্রাপ্য। একমাত্র সুকুমার রায়ের কবিতায় কিছু বাচ্চা ভূতের কথা পড়েছি, সেই যে, 'পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা দেখুন বিনা চশমাতে'। আমরা সন্ধেবেলা সেই বাড়ির জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতাম একদৃষ্টিতে। অনেক দিন আগেকার কথা, তবু যেন এখনো অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে—কোন-কোন সন্ধেবেলা ঐ বাড়ির জানলায় ছায়া-ছায়া ভূতের বাচ্চাদের দেখতে পেতাম—আর সঙ্গে-সঙ্গে, ওরে বাবারে বলে চিৎকার করে ছুটে পালাতাম।

আমাদের স্কুলের এক মাস্টারমশাই ছিলেন হরিনাথ ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী তাঁর নিজস্ব পদবী ছিল, না লোকে এই উপাধি দিয়েছিল, তা ঠিক মনে নেই। খুব লম্বা চওড়া মানুষ, মাথায় বিরাট জটা, গলার আওয়াজটা গমগমে বাজের মতন। তিনি থাকতেন কলুটোলার এক মেসে। আমাদের পাড়ার ঐ ভুতুড়ে বাড়ির কথা শুনে তিনি বললেন, বাঃ বেশ তো, আমি থাকব ঐখানে—আমার সাধনভজনের জন্য একটা নির্জন জায়গা দরকার!

সবাই বারণ করল, কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না ব্রহ্মচারী মাস্টারমশাই। একদিন তিনি কম্বল বালিশ নিয়ে উঠলেন গিয়ে সেখানে। ঠিক হলো, তিনি প্রত্যেক দিন রাত্রে আমাদের বাড়িতে এসে খাবেন। তিন-চারদিন কেটে গেল, কিছুই হলো না! রাত দশটা আন্দাজ তিনি খেতে আসতেন—তখন ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসত—তবু জেগে থাকতাম দারুণ কৌতূহল নিয়ে। ব্রহ্মচারী মাস্টারমশাই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সহজে কথাই বলতে চান না। বাবা যখন জিজ্ঞেস করতেন, দু-এককথায় উত্তর দিতেন। তিনি বলতেন, ভূতের দেখা পেলে ভালোই হতো হে! মানুষের সঙ্গ আর ভালো লাগে না—ভূতের সঙ্গেই আলাপ জমাতাম! কিন্তু ভূতেরা আমাকে বোধ হয় ভয় পায়—আমার সামনে আসে না। তবে শব্দটব্দ করে বটে।

একদিন রাত আটটা আন্দাজ পাড়ার তিন-চারটে ছেলে ছুটতে-ছুটতে এসে আমাদের বাড়িতে খবর দিল, শিগগির আসুন! শিগগির! আপনাদের সেই ভদ্রলোকের কী যেন হয়েছে, দারুণ চ্যাঁচাচ্ছেন!

বাবা-কাকারা বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি—আমাদেরও খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বড়রা দারুণ হিংসুটে হয়, ভালো-ভালো জায়গায় কখনো বাচ্চাদের নিয়ে যায় না। বাবা-কাকারা অবশ্য সরাসরি নিজেরাও সেই বাড়িতে ঢুকতে সাহস পেলেন না—মোড় থেকে একজন পুলিসকে ডেকে নিলেন। ভূতেরা যে কেন

পুলিসকে ভয় করবে—এটা অবশ্য আমি আজও বুঝতে পারি না।

খানিকক্ষণ বাদে ব্রহ্মচারী মশাইকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হলো। তাঁর ডানপায়ের বুড়ো আঙুল থেকে খুব রক্ত বেরুচ্ছে, শরীরে আর কোন ক্ষত নেই। তিনি অনবরত চ্যাঁচাচ্ছেন, ওঃ, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল!

রোমহর্ষক ব্যাপার! ভূতে এসে মাস্টারমশাইয়ের পায়ের আঙুল কামড়ে ধরেছিল।—মাস্টারমশাই তখন চোখ বুজে ধ্যান করছিলেন, ভূতকে দেখতে পাননি—ভূত নিশ্চয়ই মাটিতে গড়িয়ে-গড়িয়ে এসেছে, নইলে পায়ের আঙুল কামড়াবে কী করে!

কত লোক যে এসে ভিড় করল আমাদের বাড়িতে! ভূতে মানুষ ধরার এমন একটা জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত! সে-রাত্রে আমাদের চোখ থেকে ঘুম উপে গেল, কেউ আমাদের বিছানায় শুয়ে পড়ার জন্য তাড়াও দিল না—কত যে ভূতের গল্প শুনলাম। প্রত্যেকেরই কোন-না-কোন আত্মীয় বা বন্ধু কখনো-না-কখনো ভূতের পাল্লায় পড়েছে। তবে এ পর্যন্ত কোনদিন কোন ভূতকে কারুর পায়ের আঙুল কামড়াতে শোনা যায়নি—এটা একটা সত্যিই নতুন ব্যাপার।

কেউ-কেউ অবশ্য আড়ালে সন্দেহ প্রকাশ করল যে ভূত নয়, ও বাড়িতে অনেক ধেড়ে-ধেড়ে ইঁদুর—সেই ইঁদুরেই কামড়েছে। কিন্তু প্রবল জনমতের চাপে এই সন্দেহ উড়ে গেল হাওয়ায়।

ব্রহ্মচারী মাস্টারমশাই টানা এক মাস ছুটি নিলেন স্কুল থেকে। তাঁর পায়ের অনেক চিকিৎসা করানো হলো, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁর পা আর সারল না। বুড়ো আঙুলটা বিরাট হয়ে ফুলে উঠল—শেষ পর্যন্ত সেই আঙুলটা কেটে বাদ দিতে হলো। ইঁদুরে কামড়ানোর কথা আর ভুলেও কেউ উচ্চারণ করল না, সবাই বলল, ভূতের দাঁতের বিষ, ও কী আর ডাক্তারের ওষুধে সারে! ব্রহ্মচারী মাস্টারমশাই ক্লাসে আমাদের দারুণ জোরে কান মলে দিতেন—সুতরাং তাঁর একটা আঙুল কাটা যাওয়ায় আমরা কেউ তেমন দুঃখিত হইনি।

আমাদের ছেলেবেলায় আরো অনেক ভালো-ভালো ভূত ছিল। এখন কলকাতা শহরটা একেবারেই রহস্য-রোমাঞ্চহীন। সেইসব ভালো-ভালো ভূতেদের জন্য আমার এখন মাঝে-মাঝে মন খারাপ লাগে। এখনকার ছোটরা কী এমন দোষ করেছে যে, তাদের দেখতে পাবে না কিংবা তাদের গল্প শুনবে না!

২০

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা। সারী বলে, আমার রাধার নামটি তাহে লেখা, ঐ যায় যে দেখা!

ঠিক সেইরকমই, শুক বলল, আরে যাও যাও! তোমাদের সাউথ ক্যালকাটায় আবার লাইফ আছে নাকি? সবাই মেপে-মেপে কথা বলে, মেপে-মেপে হাসে! প্রাণ খুলে কেউ বাঁচতে জানে ওখানে?

সারী বলল, আহা-হা-হা! তোমাদের নর্থ ক্যালকাটায় একেবারে লাইফের ছড়াছড়ি! এত বেশি লাইফ যে লোকে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারে না। ঘিঞ্জি-ঘিঞ্জি সরু গলি, গায়ে-গায়ে লাগানো বাড়ি, রাস্তায় যা ভিড় লোকের গায়ে ধাক্কা লাগবেই। আমি একদিন গিয়েছিলাম, কী যেন জায়গাটার নাম, হাতিবাগান—ওরে বাসরে, কী ভিড়!

—নর্থ ক্যালকাটাকে ভালোবাসে বলেই তো এত লোক এখানে থাকতে চায়!

—ভালোবাসে না ছাই! ভালোবাসলে কেউ রাস্তাঘাট ওরকম নোংরা করে রাখে? আমাদের ওদিকটা কত ফাঁকা-ফাঁকা, কত পরিষ্কার।

—মরুভূমি তো আরো ফাকা। আরো পরিষ্কার। তাহলে মরুভূমিতে থাকলেই হয়! সাউথ ক্যালকাটায় আমি তো কোনদিন থাকব না! ন্যাকা-ন্যাকা কথা, ছেলেগুলো মেয়েদের মতন, আর মেয়েরা—

সারী এবার চোখ পাকিয়ে বলল, এই, আমি বুঝি ন্যাকা-ন্যাকা কথা বলি? বেশ ঠিক আছে—

শুক খপ করে সারীর হাতটা চেপে ধরে বলল, তুমি অমনি রাগ করছ কেন? তোমার কথা কী বলেছি? দু-একজন এক্সসেপশান থাকেই। তাছাড়া, এমনি তর্ক হচ্ছে, এর মধ্যে পার্সোনাল ব্যাপার টেনে আনছ কেন?

সারী আবার বসে পড়ে আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। শুক সিগারেট ধরিয়েছে।

সারী বলল, সাধারণ ভদ্র ব্যবহারকে তোমরা বলো ন্যাকা-ন্যাকা কথা! তোমাদের তো সব কাঠখোট্টা ব্যাপার! বাড়িতে বসেও এমন চেঁচামেচি করে কথা বলবে যে পাশের বাড়ির লোকের কান ঝালাপালা, তোমাদের সেটাও খেয়াল থাকে না।

—তোমাদের সাউথের লোকেরা ভদ্রতার কী জানে? সাহেবি আদবকায়দার নকল আর কথায়-কথায় ইংরিজি! তাও, ইংরিজি বলার সময় এমন ঠোঁট বেঁকানো আর ভুরু কুঁচকোনো—যেন সবাই এক-একটি সাহেবের পোষ্যপুত্তুর!

—নর্থেও অনেক লোক ইংরিজি বলে, কিন্তু ভুল বলে, বিচ্ছিরিভাবে বলে!

বউয়ের অসুখ না-বলে, তোমরা বলো ওয়াইফের অসুখ! জরুরি কাজ আছে না-বলে বলো আর্জেন্ট কাজ আছে! শুনলেই হাসি পায়! আপ টু এগারোটা পর্যন্ত কিংবা শতকরা টেন পারসেন্ট—এধরনের কথাও নর্থেই শুধু শোনা যায়! কথায়-কথায় ইংরিজি বলাটা ঠিক না-হতে পারে। কিন্তু ইংরিজি বলতে গেলে সাহেবদের মতন বলাই ভালো।

—সাউথে বুঝি সবাই সাহেবদের মতন ইংরিজি বলে? আমার আর জানতে বাকি নেই! ওপর-ওপর ফরফর করে শুধু, ভেতরে ঢন-ঢন! সবাই তো আপস্টার্ট—সত্যিকারের কিছু কালচার আছে ওখানে? কটা বনেদী বাড়ি আছে সাউথে? নর্থে দ্যাখো গিয়ে বনেদী বাড়ির ছড়াছড়ি। সত্যিকারের কালচার, কিংবা ভারতীয় ভদ্রতা তো এরাই বাংলাদেশে...

—তোমাদের ঐসব বনেদী বাড়ি নিয়ে ধুয়ে জল খাও এখনো! ঐসব বনেদী বাড়ির অনেকের স্ক্যাণ্ডালও জানতে বাকি নেই। সত্যিকারের ভদ্র কিংবা কালচার্ড হবার জন্য বনেদী হবার দরকার হয় না, বড়লোক হবারও দরকার হয় না।

—ক'টা স্কুল-কলেজ আছে তোমাদের সাউথে? বড়বড় সব কলেজই তো নর্থে—

—এক-একটা হরি ঘোষের গোয়াল। লেখাপড়া কিচ্ছু হয় না!

—আমাদের এই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি একসময় পুরো নর্থ ইণ্ডিয়ায়—এমনকী বার্মাতেও—

—এখন নাম শুনলেই লোকে নাক সিঁটকোয়—

—তবু তো একটা ঐতিহ্য আছে। তোমাদের কী আছে কী?

—আমাদের ওখানে মানুষজন ভালোভাবে বেঁচে থাকতে জানে। বেঁচে থাকা মানে তো আর পরনিন্দা আর ঝগড়াঝাঁটি নয়—

—ছাই জানে! আমাদের এখানে কেউ কারুর নিন্দে করতে গেলে সোজাসুজি করে, মুখের ওপর যা বলার বলে দেয়। আর তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে, মিছরির ছুরির মতন—

—ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বললেও তাতে ভদ্রতা বজায় থাকে—বুদ্ধিমান লোকরাই এরকমভাবে বলতে পারে। বোকা লোকরাই চ্যাচামেচি করে শুধু—

—সরল লোকদেরই তোমরা আজকাল বোকা বলো!

—আহা, কত সরল, তা আমার খুব জানা আছে!

শুক সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে নতুন করে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হল। সারী চায়ের কাপে দিল শেষ চুমুক।

শুক আবার বলল, এটা তো মানবে, থিয়েটারই হলো একটা জাতির

কালচারের আয়না! ক'টা থিয়েটার হল আছে সাউথে? সবেধন নীলমণি তো ঐ এক বারোয়ারি মুক্তাঙ্গন। আমাদের এখানে মিনার্ভা, বিশ্বরূপা, স্টার, রঙমহল, কাশী বিশ্বনাথ—

—আঃ, কী সুন্দর কালচারই না ফুটে বেরোয় ওখানকার নাটকগুলোয়! একবার দেখতে গিয়েছিলাম, বমি আসে! শুধু সংখ্যায় বেশি থাকলেই হয় না। তাহলে বলো না, হাসপাতালও নর্থে বেশি আছে অনেক। থাকবেই তো! বাড়িগুলো যে এক-একটা রোগের ডিপো। যেমন অস্বাস্থ্যকর, তেমন নোংরা —হবেই তো, এত ঘিঞ্জি হলে—

—তোমার শুধু ঐ এক যুক্তি আছে, ঘিঞ্জি আর নোংরা। এটা বুঝতে পারছ না—নর্থটা হচ্ছে পুরোনো পাড়া। কলকাতার আদি জায়গা। পুরোনো জায়গা একটু ঘিঞ্জি হয়ই। তোমাদের বালিগঞ্জ-ফালিগঞ্জ তো সেদিনের ছেলে। ষাট-সত্তর বছর আগেও বনজঙ্গল ছিল।

—নর্থটা পুরোনো বলছ, ঠিকই, কিন্তু কত পুরোনো? বড়জোর এখানকার চেয়ে একশো-দেড়শো বছর? তার আগে শ্যামবাজার-বাগবাজারও বনজঙ্গল ছিল। কিন্তু তোমাদের ট্র্যাজেডি হচ্ছে, তোমরা সেই পুরোনোটাই আঁকড়ে ধরে বসে আছো। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক হতে পারোনি!

—তোমাদের সাউথের মতন আধুনিক হতেও চাই না। আধুনিক হওয়া মানেই চোঙ্গা প্যান্ট, বড় জুলফি, ফাঁপিয়ে চুল আচড়ানো আর চাল মেরে কথা বলা! এদিকে এক ফোঁটা মুরোদ নেই। রাস্তা জুড়ে যদি একটা ষাঁড় বসে থাকে, সেটাকে সরিয়ে দিতে পারে না—সেটার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, এই ষাড়, সরে যাও বলছি, নইলে তোমাকে ফুল দিয়ে মারব!

সারী খিলখিল করে হাসল। হাসি তার থামতেই চায় না। তারপর বলল, উঃ, কী বস্তাপচা গল্প! এ গল্পটা যে বানিয়েছে, তার একটু কল্পনাশক্তি পর্যন্ত নেই! ওখানে তোমাদের মতন ষাড় ঘুরে বেড়ায় না রাস্তায়-ঘাটে! মুরোদ আছে কিনা একদিন পরীক্ষা করে দেখবে? শান্তনুদার সঙ্গে একদিন পাঞ্জা লড়ে দেখো না!

—শান্তনুদাটা আবার কে?

—সে যে-ই হোক না!

—তবু শুনি, শুনি! শান্তনুদার কথা তো আগে শুনিনি। খুব হিরো বুঝি?

—ও কথা থাক! সাউথের ছেলেদের কথা বললে, আর নর্থের ছেলেরা কীরকম? চোয়াড়ে-চোয়াড়ে চেহারা, চুলে একগাদা তেল দেয়, আর কথা বলে স-স করে...সামবাজারের সসীবাবু সসা কিনতে মেয়েদের দিকে এমন অসভ্যের মতন তাকায়!

—এটা বুঝি আমার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ?

সারী আবার হাসতে-হাসতে বলল, এবার তুমি পার্সোনালভাবে নিচ্ছো কেন ? সব ব্যাপারেই ব্যতিক্রম থাকে। নর্থের মেয়েরাও সাজগোজ করে গাঁইয়ার মতন—খুব দামি শাড়ি কিংবা একগাদা গয়না পরে রাস্তায় বেরোয—অথচ সবরকম শাড়ি, সবরকম গয়না যে সবাইকে মানায় না—সেটা বোঝে না !

—তোমাদের সাউথে মেযেদের আবার সাজগোজই আছে শুধু, রূপ আছে ক'জনের ? আমাদের এখানকাব অনেক বনেদী বাড়িতে এমন সব সুন্দরী মেযে এখনো আছে, দেখলে তোমাদের মাথা ঘুরে যাবে।

—দু-চাবজনের কথা হচ্ছে না। সব মিলিয়ে বাস্তাঘাটে যা দেখা যায়—

এ তর্কের কোথায় শেষ হবে ? সারী বলল, আচ্ছা বাবা, অত কথায় দরকার নেই। আমাদের রাসবিহারী এভিনিউ হচ্ছে রাই, তোমাদের শ্যামবাজারটা শ্যাম।

এর পরের গান, রাই আমাদের, রাই আমাদের, রাই আমাদেব, শ্যাম তোমাদের !

সুদূর ঝর্নার জলে

মার্গারিট, তোমার জন্য

মানিব্যাগ রাখার অভ্যেস আমার নেই কখনো। যখন যা দু'চার টাকা থাকে, বুক পকেটেই রাখি। আর প্যাণ্টের পকেটে রাখলে চেপ্টে যায় বলে সিগারেট-দেশলাইও ঐ বুক পকেটেই রাখতে হয়। হাওয়াই সার্টের ঐ একটাই পকেট।

চক্রধরপুর থেকে ট্রাকে চেপে যাচ্ছিলাম টেবো-হেসাডির দিকে। হেসাডির বাংলোয় ইন্দ্র আর হেমন্ত আছে। ওরা এসেছে দুদিন আগে। এ রাস্তায় দিনে দু'বার বাস চলে, কিন্তু ট্রাক ড্রাইভারের পাশে বসে যাবার আরাম আরো বেশি। চমৎকার রাস্তা। পাহাড়ী ঘাট, এক পাশে খাদ, আর এক পাশে জঙ্গল। বিকেলের সূর্য অতিশয় গাঢ় হয়ে একটু স্থির হয়ে আছেন, এক্ষুনি অস্ত যাবেন কিনা মনস্থির করতে পারছেন না। হু-হু করা হাওয়া যেন আকাশের গায়ে গিয়েও ঝাপ্টা মারছে। ডান পাশের অরণ্যের বড় বড় বনস্পতি মাথা নোয়াচ্ছে বারবার স্বাগতম জানাচ্ছে বৃষ্টিকে। দূরের উপত্যকায় বৃষ্টি নেমে গেছে, এখান থেকেই দেখা যায়।

এই সময় প্রকৃতি আমার সঙ্গে একটু রসিকতা করলেন।

ট্রাক ড্রাইভারটি বেশ আমুদে। সেকেণ্ড গিয়ারে গতি রেখে গান গেয়ে যাচ্ছে অনবরত, দুর্বোধ্য ছেকাছেনি ভাষায় গান, যার একবর্ণ আমি বুঝি না। মাঝে মাঝে আমাকে চমকে দেবার জন্য এই বিপজ্জনক পাহাড়ী রাস্তায় সে স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে নেয়। একটু আগে খাদের মধ্যে একটা ওল্টানো বাস দেখে এসেছি। তবু তাকে উৎসাহ দেবার জন্য আমি বললাম—আউর জোরে চালাইয়ে। এ কেয়া বয়েল গাড়ি চলতা হ্যায়।

রোগা মতন ক্লিনারটি আমার আর ড্রাইভারের মাঝখানে বসেছে। সে কথা বলে না, শুধু গানের তাল দেয়। ট্রাক ভর্তি সিমেণ্টের বস্তা। ক্লিনারটির হাতে এবং জামায় এখনো সিমেণ্টের গুঁড়ো লেগে আছে। লোকটার রং যা কালো, মুখেও কিছু সিমেণ্ট মেখে নিলে পারত। তারপর বৃষ্টিতে ভিজলেই একেবারে পাকা রং।

একবার সে বলল, 'বাবু ম্যাচিসঠো দিজিয়ে তো!'

তখন আমারও সিগারেট টানার ইচ্ছে হলো। হাওয়ায় বেশ শীত শীত ভাব : পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করতে যেতেই ফরফর শব্দে টাকাগুলোও বেরিয়ে এল। এবং আমি খপ করে ধরবার আগেই প্রবল হাওয়ায় সেগুলো চলে গেল গাড়ির বাইরে।

রোককে রোককে বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলেও সঙ্গীতপ্রেমিক ড্রাইভারের ব্যাপারটা বুঝতে খানিকটা সময় লাগল। তা ছাড়া সেটা বাঁকের মুখ। গাড়ি থামল, একটু দূরে।

ছুটে এসে দেখলাম, হাওয়ায় চড়ুই পাখির মতন আমার নোটগুলো উড়ছে। কিংবা কার্পাসের বীজের মতন। দৌড়োদৌড়ি করে সেগুলো ধরার চেষ্টা করলুম, কোনটাই ধরা যায় না। টাকা জিনিসটা যে মানুষের হাত ছাড়িয়ে সব সময়েই পালাতে চায়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যে নোটটাকে আমি প্রায় ছুঁই ছুঁই, সেটাই টুপ করে পালিয়ে যায় খাদের দিকে। দু' একটা উড়ে গেল আকাশের দিকে। আমার রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে পাওয়া টাকাগুলো ছন্নছাড়ার মতন চলে গেল এদিক সেদিন। এত হাওয়া যে আমার চোখের ওপর নিজের চুলের ঝাপ্টা লাগছে, ভালো করে দেখতেই পাচ্ছি না।

কোনক্রমে দেখলাম, একটা দশ টাকার নোট খাদের সামান্য নিচে একটা বনতুলসী গাছের ওপর চুপ করে বসেছে। দু-তিনটে পাথরে পা দিয়ে নেমে গেলে ওটাকে উদ্ধার করা যায়। একটা পাথরে পা দিয়ে নেমেছি, পেছন দিক থেকে ড্রাইভারটি আমার এক হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ধমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আর এক হাওয়ার ঝাপটায় নোটটা গাছের শুকনো পাতার মতন আবার উড়ে গেল, আমারই চোখের সামনে সেটা দুলতে দুলতে নেমে গেল অনেক নিচে। বৃষ্টিতে ভিজে যদি একেবারে নষ্ট না হয়ে যায় তা হলে হয়তো কোনদিন কোন রাখাল বালক ওটা কুড়িয়ে পাবে।

ক্লিনারটি হা-হা করে হাসছে। ড্রাইভারটি বলল, 'দশ রুপিয়ার জন্য জান দিতে যাচ্ছিলেন?'

বাতাসে আমার একটা বড় নিশ্বাস মিশিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এই আকস্মিক ঘটনায় ড্রাইভার ক্লিনার দুজনেই বেশ মজা পেয়েছে। ওদের আর দোষ কি? অন্য কারুর টাকা উড়ে গেলে আমিও হাসতাম।

—কিৎনা রুপিয়া থা?

বেশি নয়, মাত্র বত্রিশ টাকা। এ কথা শুনেও ওরা হাসি থামালো না। যাক, এই বত্রিশ টাকার বিনিময়ে একটা মজার খেলা দেখা গেল। ঠিক বত্রিশ নয়, উনত্রিশ টাকা, কারণ ড্রাইভার আর ক্লিনার দুজনে মিলে তিনটে এক টাকার নোট উদ্ধার করতে পেরেছে, আমি একটাও পারিনি।

টাকাটা সত্যিই বেশি না। কিন্তু সেটাই যে আমার যথাসর্বস্ব, সেটা তো ওরা জানে না! বলাও যায় না। আমি এসেছি ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তর ভরসায়, ওদের এখন রোজগার আছে, আমি বেকার।

আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। সিগারেটে স্বাদ নেই। আমার তুলনায় এই ট্রাক ড্রাইভারও অনেক বড়লোক। ও উনত্রিশ টাকা নিয়ে এখনো হাসি ঠাট্টা করছে। কিংবা, ও নিশ্চয়ই ভাবছে আমার প্যান্টের পকেটে সুদৃশ্য কোন চামড়ার ব্যাগে থরে থরে একশো টাকার নোট সাজানো আছে, বাবুদের যে-রকম থাকে।

সন্ধ্যের কাছাকাছি হেসাডি ডাক-বাংলোর মুখটায় ওরা আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। কোন রকম দীনতা প্রকাশ না করে আমি ড্রাইভারের হাতে পূর্ব প্রতিশ্রুত দু টাকা দিয়ে দিলাম। এবং বিদায় সম্ভাষণের পর দুজনকে আমার প্যাকেট থেকে দুটি সিগারেট উপহার।

পকেটে একটি মাত্র টাকা নিয়ে আমি বাংলোর গেট খুলে ভেতরে এলাম বারান্দায় আলো জ্বলছে। ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তকে খুব রোমহর্ষক ভাবে বলতে হবে ঘটনাটা।

কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস তখনো শেষ হয়নি। বাংলোতে দুটি ঘর। দুটি ঘরেই দুজন সরকারি অফিসার সপরিবারে উপস্থিত। ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তর পাত্তা নেই। এ বাংলোতে আগেও দুবার এসেছি, কোনবারই রিজার্ভ করে আসিনি, প্রত্যেকবারেই ফাঁকা পেয়েছি।

বাংলোর সামনে একটা বড় মাঠ। তার ওপাশে চৌকিদারের ঘর এবং রান্নাঘর। মাঠ পেরিয়ে এসে ডাকলাম, 'লেমসা, লেমসা!'

চৌকিদারটি আগের দুবারই আমাদের খুব খাতির করেছিল। ওর নাম আসলে নেলসন, ওরাওঁ খৃষ্টান, কিন্তু নিজেই নাম বলে, লেমসা।

সে বেরিয়ে এসেই বলল, 'ঘর খালি নেই!'

আমি বললাম, 'কি রে, চিনতে পারছিস না?'

সে এমন একটা ভাব করল, যার অর্থ হ্যাঁ কিংবা না দুটোই হয়। এর স্মৃতিশক্তি এত খারাপ কেন?

তখনই আমার মনে পড়ল, এর আগে এসে প্রথমেই লেমসাকে বকশিশ দিয়েছি কিছু। কাজের আগে টাকা না দিলে ওর উৎসাহ আসে না। এমনি ছেলেটি বড় ভালো, কিন্তু আগে ওকে সন্তুষ্ট না করলে এক পাও হাঁটতে চায় না। কিন্তু আমার কাছে আছে একটি মাত্র টাকা ও কিছু খুচরো। পকেট একেবারে শূন্য করলে মানুষ লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার দুই বন্ধু এখানে এসেছিল, তারা কোথায়?'

সে জানাল যে দু-দিন আগে দুই বাবু এসেছিল ঠিকই, তারা এখানে জায়গা

না পেয়ে বদগাঁও চলে গেছে। আমাকেও সেখানে যেতে বলেছে।

সে তো কালকের কথা। সন্ধ্যের পর এখানে বাস চলে না, অন্ধকার পাহাড়ী রাস্তায় ট্রাক যেতেও ভয় পায়। আজ রাতটা এখানেই থাকতে হবে, এবং খেতেও হবে। আমি লক্ষ্য করেছি, পকেটে টাকা না থাকলেই আমার খিদে আরও বেড়ে যায়।

হাতে ঘড়ি নেই, সঙ্গে কলম কিংবা একটা এমন দামি জিনিসও নেই, যা জমা রাখতে পারি। আছে শুধু একটা সস্তা ডট পেন, যার কোন মূল্যই নেই লেমসার কাছে। আর দু জোড়া প্যান্ট সার্ট, দুটো পাজামা, দুটি গেঞ্জি। এই দিয়েই কাজ চালাতে হবে আর কি!

লেমসা তার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল, তার পেছনে পেছনে গিয়ে খুব মোলায়েম গলায় বললাম, 'লেমসা, আমাকে রাতটা যে এখানেই থাকতে হবে?'

লেমসা স্বভাবগম্ভীর। টাকা না পেলে আরো গম্ভীর হয়ে যায়। বলল, 'জায়গা নেহি!'

উনুনের পাশে বসে আছে লেমসার স্ত্রী ফুলমণি। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী রমণী। সুতরাং আমি লেমসার ঘরেও থাকতে চাইতে পারি না।

—একটা খাটিয়া যদি পেতে দাও বারান্দায়!

—খাটিয়া নেহি।

—তাহলে গ্যারাজ ঘরটা খালি আছে না?

—ও ঘরে এক বাবু আছে!

এই প্রায়-কেউ-নাম-জানে-না বাংলোয় হঠাৎ এত লোক সমাগম কেন? গ্যারাজটা পর্যন্ত ভর্তি! অল্প অল্প শীত আছে, একেবারে মাঠে শুয়ে থাকা যাবে না। তা ছাড়া, যে-কোন সময়ে বৃষ্টি আসবে।

ঝোলা থেকে আমার শ্রেষ্ঠ জামাটা বার করলাম। র-সিল্কের। লেমসাকে বললাম, 'তোর জন্য এই জামাটা এনেছি, দ্যাখ তো গায়ে লাগে কিনা।'

পাহাড়ী লোকেরা জামা-কাপড় সম্পর্কে বেশ খুঁতখুঁতে। ডাক-বাংলোর চৌকিদার হলেও লেমসা তার খৃষ্টান-গর্ব ঠিক রেখেছে, সে প্যান্ট ছাড়া ধুতি পরে না, এবং কোমরে চওড়া বেল্ট। জামাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর পরে ফেলল। চমৎকার ফিট করে গেছে, ঠিক যেন আমার যমজ ভাই।

এবার তাকে সস্নেহ ভর্ৎসনার সঙ্গে বললাম, 'কী রে বোকা! চিনতে পারছিস না আমাকে? সেই যে দু'বছর আগে এসেছিলাম আমরা চারজন, একটা বাবু খুব ভালো নাচতে জানত?'

লেমসা বলল, 'হুঁ!'

কে জানে তাও ওর মনে পড়েছে কিনা! যাই হোক, কাল সকাল পর্যন্ত তো ওকে খাতির করে চলতেই হবে। বললাম, 'আজ রাতটা এখানেই থাকব আর খাব। তোকে ব্যবস্থা করে দিতেই হবে, বুঝলি?'

লেমসা ঘরের মধ্যে চলে গেল। ফুলমণি একমনে উনুনে পাখার হাওয়া করে যাচ্ছে, এই সময় গলগল করে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। আর টেকা যায় না এখানে।

গ্যারাজটা দেখতে গেলাম। একজন পাকানো-চেহারার লোক খাটিয়ার ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে বসে বিড়ি টানছে আর অনবরত কাশছে। লোকটি বাঙালি।

লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। কাশির দমকে লোকটির অর্ধেক কথা বোঝাই যায় না অবশ্য। লোকটি বলল, 'আরে মশাই, কাল ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে ছিলাম কিনা সারারাত, ওঃ যা ঠাণ্ডা বসে গেছে!'

—কেন, সারারাত বাইরে ছিলেন কেন?

—কোথাও জায়গা পাই না। এদিকে সব সার্ভের লোক এসেছে কিনা, বাংলোগুলো ভর্তি। তাই গাড়িতে শুয়ে রইলাম।

—গাড়ি?

বাংলোতে তো কোন গাড়ি দেখিনি এখন পর্যন্ত। এমনকি যে সরকারি অফিসাররা রয়েছে, তাদেরও গাড়ি নেই।

লোকটি বলল, 'আমার গাড়ি দেখেননি? গেটের বাইরে রয়েছে, ও গাড়ি কি কারুর চোখে না পড়ে পারে। পাঁচ টন ওজন—হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা।'

লোকটা দম ফলিয়ে হাসতে লাগল। একটু পরে পরিষ্কার হলো রহস্য। গাড়ি মানে রোড রোলার। পিচ-রাস্তা সারাবার সময় যেগুলো দেখা যায়। লোকটি সেইরকম একটি রোড রোলার রাঁচি থেকে চক্রধরপুরে ডেলিভারি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। এই পাহাড়ী রাস্তায় সারা দিনে আট দশ মাইলের বেশি চলে না।

এত কাশি সত্ত্বেও লোকটির বিড়ি খাওয়ার শখ খুব। একটার পর একটা বিড়ি ধরিয়ে যাচ্ছে। আমি সিগারেটের প্যাকেট বার করতেই হ্যাংলার মতন তাকাল। প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'নেবেন একটা?'

—দিচ্ছেন? তাহলে দুটো নিই? কাল সকালে ইয়ে করার সময় একটা পেলে বেশ যুৎসই হয়।

আমি হেসে বললাম 'তাহলে এই ভাঙা প্যাকেটটা আপনার কাছেই রাখুন!'

ঝোলার মধ্যে আরো তিন প্যাকেট সিগারেট আছে। ও ব্যাপারে আপাতত নিশ্চিন্ত। তাছাড়া লোকটিকে খুশি রাখা দরকার। রাত্রে বৃষ্টি নামলে আমাকে এখানেই ওর সঙ্গে শুতে হবে।

আবার লেমসার ঘরের বারান্দায় চলে এলাম। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। উনুনের আঁচটা গায়ে বেশ আরাম দেয়। এক কাপ চা পেলে বেশ হতো।

লেমসা আর বউ চা-ই বানাচ্ছে তখন। দেয়ালের কাছে বসে পড়ে আপনজনের মতন বললাম, 'দে রে লেমসা, আমাকে এক কাপ চা দে!'

লেমসা মুখ তুলে বলল, 'এ চা-চিনি-টিনা-দুধ বাবুলোককো হ্যায়!'

মনে পড়ল লেমসার কাছে কিছুই থাকে না, সবই পয়সা দিয়ে কিনে আনাতে হয়। কাছেপিঠে কোন দোকান নেই। সিগারেট কিনতে গেলেও সাত মাইল দূরে বদগাঁওর হাটে যেতে হবে। তবে কাছাকাছি গ্রামের মধ্যে চাল আর মুর্গী পাওয়া যায়।

বললাম, 'ওর থেকেই একটু দে না বাবা! বাবুরা কি আর দেখছে!'

লেমসা কোন উত্তর দিল না। মান খুইয়ে চাইলাম, যদি এর পরও না দেয়! 'স্বামী-স্ত্রী কি যেন বলাবলি করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। তারপর আমার মান রাখল ফুলমণি। সে এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিল আমার দিকে। আমি তাকালাম তার দিকে। যদিও সে কোন বিখ্যাত শিল্পীর কালো পাথরের ভাস্কর্যের মতন রূপসী, তবু তখন তার সম্পর্কে আমার মনোভাব, নারীজাতি সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন অনেকটা।

চায়ের ব্যাপারেই লেমসার ব্যবহারে খটকা লেগে গেল। রাত্তিরে খেতে-টেতে দেবে তো? বাতাস থেমেছে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। মাত্র সাতটা বাজে, সামনে একটা লম্বা রাত। চতুর্দিক এত নিস্তব্ধ যে নিস্তব্ধতারও যেন একটা শব্দ শুনতে পাই।

তিনটে মুর্গী ছাড়িয়ে রাখা আছে শালপাতার ওপর। ফুলমণি মশলা বাটছে। বাংলোর সাহেবদের জন্য লেমসা এখন ওমলেট ভাজছে, তার থেকে নিশ্চয়ই আমায় দেবে না। দেখতে দেখতেই আমার খুব জোরে খিদে পায়। যেন পেটের মধ্যে একটা রেলের হুইসল!

—রাত্রে কী খেতে দিবি লেমসা?

—চাউল লা'নে হোগা, রূপিয়া দিজিয়ে।

লোকটা তো সাঙ্ঘাতিক চশমখোর! একটু আগে একটা অত দামি জামা দিলাম, তার জন্য একটুও কৃতজ্ঞতা নেই! এরা জিনিসপত্র তত গ্রাহ্য করে না, টাকাটাই আসল। আগেরবার এসে দেখেছি, প্রত্যেক রাত্রে লেমসা প্রচুর মহুয়া খেয়ে হৈ-হল্লা করে। আজ বোধ হয় এখনো মহুয়া কেনার টাকা জোটেনি। সরকারি অফিসারদের কাছে তো সহজে বকশিশ পওয়ার উপায় নেই।

আমার একটা টাকা ওকে দিয়ে কিছু লাভ হবে না। ডাক-বাংলোর কোন

বাবু এসে চৌকিদারের হাতে কক্ষনো মাত্র এক টাকা দেয় না। গ্রামের মধ্যে যদি চাল কিনতে যায়—তাহলে সেজন্য ওর পারিশ্রমিকই হবে অন্তত দুটাকা।

—লেমসা, এদিকে আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।

উনুন ছেড়ে লেমসা সহজে আসতে চায় না। দুখানা ওমলেট ভাজবার পর সেগুলো আর চায়ের সরঞ্জাম ট্রেতে সাজিয়ে বৃষ্টিতে ভিজেই লেমসা বাবুদের দিয়ে এল। তারপর তাকে আমি বারান্দার এক কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম, 'শোন লেমসা, আমার ব্যাগ হারিয়ে গেছে, আমার কাছে একটা পয়সাও নেই। বদগাওতে আমার বন্ধুরা আছে, কাল সকালেই তুই সব টাকা পেয়ে যাবি। ঠিক আছে তো? কোন চিন্তা নেই।'

কিন্তু লেমসার কাছে বোধ হয় আজ রাত্রের মহুয়া কেনার টাকা জোগাড় করাই সবচেয়ে জরুরি। সে কোন সাড়া শব্দ করল না। আবার নিজের কাজে ফিরে গেল। তারপর আমারও আর কিছু করবার নেই, শুধু বসে বসে ওদের খাওয়াদাওয়া দেখা। শুধু শুধু উনত্রিশটা টাকা গেল! সে টাকাটা থাকলে আজ একটা রাত অন্তত লেমসার কাছে কত ফাটের সঙ্গে থাকা যেত। কত কষ্টের টাকা! যে বাড়িতে টিউশানি করি, তারা সাত তারিখের আগে মাইনে দেয় না বলেই তো ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তের সঙ্গে আমার আসা হলো না। ওরা পাঁচ তারিখে ট্রেনের টিকিট কেটেছিল। সেই পঞ্চাশ টাকা মাইনে আর ছোটকাকার কাছ থেকে পনেরো টাকা ধার। কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে আর ট্রেনের টিকিটে বাকি টাকাটা গেছে। ভেবেছিলাম এক টিন চীজ কিনে আনব, শেষ পর্যন্ত কিপ্টেমি করে কিনিনি। ইস কেন যে কিনিনি! চীজের টিন তো আর টাকার মতন উড়ে যেতে পারত না! আমার মতন এরকম কেউ কখনো সত্যিকারের টাকা উড়িয়েছে?

—থোড়া গরম পানি দাও না। হরলিক্স বানায়গা।

দুটি মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দৌড়ে উঠে এল বাংলোর বারান্দায় : একজনের হাতে একটা ফ্লাস্ক। আর একজন লেমসাকে ধমক দিয়ে বলল, 'এতক্ষণ ধরে ডাকছি তারা, শুনতা নেই?'

আমি আড়ষ্ট হয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলাম। দুজনের মধ্যে একজন বেশ সুন্দরী। সুন্দরী মেয়েরা কাছাকাছি এলে আমি চোখভরে না দেখে পারি না। এখন মনে হলো, ওরা যেন আমার মুখটাও দেখতে না পায়। বুকের মধ্যে চড়চড় করছে। কিন্তু পকেটে পয়সা না থাকলে নিজেকে মানুষ বলেই মনে হয় না।

গরম জল চেপেছে। বৃষ্টিও জোরে এসেছে। মেয়ে দুটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কল কল করে কথা বলতে লাগল। অন্য যে-কোনদিন হলে, এদের সঙ্গে আমার ভাব করা ছিল নদীতে স্নান করার মতনই সহজ। কিছুটা সময় অন্তত সুন্দরভাবে

কাটতে পারত। আমি ঘুমের ভান করে মুখ গুঁজে রইলাম।

মেয়ে দুটি বোধহয় ইঙ্গিতে একবার ফুলমণিকে জিজ্ঞেস করল যে, আমি কে? ফুলমণি ভাঙা ভাঙা ভাষায় যা উত্তর দিল, তাতে কিছুই বোঝা গেল না। মেয়ে দুটি নিশ্চিত আমাকে সন্দেহ করছে, ভয়ও পেতে পারে। প্যান্ট-সার্ট পরা ভদ্রলোকের মতন চেহারার একজন যুবক চৌকিদারের ঘরের বারান্দায় বসে ঝিমোয় কেন? মেয়ে দুটি তাদের বাবার কাছে নালিশ করে আমাকে এক্ষুনি এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করতে পারে। সুন্দরী মেয়েরাও কত নিষ্ঠুর হয় তা জানি! ডাক-বাংলোতে যারা জায়গা পায় আর যারা জায়গা পায় না, তাদের মধ্যে একটা প্রকৃত হ্যাভ আর হ্যাভনটস-এর মতন শ্রেণীবৈষম্য গড়ে ওঠে। তাও আমার বুক পকেটে পয়সা থাকলে আমার বুকের জোর বাড়ত, যে-কোন লোকের সঙ্গে ধমকে কথা বলতে পারতাম।

একটু বাদে লেমসা বাংলো থেকে ছাতা নিয়ে এল। সেই এক ছাতা মাথায় দিয়ে মেয়ে দুটি নেমে পড়ল বারান্দা থেকে। হাওয়ার তোড় এখনো কমেনি। ছাতা উড়ে যেতে চায়, মেয়ে দুটি আউ! উঃ! এই, এই, এই! হি-হি-হি শব্দ করছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, যাক না ছাতাটা উড়ে! কিংবা ছাতাটা উল্টে গিয়ে শিক-ফিক ভেঙে যাক। মেয়ে দুটো মাঠের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়লে আরো ভালো হয়! আমার মধ্যে একটা প্রতিশোধ কিংবা হিংসের আগুন জ্বলে উঠছিল। গ্র্যান্ড হোটেলের আর্কেডে যে-সব ভিখিরিরা বসে থাকে, তাদের মনেও নিশ্চয়ই এইরকম চিন্তা জাগে।

বৃষ্টির মধ্যে বাইরে যাবার উপায় নেই, শুধু চুপচাপ বসে থাকা। হাতকাটা সোয়েটার শীত মানে না। সঙ্গে কম্বল-টম্বলও নেই। ডাক-বাংলোয় আসবার সময় কে আবার বিছানা আনে? উনুনের আঁচে ফুলমণির লালচে মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি যেন তার শরীর থেকে উষ্ণতার ভাগ নিচ্ছি, দশ ফুট দূরে বসে থেকে তাকে না ছুঁয়ে।

রান্না চলতে লাগল, নানারকম গন্ধ। দু' একটা রাত না-খেয়ে থাকা এমন কিছু নয়, এরকম আমি আগেও থেকেছি। কিন্তু রান্নার উনুনের পাশে এরকম বসে থাকা যে কী কষ্টকর! লোভী শিশুর মতন আমি খিদের জ্বালায় ছটফট করছি। ছেলেবেলায় জ্বর হবার পর যেমন রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতাম। খালি মনে হচ্ছে, লেমসা কখন খেতে দেবে! কখন খেতে দেবে!

উনুনের ওপর মুর্গীর মাংসতে শেষবার ঘি ঢালবার পর লেমসা ভাত বাড়তে শুরু করল। এতক্ষণ ওর সঙ্গে আমি একটি কথাও বলিনি, অন্যমনস্ক থাকবার জন্য সিগারেট ধ্বংস করছিলাম শুধু। পা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, এবার পা গুটিয়ে

বাবু হয়ে বসলাম, ভাতের থালার জায়গা করার জন্য সামনে থেকে সরিয়ে রাখলাম ঝোলাটা।

কিন্তু কয়েক প্লেট ভাত বেড়ে লেমসা নিয়ে গেল ডাক-বাংলোয়। আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। ফিরে এসে আবার ডাল আর আলুভাজা নিয়ে গেল। তারপর মাংস। আমি মাথা হেঁট করে মাটিতে দাগ কাটছি। মুনি-ঋষিরা কীভাবে ইন্দ্রিয় জয় করতেন? আমি পারব না কেন? ধরা যাক, এই মুহূর্তে খবর পেলাম আমার বাবা মারা গেছেন, তাহলে কী আর আমার খাওয়ার ইচ্ছে হতো?

খানিকটা বাদে লেমসা একটা কাচের প্লেটে খানিকটা ভাত এনে দিল আমার সামনে। ছোট প্লেটে একটু ডাল। আমি তবু হাত গুটিয়ে বসে রইলাম চুপ করে। হাজার হোক, আমি বাবুদের বাড়ির ছেলে, শুধু ডাল আর ভাত তো খেতে পারি না। আর কিছু দিক, তারপর দেখা যাবে।

কিছুই দিল না আর। এবার রাগ হয়ে গেল। আমি কি বিনা পয়সায় খাচ্ছি? কাল সকালেই সব কিছুর দাম বকশিশ সমেত চুকিয়ে দেব। গম্ভীর গলায় বললাম, 'লেমসা, আর কিছু নেই?'

লেমসা বলল, 'ভাজি খতম হো গিয়া। মুর্গী তো বাবলোককা হ্যায়।'

অর্থাৎ আমি আর বাবু নই। যার পয়সা থাকে না, সে আবার বাবু কি! কে বলে যে ব্যবসায়ীরাই শুধু পয়সা চেনে? গরীবরা আরো বেশি চেনে।

এ তো মা নয় যে, রাগ করে ভাতের থালা ঠেলে ফেলে উঠে যাব? তবু সেইরকমই অভিমান হয়। ঢোক গিলে বললাম, 'ঠিক হ্যায়, একঠো পেঁয়াজ আর হারা মির্চে দেও!'

তখন ফুলমণি বলল, 'একটু ঝোল লিবেন?'

পোর্সিলিনের পাত্রে মুর্গীর খানিকটা তলানি ঝোল আর কুচো দু' এক টুকরো মাংস পড়ে আছে। ফুলমণি সেটা নিয়ে এল কাছে। আমি না-না বলে হাত দিয়ে থালা চাপা দিলাম। ফুলমণি তবু শুনল না, একহাতা কুচো মাংস আর ঝোল ঢেলে দিল আমার প্লেটে। ওর দিকে রক্তচক্ষে তাকালাম। তারপর সেই ঝোল ও মাংস সমেত সেই জায়গার ভাত তুলে ফেলে দিলাম মাটিতে। বাকি ভাতটা ডাল আর পেঁয়াজ-লঙ্কা দিয়েই খেয়ে শেষ করলাম।

মাত্র সাত মাইল দূরের ডাক-বাংলোতে ইন্দ্রনাথ আর হেমন্ত এখন কতরকম কী খাচ্ছে কে জানে। ওরা দুজনেই দিলদরিয়া। ইন্দ্রনাথ আবার দারুণ খাদ্যরসিক, অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের কাটসিনস্কির মতন যে-কোন দুর্গম জায়গাতেও ও দারুণ সুখাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। ওরা নিশ্চয়ই এখন ভাবছে আমার কথা, তাই একবার বিষম খেলাম।

খেয়ে উঠে হাত ধুতে গিয়ে দেখি বালতিতে জল নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'লেমসা, পানি?'

লেমসা বলল, 'বালটিমে নেই হ্যায়? কুয়াসে লে লিজিয়ে।'

অর্থাৎ কুয়ো থেকে আমাকেই জল তুলতে হবে। এরপর পাছে ও আমাকে বাসন মেজে দেবার জন্য হুকুম করে, তাই নিজেই আমি এঁটো প্লেটটা তুলে নিলাম। দুঃখ হতে লাগল জামাটার জন্য। বড্ড প্রিয় জামা ছিল আমার। ব্যাটাকে বগলের কাছে ছেঁড়া ওই শার্টটা দিলেই তো হতো। যাক, একটা রাত তো। কেউ তো আর দেখছে না আমার এই অপমানের দশা।

রোড-রোলার চালক সঙ্গে পাঁউরুটি আর শুকনো খেজুর রাখেন, তাই খেয়েই শুয়ে পড়েছেন। বাকি রাতটা সেই কেশো রুগীর পাশে শুয়েই কাটল।

ঘুম ভাঙল খুব ভোরেই। ডাক-বাংলোর অধিবাসীরা জাগবার আগেই আমি কুয়োর কাছে গিয়ে মুখ চোখ ধুয়ে নিলাম। কতক্ষণে হেমন্ত আর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হবে! এখানে আর এক মুহূর্ত থাকার ইচ্ছে নেই। লেমসা নিশ্চয়ই সকালের চা দেবে না।

প্রথম বাস আসে প্রায় দশটার সময়। সকালের দিকে বেশি ট্রাকও চলে না। লেমসার সাইকেলটা নিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। তারপর লেমসা বাসে করে গিয়ে সাইকেলটা ফেরত নিয়ে আসবে। বিশ্বাস করে দেবে তো?

এই সময় লেমসা নিজেই সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছ?'

লেমসা জানাল, ওকে বদগাঁওতে যেতে হবে আণ্ডা আর মাখন আনবার জন্য।

দমে গেলাম। পাহাড়ি চড়াই রাস্তা, এই সাইকেলে দুজন যাওয়া প্রায় অসম্ভব। আমি চাইলেও ও নিশ্চয়ই রাজি হবে না। এখন ট্রাকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর গতি কি?

লেমসা আজ আমারই সার্টটা পরেছে। যদিও মুখে একটুও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন নেই, তবু ওকে অনুরোধ করলাম, 'এই একটা কাজ করবি লেমসা? বদগাঁও ডাক-বাংলোতে যে দু'বাবু আছে, তাদের খবর দিয়ে আসবি? বলবি যে আমি একটু পরেই আসছি। আচ্ছা, আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তোকে ওরা পাঁচ টাকা বকশিশ দেবে।'

চিঠি নিয়ে লেমসা চলে গেল। আমি বাংলোর কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে রাস্তায় কালভার্টের ওপর বসে রইলাম ট্রাকের প্রতীক্ষায়। মাত্র সাত মাইল রাস্তা, এক টাকায় নিয়ে যেতে যে-কোন ট্রাক রাজি হবে।

একটু বাদে দুজন বয়স্ক লোক, দুই মহিলা, পাঁচটা বাচ্চা আর কাল সন্ধেবেলা দেখা সেই দুই যুবতী এক সঙ্গে বেরিয়ে এল বাংলো থেকে। এঁরা মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি ঝোলা থেকে একটা বই বার করে অখণ্ড মনোযোগে পড়তে শুরু করি। এঁদের সঙ্গে একটাও কথা বলতে চাই না। যে-কোন কারণেই হোক এরা আমার শত্রু হয়ে গেছে।

ট্রাক এল না, কিন্তু দেড় ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল লেমসা। সঙ্গে একটা চিঠি। ইন্দ্রনাথ লিখেছে, 'হঠাৎ এদিকে সার্ভে-ডিপার্টমেন্টের অনেক লোকজন এসে গেছে, কোন ডাক-বাংলোতে জায়গা নেই। আমরা অনেক চেষ্টা করেও থাকার জায়গা পেলাম না। আমরা রাঁচির দিকে চলে যাচ্ছি। নেতারহাটে থাকব। তুই চলে আয়। আমরা তোর জন্য অপেক্ষা করব। বাংলোর চৌকিদারের কাছে চিঠি রেখে যাচ্ছি।'

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার কথা ছিল। তার বদলে হাসি পেল। ওদের তো দোষ নেই, ওরা জানবে কি করে যে আমি সর্বস্বান্ত হয়ে এখানে এসেছি। ওদের রোজগার আছে, আমার নেই, তবু নিজের গাড়ি-ভাড়াটা অন্তত আমি সব সময়েই জোগাড় করে আনি।

এখন আমার কাছে দু'দিকের পথই সমান। রাঁচি যাবারও ভাড়া নেই, কলকাতা ফেরারও ভাড়া নেই। তাছাড়া আছে লেমসার বকশিশের দায়। পকেটের একটা টাকা এখন আর কিছুতেই হাতছাড়া করা উচিত নয়। লেমসা, চিঠিটার মর্ম জানে না। ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'শোন, বাবুরা চক্রধরপুর আছে। আমরা দু'দিন পরে আবার আসছি, তোকে ভালো করে বকশিশ দিয়ে দেব তখন। কি রে, ঠিক আছে তো?'

লেমসা উল্টো দিকে হাত দেখিয়ে বলল, 'চক্রধরপুর নেহি, বাবুলোক ইধার গিয়া।'

এই রে, ধরে ফেলেছে দেখছি। তবু জোর দিয়ে বললাম, 'না, না, চক্রধরপুরেই গেছে। আমরা আবার ফিরে আসছি, তোর কোন চিন্তা নেই।'

লেমসা মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। আর কথা না বাড়িয়ে আমি হনহন করে এগিয়ে গেলাম।

খানিকটা পরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালাম। এবার কোনদিকে যাব? মন টানছে বন্ধুদের দিকে। ওরা দুজনে মিলে আনন্দ করছে, আর আমি এখানে পরিত্যক্ত, একা! নিজের দোষেই আমার এই অবস্থা, তবু মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অভিমান জন্মায়। মনে হয়, পৃথিবীর কেউ আমাকে চায় না। বন্ধুরাও আমাকে ভুলে গেছে। আমার জন্য কেউ কোথাও অপেক্ষা করে নেই।

রাঁচির দিকে যাবার কোন মানে হয় না। নেতারহাট ভিড়ের জায়গা। টিপিক্যাল টুরিস্ট স্পট। ওসব আমার ভালো লাগে না। কথা ছিল, এদিক থেকে আমরা সারাণ্ডা ফরেস্টের দিকে যাব, কারো নদীর উৎস সন্ধান করে আসব। তাছাড়া, ভিক্ষে করেই যখন যেতে হবে আমাকে তখন কলকাতার দিকে ফেরার চেষ্টা করাই ভালো। এবার যে-কোন উপায়েই হোক একটা চাকরি জোগাড় করতেই হবে, আমিও হেমন্ত বা ইন্দ্রনাথের মতন প্যান্ট-সার্টের বিভিন্ন পকেটে গোছা গোছা টাকা রাখব।

আসবার সময় পাহাড়ে উঠতে হয়েছিল, ফেরার পথটা ঢালু। হাঁটা খুব কষ্টকর নয়। যদিও পুরো রাস্তাটা হেঁটে ফেরা একটা অবাস্তব প্রস্তাব, তবু কিছুদূর হেঁটে গিয়ে বাস বা ট্রাকের ভাড়া কমানো যায়। তাছাড়া আর একটা কথা বারবার আমার মাথায় ঘুরঘুর করতে লাগল। আজ সকালে বৃষ্টি নেই, বাতাস নেই। যে-জায়গায় আমার নোটগুলো উড়ে গিয়েছিল, সেখানটায় গিয়ে আর একবার খুঁজলে হয় না! প্রকৃতি তো এখন আমার ওপর প্রসন্নও হতে পারেন। যদি অন্তত একটা দশ টাকার নোটও পাওয়া যায়।

খানিকটা এগোবার পর রাস্তার পাশে একটা বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িটা আমার চেনা। সাদা রঙের এই দোতলা বাড়িটা একজন ঠিকাদারবাবুর। গতবার আলাপ হয়েছিল। বেশ ছটফটে ধরনের দিলদরিয়া লোক, সেবার ওর জিপে করে আমাদের জঙ্গলের অনেক গভীরে ঘুরিয়ে এনেছিলেন। ঐ ঠিকাদারবাবুর কাছে আমার পরিচয় দিয়ে কিছু টাকা ধার চাইলে কেমন হয়! লোকটার তো অনেক টাকা। কলকাতায় গিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেই হবে।

খানিকটা এগিয়েও থেমে গেলাম। যদি না দেয়! যদি অবিশ্বাস করে? সেই বাড়তি অপমানটুকু নিতে যাব কেন? তাছাড়া সেবারই সন্দেহ হয়েছিল, লোকটা মেয়েমানুষ চালান দিয়েও পয়সা রোজগার করে। খেতে না-পাওয়া সাঁওতাল-ওরাঁও মেয়েদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে দুর্গাপুর বা আসামে চালান করে দেয়। সেবার আমি একটি আদিবাসী মেয়ের রূপের প্রশংসা করায় লোকটা বলেছিল, 'চান? এর মধ্যে কোনটাকে চান বলুন, সবাই তো আমার হাতের মুঠোয়।' কুৎসিত লেগেছিল শুনে।

কোথায় যেন একটা সংস্কৃত শ্লোক পড়েছিলাম : যাচ্ঞা মোঘা বরমধি গুণে নাধমে লব্ধকামা। যে অধম, তার কাছ থেকে কোন কিছু চেয়ে পাওয়ার চেয়েও, আমার চেয়ে যে গুণে বড়, তার কাছ থেকে কিছু চেয়ে ব্যর্থ হওয়া অনেক ভালো। আর গেলাম না।

রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে চেয়ে হাঁটতে লাগলাম। যদি একটা টুকরো

কাগজও চোখে পড়ে অমনি উল্টেপাল্টে দেখি। মাঝে মাঝে উল্টো দিক থেকে ট্রাক আসছে, তখন ধার ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছি। আবহাওয়া খুব সুন্দর বলে হাঁটায় কোন কষ্ট নেই সত্যিই।

কোন্ জায়গায় আমার টাকা হারিয়েছে, তা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। পাহাড়ের অনেক বাঁকই এরকম। তবু এক সময় ঠিক চিনতে পারলাম। এই তো খাদের পাশে সেই বনতুলসী গাছটা, যার ওপর অন্যরকম ফুলের মতন আমার দশ টাকার নোটটা ফুটেছিল!

তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম জায়গাটা। টাকাগুলোর চিহ্ন নেই। তবু কেন যে আমাকে আরো কষ্ট দেবার জন্য এখানেই পাঁউরুটির খোলসের কয়েকটা টুকরো পড়ে থাকবে! সেগুলো বারবার কুড়িয়ে আমাকে আহাম্মক হতে হয়। এই কাগজগুলো উড়ে যেতে পারত না!

জায়গাটা আমাকে চুম্বকের মতন আটকে রাখল, ছেড়ে যেতে পারলাম না। একটা পাথরের ওপর বসলাম। এবং একটা সিগারেট ধরিয়ে একটুক্ষণ টানবার পর লক্ষ করলাম, জায়গাটা অসম্ভব সুন্দর। সামনে বিশাল ঢালু হয়ে নেমে গেছে উপত্যকা। নিচের সমতলভূমি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। এখানে বসে থাকলে মনে হয়, পৃথিবীটা কী নির্জন! মানুষের বসবাস করার পক্ষে পৃথিবীটা এখনও কত সুন্দর! চতুর্দিকে এত সবুজ, এমন শান্ত সুগম্ভীর পাহাড়, এমনি এমনিই ফুটে আছে কত বুনো ফুল। এমনকি শালের মতন কঠিন গাছও কত নরম সুন্দর ফুল ফোটায়। এখানে আকাশ বেশি নীল, এবং এই নীল রঙের মধ্যে কোন বিষাদ নেই।

কে বলে খালিপেটে সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না? যে-জায়গাটা আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে, সেই জায়গাটারই রূপে মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। নেতারহাট মোটেই এর চেয়ে ভালো জায়গা নয়। ইন্দ্রনাথ আর হেমন্ত আমার চেয়ে বেশি কিছু উপভোগ করছে না। চক্রধরপুরে ফেরার কোন তাড়া অনুভব করলাম না। ইতিমধ্যে দু'দিক থেকে দুটো বাস চলে গেছে! পকেটে যা পয়সা আছে, তাতে কোনক্রমে চক্রধরপুরে পৌঁছোনো যায়।

এমন সময় বেশ জোরে একটা ঘট্ ঘট ঘট ঘট্ শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দে যেন পাহাড় কাঁপছে। তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তার মাঝখানে এলাম। দূরে একটা জিনিস দেখে কিন্তু বেশ কৌতুকমিশ্রিত আনন্দ হলো।

রোড রোলার চালিয়ে সেই কেশো রুগীবাবু আসছেন। রোড রোলারটা তো চক্রধরপুরেই যাবে। এটায় উঠে বসলে তো আমার ভাড়ার টাকাটা বেঁচে যায়। যাক না আস্তে! আমার জন্য তো কেউ কোথাও অপেক্ষা করছে না। হাত তুলে সেটা থামালাম।

রোড রোলারটা চক্রধরপুরে আমাকে পৌঁছে দিল রাত দশটায়। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম ভদ্রলোকের কাছ থেকে। ক্ষিদেয় নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাবার জোগাড়। বিকেলে শুধু এক কাপ চা খেয়েছি। সারাদিনে ঐ আমার একমাত্র খাদ্য। সেই সময় রোড রোলার চালকবাবুকেও এক কাপ চা খাওয়াতে হয়েছিল এবং তাতে আমার খুচরো পয়সাগুলি খরচ হওয়ায় গা করকর করছিল। অবশ্য এক প্যাকেট সিগারেট দিয়েছি ভদ্রলোককে।

আসবার পথে ভেবেছিলাম, চক্রধরপুরে অনেক বাঙালি আছে, যে-কোন একজনের বাড়িতে ঢুকে গিয়ে সব খুলে বলব। কেউ কি সাহায্য করবে না? কলকাতায় ফেরার ভাড়াটা কেউ ধার দেবে না? কিন্তু কয়েকটা বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করেও ভেতরে ঢোকার সাহস হলো না। অনেক রাত হয়ে গেছে। তাছাড়া অনেক ঠক জোচ্চোরও তো গাড়ি ভাড়া নেই, টাকা হারিয়ে গেছে বলে লোককে ঠকায়। কাগজে প্রায়ই পড়ি। আমাকে যে সেরকম ভাববে না, তার নিশ্চয়তা কী? পকেট থেকে হাওয়ায় টাকা উড়ে গেছে, এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে?

এবং মনের মধ্যে রয়ে গেছে সেই অহংকার। যাজ্ঞা মোখা বরমধি গুণে নাধমে লব্ধকামা। কোনদিন তো কারুর কাছে কিছু চাইনি। ভিক্ষাবৃত্তি ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন পেশা, আমি ভিক্ষুক হিসেবেও অযোগ্য।

রাত কাটানো যায় রেল স্টেশনে। কিন্তু কিছু না খেলে কিছুতেই ঘুম আসবে না। স্টেশনের বাইরে দেখলাম, রিক্সাওয়ালারা এক জায়গায় গোল হয়ে বসে ছাতু খাচ্ছে। চিরকাল শুনেছি ছাতু খুব স্বাস্থ্যকর খাদ্য, খুব সস্তাও বটে। ছাতুওয়ালার কাছ থেকে চল্লিশ পয়সার ছোলার ছাতু কিনলাম। দুটো কাচা লঙ্কা ফ্রি। পেতলের থালায় জল দিয়ে মেখে নিলাম অন্যদের দেখাদেখি। ক্ষিদের মুখে খেয়েও ফেললাম টপাটপ করে। মাঝখানে একটু দম বন্ধ করেছিলাম, আর গোল্লাগুলো জিভে না ঠেকিয়ে একেবারে গলার মধ্যে। বেশ পেট ভরে গেল। তারপর স্টেশনের কল থেকে অনেকখানি জল খেয়ে নেবার পর মনে হলো, এত চমৎকার সস্তা খাবার থাকতে অন্য আজেবাজে স্বাস্থ্যহীন খাবারের জন্য মানষ বেশি পয়সা খরচ করে কেন?

একটু পরেই পেটটা গুলিয়ে উঠতেই আমি রেল লাইনের পাশে বসে পড়লাম। এত বেশি বমি হলো যে মনে হলো যেন আগের দিনের ভাতসুদ্ধু উঠে আসছে। দমকে দমকে বেশ কয়েক দফায় বমি করলাম। উঠে এসে মুখ ধুতে গিয়ে অনুভব করলাম, মাথা ঘুরছে, শরীর অসম্ভব দুর্বল লাগছে। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। কোনক্রমে একটা অন্ধকার মতন জায়গা খুঁজে প্লাটফর্মের

মেঝেতে ঝোলাটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

চোখ বুজে পরবর্তী কর্মসূচিটা ঠিক করে নিতে হলো। যদি রাত্তিরটা বেঁচে থাকি, তাহলে কাল সকালেই বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠে পড়তে হবে। ধরা পড়লেও, আশা করা যায়, জেলে ওরা ছাতুর বদলে ভাতই খেতে দেয়। আর যদি ধরা না পড়ি, তাহলে খড়গপুরে মানবেন্দ্রর কাছে যেতে হবে। কাছাকাছির মধ্যে আর কেউ চেনা নেই।

সকালে ঘুম ভাঙল ট্রেনের শব্দে। একটা লোকাল ট্রেন তখনই খড়গপুর যাবে। চড়ে বসলাম। ফার্স্ট ক্লাসে। ধরা পড়তে গেলে ভালো জায়গাতেই ধরা পড়া ভালো। থার্ড ক্লাসে অসম্ভব ভিড়, এখন আমার দাঁড়িয়ে যাবার একটুও ইচ্ছে নেই, বরং শোওয়ার জায়গা পেলে ভালো হয়।

ট্রেনে কেউ বিরক্ত করল না। খড়গপুর স্টেশনের একটু আগে ট্রেনটার গতি মন্থর হতেই ঝপ করে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। লাইন পেরিয়ে রাস্তায় এসে মনে হলো আমার চেয়ে ভাগ্যবান আর কে আছে? পকেটে এখনো বারো আনা পয়সা, অনায়াসে কফি আর নোনতা বিস্কুট খাওয়া যায়। তাই খেয়ে নিলাম আগে। প্যাকেটে এখনো দুটো সিগারেট। রিক্সা ডেকে চেপে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'চলো, আই আই টি।'

আই আই টি ক্যাম্পাসে মানবেন্দ্রর কোয়ার্টার আমার চেনা। ওখানে গিয়ে অন্তত একটা দিন বিশ্রাম না নিয়ে আর কলকাতায় ফেরা নয়। সারা গায়ে দারুণ ব্যথা। এটা নিশ্চিত রোড রোলারে চাপার ফল। প্রথম ঘোড়ায় চড়লেও গায়ে এত ব্যথা হয় না।

মানবেন্দ্রর ঘর তালাবন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করে তার চাকরকে খুঁজে বার করা গেল। এই চাকরটি নতুন, আগেরবার এসে একে দেখিনি। বাবু কোথায়?

চাকর ঠিক জানে না। বাবু খেয়েদেয়ে বেরিয়েছেন।

—কোথায়? কলেজে?

—তা হতেও পারে।

আমি চাকরকে হুকুম দিলাম, 'যাও দেখে এসো। বাবুকে ডেকে আনবে এক্ষুনি, বলবে কলকাতা থেকে এক বন্ধু এসেছে, খুব দরকার।'

সে ডাকতে চলে গেল। আমি রিক্সাওয়ালাকে বললাম, 'একটু দাঁড়াতে হবে ভাই!'

সামনের কম্পাউণ্ডে পায়চারি করতে লাগলাম আমার শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে। দেয়ালের পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অনেকগুলো লজ্জাবতী লতা। একটু

পা লাগলেই গুটিয়ে যায়। উবু হয়ে বসে আমি সবকটা পাতায় হাত বুলোতে লাগলাম। ইচ্ছে হলো, ওদের সঙ্গে কথা বলি।

পাতাগুলোর মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল একটা বড় আকারের সবুজ ঘাস-ফড়িং —বাঙাল ভাষায় যাকে বলে কয়া। সেটা তিড়িং করে লাফ দিল। অনেক দিন বাদে এরকম একটা ঘাস-ফড়িং দেখলাম। সেটাকে ধরার জন্য আমি ক্ষেপে উঠলাম। যতবার ধরতে যাই, লাফিয়ে লাফিয়ে পালায়।

এরকমভাবে বেশ সময় কাটছিল। রিক্সাওয়ালা ডাকলো, বাবু!

হঠাৎ আমার শরীরে একটা শিহরন বয়ে গেল। চাকরটা আসতে অনেক দেরি করছে। মানবেন্দ্র যদি কলেজে না থাকে? যদি হঠাৎ সে কলকাতায় চলে যায়! কিংবা যদি এখানেই কোন বন্ধু বা প্রেমিকার কাছে সারাদিনের জন্য গিয়ে থাকে? আমি রিক্সার ভাড়া দিতে পারব না। পকেট এখন সত্যিকারের শূন্য। খাটি সর্বহারা বলা যেতে পারে। চাকরটা যদি আমাকে দরজা খুলে না দেয়?

এই প্রথম আমার মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল। মনে হলো, আমি আর উঠে দাঁড়াতে পারব না। মুখটা কুঁচকে আমি লজ্জাবতীর গুটিয়ে যাওয়া পাতাগুলোয় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'এইভাবে আর চলে না। এবার জীবনটার একটা পরিবর্তন দরকার। সত্যি এইরকম ছন্নছাড়াভাবে আর চলে না।'

২

কলকাতায় ফিরে বিদেশী খামের একটা চিঠি পেলাম। প্রায় আট ন'খানা ঝকমকে স্ট্যাম্প আঁটা। চিঠিটা এসেছে জাপানের কিওটো শহর থেকে, লিখেছে একজন অ্যামেরিকান। খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি।

আরো চার পাঁচখানা চিঠির সঙ্গে ওটাও ছিল আমার টেবিলের ওপর। সেখানে চারদিনের ধুলো জমেছে। চিঠিটা পড়তে পড়তে আমি দেয়ালে হেলান দিলাম। নইলে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারতাম!

"তুমি কি আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রামে যোগ দিতে রাজি আছ? তোমাকে এক বছরের জন্য প্রতিমাসে দু'শো ডলার হিসেবে স্কলারশিপ দেওয়া হবে। তোমার যাতায়াত ভাড়াও আমরাই বন্দোবস্ত করব। আয়ওয়া শহরটি খুব ছোট, তবু আশা করি তোমার অপছন্দ হবে না। সেখানকার মানুষগুলি খুব বন্ধুত্বপূর্ণ। তোমার সম্মতি আছে কিনা তা আমাকে অবিলম্বে জানাও!"

তিনবার চারবার চিঠিটা পড়লাম। তবু ঠিক বিশ্বাস হয় না। কেউ ঠাট্টা করছে আমার সঙ্গে? তবে চিঠিটা জাপান থেকে এসেছে ঠিকই, একটি বিখ্যাত হোটেলের নাম লেখা প্যাডের কাগজ।

নাম সই দেখে মনে হলো, এ নিশ্চয়ই সেই সাহেবটা। কিছুদিন আগে এক বুড়ো সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে। সেই সাহেবটি নাকি একজন নামকরা কবি, যদিও আমি তার নাম আগে কক্ষনো শুনিনি। সেবার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে এক দুপুরে খাঁটি বাঙালি খাদ্যের এক ভোজসভা হয়েছিল। এক বন্ধুর সুবাদে সেখানে আমিও জুটে গিয়েছিলাম। সাহেবটি বসেছিল ঠিক আমার পাশেই। বাঙালি খাবার খেতে খেতে ইংরেজি কথা বলা আমার ধাতে সয় না। সাহেব-টাহেব দেখলে এমনিতেই অস্বস্তি লাগে। তবু সাহেবটি আমাকে নানা খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞেস করছিল।

হঠাৎ সাহেবটি একটা পটলভাজা তুলে নিয়ে বলল, 'এটার নাম কি?'

এই সেরেছে, পটলের ইংরেজি আবার কি রে বাবা? কোনদিন শুনিনি। ছেলেবেলা যে ওয়ার্ডবুক মুখস্থ করেছিলাম, তাতে কি পটল ছিল? সাহেব আমাদেরই একটা খাবারের নাম জিজ্ঞেস করলো, আর আমি তা বলতে পারব না? মরিয়া হয়ে বলে দিলাম, 'দিস ইজ কল্‌ড ফ্রায়েড পাট্‌ল!'

আশেপাশের কয়েকজন সে কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু আমার ধারণা, তারাও পটলের ইংরেজি জানে না। না হলে বলে দিল না কেন?

তারপরে সেই সাহেবটির সঙ্গে আরো কয়েকবার দেখা হয়েছিল। বুড়ো হলেও বেশ প্রাণশক্তি আছে। খুব লম্বা, মাঝে মাঝেই হাসতে হাসতে পেছন দিকে মাথাটা হেলিয়ে দেয়। ওর নাম পল ওয়েগনার। আমরা মিঃ ওয়েগনার বলছিলাম প্রথম দিকে, সে-ই বলল, শুধু পল বলে ডাকতে। ওদের দেশে বড়-ছোট সবাই নাকি সবার নাম ধরে ডাকে। সাহেবটি আমাদের সঙ্গে একদিন নিমতলা শ্মশানে রবীন্দ্রনাথের চিতাস্থান দেখতে গিয়েছিল। আর একদিন আমাদের কয়েক বন্ধুকে খাইয়েছিল গ্র্যান্ড হোটেলে। সেই প্রথম আমার জীবনে গ্র্যান্ড হোটেলে পা দেওয়া। পরের পয়সায় খুব খেয়েছিলাম সেদিন!

সেই সাহেবটি আমাকে বিদেশ যাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করেছে? কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। কলকাতায় ওর তো কম লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, তবু আমাকেই পছন্দ করল কেন? আমার মুখখানা গোল, সেইজন্য? অচেনা লোকের সঙ্গে আমি এমনিতেই বেশি কথা বলতে পারি না, তারপর ইংরেজিতে বলতে হলে তো কথাই নেই!

চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যদি সত্যি হয়, তবে এরকম সুযোগ মানুষের জীবনে বেশি আসে না। কিন্তু ওখানে গিয়ে কী করতে হবে? ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রাম ব্যাপারটি কি? বিশ্ববিদ্যালয় যখন, তখন আমাকে ছাত্র বা মাস্টার হতে হবে নাকি? অনেক দুঃখে অনেক কষ্টে ছাত্রজীবন শেষ করেছি, আবার কিছুতেই স্কুল কলেজের ছাত্র হতে পারব না! সে আমায় যে যতই লোভ দেখাক। মাস্টার হবার মতনও যোগ্যতা আমার নেই। ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে হলে তো অজ্ঞান হয়ে যাব! বেশিক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলতে গেলেই আমার বুক ধড়ফড় করে, কান কটকট করে, হাঁচি পায়, পেট কামড়ায়।

এমনও হতে পারে, চিঠিটা ভুল করে আমার কাছে এসেছে। বুড়ো সাহেব অন্য কারুর কথা ভেবে ভুল করে আমার ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তো হোমরা-চোমরা লোকদেরই নেমন্তন্ন আসে। আমি একটা সাধারণ বেকার—কোনদিন কোন পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করিনি। কথাটা ভেবেই খুব নিরাশ হয়ে পড়লাম। দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল, ভুল করে চিঠিটা এসেছে আমার কাছে! যদি সত্যি একটু মন দিয়ে পড়াশুনো করতাম!

যাই হোক, এসব পরে ভাবা যাবে! কয়েকখানা পুরনো বই নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিলাম কলেজ স্ট্রিটে। পকেটে একদম পয়সা না থাকলে কি এসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করা যায়! কফি হাউসের সামনে হীরেন আর স্বপ্নার সঙ্গে দেখা। ওরা সদ্য কফি হাউস থেকে নেমে এসেছে। আমি ওদের বললাম, 'চল, আবার চল, আমি তোদের মাটন ওমলেট খাওয়াব।'

সত্যি হোক মিথ্যে হোক, আমার পকেটে একটা আমেরিকার নেমন্তন্ন চিঠি। এই উপলক্ষ্যে কারুকে কিছু খাওয়াতে না পারলে কি মন ভরে?

ছেলেবেলা থেকে কত স্বপ্ন দেখেছি বিদেশে যাবার। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী পড়ে ভেবেছিলাম, জাহাজে আলুর খোসা ছাড়াবার চাকরি নিয়ে একদিন সমুদ্রে ভেসে পড়ব। তা আর হয়নি, স্কুল কলেজে পড়াশুনো করার যাবতীয় দোষ আমার ঘাড়ে চেপে বসে গেল। কলেজে পড়ার সময় আমার বন্ধু অসিত হঠাৎ জার্মানি চলে গেল। আমি তাকে বলেছিলাম, অসিত, আমার জন্য একটা ব্যবস্থা করিস, যে-কোন চাকরি, কুলিগিরি হলেও আপত্তি নেই, শুধু দেশগুলো একটু দেখে আসব! অসিত চিঠি লিখে জানাল, তুই তো আর্টসের ছাত্র, তাই এখানে কোন সুযোগ নেই—সায়েন্স পড়লে চেষ্টা করা যেত! আর্টস পড়লে নাকি কুলিগিরিও পাওয়া যায় না।

তারপর একবার বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম, রাশিয়াতে কয়েকজন বাংলা ভাষায় অনুবাদক নেবে। দিলাম দরখাস্ত করে। এক বন্ধুকে ধরে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

কাছে চরিত্রের সার্টিফিকেট আনতে গিয়েছিলাম। তিনি বাঁকা হেসে বলেছিলেন —সার্টিফিকেট দিচ্ছি বটে, কিন্তু ও চাকরি তুমি পাবে না, অনেক বড় বড় লোক এজন্য চেষ্টা করছে। কথাটা প্রায় অভিশাপের মতন ফলে গেল, দরখাস্তের উত্তর পর্যন্ত এল না!

এখন হঠাৎ এই চিঠি? এ কি মরীচিকা! খড়গপুরে লজ্জাবতী গাছের লতাগুলি ছুঁয়ে বলেছিলাম, এবার একটা কিছু পরিবর্তন দরকার। এই কি সেই?

পরদিন চিঠি লিখে দিলাম, 'আমি যেতে নিশ্চয়ই রাজি আছি। আমায় কী করতে হবে আগে জানাও! আমার কী কী যোগ্যতা আশা করছ তাও আমি জানি না।'!

সাহেবটি তখন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চার পাঁচদিন পর থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন শহর থেকে আমার কাছে চিঠি আসতে লাগল। এবং নানা রকম ফর্ম, রংচঙে পুস্তিকা। পল ওয়েগনার আমাকে জানাল, 'তোমার যা যোগ্যতা আছে তাই যথেষ্ট। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি খুশি হয়েছি। তোমাকে পড়াতে হবে না, ছাত্রও হতে হবে না। তুমি তোমার দেশের সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করবে। আমরা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, জার্মানি, রাশিয়া, জাপান থেকেও এরকম এক একজনকে আনাচ্ছি।'

যেটুকু দোনামনার ভাব ছিল আমার, তাও কেটে গেল আর একটি ঘটনায়। এর মধ্যে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে একটা খাকি খামের চিঠি পেলাম। আমাকে একটা লোয়ার ডিভিশনের ক্লার্কের চাকরি দেওয়া হয়েছে। চাকরি! এর আগে কত জায়গায় যে ইন্টারভিউ কিংবা পরীক্ষা দিয়েছি। কিন্তু পাইনি। হঠাৎ এই সময় চাকরির প্রলোভন! বাড়ির কারুকে কিচ্ছু না জানিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম সেই চিঠিটা। কেরানিগিরি করার চেয়ে যে-কোনো জায়গায় পালানো অনেক ভালো। আর গবেষণায় তো ভয় কিছু নেই। গবেষণা মানে তো পাঁচখানা বই দেখে টুকে দেওয়া!

দিন দশেক বাদে বন্ধুদের ব্যাপারটা জানাতেই হলো। না জানিয়ে উপায় নেই। পাসপোর্ট, ভিসা, ডাক্তারী পরীক্ষা—এরকম নানান ঝামেলা আছে। ওসবের আমি কিছুই জানি না। এক রঙের প্যান্ট আর কোট, যাকে স্যুট বলে, তা আমি জীবনে পরিনি। খুব অল্প বয়সে একটা কোট ছিল, যার নাম তখন ছিল অলেস্টার। এখন তো সোয়েটার আর আলোয়ান দিয়েই কাজ চালিয়ে দিই। সাহেবদের দেশে তো এরকম চলবে না। গলায় কখনো টাই বাঁধিনি, সেটাও শিখতে হবে।

বন্ধুবান্ধবরা চাঁদা করে প্যান্ট কোট বানিয়ে দিল। রিডাকশন সেলের দোকান থেকে কিনলাম এক জোড়া বুট। আর কিছু গেঞ্জি আর রুমাল—বিদেশে নাকি সুতোর জিনিসের খুব দাম। তারপর সত্যিই একদিন রাত দুটোর সময়

দমদম থেকে জেট প্লেনে চড়ে বসলাম। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা বিদায় দিয়ে গেল।

তবু ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না। মনে হয় স্বপ্ন। প্যান্ট কোট পরে আমি বিশাল বিমানের জানলার ধারে বসে আছি, ঠিক যেন মানাচ্ছে না। অন্য সব যাত্রীরা বেশ স্বাভাবিক, আমিই একমাত্র আড়ষ্ট। যেন ঝকঝকে পিন কুশানের মধ্যে একটা বাবলা কাঁটা।

পকেটে মাত্র আট ডলার। যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কারুকে চিনি না। শুধু, ভরসা এই, বিদেশে কোথাও আমি মারা গেলে, ভারতের রাষ্ট্রপতি আমার মৃতদেহটাকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করবেন। পাসপোর্ট ফর্মে এইরকম লেখা ছিল।

সীট বেল্ট বাঁধতে পারিনি, অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করবার পর পাশের লোকটি দেখিয়ে দিল। হেমন্ত গলায় টাই বেঁধে দিয়েছে। ঠিকই করে ফেলেছি, টাইয়ের গিঁটটা কক্ষনো আর খুলব না। রাত্রে শোবার সময় গিঁট শুদ্ধুই টাইটা খুলে ঝুলিয়ে রাখব, আবার দরকারের সময় পরে নেব।

করাচি আর বেইরুটে দু'বার থামল। অন্য যাত্রীদের দেখাদেখি আমিও নিচে নামলাম। কিন্তু বেশি দূরে গেলাম না, যদি কোন গোলমাল হয়ে যায়। মাইক্রোফোনের ঘোষণা ভালো করে বুঝি না। এ তো আর বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়া কিংবা ট্রাক ড্রাইভারের পাশে বসে ভ্রমণ নয়।

রোমে চা জলখাবার খেয়ে দুপুরের আগেই প্যারিস। ভাবা যায়! গতকাল এই সময় আমি দমদমের রাস্তায় বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। অসম্ভব ভিড়ের জন্য তিনটে বাস ছাড়তে হয়েছিল, আর এখন আমি প্যারিসের বিখ্যাত নীল আকাশের নিচে। বিমান থেকে নেমে গম্ভীরভাবে হেঁটে যাচ্ছি ট্রানজিট লাউঞ্জের দিকে। টাই ঠিক আছে তো? কোটের নিচ দিয়ে জামা বেরিয়ে যায়নি তো? পাসপোর্ট? ওটা হারালেই সর্বনাশ!

প্যারিসে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। বিমান বদল হবে এখানে। ওর্লি বিমান বন্দরটা চারদিকে কাচ দিয়ে ঘেরা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম, যদি প্যারিস শহরটা একটু দেখা যায়, যদি দেখা যায় ইফেল টাওয়ার। তখন তো জানি না, বিমান বন্দর থেকে শহর অনেক দূরে। তবু যাই দেখি, তাতেই দারুণ উত্তেজনা। প্যারিসের মাটিতে তো দাঁড়িয়ে আছি, স্বপ্নের প্যারিস। প্রত্যেক মানুষেরই নাকি দুটি মাতৃভূমি থাকে। একটা, যেখানে সে জন্মায়, আর একটি প্যারিস। কাছাকাছি যেসব ফরাসীরা ঘোরাফেরা করছে, তাদের সকলকেই আমার কবি কিংবা শিল্পী মনে হয়।

এক সময় শখ করে ফরাসী শিখতে গিয়েছিলাম। বন্ধুবান্ধবদের হুজুগ। বেশি দূর এগুনো হয়নি, তাও এতদিনে সব ভুলে মেরে দিয়েছি। তবে সেই সময়ই একটা জিনিস শিখেছিলাম, খুব ভালো ফরাসী ভাষা না জানলে ফরাসীদের সঙ্গে ফরাসীতে কথা বলার চেষ্টা করা একদম উচিত নয়। ওরা ফর্‌ফর করে এমন কথা বলবে, যার একবিন্দু বোঝা যাবে না। সুতরাং আমি কাউণ্টারের সুন্দরী মেয়েটিকে ইংরিজিতেই বললাম—টু পোস্টকার্ড প্লীজ!

বিমান বন্দর থেকে রঙীন ছবির পোস্টকার্ডে চিঠি লেখা নিয়ম না? সেইজন্যই কিনলাম কার্ড দুটো। কিন্তু কাকে চিঠি লিখব? একটাতে না হয় বাড়ির চিঠি। কিন্তু আর একটা? কোন একটা মেয়েকে চিঠি লিখতে পারলে কী চমৎকার হয়! কিন্তু কে সে? আমার জন্য তো কোথাও কেউ প্রতীক্ষা করে বসে নেই। কোন মেয়ে তো আমাকে কখনো নিভৃত সময় দেয়নি। মন খারাপ হয়ে যায়। যেসব মেয়েদের চিনি, তারা সবাই অন্য কারুর না কারুর বান্ধবী। কলম খুলে বসে রইলাম চুপ করে।

কাছাকাছি কত লোভনীয় দোকান। কিন্তু কিছু কেনার সাহস নেই। আট ডলার থেকে কমে সাড়ে সাত ডলার হয়ে গেছে এর মধ্যেই। এখনো অনেক রাস্তা বাকি, কোথায় কী লাগবে জানি না। কলকাতায় একজন বিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দুশো ডলার মানে আসলে কত? তিনি বলেছিলেন, দুশো ডলার মানে দুশো টাকা। আমাদের দেশে ডলারের যা দামই হোক, আমেরিকার এক ডলার মানে এক টাকা! তাহলে ওখানে দুশো টাকায় আমার একমাস চলবে তো? যে কেরানিগিরির অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পেয়েছিলাম, তার মাইনে ছিল দুশো সাতাশি টাকা।

হেসাডিতে বেড়াতে যাবার সময় তবু বত্রিশ টাকা আমার সঙ্গে ছিল। এখন পকেটে মাত্র সাড়ে সাত ডলার নিয়ে পাড়ি দিচ্ছি চোদ্দ হাজার মাইল দূরে। ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তের মতনই, যদি পল ওয়েগনারের সঙ্গে আমার কোনক্রমে দেখা না হয়?

হঠাৎ শুনলাম, মাইক্রোফোনে আমার নাম ঘোষণা করছে। প্রথমে মনে হলো, ভুল শুনছি। এ কখনো হতে পারে? আমার নাম ধরে কে ডাকবে? কেন ডাকবে? আবার কয়েক মিনিট পরে সেই ঘোষণা, যদিও বীভৎস উচ্চারণ, তবু আমার নাম ঠিকই। দৌড়োলাম সিঁড়ির দিকে। তখন আমার পেছন থেকে কেউ আমাকে ডাকল। কাউন্টারের সেই সুন্দরী মেয়েটি। আমি পাসপোর্ট সমেত আমার হাতব্যাগ ফেলে যাচ্ছি। মেয়েটিকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে আবার ছুটলাম।

একটা বিমান ছাড়বার জন্য গজরাচ্ছে। আমাকে দেখে একজন লোক তড়বড় করে অনেক কিছু বলে গেল, একটি অক্ষরও বুঝলাম না। অতি দুঁদে ফরাসী! এরকম অবস্থার জন্য তৈরি ছিলাম আগে থেকেই। মুখস্থ করা বাক্যটা বললাম, 'জ্য ন্য পার্ল পা ফ্রাঁসে!' আমি ফরাসী জানি না!

লোকটা আমার একথাও বুঝতে পারল না। আবার সে বাক্যবন্যা শুরু করল। আমি এবার প্রায় বানান করার মতন করে উচ্চারণ করলাম, আ-মি ফ-রা-সী জানি-না-না!

তখন সে আর একজনের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ল। সে ইংরেজি জানে। সেই লোকটি আমাকে খুব মিষ্টি করে বলল, 'ভদ্রমহোদয়, ঐ যে আপনার বিমান ছেড়ে যাচ্ছে!'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সেদিকে ছুটতে যাচ্ছিলাম, লোকটি আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'আপনার কী মাথা খারাপ? দেখছেন না সিঁড়ি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

—তা হলে আমি কী করে যাব?

—আপনি যেতে পারবেন না!

আমার ইচ্ছে হলো প্রচণ্ড গর্জন করে বলি, 'আবার সিঁড়ি লাগাও! আমাকে যেতেই হবে!'

মিনমিন করেই বললাম কথাটা। কিন্তু একবার সিঁড়ি সরিয়ে নিলে আর নাকি লাগাবার নিয়ম নেই। আমারই চোখের সামনে বিমানটা আমার সুটকেশ পেটে নিয়ে উড়ে গেল।

আসলে বেইরুটের পর আমি ঘড়ির কাঁটা ঘোরাতে ভুলে গেছি! সময়ে গোলমাল হয়ে গেছে আমারই! ছোটকাকার ঘড়িটা ধার করে এনেছি, বেশি নাড়াচাড়া করতেই ভয় করে।

বাস থেকে একবার নেমে পড়লে সেই টিকিটে যেমন অন্য বাসে চাপা যায় না, প্লেনের বেলাতেও সেই নিয়ম নাকি? এরকম সন্দেহ একবার উঁকি মেরেছিল মনের মধ্যে। জামাকাপড়ের সুটকেশটাও চলে গেল। পকেটে সাড়ে সাত ডলার নিয়ে প্যারিসে আমি পরিত্যক্ত। এবার?

সেরকম কিছু হলো না অবশ্য। দেড়ঘণ্টা বাদে আর একটি বিমানে আমাকে তুলে দেওয়া হলো। এবার সাড়ে সাতঘণ্টা অবিরাম উড়ে যেতে হবে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে। প্রত্যেকবার বিমান ছাড়ার পরই একটি মেয়ে এসে নেচে নেচে দেখায়, অ্যাক্সিডেন্ট হলে কীভাবে লাইফ জ্যাকেটটা খুঁজে নিয়ে পরতে হবে, কোন্ দরজা দিয়ে লাফাতে হবে। কোনদিন এইভাবে কেউ বেঁচেছে বলে শোনা যায়নি।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঠিক আকাশের মতনেই নীল বিশাল মহাসাগর। মোটেই ভয়াবহ মনে হয় না। যদি মরতেই হয়, তবে সমুদ্রে ডুবে মরতে আমি পছন্দ করব। ক্রমে আটলান্টিকও ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল। এখন শুধু মেঘ। ধপধপে সাদা। বিমানটি এখন এভারেস্টের চূড়ার থেকেও অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এই মেঘের রাজ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় মনে হয় এটা যেন আর একটা পৃথিবী, এখানেও মাঠ, পাহাড়, বাড়ি, দুর্গ রয়েছে—শুধু সব কিছুই সাদা আর ঘুমন্ত।

বিকাল থেকে সন্ধে হলো, তারপর রাত হয়ে গেল, খেয়ে নিয়ে অনেকে ঘুমিয়ে পড়ল। এবং তার খানিকটা বাদে নিউ ইয়র্কে যখন পৌঁছোলাম, তখন সেখানে সন্ধে। আইডল ওয়াইল্ড বিমান বন্দরটি এত বড়, এত আলো, এত মানুষজন যে, প্রথমটায় দিশেহারা হয়ে যেতেই হয়। আমার সুটকেশটা খুঁজে বার করাই প্রথম কাজ। কিন্তু তার আগেই একজন আমায় দাঁড় করিয়ে দিল একটা কাউন্টারের সামনে। হাত বাড়িয়ে বললো, প্লেট?

ভাগ্যিস এক্স-রে প্লেটটা সুটকেশে না রেখে বাইরেই রেখেছিলাম। এক্স-রে প্লেট না দেখে ওরা কারুকে দেশে ঢুকতেই দেয় না। জোরালো আলোয় অনেকক্ষণ ধরে সেটা দেখে লোকটি পছন্দ করল। তারপর চালান করে দিল আরেক কাউন্টারে। সেখান থেকে আর একটায়। ব্যাগাটেলির গুলির মতন এইরকম ঘোরাঘুরি চলল কিছুক্ষণ। সুটকেশটাও উদ্ধার হলো। কাস্টমস চেকিং-এর পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি শিকাগো যাব, কোনদিক দিয়ে?'

লোকটি গম্ভীরভাবে বলল, 'টেক অ্যাল!'

এই প্রথম আমেরিকান ইংরিজির ভালোমতন স্বাদ পেলাম। অ্যাল আবার কী জিনিস? সব কিছু ছোটি করে বলা এদের স্বভাব। আমরা চিরকাল শুনেছি, আধ ঘণ্টার ইংরিজি হাফ অ্যান আওয়ার, এরা বলবে হ্যাফ আওয়ার। এমনকি, বাঘকে বলবে ক্যাট।

এক লোককে দু'বার জিজ্ঞেস করে বোকা বনার চেয়ে আর একজনকে আবার ধরলাম। সেও বলল, 'টেক অ্যাল!'

তারপর আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হোয়াট ইজ অ্যাল?'

অনেক কষ্টে উদ্ধার করা গেল। বিমান বন্দরটা এত বড় যে একদিক থেকে আর একদিকে যেতে বাস লাগে। আমেরিকান এয়ার লাইনসের বাস ধরলে সেটা নিয়ে যাবে তাদের প্লেনের কাছে। সেটা যাবে শিকাগো। ঐ কোম্পানির নামই সংক্ষেপে অ্যাল।

শিকাগোয় পৌঁছোলাম রাত বারোটায় প্রায়। এখান থেকে আবার ছোট প্লেন।

এবারে কাউন্টারের লোকটি জানাল, সে তো কাল সকালে! আজ রাত্রে আর কোন প্লেন যাবে না।

তাহলে রাতটা কোথায় কাটাব?

তখন আমি একটা দারুণ নির্বোধের মতন কাণ্ড করলাম। আমি কত রাত মাঠে, গাছতলায় কিংবা শ্মশানঘাটে শুয়ে কাটিয়েছি, আর একটা রাত যে এয়ারপোর্টেই কাটানো যায়, সেটা আমার মাথায় এল না। আমি ভাবলাম, সাহেবদের দেশে বোধ হয় কেউ বাইরে থাকে না! চমৎকার সব গদি মোড়া বেঞ্চ, সুটকেশটা মাথায় দিয়ে অনায়াসেই ঘুমিয়ে পড়া যায়, কিন্তু তাহলে যদি কেউ আমাকে বাঙাল ভাবে? এয়ারপোর্টটা একেবারে নির্জন হয়ে এসেছে, আমি ছাড়া আর একটিও যাত্রী নেই।

কাউন্টারের লোকটিকে বললাম, 'আমার জন্য একটা হোটেল ঠিক করে দিতে পারো?'

সে বলল, 'ঐ তো অ্যাপ্রুভড হোটেলের লিস্ট টানানো আছে। তুমি ফোন করো।'

সেইসব হোটেলের রেট কুড়ি থেকে সত্তর ডলার। কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আমি বললাম, 'কাছাকাছি কোন ছোটখাটো হোটেল নেই? শুধু রাতটা থাকব, কাল ভোরেই আমার প্লেন।'

সে বলল, 'আট দশ মাইলের মধ্যে দু'একটা হোটেল আছে। আচ্ছা আমি চেষ্টা করে দেখছি তোমার জন্য।'

গল্প উপন্যাসে পড়েছি শিকাগো বিখ্যাত গুণ্ডাদের জায়গা। এত রাত্রে পথে ঘুরে ঘুরে হোটেল খুঁজতে ভয় করবে। তাছাড়া সবচেয়ে কাছের হোটেলটাই নাকি আট দশ মাইল দূরে।

লোকটি ফোন নামিয়ে বলল, 'ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তোমার জন্য গাড়ি আসছে।'

—ওদের রেট কত?

—খুব রিজনেবল।

আর কিছু জিজ্ঞেস করার সময় পেলাম না। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একটা গাড়ি এসে থামল, হর্ন বাজল। লোকটি বলল, 'ঐ যে তোমার গাড়ি এসে গেছে।'

দশ মাইল দূরের হোটেল থেকে এত তাড়াতাড়ি গাড়ি আসে কি করে? সে কথা জিজ্ঞেস করার সময় পেলাম না। গাড়িটা জোরে জোরে হর্ন দিতে লাগল।

সুটকেশটা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। বড় ভ্যানের মতন নীল রঙের গাড়ি।

ড্রাইভার একটি নিগ্রো, আর কেউ নেই। সে আমার সুটকেশটা পেছন দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আমাকে সামনে এসে বসবার ইঙ্গিত করল।

নিগ্রোটি প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা, চকচকে চামড়ার পোশাক পরা, অবিকল একটি দৈত্য। গাড়ির মধ্যে একটি যন্ত্র থেকে মাঝে মাঝে কে যেন কথা বলছে, নিগ্রোটি তার উত্তরও দিচ্ছে। বুঝলাম, হোটেল থেকেই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তাকে। গাড়িটা রাস্তাতেই ঘুরছিল, হোটেল থেকে তাকে বলে দেওয়ায় সে অত তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। সে একটু দেরি করে এলে আমি অনেক লজ্জা থেকে বাঁচতাম।

রাস্তার পাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। এই আমার প্রথম আমেরিকা দর্শন। কিছুই দেখা যায় না, বেশ চওড়া একটা আলো-ঝলমল রাস্তা, দু'পাশে অন্ধকার মাঠ। যে-কোন দেশের রাস্তাই এরকম।

নিগ্রোটি কোন কথা বলে না। সে একটা চুরুট টানছিল, এক সময় সেটা ফেলে দিল। সেই সুযোগে আলাপ জমাবার ছুতোয় আমি বললাম, 'তুমি কি আমার দেশের একটা সিগারেট খাবে?'

ভেবেছিলাম, নিগ্রো যখন, নিশ্চয়ই কড়া সিগারেট পছন্দ করবে। এগিয়ে দিলাম চারমিনারের প্যাকেট।

সে সন্দিগ্ধভাবে প্যাকেটটা নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর একটা সিগারেট নিয়ে ফটাস করে লাইটার জ্বেলে ধরালো।

আমি বললাম, 'তোমার ভালো লাগছে? তা হলে তুমি পুরো প্যাকেটটা নিতে পারো।'

সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে সে বলল, 'ম্যান! দিস ইজ পোয়জন।'

সিগারেটের ব্যাপারে সুবিধে হলো না। তখন সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'যে হোটেলে যাচ্ছি, তার ভাড়া কত?'

—সিঙ্গল রুম দশ ডলার। দু ডলার গাড়ি ভাড়া!

তৎক্ষণাৎ আমার গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়া উচিত ছিল। ষাট-সত্তর মাইল গতিতে গাড়ি ছুটছে, আত্মহত্যা করার জন্য ধরণীকে আর দ্বিধা হতে হতো না!

আমি বললাম, 'আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো!'

—হোয়াট?

নিগ্রোটির সাদা দাঁতে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কিন্তু আমি তখন ভয়-ভাবনার উর্ধে। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। অনেক দারিদ্র্য সহ্য করেছি, কিন্তু কখনো কারুর কাছে দীনতা প্রকাশ করিনি। বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে তাই করতে হবে?

নিষ্প্রাণ গলায় বললাম, 'আমার কাছে অত টাকা নেই।'

রাস্তার ডান দিকে খুব জোরে গাড়ি ঘুরিয়ে একটা গেট পেরুতে পেরুতে সে বলল, 'হিয়ার ইউ আর!'

হোটেলের কাউন্টারে একটি মাত্র লোক জেগে আছে। বাইশ-তেইশ বছরের একটি তরুণ, নীল চোখ, চুলগুলো রুপোলি, ঠিক কোন দেবতার মতন রূপবান। এই সুন্দর চেহারার ছেলেটি সিনেমায় নায়ক না হয়ে হোটেলের কেরানি হয়েছে কেন?

তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ইয়োর পাসপোর্ট প্লিজ!'

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম একটুক্ষণ। কী রকম যেন বিষণ্ন। আমিও মুখটা বিষণ্ন করে বললাম, 'আগে একটা কথা বলি। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে! আমি আজই এদেশে এসে পৌঁছেচি। আমার কাছে বেশি টাকা নেই। আগে রেট জানলে আমি এখানে আসতাম না।'

ছেলেটি আমার সম্পর্কে কোনোরকম কৌতূহল দেখাল না। আমি কোন দেশ থেকে এসেছি, কেন এসেছি, কিছুই জানতে চাইল না। বোধ হয় ওর ঘুম পেয়েছিল। রাত প্রায় একটা। সে শুকনো ভদ্রতার সঙ্গে বলল, 'তুমি এখন কী করতে চাও?'

—কাল ভোর ছ'টার সময় আমার প্লেন। সেই প্লেন ধরতেই হবে। আমাকে যদি এখনই এয়ারপোর্টে ফেরত পাঠিয়ে দাও, আমি গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিতে পারি। নিজে থেকে কোন গাড়ি ধরা আমার পক্ষে অসম্ভব।

ছেলেটি এবার হাসলো একটু। বলল, 'সেটা সত্যিই অসম্ভব! তোমার কাছে যা টাকা আছে দাও!'

আমি সাড়ে সাত ডলার বার করে দিলাম। সে সাত ডলার নিয়ে বাকি পঞ্চাশ সেন্ট আমাকে ফেরত দিয়ে বলল, 'এটা রেখে দাও, কাল সকালে যে তোমার সুটকেশ গাড়িতে তুলে দেবে, তাকে টিপস দিও!'

—না, না। আমার সুটকেশ আমি নিজেই তুলে নিতে পারব।

—তা হলেও। তুমি রাত্রে কিছু খাবে না?

—না, খাবারের দরকার নেই।

—এসো, তোমায় ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

—কাল সকালে আমাকে কেউ ডেকে দেবে তো? প্লেনটা না ধরতে পারলে কিন্তু—

—কোন চিন্তা নেই। এখান থেকে আরো লোক যাবে।

ছেলেটিকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'বাকি টাকাটা আমি পরে দিয়ে দিতে পারি।'

—তার দরকার হবে না।

হোটেলটাতে অন্তত পঞ্চাশখানা ঘর, কিন্তু বাড়িটা একতলা। লাল ইটের দেয়াল, প্রায় আগাগোড়াই আইভি লতা দিয়ে মোড়া। আমার ঘরে ঢুকে আমি একটা বিরাট নিঃশ্বাস ফেললাম। অনেক, অনেকক্ষণ বাদে আমি নিশ্চিন্তভাবে একা! গত রাত্রে প্রায় এই সময়েই দমদমে প্লেনে চেপেছিলাম, কিন্তু মাঝখানে প্রায় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। আমার আয়ুর সঙ্গে বেহিসেবী অতিরিক্ত দশ-বারো ঘণ্টা যোগ হয়ে গেল। এখন কলকাতায় আগামী কালের দুপুর।

এতটা সময় একই জামাকাপড় পরে আছি। এমনকি জুতো-মোজা পর্যন্ত। টেরিলিনের জামা গায়ে চিটচিট করছে। গরমও লাগছে খুব। শীতের দেশ বলে সবাই বেশ ভয় দেখাচ্ছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত একটুও শীত পাইনি।

ঘরটা আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। এক পাশে টেলিভিসন সেট। বিছানার চাদরটা যাকে বলে দুগ্ধফেননিভ। মাথার কাছে টেলিফোন ও বাইবেল। টেলিভিসনটা একটা নতুন খেলনা। আগে এটা নিয়ে আমি কখনো খেলিনি। সুতরাং প্রথমেই সেটার সুইচ টেপাটেপি করলাম খানিকক্ষণ। অনেকরকম আলোর ঝলক, সমুদ্রের ঢেউ, কিচির-মিচির শব্দ, তারপরেই দুমদাম গোলা-গুলি। যুদ্ধের ছবি।

আট-দশ ঘণ্টা পেটে কিছু কঠিন খাদ্য পড়েনি। নিউ ইয়র্কে বিমান বন্দরে অনেক ভালো ভালো খাবার দোকান ছিল, হুড়োহুড়িতে কিছু খাওয়া হয়নি। শিকাগো আসবার সময় প্লেনে দিয়েছে শুধু এক কাপ কফি।

মোজা খোলার পর খালিপায়ে খানিকক্ষণ হেঁটে বেশ আরাম লাগল। দরজা খুলে বাইরে এলাম। দু'একটা ঘর থেকে কিছু কথাবার্তা, হাসির টুকরো ভেসে আসছে। লনটা ফাঁকা। মোরাম বিছানো পথ পার হয়ে ছোট বাগানটাতে এলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল বাগানের মাঝখানে একটি মেয়ে একা বসে আছে। কাছে এসে দেখলাম, মেয়ে ঠিকই, তবে পাথরের, নগ্ন। তার সামনে তবু আমার বলতে ইচ্ছে হলো—'দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কিনা!'

ভোরবেলা টেলিফোনের আওয়াজ আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। বিমান বন্দরে যাবার ডাক। ধড়মড় করে উঠে তৈরি হয়ে নিলাম। প্যান্ট কোট চাপিয়ে গিঁট বাঁধা টাইটা গলিয়ে নিলাম গলায়। বাইরে গাড়ি তৈরি। সেই নিগ্রো।

প্লেনটা ছাড়তে কিন্তু অনেক দেরি করল। কি যেন যান্ত্রিক গোলযোগ। ছোট প্লেন। অনেকটা ডাকোটার মতন। জীবনে এর আগে আমি একবারই মাত্র প্লেনে চেপেছি, কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি, এই রকম প্লেনেই। তাতে অবশ্য এয়ার

হস্টেসের বদলে একজন ধুতিপরা ঢ্যাঙা লোক চা দিয়েছিল।

প্লেনটা যখন ছাড়ল, তখন মাত্র পাঁচ ছ'জন যাত্রী। অন্যরা দরজার কাছেই বসেছে। অনেক ফাঁকা জায়গা বলে আমি একটু দূরে বসলাম। এই বিমানের জানলা থেকে নিচের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। সবুজ সমতল ভূমি, মাঝে মাঝে চৌখুপ্পি কাটা শস্যের খেত, আর রাস্তার ওপর ডিঙ্কি টয়ের মতন মটোর গাড়ি। ওপর থেকে সত্যি মনে হয়, এই পৃথিবীটা একটা পুতুলের সংসার।

মোটাসোটা এয়ার হস্টেসটি আমাকে একটু ধমকের সুরে বলল, 'সিট-বেল্ট বাঁধোনি কেন?'

একটু অবাক হয়ে গেলাম। সব সময় কৃত্রিম ভদ্রতা করাই তো এদের নিয়ম। বেল্ট বাঁধতে ভুলে গেছি বলে বকুনি খাব?

একটু বাদে মেয়েটি কফি এনে অন্যদের দিতে লাগল। সকাল থেকে চা-টা কিছু খাইনি। তেষ্টা পেয়েছে খুব। মেয়েটি কিন্তু অন্য লোকদের কফি দিয়েই থেমে গেল, আমার কাছে আর এল না। ওখানেই বসে পড়ে গল্প করতে লাগল অন্য যাত্রীদের সঙ্গে।

মেয়েটি কি আমার কথা ভুলে গেছে! একি হতে পারে কখনো? আমি ঐ দিকে ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইলাম, যদি চোখে চোখ পড়ে। তাকালই না। চেঁচিয়ে চাইতে পারতাম। কিন্তু কেন চাইব? আমার কাছে ন্যায্য টিকিট আছে, তবু কফি দেবে না কেন?

অন্য লোকগুলো দিব্যি কফি আর বিস্কুট খেতে খেতে হাসাহাসি করছে। হঠাৎ মনে হলো, ওরা আমার সম্পর্কেই কিছু বলছে। নাও হতে পারে। কিন্তু এই রকম অনুভূতি একবার এলে তাড়ানো শক্ত। আমি কান খাড়া ক'রে রইলাম। এই বিমানে আমিই একমাত্র কালো লোক। সেইজন্যই কি অবহেলা করছে আমাকে? কলকাতায় অবশ্য আমাকে কেউ ঠিক কালো বলে না, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু এখানে ওদের কাছে কি আমি এ্যানাদার ডার্টি নিগার!

অপমানে গা জ্বলতে লাগল। এবং খিদে! এইভাবে আমি আমেরিকায় আমার গন্তব্য স্থানে পৌছোলুম খাঁটি ভারতীয়ের মতন। ক্ষুধার্ত এবং নিঃস্ব। এখন এয়ারপোর্টে যদি আমার জন্য কেউ অপেক্ষা না করে, তাহলেই খুব চমৎকার ব্যবস্থা হয়।

৩

প্লেন থেকে নামতেই দেখলাম একজন লম্বা মতন লোক দু'হাত মেলে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। পল ওয়েগনার।

—ভালো আছ তো? রাস্তায় কোন অসুবিধে হয়নি তো? কোন জিনিস হারাওনি তো?

টানতে টানতে আমাকে নিয়ে এলো বাইরে। একটি আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখিয়ে বলল, 'এই আমার মেয়ে, সেরা।'

মেয়েদের সঙ্গে শেক হ্যান্ড করতে হয় কিনা ঠিক জানি না। হাতটা বাড়াতে গিয়েও একটু অপ্রস্তুত হয়ে রইলাম। মেয়েটিই কপালের কাছে দু' হাত জোড় করে বলল, 'নামা- কার!' তারপর হাসলো। সেই হাসিতেই ব্যবহারটা সহজ হয়ে গেল।

প্যান্টের ওপর নীল একটা গেঞ্জি পরা। সোনালি চুল, তীক্ষ্ণ নাক। নাকটা দেখলে একটু অহংকারী মনে হয়, যদিও হাসিটা খুব সরল। সেই গাড়ি চালাচ্ছে।

পেল্লায় গাড়ি। ভেতরটা এয়ার কণ্ডিশানড্ তো বটেই, বোতাম টিপলে জানলার কাচ আপনি বন্ধ হয় বা খোলে। এই রকম একটা জটিল যন্ত্র ঐটুকু একটা মেয়ে কী অবলীলাক্রমে চালায়!

পল্ বলল, 'তোমার জন্য আমি ঘর ভাড়া করে রেখেছি। বেশ ভালো ঘর, তোমার পছন্দ হবে। প্রথমে কয়েকটা দরকারি কাজ সেরেই তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেব।'

প্রথমেই যাওয়া হলো ব্যাঙ্কে। সেখানে তক্ষুনি আমার নামে পাঁচশো ডলার দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খোলা হলো, একশো ডলার ক্যাশ দেওয়া হলো আমার পকেটে। সব ব্যাপারটা সারতে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগল না। ব্যাঙ্কের প্রায় সব ক'টা কাউন্টারেই বসে আছে কয়েকটা ফচকে চেহারার মেয়ে। তারা চুয়িংগাম চিবোতে চিবোতে নাকিসুরে কথা বলে আর অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে ফরফর করে টাকা গোনে। এবং একবার মাত্র গুনেই টাকা দিয়ে দেয়। এতকাল আমার ধারণা ছিল, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ব্যাপার।

সেখান থেকে বেরিয়ে পল্ আরো কয়েক জায়গায় গাড়ি থামাল। এক-একটা দোকান বা অফিসের মধ্যে ঢোকে আর বেরিয়ে আসে। কোনবার বলে, 'তোমার গ্যাস কানেকশান দিতে বলে এলাম।' কোনবার বলে, 'তোমার টেলিফোন লাইন দিতে বললাম।'

তারপর একবার বলল, 'সব হয়ে গেছে। এবার খেতে যাওয়া যাক। তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই!'

আমি সবেগে মাথা নেড়ে বললাম, 'না, না, না।'

সৌভাগ্যবশত আমার আপত্তিতে গুরুত্ব না দিয়ে পল তখন একটা খাবারের দোকানে ঢুকল। টেবিলে বসে বলল, 'কী খাবে বলো?'

এখানে কী খাবার পাওয়া যায়, তা কি ছাই আমি জানি নাকি? আমি কী করে বলব? সেরার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ও যা বলবে।'

সুপ আর হ্যামবার্গার এল। প্রথম দিনই বেশি খাওয়া উচিত নয় বলে আমি পেটে খিদে রেখে পাতে অনেক কিছু ফেলে রেখে বললাম, 'ও! পেট ভরে গেছে।'

পল বলল, 'চলো, এবার তোমার বাড়ি দেখে আসি। এখন সেখানে বিশ্রাম নাও, বিকেলবেলা আমি আবার আসব।'

তিনতলা কাঠের বাড়ি। এদিকে অনেক বাড়িই কাঠের। তবে নানারকম আকারের। আমার ঘরটা দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে পল চাবি দিয়ে দরজা খুলল। দেখলাম, ভেতরে একটি খুব বুড়ো লোক জানলার পর্দা সেলাই করছে।

পল বলল, এই তো ম্যাক এখানেই রয়ে গেছে। ম্যাক, তোমার নতুন ভাড়াটে নিয়ে এলাম।'

ম্যাক বলল, 'হাই দেয়ার।'

লোকটি এতই বুড়ো যে শরীরটা কুঁজো হয়ে গেছে, ভুরু এসে পড়েছে চোখের ওপর। এত বুড়ো লোক পর্দা সেলাই করে কী করে?

পল বলল, 'ম্যাক খুব ভালো লোক। আগে আমাদের অঙ্কের প্রফেসার ছিল।'

আমি চমৎকৃত হলাম। কোন অঙ্কের অধ্যাপককে ভাড়াটের পর্দা সেলাই করতে এর আগে নিশ্চয়ই দেখিনি।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে হাত ঝাঁকাঝাঁকি করলাম। তিনি বললেন, 'তোমার রেফ্রিজারেটারে একটু শব্দ হয়, সেটা আমি কালই ঠিক করে দেব।'

একটা বড় ঘর, একটা রান্না ঘর, বাথরুম, পর্দাঘেরা অনেকখানি জায়গায় ওয়ার্ডরোব। বাড়িটা বড় রাস্তার ওপরে। উল্টো দিকে একটা পেট্রল পাম্প, এদেশে যার নাম গ্যাস স্টেশন। আমার ঘরের জানলায় দাঁড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, এমনকি দূরে একটা নদী পর্যন্ত।

ওরা চলে যাবার পর আমি আমার অ্যাপার্টমেন্ট খুঁটিয়ে দেখলাম। দেয়াল-জোড়া একটা মস্ত বড় আয়না। সেটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানা

টিপেটুপে দেখলাম, এতক্ষণ ধরে ইংরেজি বলার জন্য, চোয়াল-টোয়াল বেঁকে গেছে কিনা!

ধড়াচূড়া ছেড়ে পায়জামা আর গেঞ্জি পরে বাঙালি হলাম। তারপর চটি ফটফট করে সবে মাত্র একটু ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছি, অমনি দরজায় বেল বেজে উঠল। আবার কে?

দেশেই একজন বলে দিয়েছিল, সাহেবদের সামনে কখনো পাজামা পরে বেরুতে নেই। হয় ড্রেসিং গাউন পরে থাকবে, না হলে পুরো প্যান্ট-সার্টে। ড্রেসিং গাউন আমার নেই। সুতরাং চটপট সেই পাজামার ওপরেই প্যান্ট পরে নিয়ে দরজা খুললাম!

টেলিফোনের যন্ত্র নিয়ে একটি লোক এসেছে কানেকশান দেবে।

মাত্র ঘণ্টা দেড়েক আগে টেলিফোন কোম্পানিতে খবর দিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের দেশে টেলিফোন পেতে দশ-বারো বছর লাগে না? ওঃ, সাহেবগুলো কী স্বার্থপর। নিজেদের জন্য সব ভালো ভালো ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

আধ ঘণ্টা বাদে আপনা-আপনি টেলিফোন বাজল। এবার গ্যাস কোম্পানির লোক।--আপনার গ্যাসের কানেকশান দেওয়া হয়ে গেছে, একটু টেস্ট করে দেখুন তো।

রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনটা আগেই দেখেছি। ব্যাপার-স্যাপার ঠিক বুঝতে পারিনি। আলমারির মতন উঁচু একটা জিনিস। নিচের দিকের পাল্লা খোলা যায়। ওপর দিকে চারটে উনুন। অনেকগুলো সুইচ, ঘড়ির ডায়ালের মতন কয়েকটা জিনিস, কী রকমভাবে ব্যবহার করতে হয় জানি না। যাই হোক, একটা সুইচ টিপলাম, অমনি সোঁ সোঁ করে শব্দ হতে লাগলো। তাড়াতাড়ি সেটা বন্ধ করে ফিরে এসে টেলিফোনে বললাম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কানেকশান এসে গেছে, অনেক ধন্যবাদ!

বিকেলের দিকে পল আবার এল। এবার তার সঙ্গে অন্য একটি মেয়ে। এর বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ, বেশ লম্বা, হলুদ রঙের স্কার্ট আর ব্লাউজ পরা। ব্লাউজের সামনের দিকটা এতখানি খোলা যে সোজাসুজি তাকাতে লজ্জা করে।

পল বলল, 'এর নাম ডোরি। ডোরি ক্যাটিজ। খুব ভালো মেয়ে। ও তোমাকে অনেক সাহায্য করবে। তুমি একদিনে অত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছ, নিশ্চয়ই মনটা একটু খারাপ হয়ে আছে। আমার মতন বুড়োর সঙ্গে কথা বললে কি আর মন ভালো হবে?'

ডোরি নিজে থেকেই হাত বাড়িয়ে দিল। আমি ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। বেশ উষ্ণ হাত। সে বলল, 'গ্ল্যাড টু সি ইউ!'

পল্ বলল, 'তোমার তো ছোটখাটো কিছু জিনিস কিনতে হবে! সেগুলো

ডোরিই তোমাকে বলে দেবে। নতুন সংসার পাততে গেলে মেয়েদের সাহায্য ছাড়া চলে না।'

একটু পরেই পল বিদায় নিল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল ঝপাং করে। ঘরের মধ্যে আমি আর একটি যুবতী মেয়ে। একদম অচেনা। এর সঙ্গে ঠিক কী রকম ব্যবহার করা উচিত কে জানে!

আমার এই ঘরে খাট নেই। একটা বড় সোফা রয়েছে। পরে জেনেছিলাম, ঐ জিনিসটার নাম ড্যাভেনপোর্ট, বাংলায় যাকে বলে সোফা-কাম-বেড। বাড়িওয়ালা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেই অনুযায়ী দুপুরে একবার টেনে খুলেছিলাম। কিন্তু কোন মেয়েকে কি বিছানায় বসতে বলা উচিত? সেটাকে ঠেলে আবার সোফা বানালাম। তারপর ডোরিকে বললাম, 'বসো'।

ডোরি খুব সপ্রতিভ। হ্যান্ডব্যাগটা নামিয়ে রেখে পায়ের ওপর পা তুলে বসল। মনে হয়, ওর পা দুটো মোমের তৈরি। মানুষের পা কি এত ধপধপে সাদা হতে পারে?

ডোরি বলল, 'তোমার অ্যাপার্টমেন্টটার ভাড়া কত?'

—তা তো জানি না!

—এটা আমারও নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কখন খালি হলো টেরও পেলাম না। তুমি কি আজ এসেই পেয়ে গেলে?

—না। পল ওয়েগনারই ভাড়া করে রেখেছিলেন।

—তুমি খুব লাকি দেখছি! আচ্ছা দাঁড়াও, লিস্ট করি, তোমার কী কী জিনিস কিনতে হবে। বিছানার চাদর—তুমি নিশ্চয়ই আগের লোকের চাদরে শোবে না? —বালিশ, একটা কম্বল—আচ্ছা কম্বলটা পরে কিনলেও চলবে—রান্নার জিনিস, সসপ্যান, কেটলি।

ডোরি নিজেই একটা লম্বা লিস্ট বানাল। তারপর বলল, 'চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। ফিনফিনে হাওয়া দিচ্ছে। বেশ মোলায়েম। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠলেও দিনের আলো মেলায়নি। ডোরি তার হাতব্যাগ থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি খাও?'

আমি ঘাড় নেড়ে ওর প্যাকেট থেকে একটা তুলে নিলাম। ডোরি লাইটার বার করতেই আমি বললাম, 'দাঁড়াও! পকেট থেকে দেশলাই বার করে ফটাস করে জ্বেলে ধরলাম ওর মুখের কাছে। তারপর বললাম, 'এইটাই নিয়ম না?'

ডোরি হেসে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। তবে আর একটু তাড়াতাড়ি করতে

হবে। তুমি কলকাতার মতন অত বড় শহর ছেড়ে এই গ্রামে আসতে গেলে কেন?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এটা গ্রাম?'

রাস্তাগুলো চৌরঙ্গির মতন চওড়া, দু' পাশে অনেক বেশি আলো, ছবির মতন সুন্দর বাড়ি, গ্যাস লাইন, টেলিফোন, ট্যাক্সি—এর নাম গ্রাম?

ডোরি বলল, 'গ্রাম ছাড়া আর কি?'

—কিন্তু জায়গাটার নাম যে আয়ওয়া সিটি?

ডোরি ঝরঝর করে হেসে বলল, 'সিটি? লোকসংখ্যা কত জানো? সবসুদ্ধ তিরিশ-বত্রিশ হাজার! তোমাদের ক্যালকাটার কত?'

আমরা সাধারণতঃ লক্ষ-কোটি দিয়ে হিসেব করি। তা এখানে চলবে না। মিলিয়ান মানে যেন ঠিক কত? মনে মনে হিসেব করে বললাম, 'ছ' সাত মিলিয়ান হবে!'

ডোরি একটা শিস দিয়ে উঠল। হাসলে ওর বুক দোলে। দেখা যায় দুটি সুস্তনমণ্ডল। আমার মুখের দিকে একটা গরম গরম ভাব আসছে টের পাচ্ছি। চোখ ফেরালাম, রাস্তার দু' পাশে উইলো গাছে। আস্তে আস্তে বললাম, 'আমার দরকার ছিল কলকাতা থেকে দূরে কোথাও চলে যাবার। এই জায়গাটা আমার তো বেশ ভালোই লাগছে।'

—তোমাদের ক্যালকাটা কত পুরোনো? চার হাজার? পাঁচ হাজার?

—না, দুশো আড়াই শো বছর মাত্র!

—রিয়েলি? আমার ধারণা ছিল ইন্ডিয়ার সব কিছুই চার পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। তোমার বয়েস কত?

এবারে একটা মুখস্থ করা রসিকতা শুনিয়ে দেবার লোভ হলো। বললাম, 'একটা গীর্জার বয়েসের তুলনায় আমি ছেলেমানুষ হলেও কোন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের বয়সের তুলনায় আমি বৃদ্ধ।'

রসিকতাটি মাঠে মারা গেল প্রায়। কারণ ডোরি ক্রিকেট খেলার নামই শোনেনি। বলল, 'আমার বয়েস সাতাশ।'

আমরা হাঁটছিলাম যে-দিকে, সেদিকে দুপুরে আসিনি। ডোরি বলল, 'তোমাকে এ অ্যান্ড পি চিনিয়ে দিচ্ছি—এর পর থেকে তোমার যা দরকার, এখানেই পাবে।'

—এ অ্যান্ড পি কি জিনিস?

—তুমি এ অ্যান্ডপি জানো না? আমার ধারণা ছিল, এটা বিশ্ববিখ্যাত। এটা হচ্ছে চেইন সুপার মারকেট। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে

যেখানেই যাও এই দোকান পাবে। সেইজন্যই এই রকম নাম—পুরো কথাটা হলো অ্যাটলান্টিক অ্যান্ড প্যাসিফিক!

—ডোরি, তোমাকে ধরে নিতে হবে, আমি অনেক কিছুই জানি না। আমি এর আগে কখনো ভারতের বাইরে যাইনি। এবং সোজা দেশ থেকে এতদূরে উড়ে এসেছি!

—শোনো, তা হলে তোমাকে আর একটা জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি। কোন মেয়ের সঙ্গে যখন হাঁটবে তখন মেয়েটিকে রাখবে সব সময় ভেতরের দিকে, তুমি থাকবে রাস্তার দিকে। এই যে, এটা হচ্ছে স্ট্রীট সাইড, তুমি এই দিকে যাও। এবং ইচ্ছে করলে তুমি মেয়েটির হাত ধরতে পারো!

ডোরি খপ করে আমার একটা হাত মুঠোয় পুরে নিয়ে আবার সারা শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগল। রাস্তা দিয়ে অন্য যে সব ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে, তারা পরস্পরের কোমর জড়িয়ে বা কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে। কখনো কখনো তারা থেমে পড়ে চুমু খেয়ে নিচ্ছে। সেদিকে তাকানো উচিত নয় বলে আমি বারবার চোখ ফেরাচ্ছিলাম।

এ অ্যান্ড পি দোকানটা আমাদের কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের প্রায় অর্ধেক। ভেতরে ঢুকে নিজেকেই বেছে নিতে হয়। ফর্দ মিলিয়ে আমরা সব জিনিস কিনলাম। চারটে বিরাট প্যাকেট হলো। বাইরে এসে বললাম, 'দাঁড়াও, একটা ট্যাক্সি ডাকি।'

ডোরি বলল, 'ট্যাক্সি? এইটুকু তো রাস্তা, হেঁটেই যাব! তুমি দুটো নাও, আমি দুটো!'

বিরাট বোঝা দুটো ডোরি অবলীলাক্রমে বইতে লাগল। আমি একেবারে মরমে মরে গেলাম। কোন সুন্দরী মেয়েকে এত বড় বড় বোঝা নিয়ে আমি আগে কখনো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখিনি, নিজের দেশেও না।

শুধু তাই নয়, আমার ঘরে এসে ডোরি সব কিছু নিপুণভাবে গুছিয়ে দিল। বিছানার চাদর পেতে, বালিশের ওয়াড় ভরে, রান্নার জিনিসগুলো ঠিকঠাক সাজিয়ে অ্যাপার্টমেন্টটা ঝকঝকে করে তুলল। গ্যাসের উনুন জ্বালিয়ে দেখিয়ে দিল কী ভাবে ব্যবহার করতে হয়। তারপর বলল, 'তোমার জন্য আজ আমি রান্নাও করে দিতে পারি। দেব?'

ডোরি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপিকা। তাকে দিয়ে এতখানি খাটিয়ে সত্যিই আমার লজ্জা করছিল। ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না, না, আজ আর রান্নার দরকার নেই। আজ আমরা বাইরে খাব। চল, এখানে যেটা সবচেয়ে বড় হোটেল।'

ডোরি বলল, 'আমি তো খেয়ে এসেছি!'

—কি? খেয়ে এসেছ?

—হ্যাঁ, আমার তো ডিনার হয়ে গেছে।

যদিও ঘড়িতে আটটা বাজে, তবু আকাশে এখনো একটু একটু দিনের আলো আছে। ডোরি এসেছে সাড়ে ছ'টায়। তার আগেই ডিনার?

ডোরি বলল, 'এখানে সবাই সাড়ে ছ'টায় ডিনার খায়। আমি একটু আগেই খেয়ে নিয়েছি!'

বলেই আবার সর্বাঙ্গে সেই উচ্চকিত হাসি। এই হাসিতে আমি আরো বোকা হয়ে যাই।

তবু জোর দিয়ে বললাম, 'হোক ডিনার। এত খেটেছ, নিশ্চয়ই তোমার খিদে পেয়ে গেছে আবার! চল, আমার সঙ্গে খাবে চল।'

—তুমি নতুন বলে তোমাকে ক্ষমা করলাম!

চমকে উঠে বললাম, 'কোন দোষ করেছি?'

—কোন মেয়েকে কেউ এভাবে খেতে বলে না! তুমি ডেটিং কাকে বলে জানো? জানো তার নিয়ম?

—ডেটিং কথাটা শুনেছি ঠিকই। নিয়ম তো জানি না।

—কোন মেয়েকে যদি তুমি বেড়াতে বা খেতে নিয়ে যাও, তা হলে অন্তত চারদিন আগে তাকে নেমন্তন্ন করবে! ধরো, শনিবার তুমি কোন মেয়েকে বাইরে নিয়ে যেতে চাও, তা হলে তাকে বলতে হবে মঙ্গলবার। খুব ঘনিষ্ঠ হলে বুধবারও বলতে পারো। বেস্পতি শুক্রবার বললে তাকে অপমান করা হবে। তাতে মনে হবে, মেয়েটা দেখতে বাজে কিংবা ওকে কেউ পছন্দ করে না—সেইজন্যই ও খালি আছে!

ওরেব বাবা, এ যে অনেক ঝঞ্ঝাট। বললাম, 'আমি ক্ষমা চাইছি, ডোরি! আজ সোমবার। আমি আজই তোমাকে আগামী শনিবারের জন্য ডেট করে রাখলাম। কিন্তু এই ক'দিন কি আমি না খেয়ে থাকব?'

ডোরি বলল, 'না, চল, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। তুমি পোশাক বদলাবে না?'

ইংরেজি উপন্যাসে পড়েছি বটে, সাহেবরা খেতে যাবার সময় ইভনিং স্যুট পরে নেয়। কিন্তু আমার তো একটাই প্যান্ট কোট। সুতরাং অবহেলার ভাব দেখিয়ে বললাম, 'নাঃ, আর এখন জামা-টামা বদলে কি হবে! চলো—'

এখানকার সবচেয়ে বড় হোটেলের নাম শেরাটন। শুনলাম সাধারণত বাইরের বড় বড় হোমরাচোমরা ব্যক্তিরা এখানে এসে থাকেন। ডিলান টমাস ছিল এখানে।

স্থানীয় লোকেরা বড় একটা যায় না। অনেকটা আমাদের গ্রান্ড হোটেলের মতন।

টেবিলে বসে দু'জনের জন্য এক গাদা খাবারের অর্ডার দিলাম। ডোরিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার জন্য আর কি নেবো? এক বোতল ওয়াইন? শ্যাম্পেন?

ডোরি বলল, 'তুমি কি পাগলের মতন অর্ডার দিচ্ছ! এক গাদা টাকা খরচ হবে। তুমি কি ভারতের কোনো মহারাজা-টহারাজা নাকি?'

আমি হাসলাম। এটা বেশ একটা উপভোগ্য রসিকতা। হাসতে হাসতেই বললাম, 'হ্যাঁ, আমি মহারাজাই! এই সামান্য পয়সা তো আমি দেশে থাকতে যখন-তখন খরচ করেছি।'

বিল হলো ভারতীয় হিসেবে দু' শো সাতাশ টাকা। সেই সঙ্গে বকশিশ দিলাম তেইশ টাকা (অন্তত টেন পার্সেন্ট, ডোরি ফিসফিস করে বলে দিয়েছিল)—প্রায় একজন কেরানির সারা মাসের মাইনে, আমি যা হতে যাচ্ছিলাম! ডোরির হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বেশ একটা অহংকারের ভাব ফুটে উঠল মুখে। শ্যাম্পেনের গুণে মেজাজটাও ফুরফুরে।

রাস্তায় এসে ডোরি বলল, 'এবার তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও।'

—এই রে! তা হলে আমি বাড়ি ফিরব কি করে? আমি তো রাস্তা চিনি না।

—তা হোক বোকারাম! সব সময় একটি মেয়েকেই বাড়িতে পৌঁছোতে হয়। কোন মেয়ে কোন ছেলেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে একা ফেরে না। এটা ছোট জায়গা, তুমি ঠিকই রাস্তা খুঁজে পাবে।

ডোরির বাড়ি উল্টো দিকে। নদীর ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌঁছোলাম সেখানে। পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে ডোরি বলল, 'গুড নাইট!'

ওর হাত ছেড়ে দিয়ে আমিও বললাম, 'গুড নাইট ডোরি!'

ডোরি তবু দাঁড়িয়ে রইল। নিঃশব্দে হাসছে। আবার কি হলো!

—তোমাকে কত আর শেখাবো? তুমি জানো না, কোনো মেয়েকে বিদায় দেবার সময় তাকে চুমু খেতে হয়? চুমু না খেলে বুঝতে হবে, সারা সন্ধে সেই মেয়েটার সাহচর্য তোমার পছন্দ হয়নি।

আমার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হলো, না, না, ডোরি, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। শুধু পছন্দ মানে কী, এ তো আমার দারুণ সৌভাগ্য!

কিন্তু চুমু? ঠোঁটে না গালে? আদরের না নিছক ভদ্রতার? নাঃ, সত্যিই আমি একটা বাঙাল। কিছুই শিখে আসিনি।

মুখটা এগিয়ে দিতে ডোরি নিজেই আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁট চেপে ধরল। নরম বিদ্যুৎ। এই সময় কি ওর পিঠে আমার হাতটা দেওয়া উচিত ছিল, বুকে মেশানো

উচিত ছিল বুক? কিছুই করলাম না। সেই একটা চুমুর স্বাদ মুখে নিয়ে চলে এলাম। অনেকক্ষণ সেটা লেগে রইল, আমি সিগারেট ধরালাম না।

প্রায় এক ঘণ্টা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে খুঁজে পেলাম বাড়ি। যদি গ্রামই হয়, তবে এতগুলো আলো-ঝলমল রেস্টুর‍্যান্ট কেন? অন্তত তিনটে ব্যাঙ্ক, চারটে সিনেমা হল চোখে পড়ল। রাস্তাগুলো প্রায় সব একই রকম। চওড়া কংক্রিটের। এরকম গ্রাম ভালো না। গ্রাম হবে জয়নগর-মজিলপুর-চম্পাহাটির মতন।

সে রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, আমি আবার কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। কি একটা জরুরি জিনিস আনা হয়নি, তাই এক্ষুনি আমার একবার যাওয়া দরকার। টেবিলের ওপর পড়ে আছে আমার রিটার্ন টিকিট। সেটা তুলে নিয়ে কোটটা গায়ে দিয়ে ছুটলাম এয়ারপোর্টের দিকে। প্লেনে ওঠবার পরই মনে হলো, এই রে, কারুকে তো কিছু বলে আসা হলো না! পল ওয়েগনারও কিছু জানে না। তা হলে যদি আর ফিরতে না দেয়। একবার ফিরলেই তো টিকিট ফুরিয়ে যাবে। তা হলে ফেরা হবে না। আর ফেরা হবে না? প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

জেগে উঠে নির্জন ঘরে এক গেলাস জল খেলাম।

৪

সকালবেলা পল ওয়েগনার টেলিফোন করল, দুপুর বারোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে আমাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যারা এসেছে, তাদের একটি পরিচয় সভা হবে। তখনই ঠিক করে ফেললাম, দেশে আমাকে কেউ চিনুক না চিনুক, এখানে বেশ একটা কেউকেটা সেজে থাকতে হবে। এ গাঁয়ের মোধো ভিন গাঁয়ের মদসূদন। আর কেউকেটা সাজার প্রধান উপায় গাম্ভীর্য। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দু'একটা কথা বলব মাত্র।

আগের সন্ধেবেলা ডেভিদ কিনে দিয়েছিল ডিম, সসেজ, পাউরুটি, আপেল। সব ফ্রিজে সাজানো। বিলেতের মতন এখানে বাড়ির দরজায় দুধের বোতল দিয়ে যায় না। দোকান থেকে কিনে আনতে হয়। শক্ত মোম-কাগজের ঠোঙায় পাওয়া যায় দুধ। কাল এক গ্যালনের বিশাল এক ঠোঙা কিনে আনা হয়েছে। জন্মের পর মাতৃস্তন্য ছাড়া আর কখনো দুধ খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। ঠোঙার গায়ে প্রোটিন ফর্টিফায়েড, ভিটামিন অ্যাডেড—এরকম নানা রকম কথা। বুঝতে পারলাম, দুধটা জ্বাল দেবার দরকার নেই, একেবারে তৈরি করাই আছে। ওপরে

একটা ফুটো করে খানিকটা মুখে ঢাললাম। প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। দুধ যে এত সুস্বাদু হয়, তা তো আগে জানতাম না। অনেকটা দুধ খেয়ে ফেললাম। তারপর একটু কষ্ট হলো। আমার ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবদেরও যদি এই দুধ খাওয়ানো যেত। ওরা তো এর স্বাদ পেল না! কখনো কোন ভালো জিনিস খেলে কিংবা ভালো একটা বই পড়লে ইচ্ছে হয়, অন্যদেরও তার ভাগ দিতে। একলা একলা কী কোন জিনিস ভালো লাগে? যাচ্ছেতাই!

দাড়ি কামিয়ে স্নানটান করে তৈরি হয়ে নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় আমার বাড়ি থেকে খুবই কাছে। জানলা দিয়ে ক্যাপিটলের চূড়া দেখা যায়।

একটা ক্ষীণ আশা ছিল, ডোরি হয়তো সকালে একবার আসবে। কিংবা টেলিফোনে খবর নেবে। আমি নির্বোধের মতন ডোরির টেলিফোন নাম্বার লিখে নিইনি। গাইড খুজলাম, ওর নাম নেই। হয়তো আমারই মতন নতুন।

পোশাক পরতে গিয়ে একটা হাঙ্গামা হলো। টাইটা গিট বাঁধা অবস্থায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম ওয়ার্ডরোবে। সেটা বেশি সাবধানে গলায় ঝোলাতে গিয়ে ফাঁসটা খুলে গেল। সর্বনাশ! এখন কি করে টাইটা আবার বাঁধবো? হেমন্তর কাছ থেকে শিখে আসা উচিত ছিল, তাড়াতাড়িতে হয়নি। টাই ছাড়া কেউ রাস্তায় বেরোয় এখানে? আয়নার সামনে দাড়িয়ে অনেক চেষ্টা করলাম। কী যেন বলে দিয়েছিল হেমন্ত, প্রথমে ডান হাত, তার ওপর দিয়ে বাঁ হাত—দূর ছাই, আয়নার সামনে আবার হাতগুলো উল্টো হয়ে যায়। এদিকে দেরি হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত ল্যাপলা মতন একটা নট বেঁধেই বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম মুখ নিচ করে। নিশ্চয়ই সবাই আমার টাই বাঁধা দেখে হাসছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন পল ওয়েগনার। প্রথমে তিনি ঢুকিয়ে দিলেন একটা ঘরে। সেখানে দৈত্যের মতন বিরাট ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি পাঁচকে মেয়ে। ফট ফট করে কয়েকবার আলো জ্বলল। তারপরই মেয়েটা ক্যামেরার পেছন থেকে কাগজের রীল ছিঁড়ে নিজে খানিকটা রাখল, আমাকে খানিকটা দিল। দেখলাম, তাতে আমার চার-পাঁচখানা ছবি। একি ম্যাজিক নাকি! যাই হোক, চিন্তা করার সময় নেই। এবার পাশের ঘরে। এখানে একজন ডাক্তার আমার হাঁটুতে ছোট একটা হাতুড়ি দিয়ে কয়েকবার টোকা মারল। তারপর জিভ দেখাতে বলল। তারপর বলল—এক্সেলেন্ট। আবার আর একটা ঘরে। এখানে মাঝবয়েসী একজন লোক একটা খাতা খুলে বসে আছে। আমাকে বলল—সই করো! দেখি, সেই খাতায় আমার নাম, বয়েস, ডিগ্রি ইত্যাদি সব লেখা আছে। যেন আমি ফ্রানৎস কাফকার কোনো উপন্যাসের জগতে চলে এসেছি। সই করে বেরিয়ে এলাম।

এবার একটা হলঘরে। সেখানে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জনা নানা বয়েসী নারী-পুরুষ। পল ওয়েগনার খুব রসিকতা করছে একজনের সঙ্গে। এরা এসেছে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে। এবং আমি ছাড়া একজন পুরুষ মানুষও টাই পরে নেই!

লজ্জায় আমার প্রায় মাথা কাটা যাবার অবস্থা। এতক্ষণ লক্ষই করিনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অধ্যাপকদের মধ্যেও টাইয়ের পাট একেবারে প্রায় উঠেই গেছে। এদের মধ্যে শুধু আমারই গলায় একটা ন্যাপলা গিট বাঁধা টাই—এখন সকলের সামনে খুলে ফেলাও যায় না! যতটা গাম্ভীর্য অবলম্বন করব ভেবেছিলাম, তার চেয়েও বেশি গম্ভীর হয়ে রইলাম।

বাড়ি ফিরে এলাম ঘণ্টা খানেক বাদে। আসবার পথে টাইটা গলা থেকে খুলে দলামোচা করে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম রাস্তার পাশে। কলকাতার বাঙালি সাহেবরা যত ইচ্ছে টাই পরুক, আমি আর কক্ষনো সাহেবদের দেশেও টাই-ফাই গলায় দেব না! খুব শিক্ষা হয়ে গেছে!

এখন লাঞ্চের সময়। কিন্তু আজ আর রান্না শুরু করার ইচ্ছে নেই। সন্ধেবেলা পল ওয়েগনারের সঙ্গে যেন কোথায় যেতে হবে। দুটো ডিম সেদ্ধ করে দু' স্লাইস পাউরুটির সঙ্গে খেয়ে নিলাম। ফ্রিজে অনেক খাবার মজুত থাকলে দেখছি তেমন খিদেও পায় না। যত খিদে পায় পকেটে পয়সা না থাকলে!

হাতে এখন অনেকটা সময়। কিছু চিঠিপত্র লিখলে হয়। পোস্ট অফিসটা দেখে এসেছি, কিছু খাম-টাম কিনে আনতে হবে। বাইরে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বুক কেঁপে উঠল। সর্বনাশ! চাবিটা তো ভেতরে রেখে এসেছি। দরজায় ইয়েল লক, টেনে দিলেই তালা বন্ধ—এরকম দরজা তো ব্যবহার করার অভ্যেস নেই! এখন উপায়? দরজা ভেঙে ফেলতে হবে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। একটাই উপায় আছে, বাড়িওয়ালাকে খবর দেওয়া। বাড়ির সামনের রাস্তার উল্টো দিকে গ্যাস স্টেশনে টেলিফোন আছে। গাইডে ম্যাকফারসন ট্রেভেলিয়ান-এর নাম খুঁজে, টেলিফোন যন্ত্রে দুটো ডাইম ফেলে (কুড়ি পয়সা) কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম—মিঃ ট্রেভেলিয়ান!

বৃদ্ধ বলল, 'হাই দেয়ার!'

—মিঃ ট্রেভেলিয়ান, আমার নাম এই। আমি তোমার বাড়ির...

বৃদ্ধ আমাকে থামিয়ে দিয়ে খিক খিক করে হাসতে লাগল। তারপর বলল, 'ব্যস, ব্যস, তোমার আর কিছু বলতে হবে না। তুমি আমার নতুন ভাড়াটে তো? চাবি না নিয়ে এসেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছো তো? প্রত্যেকেই তাই করে। অল

ইউ কিডস আর দা সেম! শোনো, তোমার দরজার সামনে যে কার্পেট পাতা আছে, সেটার ডান দিকের কোনটা তুলে দেখবে আর একটা চাবি—কিন্তু শোনো, যদি ও চাবিটা ঠিক ঐ জায়গায় আবার না রেখে দাও, তা হলে তোমার ঘাড় ভেঙে দেব, ইউ ফলো মি?'

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল। এত সহজ সমাধান। ছুটে আবার ফিরে এলাম। কার্পেটটা তুলে সবে মাত্র চাবিটা দেখেছি, এমন সময় কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ডোরি, সঙ্গে আর দুটি মেয়ে।

ডোরি হাসতে হাসতে বলল, 'কী? চাবি হারিয়ে ফেলেছ নিশ্চয়ই? আমিও প্রথম দিন এসে...'

ঘর খুলে ওদের ভেতরে এনে বসালাম। ডোরির সঙ্গে আর দুটি মেয়েকে দেখে মনে মনে একটু বিরক্তই হয়েছি। একটা মেয়ের সঙ্গেই ভালো করে কথা বলতে পারি না, তাতে আবার একসঙ্গে তিনজন। আর কথা যদি বলতেই হয়, তা হলে একা একটি মেয়ের সঙ্গে বলাই তো ভালো।

ডোরির সঙ্গের মেয়েদের মধ্যে একজন ফরাসী। অন্য জন আমেরিকান—টেক্সাস থেকে এসেছে। ডোরি আলাপ করিয়ে দিল। ফরাসী মেয়েটির নাম মার্গারিট ম্যাতিউ। গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ফরাসী পড়ায়, তা ছাড়া নিজে পোস্ট ডক্টরেট রিসার্চ করছে। টেক্সাসের মেয়েটির নাম লিন্ডা হপকিনস।

টেক্সাসের নাম শুনলেই কাউ বয়দের কথা মনে পড়ে। লিন্ডার চেহারাও কাউ বয়দের প্রেমিকাদেরই মতন। নীল রঙের জীনস পরা, উজ্জ্বল লাল রঙের জামা, মাথা ভর্তি সোনালি চুল একটা ফিতে দিয়ে বাঁধা, আঁট স্বাস্থ্য। মনে হয়, সে দুদ্দাড় করে ঘোড়া ছোটাতে পারে, বন্দুক চালাতে পারে অবহেলার সঙ্গে।

ফরাসী মেয়েটির চেহারাটা প্রায় পাগলির মতন। মাথা ভর্তি চুল, কিন্তু অনেক দিন বোধহয় আঁচড়ায়নি। সাধারণ একটা স্কার্ট পরা। পায়ে মোজা। সাজপোশাকের দিকে একটুও মন নেই। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, ছাই-চাপা আগুন। এমন রূপ, এমন সারল্য আগে কখনো দেখিনি মনে হয়। চোখের দৃষ্টি ঠিক শিশুর মতন কৌতূহলী।

ডোরি বলল, 'শোন, ওদের কাছে তোমার গল্প বলছিলাম, তাই ওরা আমার সঙ্গে চলে এল। মার্গারিট কখনো কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে কথা বলেনি।'

লিন্ডা নিজে থেকেই বলল, 'আমি শুনেছি, ভারতীয়রা ভালো চা বানায়। তাই তোমার হাতের চা খেতে এলাম!'

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, 'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!'

চা কেনা আছে বটে, কিন্তু টি ব্যাগ। এক চামচে চা দিয়ে একটা করে কাগজের প্যাকেট। ওপরে সুতো বাঁধা। গরম জলে ডুবিয়ে দিলেই হলো। এতে চা বানাবার কোন কৃতিত্ব নেই। তবু আমি কাপে কাপে দুধ ঢেলে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের কার ক' চামচে চিনি?'

ওরা কেউ কখনো দুধ চিনি মিশিয়ে চা খায়নি। চিনি যে মেশাতে হয় তাই জানে না। আমার তৈরি চা খেয়ে লিন্ডাও বলল বটে যে, বাঃ বেশ ভালো, চমৎকার —কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ভদ্রতা করছে। দ্বিতীয়বার ও আর চিনি মেশানো চা খাবে না।

ফরাসী মেয়েটি ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল, 'তোমার ঘরে কোনো বই নেই!'

সত্যি, একটা বইয়ের র‍্যাক আছে বটে, সেটা শূন্য। আমার কাছে বই তো দূরের কথা, একটা পত্র-পত্রিকাও নেই।

সেই মেয়েটি বলল, 'বাড়িতে একটাও বই না থাকলে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয় না? ঘরগুলো খুব খারাপ দেখায়!'

আমার ভালো লাগল ওর কথা শুনে। নতুন আলাপ করতে এসে কেউ এরকমভাবে কথা বলে না।

ডোরি বলল, 'ও তো নতুন এসেছে, বই-টই কেনার সময় পায়নি। শোন নীল, তুমি লাইব্রেরিতে যেতে পারো। এখানকার লাইব্রেরি খুব ভালো। সকাল আটটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত খোলা থাকে। সেখান থেকে তুমি যত ইচ্ছে বই আনতে পারো।'

—যত ইচ্ছে বই?

—হ্যাঁ, অনেকে পঞ্চাশ ষাটখানা বইও এক সঙ্গে আনে। তিনমাস পর্যন্ত রাখা যায়।

খানিকক্ষণ গল্পের পর ডোরি বলল, 'চল বেরুনো যাক। নীল, তুমি যাবে?'

—কোথায়?

—পার্কে। এখানকার অনেকে যায়।

—ছ'টার সময় পল ওয়েগনার আমাকে নিতে আসবে।

—তার তো অনেক দেরি, এখন তিনটে বাজে।

লিন্ডার গাড়ি আছে, সেই গাড়িতে আমরা সবাই মিলে উঠলাম। কী অসম্ভব জোরে গাড়ি চালায় মেয়েটা! দু'তিন মিনিটের মধ্যে পার্কের সামনে পৌঁছে গেলাম। লিন্ডা বললো, 'আচ্ছা, তোমরা যাও, বাই বাই!'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাস করলাম, 'সেকি, তুমি যাবে না?'

লিন্ডা হেসে বলল, 'ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারব না। আমার এখনো একুশ বছর হয়নি।'

লিন্ডার চেহারা দেখে আমি তাকেই সবচেয়ে বড় ভেবেছিলাম। বললাম, 'চলে এসো না, কে আর বুঝবে?'

ডোরি বাধা দিয়ে বলল, 'না, তার দরকার নেই। এখানে এসব নিয়ম খুব কড়া। একুশ বছর বয়েস না হলে ঢোকা যায় না। লিন্ডার তো আর মাত্র পাঁচ ছ'মাস দেরি!'

লিন্ডাকে বিদায় জানিয়ে আমরা ভেতরে এলাম। আবছা অন্ধকারে প্রচুর সিগারেটের ধোঁয়া। এখানে শুধু বীয়ার পাওয়া যায়। ছাত্র, অধ্যাপক আর লেখক বা শিল্পীরাই আসে। অনেকটা আমাদের কফি হাউসের মতন। এক টেবিলের একটি জঙ্গলের মতন দাড়িওয়ালা ছেলে সাড়ম্বরে নিজের কবিতা পড়ছে। এখানে ডোরি আর ফরাসী মেয়েটিকে অনেকেই চেনে। আমরা কোণের টেবিলে বসলাম। বেশ কয়েকটি ছেলে-মেয়ে উঠে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে যেতে লাগল। এ পর্যন্ত শুধু তিনটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, এবার কয়েকটি ছেলের সঙ্গেও অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বের মতন হয়ে গেল। শুনেছিলাম, সাহেবরা সহজে ঘনিষ্ঠ হয় না, এই ছেলেগুলো কিন্তু বেশ খোলামেলা। মার্ক লকলীন নামে একটি ছেলে আমাদের টেবিলে এসে বসল, সাঙ্ঘাতিক সুপুরুষ, তার খুব ঝোঁক ফরাসী মেয়েটির দিকে। ভাঙা ভাঙা ফরাসী ভাষায় সে প্রেমের কথা জানাতে লাগল। মেয়েটা শুধু হাসে আর বারবার ফরাসীর ভুল শুধরে দেয়।

বার মেড-এর নাম আইরীন। ছোট্টখাট্টো মিষ্টি চেহারা। তার কোমরে একটি রেশমী দড়িতে অনেকগুলো ছোট্ট রুপোর ঘণ্টা বাঁধা, হাঁটলেই চমৎকার শব্দ করে। এক হাতে পাঁচ ছ'টা বীয়ার ক্যান নিয়ে সে অবলীলাক্রমে দৌড়োদৌড়ি করে। যে-কোন টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময়ই ছেলেরা ফস্টি-নস্টি করার চেষ্টা করে ওর সঙ্গে। কোন রকম অসভ্যতা নেই, ব্যাপারটা বেশ মধুর। জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগে গেল। আসতে হবে তো মাঝে মাঝে!

সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ উঠে পড়লাম। ছ'টার সময় পল ওয়েগনার এসে নিয়ে গেল আমাকে একটা পার্টিতে। দুপুরে যাদের দেখেছি, তারাই সেখানে উপস্থিত। এবার টাই পরে আসিনি বলে স্বচ্ছন্দে অনেকের সঙ্গে আলাপ করতে পারা গেল।

পার্টি থেকে রাত সাড়ে দশটায় বেরিয়ে পল আমাকে বলল, 'তুমি কিন্তু আজ বাড়ি ফিরছ না। তুমি আমার সঙ্গে আমার গ্রামের বাড়িতে যাবে। ওখানেই দু'দিন থাকব আমরা। দেশ থেকে এতদূরে এসেই তুমি একলা একলা থাকবে, এটা ঠিক নয়।'

বেশ মজা! বাড়িতে কারুকে বলে আসার দরকার নেই। কেউ আমার জন্য চিন্তা করবে না। আমার তালা দেওয়া ঘরটা বোবা হয়ে থাকবে।

জ্যোৎস্না রাত। চারিদিক পরিষ্কার দেখা যায়। দু'পাশে গমের খেত। প্রায় সমতল ভূমি, কোথাও কোথাও সামান্য ঢেউ খেলানো। এদিকে বাড়ি-টাড়ি বেশি নেই, তবু হঠাৎ দূরে দেখা যায় ছোট্ট একটা গীর্জা, ঠিক যেন আঁকা ছবির মতন।

পলের গ্রামের বাড়িটি আসলে ছোট্ট একটি টিলার ওপরে দর্গ ধরনের বিরাট একটি প্রাসাদ। বহুদূর থেকে দেখা যায় বাড়িটা। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে পল আমাকে বলল, 'আমরা এসে গেছি। তবে শোন, তোমাকে আগে থেকে একটা কথা বলে রাখি, আমার স্ত্রী যদি হঠাৎ রেগে যান, তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন বা তোমাকে মারতে যান, তাহলে তুমি কিছু মনে করো না কিন্তু!'

এ আবার কী কথা? যে বাড়িতে যাচ্ছি, সে বাড়ির গৃহকর্ত্রী আমাকে মারতে আসবেন? পল কি রসিকতা করছে?

গাড়ি থেকে নেমে পল সন্তর্পণে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। তারপর ভেতরটা খানিকটা দেখে এসে ফিসফিস করে বলল, 'যাক, আমার স্ত্রী মেরি ঘুমিয়ে পড়েছে। এস আমরা একটা নাইট ক্যাপ নিই, তারপর আমরাও শুতে চলে যাব।'

এই বুড়ো লোকটি তার বউকে এত ভয় পায়? আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। নাইট ক্যাপ কথাটার মানে জানতাম না। পল দুটি গেলাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে এল। তারপর একটা বিশাল আরামকেদারায় পা ছড়িয়ে বসে বলল, 'বিস্তারা! দু'দিন আমরা এখানে থাকব, সাঁতার কাটব, জঙ্গলে গিয়ে মাছ ধরব, আমার বন্ধু টম পাওয়েলকে ভুট্টা চাষে সাহায্য করব, এ বাড়ির বাইরের গেটটা সারাব— অর্থাৎ শুধু বিশ্রাম। তারপর ফিরে গিয়ে আবার কাজ!'

বিশ্রামের তালিকাটা তো পেলাম, তাহলে কাজটা কি?

পলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার কাজটা এখানে ঠিক কী বলো তো? আমাকে কি করতে হবে?'

পল হেসে উঠল। বলল, 'তোমাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? তোমাকে কি আমরা খাটিয়ে মারব নাকি?'

—না মানে, কাজটা কী ধরনের!

—আমার মনে হয়, তোমার পক্ষে খুব সোজা। তোমাদের ভাষার সাহিত্য কী রকম হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ টেগোরের পর নতুন কী ধারা দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখবে। আর কিছু লেখা অনুবাদ করবে।

—এ কাজ যদি আমি না পারি? কিংবা...

—পারবে না কেন?

—মানে, যদি আমার ভালো না লাগে? ইচ্ছে না হয়?

—তাহলে যখন ইচ্ছে দেশে ফিরে যাবে। তোমার কাছে তো রিটার্ন টিকিট আছেই। দিস ইজ আ ফ্রি কান্ট্রি! ওসব কথা ভেবো না: তোমার ইচ্ছে মতন কাজ করো, যখন যতটা খুশি।

—আসলে, সত্যি কথা বলব? আমি তো ভালো ইংরিজি জানি না, অনুবাদ কি ভালো পারব?

—তুমিই ভালো পারবে। কারণ তুমি তোমার ভাষাটা জানো। ইংরিজিতে তুমি প্রথমে যা লিখবে, সেটার ভাষা একটু মেজে-ঘষে দেওয়া যাবে পরে। সেটা কোন ব্যাপারই নয়। অন্য দেশ থেকে যারা এসেছে, তাদের কেউ কেউ তো তোমার থেকেও কম ইংরিজি জানে। তুমি যে ইংরিজিতে কথা বলছ, তাই তো যথেষ্ট; আমি তো তোমার ভাষায় কথা বলতে পারি না।

পলের গলার স্বরে এমন একটা শান্ত ভাব আছে, যাতে খুব আশ্বস্ত হওয়া যায়।

ও আবার বলল, 'আসল ব্যাপারটা কি জানো? এই যে প্রোগ্রাম, এর টাকা ইউনিভার্সিটি পুরো দেয় না। এখানে অনেক বড়লোক চাষী আছে, এত বড়লোক যে প্রত্যেকেরই দু-তিনটে নিজস্ব এরোপ্লেন। তাদের কাছ থেকে আমি চাঁদা তুলি। ওদের বোঝাই যে, সাহিত্য-শিল্পের জন্য কিছু দান না করলে পরলোকে গোল্লায় যাবে। পাঁচ দশ হাজার ডলার দেওয়া ওদের পক্ষে কিছুই না। সেই টাকায় আমি চাই যথাসম্ভব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লেখকদের সাহায্য করতে: তারা যাতে নিশ্চিন্তে এখানে কিছুদিন কাটাতে পারে, ইচ্ছে মতন লিখতে পারে—'

ইস, এ জন্য আমার থেকে কত ভালো ভালো যোগ্য লোক ছিল। আমি কী কোনদিন লেখক হতে পারব? বিশ্বাস হয় না!

সারা বাড়িটা দারুণ নিস্তব্ধ। এত বড় বাড়িতে কি আর লোকজন নেই? আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার মেয়ে, সেরা, সে কোথায়? তোমার আর ছেলেমেয়ে নেই?'

—আমার দুই মেয়ে। বড় মেয়ে, মার্থা, তার বিয়ে হয়ে গেছে, সে কলোরাডোতে থাকে। ছোট মেয়ে সেরা, ওর বিয়ের দিকে মন নেই। ও ভীষণ ঘোড়া ভালোবাসে। আমার একটা ফার্ম আছে এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে, পাঁচটা ঘোড়া আছে সেখানে, সেরাই দেখাশুনো করে। ঘোড়ার গন্ধ ছাড়া ওর ঘুম হয় না। বোধ হয়, তাই রাত্তিরেও সেখানেই শোয়!

—একা!

—না, না! কোন না কোন বয়ফ্রেন্ড সঙ্গে থাকে নিশ্চয়ই!

এমন নিশ্চিন্ত পিতা আমি দেখিনি কখনো!

আমাকে শুতে দেওয়া হলো ওপরের একটি ঘরে। খাটটা দেখে মনে হলো রাজকুমার-টুমাররা এ রকম খাটে শোয়। সারা ঘরে অসংখ্য বই। এত বই দেখলেই আমার দু'একটা চুরি করতে ইচ্ছে করে। বইগুলি বিভিন্ন ভাষায়। ফরাসী, ইটালিয়ান, এমনকি জাপানী পর্যন্ত। বাংলা একটাও নেই। ওঃ, কতদিন যে বাংলা অক্ষর দেখিনি, কতদিন যে বাংলায় কথা বলিনি!

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিড়বিড় করে বাংলায় বলতে লাগলাম—ওহে নীল চন্দর, কেমন আছ? এসব দেখেশুনে কি মাথা ঘুরে যাচ্ছে? দেখো বাবা! প্রথম দিনই একটা মেয়ে চুমু খেয়েছে! আর যাই করো না কেন, মেম বিয়ে করো না! কবে দেশে ফিরবে? এর মধ্যেই আর ভালো লাগছে না যে!

ভালো লাগছে না? চারদিকে এত ভালো ভালো জিনিস, এত আরাম, তবু ভালো না-লাগার কি কারণ থাকতে পারে? তবু এত স্বাচ্ছন্দ্যও যেন বাড়াবাড়ি মনে হয়, কী রকম অস্বস্তি লাগে। এত চমৎকার বিছানায় শুয়েও কেন ঘুম আসছে না? কলকাতায় নিজের বিছানায় শুলেই তো...

ঘুম ভাঙল খুব সকালে। ঘড়িটা বন্ধ। ক'টা বাজে জানি না। এদের বাড়িতে সবাই কখন ওঠে? যদি ব্রেকফাস্ট টেবিলে আমার জন্য অপেক্ষা করে? তাড়াতাড়ি নেমে এলাম নিচে। কোনো সাড়াশব্দ নেই! আন্দাজে আন্দাজে চলে এলাম খাবার ঘরে। সেখানেও নেই কেউ। তাহলে বোধ হয় আমি খুবই আগে উঠে পড়েছি। আর বিছানায় ফিরে যাবার মানে হয় না। বেরিয়ে এলাম বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ জুড়িয়ে গেল।

চারদিকে নরম আলো। আকাশ কী অদ্ভুত নীল! বহুদূর পর্যন্ত গাছপালার সবুজ। তার মাঝখানে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি মেপল গাছ, তার পাতাগুলো গাঢ় রক্তিম। পরিপূর্ণ শরৎকাল। এদেশে যার নাম অটাম নয়, ফল, আগেই শুনেছি। মেপল পাতার রঙ বদলানো দেখে শরতের আগমন বোঝা যায়।

কয়েকটা চড়ুই পাখি দেখে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে গেল। বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। চড়ুই পাখি আমার ধারণায় খাঁটি বাঙালি জিনিস। এর পর কয়েকটা কাক দেখতে পেলেই হয়। এমনকি দাঁড় কাক হলেও চলবে। কাক চোখে পড়ল না, কিন্তু গেটের ঠিক পাশেই একটা ম্যাগনোলিয়া গ্ল্যান্ডিফোরা গাছে লুকোচুরি খেলছে কয়েকটা বাচ্চা কাঠবিড়ালি। এরাও আমার চেনাশুনো মানুষের মতন, খুব সম্ভব বাংলা বললেও বুঝবে।

টিলার নিচের রাস্তা দিয়ে উঠে আসছে একটা সুদৃশ্য নীল রঙের গাড়ি। ঐ রাস্তা এ বাড়িতেই শেষ হয়েছে। বোধ হয় পল ওয়েগনারের কাছে কোন অতিথি

এসেছে। গাড়িটা একেবারে গেটের সামনে থামল, মিলিটারির মতন পোশাক পরা একটা গাট্টাগোট্টা লোক নামল এবং চিঠির বাক্সে কতকগুলো চিঠি গুঁজে দিয়ে আবার গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল। ও বাবা রে, মোটর গাড়ি চড়া পিওন! আরো কত কায়দাই যে দেখব!

মুখ ফেরাতেই দেখলাম একজন মহিলা। প্রায় প্রৌঢ়া। ছেলেদের মতন প্যান্ট সার্ট পরা, খানিকটা খর্বকায়া। সোজা তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

এই নিশ্চয়ই পলের স্ত্রী। কারণ বাড়িতে আর কোনো জনপ্রাণী নেই। ইনি নাকি হঠাৎ রেগে যান, আমাকে মারতে আসতেও পারেন। পাগল? নাকি কালো লোকদের পছন্দ করেন না!

কিছু তো বলতে হবেই! সকালবেলা প্রথম দেখা হলে গুড মর্নিং না বলা এদেশে পাপ। কিন্তু সম্বোধন করব কি বলে? নামও জানি না।

মায়ের বয়েসী মহিলা, সুতরাং মুখে সেই সম্বোধন এসে গেল। বললাম, 'গুড মর্নিং মাদার।'

ও, এই একটা সম্বোধনের জন্য পরে আমাকে কি হেনস্থাই সহ্য করতে হয়েছিল! আমি নাকি সাঙ্ঘাতিক অন্যায় করেছিলাম। মার্কিন দেশে শৈশব কিংবা বার্ধক্যের কোন মূল্য নেই। সবটাই যৌবন।

মহিলা উত্তর দিলেন, 'গুড মর্নিং।' তারপর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বললে?'

আমি গাড়লের মতন ঐ কথাটারই পুনরুক্তি করলাম!

উনি একেবারে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন, যাকে বলে প্রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ার মতন অবস্থা। অত হাসি দেখে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। সত্যি পাগল নাকি? আমি তো হাসির কথা কিছু বলিনি!

মহিলাটি বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন—মাদার, মাদার, মাদার—আর হাসি। শেষ পর্যন্ত চোখে জল আসায় হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে তা মুছতে গেলেন, তখন আমি একটা রুমাল এগিয়ে দিলাম।

একটু সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'তুমিই সেই ইন্ডিয়ান বয়? কি নাম তোমার?'

নাম জানালাম ভয়ে ভয়ে।

—শোন, আমার নাম মেরি। মিসেস ওয়েগনার। আমি তোমার মাদার নই। এর পর আর কক্ষনো কোনো মহিলাকে মাদার বলো না। নিজের মা ছাড়া আর কারুকে মা বলতে নেই! তুমি আমাকে শুধু মেরি বলবে।

ইংরেজি ভাষায় তুমি-আপনি নেই। বয়েসে যারা অনেক বড়, তাদের শুধু

নাম ধরে ডাকতে কেমন যেন বাধো বাধো লাগে। কিন্তু উপায় কি? যবনের হাতে পড়েছি যখন, তখন সেই খানাও খেতে হবে।

মেরি অবশ্য রাগ করল না, মারতেও এল না। আমাকে খাবারের ঘরে নিয়ে এসে কেটলিতে কফির জল বসাল। তারপর ফ্রিজ থেকে বিরাট লম্বা একটা স্যালামি আর একটা ছুরি আমাকে দিয়ে বলল—কাটো।

স্যালামি আগে খেলেও কাটার অভ্যেস নেই। মোটামুটি চাকা চাকা করে কাটলাম। তারপর পাউরুটি কাটতে হলো। এর ফাঁকে ফাঁকে মেরি জিজ্ঞেস করতে লাগল আমার বাড়ির খবর। তারপর হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা আফশোসের সুরে বলল, 'ইস, তোমাকে স্যালামি কাটতে দিলাম কেন? তুমি তো নিরামিষ খাও!'

—না তো।

—ইন্ডিয়ানরা তো শুধু নিরামিষ খায়!

—অনেকে খায় বটে। কিন্তু আমি...

—তুমি বীফ খাও!

—খাই।

—এর আগে একজন ইন্ডিয়ান এসেছিল এ বাড়িতে—আ রিয়াল ইন্ডিয়ান ফ্রম ইন্ডিয়া, সে নাকি মস্ত বড় লোক, কিন্তু তার খাওয়া নিয়ে কি ঝামেলা। আমার বাড়িতে ভেজিটেবল বিশেষ কিছু থাকে না...তুমি নিশ্চয় মোজলেম।

শূকর মাংসের চাক্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বললাম, 'আমি সবই খাই। আমি গরিবের ছেলে তো, মা বলে দিয়েছেন, লোকের বাড়িতে গিয়ে এটা খাব না, সেটা খাব না বলতে নেই। যে যা দেবে সোনা-মুখ করে খেয়ে নেবে!'

মেরি হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি সবই খাও? তাহলে এটা দিয়ে আজ ব্রেকফাস্ট করো।'

মেরি একটা প্যাকেট আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। দেখলাম, প্যাকেটটার গায়ে লেখা আছে, ডগ বিস্কিট!

এই দু'দিনেই বুঝে গেছি, আমেরিকানরা সব সময় মজা করতে ভালোবাসে। যে-কোন বিষয় নিয়েই এরা হাসিঠাট্টা করতে পারে।

সুতরাং মেরিকে মজা দেবার জন্য আমি গ্রাউ, আউ, আউ, গ্রাউ করে খানিকটা কুকুরের ডাক ডাকলাম। তারপর একখানা বিস্কিটে এক কামড় দিয়ে বললাম—ইয়া, আই লাইক ইট!

মেরি ছুটে এসে আমার মুখ থেকে সিগারেটটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি সত্যি সত্যি খাচ্ছিলে? ভারি দুষ্টু ছেলে তো!'

সকালটা মেরির সঙ্গে আমার ভালোই কাটল। তবে, পরবর্তী দু'দিনে বাড়িতে যত অতিথি এসেছে, সবার সঙ্গেই মেরি আমার পরিচয় করে দেবার পর বলেছে —জানো, ও প্রথম আমায় দেখে কি কি বলেছিল? বলেছিল, গুড মর্নিং মাদার! তাই শুনে মেরির সঙ্গে সঙ্গে অতিথিদেরও কি হাসি! সেই সময় আমার বোকা বোকা মুখ করে বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

পলের ঘুম ভাঙল দশটার সময়! একটু পরেই সে একটা হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে বেরিয়ে এল, হাতে একটা বিদঘুটে যন্ত্র। আমাকে বলল, 'তুমি রেডি তো? চলো!'

কোথায় যাচ্ছি, জানি না। বেরিয়ে পড়লাম ওর সঙ্গে। টিলার উল্টোদিক দিয়ে নামলে একটা ছোট মতন জঙ্গল। সেখানে খুঁজে খুঁজে পল একটা শুকনো ওক গাছ বার করল। গাছটা বিরাট, কিন্তু ছাল বাকল খসে গেছে। পল বলল, 'আমাদের এই বাড়িটাতে এখনো ফায়ার প্লেস আছে। এখানে কাঠের খুব দাম। কিনতে গেলে ফতুর হয়ে যাব। সামনেই শীত আসছে, তাই কিছু কাঠ জোগাড় করে রাখা দরকার।'

তারপর সে গাছটা কাটতে শুরু করল। তার হাতের যন্ত্রটা একটা ইলেকট্রিক করাত। কী প্রচণ্ড তার শব্দ! কিছুক্ষণের জন্য সেটা আমি ধরে ছিলাম। অতিশয় ভারী এবং এত কাঁপে যে ধরে থাকা রীতিমতন কষ্টকর। এবং করাতের ফলাটার সামনে যদি একবার হাতটা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে কুচুং করে উড়ে যাবে। ষাট বছরের বৃদ্ধের এই শখের আমি মানে বুঝতে পারি না! কাঠের দাম-ফাম সব বাজে কথা!

প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় গাছটাকে ভূপাতিত করা গেল; মহাকাব্যের প্রতিনায়কের মতন সে হাত-পা ছড়িয়ে ঢলে পড়ল মাটিতে। পল খুব খুশি। বড় বড় কয়েকটা ডাল সে আলাদাভাবে টুকরো করে বলল, 'এবার ম্যাক গ্রেগরকে খবর দিতে হবে। সে হচ্ছে প্লাম্বার। সে এসে বলবে, কোন কোন কাঠ আমাদের গেটটা সারাবার জন্য দরকার হবে।'

ম্যাক গ্রেগর একজন মধ্যবয়সী, শক্ত-সমর্থ লোক। কথা প্রায় বলেই না। তবে দারুণ পরিশ্রমী। তক্ষুনি পলের গাড়িতে দুটো ডাল বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। এবং গেট-সারানো চলল আরো দু'ঘণ্টা। তারপর পল তাকে তার মজুরির টাকা মিটিয়ে দেবার পর বলল, 'ম্যাক গ্রেগর, একটা ড্রিঙ্কস নেবে নাকি? দুপুরের খাবারটা আমাদের সঙ্গেই খেয়ে যাও না!'

আমরা তিনজন এক সঙ্গে খাবারের টেবিলে বসলাম। কাজ শেষ হবার পর

ছুতোর মিস্তিরির সঙ্গে এক টেবলে খেতে বসার ব্যাপারটা গরিব দেশের লোকেরা জানে না।

গ্রাম হলেও জায়গাটার নাম স্টোন সিটি। যদিও এখানেও অধিকাংশ বাড়িই কাঠের। আয়ওয়ার সঙ্গে জায়গাটির তফাৎ এই যে, এখানে বিশ্ববিদ্যালয় নেই। যদিও দুটি দৈনিক পত্রিকা আছে। দুটো পত্রিকা পরস্পরের দারুণ শত্রু, প্রতিদিন সকালেই পরস্পরের প্রতি প্রচুর গালমন্দ থাকে। যদিও দুটো পত্রিকারই মালিক এক ব্যক্তি। মালিক সেই টম পাওয়েলের সঙ্গে আলাপ হলো সন্ধেবেলা। বেঁটে মোটাসোটা, খুব হাসিখুশি মানুষ। হাসতে হাসতে বলল, 'এটা কেন হয় জানো? প্রথমে আমার একটাই কাগজ ছিল। অন্য কাগজটা আমার নাম করে খুব গালাগালি দিত বলে আমি সেই কাগজটাও একদিন কিনে নিলাম। তারপর ভাবলাম, এ কাগজটার যদি চরিত্র হঠাৎ বদলাই তাহলে পাঠকরা আর নাও পছন্দ করতে পারে। তাই আরো বেশি কড়া ভাষায় আক্রমণ চলতে লাগল। অন্য কাগজটা তার উত্তর দেয়। পাঠকরা সেইজন্য দুটো কাগজই পড়ে।'

এই কাহিনী শুনিয়ে টম পাওয়েলের কী হাসি! লোকটি বেশ রসে-বশে আছে, বোঝা যায়। সন্ধের পর তার বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেল খাবার জন্য। মেরি অবশ্য গেল না। মেরি নাকি সচরাচর বাড়ির বাইরে যায় না। টম পাওয়েলের স্ত্রী জেরিও হৈ চৈ খুব ভালোবাসে। সেই রাত্রে আমাদের সুইমিং পুলে নেমে সাঁতার কাটতে বাধ্য করল। আমার সুইমিং ট্রাঙ্ক নেই, টম পাওয়েলের বিরাট ঢলঢলে একটা ট্রাঙ্ক পরতে বাধ্য হলাম এবং ঝপাং ঝপাং করে হাত পা ছুঁড়ে খুব এক চোট বাঙালি সাঁতার দেখিয়ে দিলাম।

পাওয়েলদের ছেলে নেই, চারটি মেয়ে। পনেরো থেকে সাতাশের মধ্যে বয়েস। চারজনই বেশ সুশ্রী ও চটপটে। পরে জেনেছিলাম, একটি মেয়েও ওদের নিজস্ব নয়, অনাথ আশ্রম থেকে গ্রহণ করা। অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়ে শুনলেই আমাদের চোখে অন্য একটি ছবি ভাসে, ঐ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তরুণীদের সঙ্গে একটুও মেলে না। ওরা চারটিই মেয়ে এনেছে, বিয়ে দেবার চিন্তায় একটুও শুকনো মনে হয় না স্বামী-স্ত্রীকে।

স্টোন সিটি থেকে ফিরে এলাম আড়াই দিন বাদে। পল্ আমাকে আমার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। মেরিও ফিরল আমাদের সঙ্গে, কিন্তু সারাক্ষণ উৎকট গম্ভীর।

ওদের গাড়ি আমাকে আমার বাড়ির দরজার কাছে নামিয়ে দিয়ে গেল। আমার বাড়ি? মাত্র একটা রাত কাটিয়েছি এখানে। তবু যেন বেশ একটা নিজের বাড়ি নিজের বাড়ি ভাব হলো। এর আগে কক্ষনো আমি আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকিনি।

চাবি খুলতে গিয়ে দেখলাম, দরজার পাশে একটা কাগজ গোঁজা। একটা চিরকুট, তাতে লেখা আছে, "আমি পর পর দু'দিন এসে তোমাকে খুঁজে গেলাম। তুমি ফেরার পর আমাকে একবার টেলিফোন করবে? বিশেষ দরকার।" ইতি—এম ম্যাতিউ।

এম ম্যাতিউকে? ঠিক চিনতে পারলাম না। এই ক'দিনের মধ্যে এত লোকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে যে নাম মনে রাখা খুবই শক্ত। হঠাৎ এত সাহেব-মেমের ব্যাপারে কি তাল রাখা যায়? তাছাড়া কে আমাকে অত বিশেষভাবে খুঁজতে পারে?

তক্ষুনি ফোন করলাম। ওপাশে একটি কড়া গলার মহিলার কণ্ঠস্বর শুনে বললাম, 'এম ম্যাতিউর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

উত্তর এলো—এখন না, এক ঘন্টা বাদে ফোন করো।

কট করে লাইন কেটে গেল। রহস্যই রয়ে গেল ব্যাপারটা। কে এই এম ম্যাতিউ?

যাই হোক, সকাল সাড়ে এগারোটা বাজে। আজ তো কিছু রান্নাবান্নার চেষ্টা করতেই হবে। ক'দিন ভাত খাইনি। মনে হয় যেন এক যুগ। শুধু সসেজ-ফসেজ খেয়ে কি আর প্রাণ ঠাণ্ডা হয়? প্রথম দিন বাজার করার সময় চাল কিনে এনেছিলাম। দু' পাউন্ডের প্যাকেট। প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে, ইনসট্যান্ট রাইস, ফুটন্ত গরম জলে এই চাল ফেলে দিলে ঠিক পাচ মিনিটের মধ্যে ভাত হয়ে যায়।

সসপ্যানে গরম জল চাপিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। সত্যিই বেশ চমৎকার যুঁই ফুলের মতন নরম, সাদা ঝরঝরে ভাত হয়ে গেল, ফ্যান গালারও ঝামেলা নেই। এবার? শুধু ভাত তো খাওয়া যায় না। ডাল নেই, মাছ-মাংস নেই, তরি-তরকারি নেই। আগের দিন 'এ এ্যান্ড পি'তে দেখে এসেছি এ সবই পাওয়া যায়। এমনকি বেগুন, ফুলকপি পর্যন্ত চোখে পড়েছিল। কিন্তু আনা হয়নি। এখন বেরিয়ে গিয়ে কিনে আনা যায়, কিন্তু খুব একটা উৎসাহ পেলাম না। আলু আর পেঁয়াজ আছে, তাই ভেজে নেওয়া যেতে পারে। মাখন আছে যথেষ্ট। গরম ভাত, মাখন আর আলু ভাজা—খিদের মুখে রাজা-মহারাজারাও এ রকম খাবার পেলে ধন্য হয়ে যাবে! কতদিন মাখন দিয়ে ভাত খাইনি। ভাবলেই চোখে জল এসে যায়।

আলু কুটতে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠলো। ছুটে গিয়ে ধড়ফড় করে বললাম—হ্যালো।

—আমি মার্গারিট ম্যাতিউ।

ওঃ হো, এ তো সেই ফরাসী মেয়েটি, ডোরির সঙ্গে যে এসেছিল। গলার আওয়াজেই চিনতে পারলাম। ট-গুলো বলে ত-এর মতন, র-গুলো অনেকটা হ-এর মতন।

—আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। কি ব্যাপার বলো তো?

—শোন নীল, তোমাকে বিরক্ত করছি—খুবই দুঃখিত।

—না, না, বিরক্ত কেন হবো?

—তোমার বাড়িতে কি সেদিন আমি একটা বই ফেলে এসেছি? নাও হতে পারে, মানে বইটা খুঁজে পাচ্ছি না, বইটা ক্লাসে পড়াবার জন্য আমার খুবই দরকার লাগে।

—বই, দাঁড়াও দেখছি।

একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল। সোফার পাশে পড়ে গিয়েছিল। আগাগোড়া ফ্রেঞ্চ ভাষায় একটি কবিতার বই।

—হ্যাঁ, পেয়েছি।

—সত্যি? ওঃ বাঁচলুম। বইটা এখানে পাওয়া যায় না, যদি হারাতো—

—আমি কি বইটা তোমাকে কোথাও পৌঁছে দেব?

—না, না, তুমি কষ্ট করবে কেন? আমিই গিয়ে নিয়ে আসব। আমি দু'বার গিয়ে তোমায় পাইনি।

—আমি তিনটের সময় ইউনিভার্সিটিতে যাব, তখন বইটা নিয়ে যেতে পারি।

—ঠিক আছে, হয় সেই সময়, অথবা অন্য কোন সময় আমি গিয়ে...অনেক ধন্যবাদ।

৫

আবার রান্নাঘরে ফিরে এলাম। আলুর খোসা ছাড়াবার পর পেঁয়াজ কুটতে গিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হতে হলো। কিন্তু ভাজব কি দিয়ে। তেল তো নেই! দূর ছাই! এর বদলে তো শুধু আলু সেদ্ধ করলেই হতো। পাঁচ মিনিটে কি আলু সেদ্ধ হয়? আলাদা জলে সেদ্ধ করে নেব? তা হলে আলুগুলো টুকরো টুকরো করলাম কেন? যখন আলুভাজা খাব ঠিক করেছি, তখন খাবই। মাখন দিয়েও তো সবই ভাজা যায়।

আর একটা চ্যাপটা প্যান উনুনে চাপিয়ে খানিকটা মাখন ছেড়ে দিলাম। মাখনটা গলবার সময় দিয়ে আমি পাশের ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরালাম।

তারপর কৌতূহল বশে বইটা একটুমাত্র উল্টেছি, এমন সময় ধোঁয়া ভেসে এলো রান্নাঘর থেকে। দৌড়ে গিয়ে দেখলাম, প্যানের ওপর মাখনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। এত তাড়াতাড়ি? এক মিনিটও হয়নি! আগুনটা দেখে মাথা গুলিয়ে গেল, গ্যাস বন্ধ করার কিংবা প্যানটা নামিয়ে ফেলার কথা মনে এল না, খানিকটা জল ঢেলে দিলাম দূর থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা আগুনের গোল্লা প্যান থেকে লাফিয়ে ছাদের দিকে উঠে গেল। এখানে প্রত্যেকটি ঘরের দেয়ালে ও ছাদে নানান রঙীন ছবি আঁকা ওয়াল পেপার। ওপর দিকটা কালো হয়ে গেল। সারা বাড়িটা কাঠের তৈরি, আগুন লেগে গেলে কি করতাম জানি না। শিরদাঁড়া দিয়ে একটা স্রোত নেমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

প্যানটা কালো হয়ে গেছে। ঘষে ঘষে খানিকটা পরিষ্কার করে আবার চাপালাম সেটাকে। আলু ভাজা খাবই। এবার খুব কম মাখন দিয়ে, গলতে না গলতেই আলুগুলো ছেড়ে দিলাম, তারপর পেঁয়াজ, বেশ জল বেরুতে লাগল, আর ভয় নেই।

রান্না যখন প্রায় শেষের দিকে, তখন দরজায় শব্দ। এবার আর ভুল করলাম না, গ্যাস নিভিয়ে দিয়ে দরজা খুললাম। বাইরে যে একটা দেবীমূর্তি দাঁড়ানো! সেই ফরাসী মেয়েটি। মাথার চুল সেরকম আগোছালো। একটা হালকা নীল রঙের স্কার্ট পরা, গাঢ় নীল রঙের চোখ, এবং অদ্ভুত সরল দৃষ্টি।

সে ঘোষণা করল—আমি চলে এলাম।

—নিশ্চয়ই, এসো, এসো।

দরজা বন্ধ করে মার্গারিটকে ভেতরে বসালাম। তার হাতে একটা বড় প্যাকেট, সেটা টেবলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, 'নিয়ে এলাম তোমার জন্য।'

প্যাকেটের মধ্যে ছ'টা বীয়ারের ক্যান। ধন্যবাদ জানাতে হয়। তাই জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কি বইটার বদলে?'

—না, না, এমনিই। তুমি বইটা পড়েছো?

—এ তো খাঁটি ফরাসী ভাষায়। আমি বুঝব কি করে?

—তুমি অনুবাদে নিশ্চয়ই ফরাসী কবিতা পড়েছো? কার কবিতা তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে?

বাংলায় অনুবাদ আছে বলে নির্ভয়ে বললাম—বোদলেয়্যার।

মার্গারিট মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না, আমার ওঁর কবিতা একটুও ভালো লাগে না। খুব বড় কবি নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার ভালো লাগে না। ও তো নাস্তিক! ওর

কবিতায় বিশ্বাস নেই, ভালোবাসাও নেই। আমার খুব প্রিয় কবি আপোলিনেয়ার। তোমার ভালো লাগে না!'

একটু ঢোক গিলে বললাম, 'হ্যাঁ, ভালোই তো।'

পাশের ঘরে আমার স্বহস্তে রান্না করা খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে, এখন কি কাব্য আলোচনা চলে? কিন্তু মেয়েটিকে তো কিছু বলতে পারি না। বিশেষত আগের দিন দেখেছি, একে সবাই খুব খাতির করে। তার প্রথম কারণ, এর স্বর্গীয় ধরনের সৌন্দর্য। দ্বিতীয় কারণ, জাতে ফরাসী।

ফট ফট করে দুটো বীয়ার ক্যান খুলে ওকে একটা দিয়ে নিজেও নিয়ে বসলাম। ও আমার দিকে একটু যেন কৌতূহলের সঙ্গে তাকাল। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ফ্রান্সে গেছ?'

—শুধু প্যারিস এয়ারপোর্টে কিছুক্ষণ বসে ছিলাম। শহরের ভেতরে যেতে পারিনি।

—কেন?

—পয়সা ছিল না। তবে যাব নিশ্চয়ই। একবার না একবার। জানো, ওখানকার এয়ারপোর্টে যখন বসেছিলাম, ফরাসী নারী-পুরুষদের দেখে মনে হচ্ছিল, এরা নিশ্চয়ই কবি বা শিল্পী। তুমি কি কবি?

মার্গারিট দারুণভাবে হাসতে লাগল। ঠিক যেন ঝর্ণার জলের শব্দ। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'না, না, আমি কক্ষনো এক লাইনও কবিতা লিখিনি। কবিতা লেখা কি সহজ? আমি পড়তে খুব ভালোবাসি। তোমার ধারণা ফরাসীরা সবাই কবি বা শিল্পী? এয়ারপোর্টে তো বেশির ভাগ ব্যবসায়ী কিংবা চোর-ডাকাতরা ঘুরে বেড়ায়!'

একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। নিজের শরীরের দিকে চোখ গেল। চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। কি দারুণ কেলেঙ্কারি করে ফেলেছি। আমি গেঞ্জি ও পাজামা পরে আছি। দরজায় খটখটের পর তাড়াহুড়োতে প্যান্ট-সার্ট পরে নিতে ভুলে গেছি। সাহেব-মেমের সামনে এই পোশাক? শুনেছি, ঠিক মতন সজ্জিত না হয়ে তাদের সামনে এলে তাকে নাকি অপমান করা হয়। ড্রেসিং গাউন-ফাউন একটা না কিনলে আর চলছে না!

এখন কি করব, দৌড়ে পালিয়ে যাব? আস্তে আস্তে বললাম, 'কিছু মনে করো না। আমি রান্না করছিলাম তো, তাই পোশাক পরে নেই!'

পোশাকের কথাটা গ্রাহ্য না করে ও ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'রান্না করছিলে? ইন্ডিয়ান কুকিং?'

যদিও ভাত এবং আলু-পেঁয়াজ ভাজা, তবু ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

—মে আই সি ইট? আমি কখনো দেখিনি!

নিজেই উঠে চলে এল রান্নাঘরে। আলু আর পেঁয়াজ এক সঙ্গে ভাজার জন্য রংটা লালচে হয়ে গেছে। ও জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি?'

কী বলব, ফিংগার চীপস, ফ্রায়েড পটাটো না পটাটো চীপ্‌স? বললাম, 'ফ্রায়েড পোটাটো অ্যান্ড ওনিয়ান!'

রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'মে আই টেসট ইট?'

হাত দিয়ে খানিকটা তুলে নিয়ে খুব সন্তর্পণে জিভে ঠেকাল। তারপর বলল, 'সে ব! সে ত্রে ব! খুব ভালো!'

ডোরি বলেছিল, শনিবার খাওয়াতে গেলে মঙ্গলবার নেমন্তন্ন করতে হয়। এ মেয়েটা যে নিজেই খাবার তুলে খাচ্ছে। সুতরাং একে অনায়াসেই আর একটু বলা যায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি আমার সঙ্গে একটু ভাত খাবে? আগে কখনো ভাত খেয়েছ?'

—খেতে পারি একটু। হ্যাঁ, আগে ভাত খেয়েছি নিশ্চয়ই, কিন্তু কোন ইন্ডিয়ানের নিজের হাতের রান্না তো খাইনি?

ভাতটা তখনো গরম আছে। তার মধ্যে খানিকটা মাখন ফেলে দিয়ে চামচে দিয়ে নেড়ে দিলাম। এই তো ঘি-ভাত হয়ে গেল। দুটো প্লেটে সেই ভাত আর আলু-পেঁয়াজ ভাজা বেড়ে ফেললাম চট করে। রান্নাঘরে কিছু সসার, প্লেট, কাঁটা-চামচ আগে থেকেই ছিল। আমার অবশ্য খুবই ইচ্ছে ছিল হাত দিয়ে খাবার, কিন্তু খাঁটি ফরাসী মেমসাহেবের সামনে কাঁটা ব্যবহার করতেই হলো। যাই হোক, দিব্যি জমল খাবারটা। নিজে রেঁধেছি বলে বলছি না, আলু-পেঁয়াজটা সত্যি দারুণ খেতে হয়েছিল ; নুন দিতে ভুলে গেছি, তাতে কি! নুন তো পরে মিশিয়ে নিলেই হয়!

খাওয়ার শেষের দিকে ঝড় উঠল। হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দ, তারপর পাগলা হাওয়া। মার্গারিট জানলার কাছে দৌড়ে গিয়ে শিশুর মতন কলকণ্ঠে বলল, 'উঃ! কী সুন্দর, কী চমৎকার, এ বছরের প্রথম ঝড়—নীল, তুমি দেখবে এস—'

আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পর্দাগুলো উড়ছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন। উড়ছে মার্গারিটের মাথার চুল, গায়ের জামা, উড়ে যাচ্ছে ওর কথা। বাইরে উইলো গাছগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। ঝাঁক ঝাক পাখির মতন আকাশে উড়ছে অসংখ্য শুকনো পাতা।

মার্গারিট বলল, 'তুমি একটা কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছো? বৃষ্টি আসবার আগে উইলো গাছগুলো এরকম কাঁদে।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাইরের প্রকৃতির চেয়েও এই নারীটিকে আমার আরো বেশি অপরূপ মনে হয়। প্রকৃতি উদ্দাম হয়েছে বলেই এই মুহূর্তে ওর রূপ আরো বেড়ে গেছে। ওর সর্বাঙ্গ ভরা অজস্র খুশি, যেন তার ঝাপটা এসে লাগছে আমার গায়ে।

খানিক পরেই বৃষ্টি নামল। আমার ধারণা ছিল, আসাম বা বাংলাতেই বুঝি সবচেয়ে জোরালো বৃষ্টি হয়। বর্ষা যেন আমাদেরই একচেটিয়া। কিন্তু এখানকার বৃষ্টিও তো কম তীব্র নয়। ঝমঝমে শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। তিনটের সময় ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার কথা ছিল, সে প্রশ্ন আর ওঠে না।

সোফার কাছে ফিরে এসে আর এক জোড়া বীয়ারের ক্যান খুললাম। আমার কানের কাছটায় একটু গরম গরম লাগছে। নিশ্চয়ই বীয়ারের জন্য নয়। এখানকার বীয়ার খুব পাতলা, সহজে নেশা হয় না।

মার্গারিট জিজ্ঞেস করল, 'তুমি সাকোনতালের কথা জানো? আমাকে বলবে?'

—সেটা কি জিনিস?

—সাকোনতাল, তোমাদের দেশের—

—ঠিক বুঝতে পারছি না!

ও তখন ঝর ঝর করে আবৃত্তি করল :

লোপে রইয়্যাল দা সাকোনতাল
লা দা ডাঁকর সা রেজুই
কা ইল লা ব্যাট্রিঙা প্ল পাল...

আমি বললাম, 'ইংরেজি করে বুঝিয়ে দাও!'

—এর মানে—অনুবাদ করা খুব শক্ত...তবে, মানে সাকোনতালের স্বামী, রাজা জয় করতে করতে ক্লান্ত, সত্যিকারের আনন্দ পেলেন যখন দেখলেন তাকে (সাকোনতালকে), প্রতীক্ষা ও ভালোবাসায় ম্লান, আদর করছিল হরিণ শিশুটিকে...

আমি আবিষ্কারের আনন্দে বললাম, 'ও শকুন্তলা! দুষ্মন্ত আর শকুন্তলা!' মার্গারিট উজ্জ্বল ভাবে বলল, 'বুঝতে পেরেছো? আপোলিনেয়ারের কবিতায় আছে...তুমি ওদের পুরো কাহিনীটা জানো?'

আমি হ্যাঁ বললাম। মার্গারিট ব্যগ্রভাবে আমার বাহু ছুঁয়ে বলল 'বলো না! আমাকে বলো ওদের গল্প! কতদিন ধরে আমার জানবার ইচ্ছে, কোথাও পাইনি।'

মহাভারতের নয়, কালিদাসের নাটকের শকুন্তলা-কাহিনী আমি ওকে শোনালাম। মহাভারতের কাহিনীটা তুলনায় অনেক নিরেস। গল্পটা শুনতে শুনতে

মার্গারিট এক সময় কেঁদে ফেলল। যেখানে দুঃখিনী শকুন্তলা গেছে রাজসভায়, রাজা তাকে চিনতে পারছেন না, সপারিষদ বসে কটু ভাষায় তিরস্কার করতে লাগলেন—সেখানে মার্গারিটের চোখ দিয়ে টপ্ টপ করে জল পড়তে লাগল। আমি বুঝলাম, ওর চোখ দুটি আসলে ওর মনেরই দুটি ছোট আয়না।

গল্প শেষ করার পর আমি বললাম, 'তুমি একটু বেশি অভিভূত হয়ে পড়েছিলে।'

—হ্যাঁ, কী নিষ্ঠুর অথচ কী অপূর্ব সুন্দর গল্প!

—তোমার জীবনে কি কখনো এরকম হয়েছে? কেউ ভালোবেসে তোমাকে ভুলে গেছে?

ও অবাক হয়ে বলল, 'না তো। আমায় তো কেউ কখনো সেরকম ভালোবাসেনি। আমি তো ভালোবাসার স্বাদই এখনো জানি না।'

কথা ঘোরাবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমি তোমাকে এত বড় একটা গল্প শোনালাম, এবার তুমি আপোলিনেয়ারের পুরো কবিতাটা আমাকে শোনাও!'

ও বলল, 'নিশ্চয়ই। তুমি শুনবে?'

আপোলিনেয়ারের "লা সাঁর্জো" দ্য মালএইমে" বেশ দীর্ঘ কবিতা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রণয় কাব্যগুলির মধ্যে একটি। মার্গারিট আমাকে খুব যত্ন করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে শোনাতে লাগল : ১৯০৩ সালে যখন আমি ঐখানে গিয়েছিলাম, তখন জানতাম না আমার ভালোবাসা সেই সুন্দর ফিনিক্স পাখির মতো, এক সন্ধেবেলা তার মৃত্যু হলে পরের সকালটিই তার পুনর্জন্ম দেখে...

এমন চমৎকারভাবে কবিতা পড়া আমার জীবনে আগে কখনো হয়নি। ও যেন প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন অত্যন্ত ভালোবেসে উচ্চারণ করছে। যেন এই শব্দগুলির তুলনায় পৃথিবীর আর সব কিছুই মূল্যহীন। শুনতে শুনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। আমার মনটা প্রসারিত হয়ে যেন আমার শরীর ছাড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার দেখা এবং শোনা—এই দুটো জিনিস মিলেমিশে গেছে। আমি শব্দগুলোকে দেখছি, আর এই বালিকার মতন যুবতীর রূপ যেন গানের মতন আমার ভেতরে চলে আসছে।

মাঝে মাঝে সিগারেট ধরিয়ে দেবার জন্য আমাকে উঠে আসতে হচ্ছিল, তাই এক সময় আমি মেঝেতেই ওর কাছাকাছি এসে বসেছিলাম। পুরো কবিতাটা শেষ হয়ে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। দু'জনেই। আমার মনে হলো, এতক্ষণের এই শব্দতরঙ্গ আমাদের দু'জনকে খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছে। আমি মার্গারিটের উরুর ওপর আমার মাথাটা হেলিয়ে দিলাম।

ও সেদিকে স্থির ভাবে তাকাল।

আমার মুগ্ধতা আমি কি ভাবে ওর কাছে জানাব, তা ঠিক করতে পারছিলাম না। সম্পূর্ণ কবিতাটাই যেন ওর অবয়বের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই কবিতাটিকে আরও বেশি উপভোগ করার জন্যই যেন আমার ওকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে হলো।

আমি বললাম, 'এটা আবার একদিন শুনব। মার্গারিট, মে আই কিস ইউ?'

ওর মুখে একটা পাতলা দুঃখের ছায়া ছড়িয়ে পড়ল। আমার মাথাটা সরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ম্লান গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত। আমেরিকান মেয়েরা এতে কিছু মনে করে না বটে, কিন্তু আমি পারব না। আমি মাঝে মাঝে এখানে আসতে পারি, আমরা এক সঙ্গে কবিতা পড়ব, কিন্তু আমার কাছে অন্য কিছু পাবে না।'

আমি তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত গলায় বললাম, 'না, না, তুমি আসবে। আমি আর অন্য কিছু চাই না।'

—তুমি পারবে না।

—নিশ্চয়ই পারব।

—আমি চেয়েছিলাম তোমার বন্ধু হতে, তোমার কাছে এসে অনেক কিছু জানব, কবিতা পড়ব—কিন্তু আমি তো তার বদলে আর কিছু দিতে পারব না।

—আমি সেরকম ভাবে চাইনি!

—বাট ইউ মাস্ট প্রমিস।

—নিশ্চয়ই, আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

—তুমি কিছু মনে করলে না তো? আমি কী তোমাকে আঘাত দিলাম?

—না, না, না।

—সত্যি বিশ্বাস করো, আমি ওসব পারি না। এই যে ছেলেমেয়েদের যখন-তখন শারীরিক আনন্দ, এটা ঠিক আনন্দ নয়—ভালোবাসা ছাড়া কী সত্যিকারের আনন্দ হয়? এরা শরীরকে এত প্রশ্রয় দেয় বলেই শেষ পর্যন্ত ভালোবাসতে শেখেই না।

আমি চুপ করে রইলাম। একটু বাদে বইটা নিয়ে মার্গারিট উঠল। বলল, 'যাই, আমাকে একবার হস্টেলে ফিরতে হবে। আজ আমার ঘর সাফ করার ডিউটি আছে।'

দরজার বাইরে গিয়ে ও আবার বলল, 'আমি কি তোমাকে আঘাত দিলাম?'

ওর চোখ ছলছল করছে। আমি স্বাভাবিক ভাবে বললাম, 'না, না, আমিই বোকার মতন...তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

সিঁড়ির নিচ পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিয়ে এসে আমি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। শরীরে অসম্ভব ছটফটানি! এক একবার মনে হলো, আমি সাঙ্ঘাতিক দোষ করেছি। আবার মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে বঞ্চিত মানুষ।

শেষ পর্যন্ত আমার হতাশা ও গ্লানি শুধু রাগে পরিণত হলো। ইচ্ছে হলো, হাতের কাছে যা পাই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই! আয়নাটা, কাপ, প্লেট, বাসনপত্তর! কি হবে এসব দিয়ে? কেন বোকার মতন মার্গারিটের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে গেলাম? নিজেকে ক্ষমা করব কি করে? ডোরি বলেছিল, অনেকক্ষণ এক সঙ্গে কাটাবার পর কোন মেয়েকে চুমু না খেলে সে দুঃখ পায়। আবার আর একটি মেয়েকে সে কথাটা শুধু উল্লেখ করলেই যে দুঃখ পাবে, তা আমি জানব কি করে? দূর ছাই, এ ছাতার দেশে আর থাকব না।

কি হবে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় পড়ে থেকে!

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম। এই জানলাটা পূব দিকে। এদিকেই তো কলকাতা। কত হাজার মাইল দূরে। তবু আমি জানলা দিয়ে যেন সোজা কলকাতাকে দেখতে পাচ্ছি। সেখানকার বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওদের চোখের ভাষা পর্যন্ত আমি বুঝি, ওরা আমার ভাষা বোঝে। ওখানে আমি জলের মাছ, এখানে কেউ না। চলে যাব, দু'এক দিনের মধ্যেই ফিরে যাব!

৬

দিন দশেকের মধ্যেই অনেক কিছু ধাতস্থ হয়ে গেল। চেনা হয়ে গেল রাস্তাঘাট, কোথায় কোন দোকান। এমনকি প্রতি শনিবার কোন দোকানে রুই মাছ আর ইলিশ-ইলিশ-গন্ধওয়ালা স্যামন পাওয়া যায়, সেটা পর্যন্ত জানা। হ্যালোর বদলে হাই কিংবা হাফ-এর বদলে হ্যাফ বলাও রপ্ত হয়ে গেছে। তবু মনমরা ভাবটা কাটে না।

অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এই ছোট্ট জায়গাতেও বাঙালি আছে পঞ্চাশ-ষাট জন, দুই বাংলার মিলিয়ে। কয়েকজন নিজে থেকেই আমার বাড়ি যেচে আলাপ পরিচয় করে গেছে। একজন তো আমার একেবারে প্রতিবেশী, দু'তিনখানা বাড়ি পরে থাকে, রাধারমণ ব্যানার্জি, চন্দননগরের ছেলে। অতিশয় কট্টর বামুন, কেমিস্ট্রির ডক্টরেট হলেও ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন ভীষণ ভাবে। বাড়ির

বাইরে কোথাও কখনো রান্না করা জিনিস খান না, এক টুকরো মাছ ভাজাও নয়, কারণ কুকিং অয়েলের মধ্যে যদি কোনক্রমে গরু বা শুয়োরের চর্বি মেশানো থাকে, তা হলেই জাত যাবে! উনি কখনো বাসে ওঠেন না, কারণ ভিড়ের সময় মেয়েদের গায়ের সঙ্গে ছোঁয়া লেগে যেতে পারে। মেমদের গায়ে নাকি বিশ্রী ঘামের গন্ধ! যার নাম রাধারমণ, সে যে কি করে এরকম অটলবিহারী হয়, সেটাই বিস্ময়ের। বেস্পতিবার ক্ষুর ছোঁয়ানো নিষেধ বলে উনি বুধবার মাঝ রাত্রে উঠে দাড়ি কামান।

রাধারমণ ব্যানার্জির সঙ্গে আমার কোনদিক থেকেই কিছু মিল থাকার কথা নয়, শুধু বাংলা ভাষা ছাড়া। ওর বাঙালিত্ব আবার সাঙ্ঘাতিক প্রবল, ওর মতে বাঙালিরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, জোর করে তাদের দমিয়ে রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, সত্যজিৎ রায়, ইলিশ মাছ এবং বাঙালি মেয়ে ওর প্রিয় আলোচ্য বিষয়। ভারতী নামে একটি বাঙালি মেয়ে এখানে এসে একটি ক্যানেডিয়ান ছেলেকে বিয়ে করেছে বলে উনি সাঙ্ঘাতিক মর্মাহত, যেন সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠনের মতন একটা ঘটনা!

লোকটি কৃপণ স্বভাবের। সিগারেট বা চায়ের নেশা পর্যন্ত নেই। তবে একটি মাত্র শখ আছে। নিউইয়র্কের একটি পাঞ্জাবীর দোকান থেকে অনেক দাম দিয়ে সর্ষের তেল আনান এবং সারা সন্ধে ধরে অনেক রকম রান্না করেন। বেছে বেছে কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করেও খাওয়ান—যদিও আগে থেকেই বলে দেন, 'আমি কিন্তু ভাই তোমার বাড়িতে কখনো খেতে যাব না, সে ব্যাপারে কিছু মনে করতে পারবে না।' দু একদিন আমাকেও রান্না করে খাইয়েছিলেন বটে, কিন্তু লোকটির সংসর্গ আমি খুব বেশিদিন পছন্দ করতে পারিনি।

পর পর কয়েকদিন বেশ কয়েকজনই আমাকে বলছিল, আমার নাকি মুখটা খুব শুকনো শুকনো। অসুস্থের মতন দেখাচ্ছে। অসুখটার নাম হোম সিকনেস!

রাধারমণ ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ভাইটি, বাড়ির জন্য খুব মন কেমন করছে?'

আমি বললাম, হ্যাঁ দাদা, আর ভালো লাগছে না থাকতে! নেহাৎ দৈব দুর্বিপাকে এখানে এসে পড়েছি!'

অভিজ্ঞভাবে হেসে বললেন, 'হয় হয়, ওরকম হয়। প্রথম একটা বছর এরকম হয়, কিছুতেই মন টেকে না! তারপর যেই একটা বছর পার হয়ে যায়, তখন আর কেউ এসব দেশ ছেড়ে যেতেই চায় না। ভিখিরির মতন মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে, তাও সই!'

—আপনার ক' বছর হলো?

—সাড়ে চার বছর। ঠিক হিসেব করলে চার বছর আট মাস। এরপর কিছুদিন ক্যানাডায় কাটিয়ে আসতে হবে। আমার ভাই সাফ সাফ কথা! পিঁপড়ের মতন টিপে টিপে টাকা জমাচ্ছি, যেদিন এক লাখ ডলার জমবে, সেইদিনই পিঠটান দেব। টাকাটা ব্যাঙ্কে জমিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটাব!

—আমার এক বছরও কাটবে না।

—দেখা যাবে। ওরকম অনেক শুনেছি। প্রথম প্রথম এসে সবাই বলে।

—আমি ফিরবই!

—ঠিক আছে, বাজি রইল!

প্রত্যেকদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখি, আমি দেশে ফিরে গেছি! কফি হাউসে বন্ধুদের আড্ডায় হাজির হয়েছি হঠাৎ। সবাই চেঁচিয়ে উঠেছে, আরে। কিংবা এসপ্লানেড থেকে বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছি ন্যাশনাল লাইব্রেরির দিকে, পকেটে তখনও আমার পাসপোর্ট আর প্লেনের টিকিট।

টেবলের ওপর সত্যিই আমার রিটার্ন টিকিট পড়ে আছে। যে-কোন দিন ফিরে যেতে পারি কলকাতায়। সত্যি যে ঝোঁকের মাথায় চলে যাইনি, তার কারণ পল ওয়েগনার এর মধ্যে আমার একটা নেমন্তন্নের ব্যবস্থা করেছে অ্যারিজোনায়। বেশ দূরের পথ। বেড়াবার নেশা আছে আমার, সেই টানে খানিকটা উত্তেজিত বোধ করি আবার।

মার্গারিটের সঙ্গে দু' তিনবার দেখা হয়েছিল এর মধ্যে। পথে যেতে যেতে হঠাৎ কিংবা ইউনিভার্সিটিতে। যখনই দেখা হয়েছে ও উৎফুল্লভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আমি সেই নরম হাতটা ধরে মৃদু ভাবে বলেছি—ভালো আছ? ওর চোখের দিকে তাকাতে আমার সামান্য অপরাধ-বোধ হয়। মার্গারিট বলেছিল, আবার আমার বাড়িতে কবিতা পড়ে শোনাবার জন্য আসবে! কিন্তু আর আসেনি, আমিও আসতে বলিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দু' একদিন অন্তর কিছুক্ষণের জন্য যাই। বাকি সময়টা ঘরে শুয়ে থাকি। পল ওয়েগনারকে জানিয়ে দিয়েছি যে সেই প্রবন্ধটা লেখার কথা চিন্তা করে যাচ্ছি! লাইব্রেরি থেকে একদিনে সতেরখানা বই এনে সাজিয়ে ফেলেছি ঘর। পড়ার জিনিসের অভাব নেই। তবু নিঃসঙ্গতা কাটে না। পুব দিকের জানলাটার কাছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ঐ দিকে কলকাতা।

ডোরির সঙ্গে এক শনিবার সন্ধেবেলা ডেটিং করা ছিল আগের থেকেই। সেটা রাখতেই হয়। কিন্তু ডেটিং-এর অনুষ্ঠান কি? যাদের গাড়ি আছে তারা চলে যায় খানিকটা দূরের কোন শহরে, সিডার র‍্যাপিডস কিংবা ডেময়নসে। অথবা কোন খোলা মাঠের মুভিতে, যেখানে গাড়িতে বসে বসেই সিনেমা দেখা যায়। সিনেমা

কেউ বিশেষ দেখে না, গাড়ির মধ্যে চুমু আর জড়াজড়িতে কেটে যায়। ডোরি বা আমার গাড়ি নেই। সুতরাং এখানেই রাস্তায় রাস্তায় একটু বেড়ানো, তারপর কোন হোটেলে খেতে যাওয়া। খাওয়ার পর ডোরি বলল, 'চলো, আমার ফ্ল্যাটে চলো, সেখানেই গল্প করা যাবে।'

ডোরির ঘরটা অ্যাটিকে। অর্থাৎ ছাদের ওপর তিনকোণা ঘর। খুবই ছোট। তবু প্রচুর জিনিসপত্র সাজিয়েছে। সোফা নেই, বিছানা পাতা। সেখানেই আমাকে বসার ইঙ্গিত করে বলল, 'বী কমফর্টেবল!'

দেরাজ খুলে ডোরি একটা নতুন ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করল। দুটো গেলাসে ঢেলে বলল, 'মার্গারিট এর মধ্যে তোমার কাছে গিয়েছিল?'

খানিকটা শঙ্কিতভাবে বললাম—হ্যাঁ। মার্গারিট কি ডোরির কাছে কিছু নালিশ করেছে? বলেছে যে ভারতীয়রা কোন ভদ্রতা জানে না? এতকাল গল্প উপন্যাসে পড়ে এসেছি যে ফরাসী মেয়েদের নৈতিক চরিত্র বলে কিছু নেই। তারা যখন-তখন যার-তার সঙ্গে—।

ডোরি বলল, 'মার্গারিট খুব ভালো মেয়ে। বড্ড বেশি ভালো। ও এই পৃথিবীর কোন নিয়ম-কানুন জানে না।'

আমি চুপ করে রইলাম। ডোরি একেবারে আমার গা ঘেঁষে বসে ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিল। ডোরির সেইরকম প্রায় বুক খোলা জামা। গা থেকে দামী পারফিউমের সুগন্ধ ভেসে আসছে। আগে লক্ষ করিনি, ওর পা থেকে ঊরু পর্যন্ত স্কিন-কলার মোজা পরা। ও আমার বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'তুমি এত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছ কেন? রিলাক্স।'

আগের দিন যাকে চুমু খেয়েছি, তাকে আজও নিশ্চয়ই খাওয়া যায়। কিন্তু তারপর কতটুকু? কোন জায়গায় গিয়ে বলবে—ছিঃ, তোমরা ভারতীয়রা ভদ্রতা জানো না!

দু'তিন গেলাস ব্র্যাণ্ডি খেয়ে অনেকখানি জড়তা কেটে গেল। তখন মনে হলো, দরজা-বন্ধ ঘরে বিছানার ওপর পাশাপাশি বসে ব্র্যাণ্ডি খাওয়ার একটাই মানে হতে পারে। নারী-পুরুষের মধ্যে যেটা সবচেয়ে স্বাভাবিক। ডোরিই আমার সঙ্গিনী। ডোরিও তো কম সুন্দরী নয়। শুধু তার মুখে একটা উগ্র বুদ্ধির ছাপ। তার স্বাস্থ্য যতটা উপছে উঠেছে, ততটা কমনীয়তা নেই। তাতে কি আসে যায়! মুখটা ঝুঁকিয়ে আমি ডোরির ঘাড়ে চুমু খেলাম।

ডোরির ডান হাতে সিগারেট ছিল, সেই হাতটা উঁচু করে বগলটা দেখিয়ে বলল, 'এখানে একটা—আই লাভ ইট বেস্ট হিয়ার।'

সেখানে মুখ রেখে দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ডোরি বলল, 'তোমার জ্যাকেটটা খুলে ফেল।'

আর বেশি দূর এগুবার আগেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। ডোরি টেলিফোন ধরে বলল—ইয়া, আছে... নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, খুব খুশির সঙ্গে কাম অন আপ—ফোন ছেড়ে ডোরি বলল, 'এ বাড়ির নিচতলা থেকেই একজন ফোন করছে। ওদের রুজ ফুরিয়ে গেছে—এখন তো দোকান বন্ধ— ওরা ওপরে আসছে, উই'ল হ্যাভ মোর ফান।'

ওরা না আসা পর্যন্ত আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে চুম্বনে নীরব হয়ে রইলাম। তারপর দরজা খুলে দিতে হলো।

ওরা চারজন, দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। রীতিমতন নেশাচ্ছন্ন। পোশাক দেখলেই মনে হয়, দারুণ জড়াজড়ি চলছিল। ডোরি আরো গেলাস বার করল। ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল বিছানায়। আমার সঙ্গে পরিচয় হলো। তারপরই এক একটা ছেলে এক একটা মেয়েকে বুকে নিয়ে বসল। ডোরিও মাথা হেলালো আমার বুকে। এক বোতল ব্র্যাণ্ডি শেষ হয়ে যাবার পর ডোরির দেরাজ থেকে আর একটা বোতল বেরুলো। লজ্জা নামক জিনিসটার কোনো অস্তিত্বই নেই। বরং অপরের চোখের সামনে চুম্বন আলিঙ্গনেই যেন বেশি আনন্দ।

একটা ছেলে হঠাৎ জড়ানো গলায় বলল, স্ট্যাম্প জমাবার মতন ডোরির স্বভাব হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রেমিক সংগ্রহ করা। লাস্ট সেমেস্টারে ডোরির একজন ইজিপশিয়ান প্রেমিক ছিল না? তার আগে একজন স্প্যানিশ, একজন জাপানী, ফিনল্যান্ডেরও একজন ছিল না ডোরি?'

ডোরি হাসতে লাগল। মেজাজটা একটু খিচড়ে গেল আমার। আমি কি একটা ভারতীয় ডাক-টিকিট? কিছুক্ষণ বাদে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আমার বাড়ির সামনে দরজার কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। তাকে দেখে আমি চমকে উঠে বললাম, 'আরেঃ, আপনি আমাকে খুঁজছেন নাকি?'

সে বলল, 'না তো, আমি তো এই বাড়িতেই থাকি! আপনি?'

আশ্চর্য, লোকটিকে আমি আগে থেকেই চিনি, আমাদেরই বিভাগের একজন, পোল্যান্ড থেকে এসেছে। ওর নামের পদবীতে তিনটে জেড থাকায় প্রথমে আলাপ করতে ভয় পেয়েছিলাম। পুরো নাম ক্রিস্তফ জারজেসকি। ওয়ার'শ শহরে অনুবাদকের কাজ করে। এক বছরের জন্য এখানে এসেছে। মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখের চামড়া কোঁচকানো, গলার আওয়াজ ভাঙা ভাঙা, কিন্তু লোকটি মোটেই বৃদ্ধ নয়, বছর ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বয়েস। একই বাড়িতে দু'জনে থাকি, তাও জানি না! ও থাকে ঠিক আমার ঘরের নিচেই।

ক্রিস্তফ বলল, 'ঘরটা বড্ড স্টাফি লাগছে, তাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। এখানে বড্ড লোনলি লাগে। তোমার লাগে না।'

অভ্যেসবশে ডানদিকে ঘাড় হেলালাম। এরা ঘাড় হেলাবার মানে বোঝে না। আমরা যেমন মাদ্রাজীদের দু'দিকে ঘাড় হেলিয়ে 'না' বলার মানে বুঝতে পারি না।

ক্রিস্তফ বলল, 'এস। আমার ঘরে এসে একটু বসবে? হোয়াইট রাম আছে, যদি পছন্দ করো—'

মোহনয়ী নারীর সান্নিধ্য ছেড়ে এসে এখন এই বৃদ্ধ চেহারার লোকটির সঙ্গে আড্ডা। তবু রাজি হলাম। খানিকটা বাদেই অবশ্য বেশ ভালো লেগে গেল। লোকটি বেশ সিরিয়াস ধরনের, বিশ্বসাহিত্য মোটামুটি পড়া আছে, কথাবার্তায় এলোমেলো ভাব নেই।

এর পর ক্রিস্তফের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই ওপরে চলে আসে আমার ঘরে। ও আমারই মতন একাকিত্বের রোগে ভুগছে।

আরিজোনার নেমন্তন্নর পাকা চিঠিটা এখনো আসছে না। রোজই অপেক্ষা করছি। পল ওয়েগনার মাঝে মাঝেই অন্য জায়গায় বক্তৃতা দিতে যায়। আয়ওয়ায় থাকলে প্রায়ই নেমন্তন্ন করে ওর বাড়িতে। অন্যদের বদলে আমাকেই যে বেশি নেমন্তন্ন করে তার কারণ ওর স্ত্রী মেরি এখনো আমার ওপরে রাগ করেনি বা একদিনও মারতে আসেনি। লোকমুখে শুনেছি, মেরির মাথার গোলমাল আছে, কখন কি কাণ্ড করবে তার ঠিক নেই।

পল বুঝে গেছে, বেশি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা আমার স্বভাবে নেই। তাই মাঝে মাঝে জোর করে বড় বড় পার্টিতে নিয়ে যায়। বড় পার্টি আমার বিরক্তিকর লাগে।

ইংরিজি বিভাগের অধ্যক্ষ একটা খুব বড় পার্টি দিচ্ছেন, আমারও নেমন্তন্ন এসে গেছে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, যাব না। ক্রিস্তফ সেদিন সন্ধেবেলা সেজেগুজে এসে বলল, 'কই, তুমি এখনো তৈরি হওনি?'

আমি যাব না শুনে সে রীতিমতন অবাক। প্রায় আমার অভিভাবকের মতন ধমক দিয়ে বলল, 'কেন যাবে না? এর কোন মানে হয়? এই পার্টিগুলোই তো আমেরিকার একটা প্রধান চরিত্র-চিহ্ন। এইসব পার্টিতে লোকজনের সঙ্গে মিশলে এদের ভালো করে চেনা যায়। চলো, চলো, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও!'

অগত্যা যেতেই হলো। বিরাট ব্যাপার, অন্তত শ'খানেক নারী-পুরুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফদের মধ্যে বোধ হয় সকলেই উপস্থিত। ডোরি এবং মার্গারিটকেও দেখলাম।

অতিথিদের বয়েস একুশ থেকে ষাট-পঁয়ষট্টি পর্যন্ত। কিন্তু কারুর সামনেই কারুর কোন আড়ষ্টতা নেই। কেউ এখানে লুকিয়ে মদ বা সিগারেট খায় না। সবাই সবার নাম ধরে ডাকে। এ জিনিসটা তো আমাদের দেশে স্বপ্নেও ভাবা যায় না। অথচ এখানে কেউ তো কারুর প্রতি অসৌজন্য দেখাচ্ছে না।

তিন-চারখানা ঘরে পার্টিটা ছড়ানো। পার্টির দিন এরা গোটা বাড়িটাই উন্মুক্ত করে দেয়। এক-একটা ঘরে এক-এক রকমের আড্ডা। এখানে কেউ কারুকে এড়িয়ে যায় না। একদম কোন অচেনা লোকও সামনাসামনি পড়ে গেলে নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলতে শুরু করে। আমি ডোরি আর মার্গারিট যে ঘরে, সেদিকেই বারবার ঘুরে যাচ্ছিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকে নাচ শুরু করল। আমি দর্শকদের দলে। কিন্তু ক্রিস্তফের খুব উৎসাহ নাচের ব্যাপারে। পুরোনো ইওরোপীয় কায়দায় সে এক-একজন যুবতীর সামনে গিয়ে বাউ করে বলছে—মে আই? মেয়েদের শরীর ছুঁয়ে ও নিঃসঙ্গতা কাটাতে চায়। মুশকিল হচ্ছে এই, বেচারাকে সবাই বুড়ো ভাবছে। মেয়েরা বদলে যাচ্ছে বারবার। তবু ক্রিস্তফ একটুও দমছে না। একবার মার্গারিটকে পেয়ে ওর চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠল। একে সুন্দরী, তার ওপরে ফরাসী। পোল্যান্ডের লোকেরা সবাই কিছু কিছু ফরাসী জানে। ক্রিস্তফ ওর সঙ্গে গড় গড় করে ফরাসীতে কথা বলা শুরু করল, তারপর নাচের অনুমতি চাইল।

একটু বাদে ডোরি এসে বলল, 'এই, তুমি নাচবে না?'

আমি বললাম, 'আমি তো নাচ জানি না!'

—তাতে কি হয়েছে? গোমড়া মুখে বসে আছ কেন? উঠে এস, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।

ডোরি আমার কোন আপত্তিই গ্রাহ্য করল না। হাত ধরে টেনে তুলল। বলল, 'শক্ত কিছু নয়, শুধু বীটটা মিলিয়ে যাবে, আর দেখবে আমি কি রকম পা ফেলছি।'

আনাড়ির মতন কয়েকবার ডোরির পা মাড়িয়ে দিলাম। অনেকবার এমনভাবে জড়াজড়ি হয়ে গেল, যেন মনে হবে আমি ইচ্ছে করেই করছি। ডোরি তবু আমাকে স্তোক দিয়ে বলতে লাগল, 'ঠিক আছে, এতেই হবে, এই তো হচ্ছে, তোমার হাতটা আমার কোমরের কাছে দাও—'

দেখলাম, অল্প দূরে ক্রিস্তফ নাচছে মার্গারিটের সঙ্গে। কেন যেন বুকের মধ্যে জ্বালা করতে লাগল। এর মানে কি? আমিও তো আরেকজনের সঙ্গে নাচছি! তবু আমার হিংসে হবে কেন?

রাত দুটো বাজে, পার্টি তখনও সমান উৎসাহে চলছে। মনে হয় সারা রাত চলবে। আমার পক্ষে আর বেশিক্ষণ থাকা বিপজ্জনক। রন কুলিজ নামে একটি ছেলে আমার হাতের গেলাস খালি দেখলেই বার বার জোর করে হুইস্কি ভরে দিচ্ছে। মাথাটা বেশ টলটলে লাগছে, আর একটুতেই বেশি নেশা হয়ে যাবে। সে ব্যাপারে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। বড় পার্টিতে কারুর মাতাল হয়ে পড়া রীতিমতন নিন্দনীয় অপরাধ। আগে আমার ধারণা ছিল আমেরিকান মাত্রই বদ্ধ মাতাল। এখানে এসে দেখছি, যে-কোন পার্টিতে শতকরা অন্তত ত্রিশজন লোক অ্যালকোহল স্পর্শ করে না। সামাজিকভাবে মদ্যপান এখানকার সভ্যতার একটা অঙ্গ হলেও যে-কোন মাতালকে সবাই ঘৃণা করে। ছোটখাটো নিজস্ব আসরে যা খুশি চলতে পারে—বড় বড় পার্টিতে একটা সীমারেখা থাকেই।

কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লাম। একটু বাদে পেছনে পায়ের শব্দ। একটি মেয়ে আসছে। মার্গারিট। ওর জন্য অপেক্ষা করলাম, কাছে আসবার পর বললাম, 'তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে?'

মার্গারিট বলল, 'কাল ভোরবেলা আমাকে চার্চে যেতে হবে! কিন্তু তুমি এলে কেন?'

—আমার আর ভালো লাগছিল না।

—আমারও না।

—চল, তোমাকে পৌঁছে দি।

—আমাকে পৌঁছে দেবে? কিন্তু আমি যে অনেক দূরে যাব।

—কেন, হস্টেলে ফিরবে না?

—না। আমি অনেকদিন ধরে বব্ বাকল্যান্ডদের বাড়িতে থাকছি। ওরা সল্টলেক সিটিতে গেছেন তো, আমি বাড়ি পাহারা দিচ্ছি।

আমি হেসে উঠে বললাম, 'রাত দুটো পর্যন্ত তুমি বাইরে, তাহলে কীরকম বাড়ি পাহারা দিচ্ছ?'

মার্গারিট বলল, 'পাহারা মানে কি? ওদের একটা কুকুর আছে, সেটাকে খাবার দেওয়া, সকালবেলা একজন লোক বাগানে জল দিতে আসে, তাকে গেট খুলে দেওয়া। এখানে চুরি তো হয় না। আমি প্রায় দেড় বছর আছি তো, কোনদিন কোন বাড়িতে চুরির কথা শুনিনি। এরা এসব ছোটখাটো ব্যাপারে মাথা ঘামায় না—ব্যাঙ্ক ডাকাতি, হাইজ্যাকিং বা কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারেই চোর-ডাকাতরা ব্যস্ত।'

—তবু একদম ফাঁকা বাড়িতে তুমি একলা থাক, তোমার ভয় করে না?

—না, ভয় কি!

দারুণ নির্জন রাস্তা। বব বাকল্যান্ডের বাড়ি প্রায় দু'আড়াই মাইল দূরে। একবার পৌঁছে দেব বলেছি। দূরত্বের কথা শুনে তো পিছিয়ে আসা যায় না! এই গভীর রাত্রে এতখানি নির্জন রাস্তা এই মেয়েটি একা যাবে ভেবেছিল! চুরি না হলেও নারীহরণের ঘটনা এখানে সুবিদিত। ফাঁকা রাস্তায় একলা মেয়ে দেখলে যখন-তখন কোন গাড়ি তাকে জোর করে তুলে নেয়। তারপর কিছু দূর গিয়ে মেয়েটাকে একেবারে ছিবড়ে করে কোন ফাঁকা জায়গায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে যায়। অধিকাংশ সময়েই মৃত অবস্থায়। বললাম—চল—

—তুমি আবার অত দূর থেকে একা ফিরবে?

—তাতে কি হয়েছে?

দুজনে রাস্তার খুব ধার ঘেষে হাঁটতে লাগলাম। মাঝে মাঝে দু'একটা অতিকায় ট্রাক এমন উল্কার বেগে ছুটে যায় যে, সামনে কোন হাতি পড়লেও বোধহয় গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে।

কিছু দূর গিয়ে বললাম, 'তুমি বুঝি প্রতি রবিবারে চার্চে যাও!'

মার্গারিট হেসে বলল, 'না! যাওয়া উচিত, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না। আমার বাবা মা জানতে পারলে খুব শকড হবেন। জানো তো আমরা রোমান ক্যাথলিক। আমাদের পরিবার বেশ গোঁড়া, আমার দু' বোন নান হয়েছে। আমার ছোটবোন জান তো মাত্র গত বছর কনভেণ্টে যোগ দিল। শুধু আমিই বাইরে—আমি ততটা ধার্মিক হতে পারিনি!'

—তোমার কোন ভাই নেই?

—একজন দাদা ছিল, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার-এ মারা গেছে। রেজিস্টান্স মুভমেণ্টে ছিল।

—ও।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ হাঁটতে লাগলাম। সামনেই আয়ওয়া নদীর ব্রীজ। ছোট নদী, কিন্তু ব্রীজটা বেশ চওড়া। ব্রীজ পেরুলেই জাতীয় হাইওয়ে। আমরা ডান দিকে যাব। যত দূর দেখা যায় সোজা রাস্তা। দু' পাশে উঁচু উঁচু গাছ। অবিরল পাতা খসে খসে পড়ছে। বাতাসে রীতিমতন শিরশিরে ভাব। শীত এসে গেল বলে। কোটের তলায় একটা সোয়েটার পরে আসা উচিত ছিল, টাই বিসর্জন দিয়েছি বলে আরো ঠাণ্ডা লাগছে।

মার্গারিট বলল, 'তুমি কিন্তু বড় কম কথা বলো!'

—তুমিও তো!

—আমি কি বলব! আমি তো তোমার দেশ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। যদিও জানতে ইচ্ছে করে—

—আচ্ছা মার্গারিট, তুমি তোমার দেশ ছেড়ে এত দূরে পড়তে এসেছ কেন?

—ব্যাপারটা খুব হাস্যকর, তাই না? আমি ফরাসী ভাষায় পোস্ট ডক্টরেট করছি, তা তো সোরবোনেই করা উচিত ছিল, আমেরিকায় ছোট একটা জায়গায় কেন? কিন্তু সোরবোর্নে পড়ার মতন টাকা কোথায়? আমার বাবা তো রিটায়ার্ড! আমেরিকায় অনেক স্কলারশিপ পাওয়া যায়, তাছাড়া এরা এ্যাসিস্ট্যান্টশিপও জোগাড় করে দেয়, যেমন আমি গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে পড়াচ্ছি, আরো ছোটখাটো কাজ করি, খরচ উঠে যায়। তাছাড়া এখানকার ফরাসী ডিপার্টমেন্টটা কিন্তু সত্যি ভালো। প্রফেসার আসপেলের খুব নাম আছে।

—তুমি ইংরিজি শিখলে কোথা থেকে? ফরাসীরা তো ইংরিজি ভাষাকে খুবই অবজ্ঞা করে শুনেছি।

—তা করে! বোকার মতন করে। আমি ছেলেবেলায় প্রায়ই লণ্ডনের কোন ইংলিশ ফ্যামিলিতে গিয়ে থাকতাম—তাদের বাচ্চাদেব ফরাসী শেখাবার জন্য। আমারও ইংরিজিটা মোটামুটি শেখা হয়ে গেছে। এবার তোমার কথা বলো!

হাসপাতাল ভবনটির পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম কথা বলতে বলতে। এ পর্যন্ত একজনও পথচারীর সন্ধান আমরা পাইনি। এতখানি রাস্তা এই মেয়েটা একা একা হেঁটে আসত কি করে? কথা বলতে বলতে তবু সময় কাটে এবং পথ ফুরোয়।

বব বাকল্যান্ডের বাড়ি পৌঁছে গেছি। বাড়িটা খুব বড় না হলেও বাগানটা দেখবার মতন। চারপাশে ফাঁকা। পেছন দিকে অনেকগুলি বড় বড় ঝাউ গাছ। তার ফাক দিয়ে দেখা যাচ্ছে খুব চেনা একটা চাঁদ। চাঁদের ধূসর আলোয় বাড়িটা দারুণ গম্ভীর আর নিঃসঙ্গ মনে হয়। এই বাড়িতে এই সরল মেয়েটা একা থাকবে। এরা সব পাবে।

শুভরাত্রি বলবার বদলে বললাম—বঁ নুই!

ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ফরাসী জানো?'

হেসে উত্তর দিলাম, 'একটা-আধটা শব্দ কে না জানে?'

—কিন্তু আমি তো বাংলা একটা অক্ষরও জানি না!

—বাংলা তো অনেক অজানা ভাষা!

—মোটেই না। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর আমি এনসাইক্লোপিডিয়া দেখেছি। ফরাসী যত লোকেরা মাতৃভাষা, তার চেয়েও অনেক বেশি লোক বাংলায় কথা বলে। ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষায় কনিষ্ঠা কন্যার নাম বাংলা। তোমাদের ভাষায় এক কবি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

—তুমি তো অনেক কিছু জেনে ফেলেছ দেখছি। তুমি রোম্যাঁ রলাঁর লেখা পড় নি?

—কে?

—রোম্যাঁ রলাঁ?

মার্গারিটের মুখে সাকোনতাল শুনে আমার যে অবস্থা হয়েছিল, ওরও অবস্থা অনেকটা তাই। একটু চিন্তা করে বলল, 'ও, তুমি হোম্যাঁ হুলাঁর কথা বলছ? কেন, কি হয়েছে?'

—উনি আমাদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর জীবনী লিখেছেন।

—হ্যাঁ, একটু একটু শুনেছি বটে। তুমি পাগল হয়েছ! হোম্যাঁ হুলাঁর লেখা এখন কেউ পড়ে? জাঁ ক্রিস্তফই এখন পড়া যায় না! উনি তো এক পম্পাস পাদ্রি।

রাত অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তবু ওর সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আর কেউ জেগে নেই এখন।

—তুমি আমাকে একটা অন্তত বাংলা কথা শিখিয়ে দাও না!

—কোন কথাটা বলো?

—আমুর। লাভ!

—ওর বাংলা হচ্ছে ভালোবাসা।

মার্গারিট তিন চারবার উচ্চারণ করলো—বা-লো-বা-শ্যা! ওর পাতলা ঠোঁটে ঐ শব্দটা কী মধুর শোনায়! কিন্তু আর নয়। এরকমভাবে রাত কেটে যাবে। বললাম, 'এবার আমি চলি!'

ও বলল, 'তোমাকে এতটা রাস্তা এখন একলা ফিরতে হবে! চল, আমি তোমাকে আবার একটু এগিয়ে দিয়ে আসি!'

—না, না, না!

—চল না, একটুখানি!

খানিকটা পথ গিয়েই আমি থেমে পড়ে বলি—ব্যাস, আর না। ও বলে, আর একটুখানি, আর একটু। দেখতে দেখতে অনেকটা চলে এল। তখন আমি দৃঢ়ভাবে বললাম—না, আর কিছুতেই না! তা হলে আমি যাব না।

মার্গারিট হেসে বলল, 'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা!'

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল— অ রেভোয়া!

আমিও ওর হাত চেপে ধরে বললাম—অ রেভোয়া!

তবু এখানেই শেষ হলো না। আমার হাতটা ছুঁয়েই মার্গারিট বলল, 'ইস, তোমার হাতটা কি ঠাণ্ডা! নিশ্চয়ই তোমার খুব শীত করছে। এতক্ষণ বলোনি কেন?'

—না, না, এমন কিছু না।

—হ্যাঁ, এমন কিছু! তোমার হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ওর গলায় একটা সিল্কের স্কার্ফ বাঁধা। সেটা ঝট করে খুলে দিয়ে বলল, 'তুমি এটা নিয়ে যাও!'

—না, দরকার নেই, সত্যি বলছি দরকার নেই!

—তুমি বুঝতে পারছ না। এই সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যায়!

—কিন্তু তুমি যে আবার এতটা পথ ফিরবে, তোমার যদি ঠাণ্ডা লাগে?

—আমার কিছু হবে না।

·তা হতে পারে না। এক কাজ করা যেতে পারে। তোমাকে আমি আবার বব্ ধোকল্যান্ডের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি। ততক্ষণ তুমি এটা পরে থাক, তারপর আমি নিয়ে যাব।

—তাতে কি লাভ হবে? তোমার আরো বেশিক্ষণ ঠাণ্ডা লাগবে।

মার্গারিট আমার কথা না শুনলেও আমি ওর হাত ধরে টানতে লাগলাম। ওকে দিয়ে আসবই আবার বাড়ির কাছে।

ঘ্যাচ করে একটা গাড়ি এসে আমাদের কাছাকাছি থামল। নির্জন রাস্তায় প্রায় শেষরাত্রে আমি একটি তরুণীর হাত ধরে টানছি—এ দৃশ্য রোমাঞ্চকর নিশ্চয়ই! আমি কাঠ হয়ে দাড়ালাম। ওদের কাছে সব সময় বন্দুক পিস্তল থাকেই, কী করে আমি আমার সঙ্গিনীকে রক্ষা করব!

গাড়িটা আসলে পুলিশ পেট্রল। মুখ ঝুঁকিয়ে একজন মার্গারিটকে জিজ্ঞেস করল, 'এনি ট্রাবল, কিড?'

ফরাসী বিপ্লবের উত্তরাধিকারীরা কোন কর্তৃপক্ষকে সহজে সহ্য করে না মনে হলো। মার্গারিট ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'নো ট্রাবল! ইউ গো টু হেল!'

মেয়েটার সাহস দেখে আমি চমৎকৃত। মার্কিনী পুলিশ ট্রিগার-হ্যাপি হিসেবে কুখ্যাত। তাদের মুখের ওপর এমন কথা! আমার মুখের ওপর একজন টর্চ ফেলল। ভয়ে আমার ভেতরটা শিরশির করছে। আমি শ্বেতাঙ্গ নই, এটাই যদি আমার প্রধান অপরাধ হয়! কালো লোক হয়ে আমি একটি শ্বেতাঙ্গিনীর হাত ধরে টেনেছি!

এবার মার্গারিটই আমার হাত ধরে ঝটকা টান দিয়ে বলল, 'চলো!'

পুলিশের গাড়িটা তবু কুকুরের মতন আমাদের পেছনে পেছনে আসতে লাগল।

আবার মার্গারিটই দাঁড়িয়ে পড়ে বকুনি দিয়ে ওদের বলল, 'হোয়াই ডোন্ট য়ু লীভ আস অ্যালোন?'

এবার গাড়িটা ভোঁ করে চলে গেল। আমি মি ন করে বললাম, 'তোমার তো খুব সাহস!'

মার্গারিট বলল, 'তুমি জানো না, ওদের একদম পাত্তা দিতে নেই। কেন, তুমি কি ওদের ভয় পাও নাকি?'

—আমার একটু একটু ভয় করছিল। কারণ আমি কালো লোক।

—ছিঃ, ও কথা বলতে নেই!

আবার আমরা হাঁটতে হাটতে সেই বাড়ির সামনে পৌঁছোলাম। ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে রইলাম, তারপর বললাম, 'আগে তুমি গেটের মধ্যে ঢোক, তারপর আমি যাব।'

ভেতরে ঢুকে ও গেটে ভর দিয়ে দাঁড়াল। আমি ওর চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলাম, তারপর বললাম, 'আজ রাতটা খুব সুন্দর কাটল।'

—আমারও।

ওর হাতটা একবার ছুঁয়েই আমি হাঁটতে লাগলাম পেছন ফিরে। স্কার্ফটা জড়িয়ে নিলাম গলায়। তাতে একটা ক্ষীণ গন্ধ। সেই গন্ধটা যেন আমাকে আদর করছে।

মুখ ফিরিয়ে একবার দেখলাম। মার্গারিট এখনো দাঁড়িয়ে আছে। সাদা বাড়িটার পটভূমিকায় যেন এক দেবদূতী। হাত তুলে নাড়ল একবার।

আমার মনে এক বিজয়ীর আনন্দ। আমি পেরেছি। আজ আমি ঠিক পেরেছি। এই নির্জন রাস্তায়, এমন নিশুতি রাত্রে এতক্ষণ আমি একজন রূপসী নারীর পাশে ছিলাম, তবু আমি সংযম ভাঙিনি। শুধু একটু হাতের স্পর্শ, আর কিছু না।

গলার স্কার্ফটায় হাত বুলোতে বুলোতে বাকি রাস্তাটা প্রায় দৌড়ে চলে এলাম। বাড়িতে এসে জুতো খুলেই শুয়ে পড়লাম বিছানায়। বিছানাটা কী ঠাণ্ডা!

৭

দু'চারদিনের মধ্যেই অ্যারিজোনার নেমন্তন্নর চিঠিটা এসে গেল। সঙ্গে প্লেন ভাড়া। যেতে হবে আরিজোনার টুসন শহরে। বানান অনুযায়ী মনে হয় টাকসন, কিন্তু আসল উচ্চারণ টুসন্। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা আর কিছু অনুবাদ কবিতা পাঠ করতে হবে। বক্তৃতাটা এলেবেলে, বেশি করে কিছু অনুবাদ কবিতা পড়ে দেওয়া যেতে পারে। থাকার ব্যবস্থা ওরাই করবে।

পল্ ওয়েগনার বলল, 'তুমি যদি প্লেনের বদলে বাসে যাও তাহলে কিছু টাকা বাঁচিয়ে আরো কয়েকটা জায়গা ঘুরে আসতে পারবে।'

সে তো আমি আগেই ভেবে রেখেছি। অ্যারিজোনা রাজ্যটি আমেরিকার প্রায় দক্ষিণ উপকূলে, আমি আছি মধ্য-দক্ষিণে, সুতরাং অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরে আসা যাবে। ব্যাঙ্ক থেকে আমার বাকি টাকাকড়ি সব তুলে নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লাম।

সোজা গন্তব্যের দিকে যাওয়ার বদলে একটু এঁকেবেঁকে যাওয়াই আমার স্বভাব। প্রথমেই বাস ধরে চলে গেলাম শিকাগোতে। বাসগুলোর নাম গ্রে হাউন্ড। গর্জন করে পথ চলে। ভিড়ভাট্টার প্রশ্নই নেই, যতগুলো সীট, সেই ক'টা যাত্রী। এবং সীটগুলো ঠিক এরোপ্লেনের মতনই, এমনকি হাতলের সঙ্গে লাগানো অ্যাশট্রে পর্যন্ত। বেশির ভাগ বড় শহরেই এইসব বাসের স্টেশন আছে মাটির নিচে, প্রায় রেল স্টেশনের মতনই জমজমাট জায়গা।

হিটলার জার্মানির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপায় হিসেবে সারা দেশ জুড়ে অটোবান বা বড় বড় রাস্তা বানিয়েছিলেন। এখন রাস্তা নির্মাণে আমেরিকানরাও দারুণ মনোযোগী। সারা দেশ জুড়ে বিরাট বিরাট রাস্তা এবং আশ্চর্য মসৃণ। কোন কোন রাস্তায় চারটি করে লেন, কোন গাড়ি সত্তর মাইলের কম গতিতে গেলেই পুলিশে ধরে। নিউ ইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত তিন হাজার মাইলের রাস্তায় গাড়ি একবারও থামবার দরকার নেই, লেভেল ক্রসিং বা চৌরাস্তায় ট্রাফিক আলোতেও দাড়াতে হয় না, সেসব জায়গায় রাস্তাটা হয় ছাদে উঠে গেছে অথবা মাটির তলায় ডুব মেরেছে। যে-কোন ছোটখাটো শহর বা গ্রামেও একই রকম পাকা রাস্তা। অবশ্য অধিকাংশ সেতু পেরুবার সময়েই ট্যাক্স দিতে হয়। সেই ট্যাক্সের টাকায় ক্রমাগত তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সেতু বা রাস্তা।

এদেশের খাদ্য চলাচল করে প্রধানত ট্রাকে। ট্রাকের জিনিসপত্র অবশ্য তেরপল মোড়া নয়। অনেক ট্রাকের খোলই এয়ার কণ্ডিশানড, অথবা সেখানে ডিপ ফ্রিজ বসানো, যাতে মাছ-মাংসও টাটকা থাকতে পারে। এক-একটা রাজ্য এক-এক রকম খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্ব নিয়েছে। কোথাও হচ্ছে শুধু গম, কোথাও শুধু কমলালেবু, কোথাও পোলট্রি। এইজনাই ক্যালিফোর্নিয়ার ডাকনাম অরেঞ্জ স্টেট, আয়ওয়ার ডাকনাম কর্ন স্টেট। সরকার পরীক্ষা করে খাঁটি বলে নির্দেশ না দিলে কোনো খাদ্যই বাজারে আসতে পারে না—এবং সারা দেশে সব জায়গায় খাদ্যের এক দাম। উত্তরপ্রদেশ থেকে সস্তা দামে সর্ষে কিনে কলকাতার বাজারে বেশি দামে বিক্রি করার কায়দা এদেশে অচল। এখানে গরিব ও বড়লোকের প্রভেদটা অত্যন্ত প্রকট। গরিব অত্যন্ত গরিব এবং বড়লোকেরা যাচ্ছেতাই রকমের

বড়লোক। তবে, আমাদের দেশের সঙ্গে তফাত এই যে, গরিব আর বড়লোকদের দৈনন্দিন খাবারদাবার প্রায় এক। বড়লোকরা শুধু একটা ছবি কেনবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কিংবা নিজস্ব এরোপ্লেনে চেপে ফুটবল খেলা দেখতে যায়। কিন্তু অত্যন্ত গরিবও দু'বেলা মাংস রুটি খেতে পায়। এদেশে কিছু ভিখিরিও আছে, কিন্তু তাদের গায়ে অটুট ওভারকোট এবং তাদের রান্নাঘরে রেফ্রিজারেটর থাকে। পরে এক সময় আমি ঐরকম একজন ভিখিরির ঘরে কয়েকদিন ছিলাম।

আর একটা মজার ব্যাপার এই যে, বাসে, ট্রেনে কিংবা সিনেমা হলে গরিব আর বড়লোককে পাশাপাশি বসতেই হবে। ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাসের ব্যাপার নেই কোথাও। উত্তরের রাজ্যগুলিতে অন্তত, নিগ্রো আর শাদারাও পাশাপাশি বসতে বাধ্য।

আমেরিকানরা নিজেদের দেশে এরকম অনেক বিষয়ে সমতা বজায় রাখলেও বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবসা করার সময়ে তারা একেবারে নৃশংস। অস্ট্রেলিয়া, কানাডায় গমের উৎপাদন একটু কম হলেই সে বছর তারা সারা পৃথিবীর গমের বাজারে যেমন খুশি দর বাড়ায়। সেনেটর ফুলব্রাইট একবার অভিযোগ করেছিলেন যে, আমেরিকান ওষুধ ব্যবসায়ীরা ভারতে অন্তত চারশো গুণ বেশি দামে ওষুধ বেচে।

দুপুরে শিকাগোতে এসে পৌঁছোলাম। প্রথমদিন এই শহরে এসেছিলাম প্রায় ভিখিরির মতন। এবার তার শোধ নিতে হবে। যাকে বলে ডাউন টাউন অর্থাৎ শহরের কেন্দ্রস্থলে সাউথ ওয়াবাস এভিনিউতে একটা ভালো হোটেলে উঠলাম, এবং কথায় কথায় ট্যাক্সি। যতদিন পয়সা থাকে নবাবী করা যাক না একটু! সব সময় টিপে টিপে পয়সা খরচ করলে একটা মানসিক দৈন্য এসে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক পাশে নিউ ইয়র্ক আর অন্য দিকে লস এঞ্জেলিস পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে সব সময়। মাঝখানে শিকাগো বসে আছে এক দৈত্যের মতন। মাফিয়াদের ঘাঁটি। এককালে বিখ্যাত দস্যু আল কাপন এই শহরটাকে পায়ের তলায় রেখেছিল। আবার নিগ্রো গুণ্ডাদের সংখ্যাও কম নয়। প্রথম রাত্রেই একটি নাইট ক্লাবে আমার চোখের সামনে কয়েকজন নিগ্রোর মধ্যে ছুরি মারামারি হয়ে গেল। শিকাগোর জ্যাজ বাজনা বিখ্যাত, তাই শুনতে গিয়েছিলাম, শেষকালে দৌড়ে পালাবার পথ পাই না!

দু'তিন দিন থাকার পরেই শিকাগোর বৈচিত্র্য অনেক কমে যায়। পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলো খুব একটা আলাদা নয়। পার্ক স্ট্রিটকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পাঁচ গুণ করতে পারলেই শিকাগোর রাস্তা হয়ে যায়। এত বড় সুন্দর পার্ক অবশ্য কলকাতায় নেই, কিন্তু দিল্লিতে আছে। লেক মিসিগান দেখলে সমুদ্রের কথাই মনে

পড়ে। অন্যান্য চাকচিক্যও দু'দিনে পুরোনো হয়ে যায়, যেমন পঞ্চাশতলা মোটর গ্যারেজ কিংবা দোকানের ম্যাজিক ডোর—দরজার সামনে দাঁড়ালেই আপনাআপনি দরজা খুলে যাওয়া, কিংবা আকাশের গাছে আলোয় বিজ্ঞাপন। চুম্বক ছাড়া আর কোন বস্তুরই দীর্ঘস্থায়ী আকর্ষণ থাকতে পারে না। শেষ পর্যন্ত থাকে মানুষ। এবং শহুরে মানুষ কোথাও খুব আলাদা নয়।

শিকাগোর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার ন্যাশনাল মিউজিয়াম। সেটা গোটা একদিন ধরে ঘুরে দেখে পরদিনই কেটে পড়লাম সেখান থেকে।

আবার যে-কোন জায়গায় বাস ধরলেই হয়। তবে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম অ্যালাবামা, জর্জিয়া, মিসিসিপির রাস্তার দিকে কিছুতেই যাব না। কালো লোক বলে যদি কেউ মাথায় চাটি মারে কিংবা কোন দোকানে ঢুকতে না দেয়, তবে সেই দণ্ডেই এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে! প্রায়ই কাগজে এরকম ঘটনা পড়ি।

বাস ধরে চলে এলাম ক্যানসাস সিটি। তারপর উইচিটা। তারপর আরক্যানসস। এক একদিন এক এক জায়গায়। এও যেন সাঁওতাল পরগণায় ঘুরে বেড়াবার মতনই। তফাৎ এই যে, সব জায়গাতেই একই রকম আরামদায়ক হোটেল। ঘুরতে ঘুরতে আলবকার্কে শহরে এসেই একটু অন্যরকম লাগল। এখানে রাস্তাঘাটে অনেক রেড ইন্ডিয়ান দেখা যায়। পালকের মুকুট পরা নয় অবশ্য, সাধারণ প্যান্ট-সার্ট পরাই, তবু দেখলে চেনা যায়। শুনলাম, কাছেই কোথাও ওদের এনক্লেভ আছে, অর্থাৎ ওদের জন্য আলাদা করা নির্দিষ্ট জায়গা—হলিউডের ফিলম কোম্পানিগুলো ছবি তুলতে এলে ওরা মুখে লাল রং মেখে মাথায় পালকের মুকুট পরে নেয়।

ইতিমধ্যে বাসে বা হোটেলে আমি অন্যদের কাছে পরিচয় দেবার সময় নিজেকে ইন্ডিয়ান বলা ছেড়ে দিয়েছি। কেউ বোঝে না। এখানে স্পষ্ট করে বলতে হয়, কামিং ফ্রম ইন্ডিয়া, ক্যালকাটা। শুধু ইন্ডিয়ান বললে এখন আমেরিকার আদিবাসীদেরই বোঝায়। রেড শব্দটা উঠে গেছে। উচ্চারণটা অবশ্য একটু আলাদা, ইন্ডিয়ান নয়, ইনজান! কী অবস্থা সে বেচারিদের! ভূতপূর্ব জমিদার যদি বাড়ির দারোয়ান হয় সেই রকম। কলকাতা সমেত তিনখানা গ্রাম সাবর্ণ রায় চৌধুরীরা বেচে দিয়েছিল মাত্র তেরোশো টাকায়। সেইরকম নিউ ইয়র্ক নামের উপদ্বীপটিও ইন্ডিয়ানরা সাহেবদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল মাত্র ছাব্বিশ ডলারে।

কাছেই মেক্সিকো। আমেরিকার একটি রাজ্যের নামও নিউ মেক্সিকো। এখানে স্প্যানীশ ভাষাও বেশ চলে। রেড ইন্ডিয়ান আর স্প্যানীশদের মিশ্রণে এখানে একটি সংকর জাতি তৈরি হয়েছে। তাদের চেহারা অনেকটা আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের

মতন। রাস্তাঘাটে অনেকে আমার দিকে তাকিয়ে গড়গড় করে কী যেন বলতে শুরু করে দেয়, আমি এক বর্ণ বুঝি না। আমাকে বোকার মতন চুপ করে থাকতে দেখে তারা জিজ্ঞেস করে—স্প্যানীওল : স্প্যানীওল? ওরা আমাকে জাতভাই ভেবেছে। আমি ঘাড় নেড়ে বলি—নো, ইংলিশ। আই আন্ডারস্ট্যান্ড ওনলি ইংলিশ। কেউ কেউ তখন বেশ রাগতভাবে তাকায়। ছাপরা জেলার কোন লোক যেন কলকাতায় এসে বাবু সেজে জাত-ভাইদের চিনতে পারছে না।

মেক্সিকো ঘুরে আসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমার ভিসা নেই। ভিসা অফিসে গিয়ে শুনলাম, ওদিকে যেতে পারি বটে, কিন্তু এদিকে আর ফিরতে পারব না। ওখান থেকেই বাড়ি যেতে হবে। সুতরাং যাওয়া হলো না। নোগালিস নামে একটা শহরের অর্ধেকটা আমেরিকায়, অর্ধেকটা মেক্সিকোতে। সেই শহরেই একদিন ঘুরে বেড়িয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটালাম। এ যেন শুধু ফুনট-শুলিং গিয়ে ভুটান দেখে আসা।

নোগালিস শহর থেকে আর বাস নয়, প্লেনে চাপলাম। কারণ টুসন-এ আসল নিমন্ত্রণ-কর্তারা আমাকে বিমান বন্দর থেকে নিতে আসছে। এইভাবে তাদের চোখে ধুলো দেওয়া। আমি যেখান থেকেই যাই না কেন, প্লেন থেকে নামলেই তো হলো।

বিমানবন্দরে দেখলাম জাদরেল চেহারার এক মেমের পাশে আমার এক স্কুলের বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। সে যে এই দেশে আছে তাই জানতাম না। অন্তত পনেরো বছর দেখাই হয়নি। কিন্তু স্কুলের বন্ধুদের মুখ কেউ ভোলে না।

বাংলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কি রে সুবোধ! তুই কি করে এলি?'

সুবোধ এক গাল হেসে বলল, 'আমি এসেছি তোকে চিনিয়ে দেবার জন্য। স্টুপিড, আমাকে চিঠি দিসনি কেন আসবার আগে?'

—কি করে জানব, তুই এখানে আছিস?

—আমি কি করে জানলাম জানিস? এখানকার কাগজে তোর নাম ছাপা হয়েছে।

—তাহলে খুব ফেমাস হয়ে গেছি বল?

—না রে গাধা। ইউনিভার্সিটিতে বাইরে থেকে যে-ই আসে, সভা-সমিতির কলমে তারই নাম ছাপা হয়।

খুব জমে গেল টুসন-এ। শুধু পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যই নয়। এখানকার লোকরা খুব চট করে আপন করে নিতে জানে। নানান জায়গায় নেমন্তন্ন, পরের গাড়িতে খুব ঘোরাঘুরি। বক্তৃতার ব্যাপারটা দু'লাইনে সেরে এবং কাঁপা কাঁপা গলায় কিছু কবিতা আবৃত্তি করে আমার দায়িত্বও চুকিয়ে দিলাম।

এখানকার কবি-লেখকদের প্রধান আয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেমন্তন্ন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কবিতা পাঠ বা বক্তৃতা দিতে ডেকে তাদের পাঁচশো থেকে হাজার ডলার দেয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন জ্যান্ত লেখকদের গ্রাহ্যই করে না, মৃতদেরই শুধু কদর। এখানে ঠিক তার উল্টো। এখানে বেঁচে থাকাই প্রতিদিন একটা উৎসবের মতন, মৃত্যুকে এরা মনে রাখে না। মৃত্যু আসে এবং চলে যায়। তবু বাকি লোকদের কাছে জীবন প্রতিদিন আরো বেশি ফুল-ফল-পল্লবময়।

ড্যানি ডেনহাম নামে একটা ছেলের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। তার বউয়ের নাম বারবারা। দু'জনেরই এমন চমৎকার স্বাস্থ্য যে মনে হয় বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় এরা যুগ্মভাবে প্রথম হবার যোগ্য। কেন যে কেঁচোর মতন মাসলওয়ালা কিছু লোক ঐ সব প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর জেতে কে জানে!

ড্যানি ওদের বাড়িতে এক সন্ধেবেলা নেমন্তন্ন খেতে গেলে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, রাজস্থানের মরুভূমিতে কত ফুট খুঁড়লে জল পাওয়া যায় বলতে পারো?'

এ আবার কি বিদঘুটে প্রশ্ন? রাজস্থানের মরুভূমির কথা জানলই বা কি করে? সাধারণভাবে দেখেছি, আমেরিকানরা ভূগোল সম্পর্কে অজ্ঞ। আমাদের দেশের স্কুলের ছেলেরা এখনো সাউথ আফ্রিকার রাজধানীর নাম মুখস্থ করে—আর এখানে এরা অনেকে জানেই না, বেঙ্গল পৃথিবীর কোথায়। এরা বেশি খবর রাখে নিজের দেশের। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে অনেকখানি অজ্ঞ বলেই মনে করে, ওদের দেশটাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা। আসবার পথে মিসিসিপি নদী দেখতে গিয়েছিলাম যখন, খুবই সুন্দর সেই নদীর দৃশ্য, তবু সেখানে এক প্রৌঢ়ের প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছিলাম। সে আমাকে বলেছিল, এত বড় নদী আগে কখনো দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্র দেখেছি। সেই প্রৌঢ় পদ্মা বা ব্রহ্মপুত্রের নাম তো দূরে থাক, সম্ভবত চীনের হোয়াং হো বা ইয়াংসি কিয়াং-এরও নাম শোনেনি।

ড্যানির কথায় আমি বিস্ময় প্রকাশ করায় বারবারা বলল, 'জানো না, ওর খুব মরুভূমি সম্পর্কে কৌতূহল। পৃথিবীর সব মরুভূমির খবর রাখে। ও মরুভূমিতে সোনা খুঁজতে যায় কিনা!'

—তাই নাকি?

ড্যানি বলল, 'কালই তো আবার যাচ্ছি। তুমি যাবে?'

ওয়াইল্ড ওয়েস্টে স্বর্ণশিকারীদের সম্পর্কে অনেক গল্প পড়েছি, ছবিও দেখেছি। সেরকম এখনো চলে নাকি? এই এক নতুন অভিজ্ঞতার সুযোগ ছাড়া যায় না। রাজি হয়ে গেলাম।

ড্যানির একটা স্টেশান ওয়াগন আছে, নানারকম রং করা। রৌদ্র-ঝলমল সকাল, তার মধ্যে দিয়ে গাড়িটা একটা অচেনা প্রাণীর মতন ছুটে যায়। প্রচুর হ্যাম সসেজ আর পাঁউরুটি নেওয়া হয়েছে, আর কয়েক ডজন বীয়ার। বারবারা যা পোশাক পরেছে, তাকে পোশাক না বলে পোশাকের অছিলা বলা যায়। ড্যানি পরেছে একটা শর্টস আর খালি গা। বারবারারও খালি গা-ই প্রায়, শুধু ফিতের মতন একটা ব্রা-তে প্রগলভ স্তন দুটিকে আটকে রাখার চেষ্টা। আমি আলবুকার্কেতে ব্লু জিন্‌স আর গেঞ্জি কিনেছিলাম, তাই পরে এসেছি। গাড়ির সামনের সীটেই আমরা তিনজন। প্রথম প্রথম বারবারার শরীরের সঙ্গে ছোঁয়া লাগায়, যাকে বলে আমার কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠছিল এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছিল। বারবারার দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছিলাম না। খানিকটা বাদে কিন্তু সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। আকাশের নিচে, খোলা মাঠের মধ্যে আমরা প্রকৃতির সন্তান, পোশাকের বাহুল্যের প্রয়োজনটা কি!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম মরুভূমিতে। এ মরুভূমি অবশ্য অন্যরকম, নিছক বালির সমুদ্র নয়। অসমতল বিরাট প্রান্তর, কোথাও বালি, কোথাও পাথুরে মাটি। কিছু দূর দূর অন্তর প্রহরীর মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে এক একটা বিরাট ক্যাকটাস, দু'তলা তিনতলা বাড়ির মতন উঁচু। স্প্যানিশ ভাষায় এগুলোর নাম সাউআরো, আশী-নব্বই বছর করে বয়েস এক-একটার, কোন কোনটা নাকি দেড়শো দু'শো বছর পর্যন্তও বাচে। অদ্ভুত দৃশ্য। আরো ছোটখাটো নানান জাতের ক্যাকটাসও ছড়িয়ে আছে, ফুল ফুটেছে কোনটাতে। একটা আগেকার দিনের পাউডার পাফের মতন ফুল দেখিয়ে বারবারা জিজ্ঞেস করল, 'এটার নাম কি জানো? একে বলে শাশুড়ির মাথা!'

ড্যানি গাড়ি থামিয়েছে একটা টিলার কাছে। রোদ এখন বেশ কড়া। একটা দানব ক্যাকটাসের ছায়ায় বসে আমরা বীয়ার সহযোগে কিঞ্চিৎ ছোট হাজরি সেরে নিলাম। ড্যানি বলল, 'সাবধানে চারদিকটা দেখে বসবে কিন্তু, এ জায়গাটায় র‍্যাটল স্নেকের আড্ডা!'

প্রথম কিছুক্ষণ আমরা ড্যানির সঙ্গে সোনার সন্ধানে যোগ দিলাম। পাশাপাশি ছড়িয়ে শুধু মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটা। এখানকার বালি ছাঁকলে নাকি সত্যি কিছু কিছু সোনা পাওয়া যায়, কিন্তু খরচা পোষায় না। ড্যানি তাতে উৎসাহী নয়। সে চায় তাল তাল সোনা। কিংবা সোনার ঢালা! কেউ কেউ নাকি দু'একবার পেয়েছেও। এখানকার পাথরগুলোর রংও বিচিত্র, সুতরাং একেবারে সোনালি রঙের পাথর থাকা একেবারে অসম্ভব নয়।

এক সময় বারবারা আর আমি ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে পড়লাম। ড্যানির ক্লান্তি নেই।

বীয়ারে চুমুক দিয়ে বারবারা বলল, 'ড্যানিটা কী রকম পাগল জানো? এই বিরাট মরুভূমিটাকে ও ইঞ্চি ইঞ্চি করে খুঁজে দেখবে ঠিক করেছে। গত সপ্তাহে ঠিক যেখানে শেষ করেছিল, আজ আবার সেইখান থেকে শুরু করেছে। আমি জানি, ও কোনদিনই পাবে না। পাবার কোন দরকারও নেই।'

—কেন?

—আমরা তো স্বর্ণলোভী নই। এই খোঁজাটাই আসল, এটাই দারুণ এক্সাইটিং। পাওয়াটা নয়। জীবনে সব সময়েই কিছু খুঁজে বেড়ানো দরকার। পেয়ে গেলে খোঁজাটা থেমে যায়—সেটাই বিরক্তিকর!

এসব দার্শনিক কথাবার্তা আমার ঠিক মাথায় ঢোকে না। সেই স্বর্ণকেশী যুবতীর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, ড্যানি তো একেই পেয়েছে আর সোনা পাওয়ার দরকারটাই বা কি! এ বছর বারবারা চাকরি করছে, ড্যানি করছে পড়াশুনো আর এইরকম অ্যাডভেঞ্চার। আগামী বছর সে চাকরি করলে, বারবারা আবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে। চমৎকার জীবন।

আর একটা কথা ভেবেও আশ্চর্য হচ্ছিলাম। এরা কত সহজে আপন করে নিতে পারে। মাত্র ত' একদিনের পরিচয়! এই এখন দুপুর রৌদ্রে এক অজানা মরুভূমির মধ্যে বসে এক প্রায় অচেনা মেয়ের পাশে বসে বসে বীয়ার খাব —এটা কি কয়েক মাস আগে স্বপ্নে ভেবেছিলাম? এখনো মাঝে মাঝে সবটাই স্বপ্ন মনে হয়। সত্যি আমি এখানে বসে আছি? হাত দিয়ে ভূমি স্পর্শ করি। তারপরই কাছাকাছি কোথাও কিরকির কিরকির শব্দ হতেই লাফিয়ে উঠি। র‍্যাটিল্ স্নেক নয় তো! ড্যানি অনেক দূরে মিলিয়ে গেছে।

এরা এতই উদ্যমী যে এই মরুভূমির মধ্যেও একটা ছোট মিউজিয়াম খুলে রেখেছে। একলা একটি বাড়ি। তাতে রয়েছে এই মরুভূমির ম্যাপ এবং এখানে কী কী জিনিস ও পশু-পাখি-প্রাণী পাওয়া যায় তার নমুনা। সেখানে র‍্যাটিল স্নেকও যেমন আছে, তেমনি আছে কয়েক টুকরো সোনালি পাথর—ড্যানির মতন ছেলেদের উৎসাহ টিকিয়ে রাখার জন্য।

দুপুরে আমাদের এক ফাঁকে মিউজিয়ামটা দেখিয়ে দিয়ে ড্যানি আবার সোনা খুঁজতে লাগল। তারপর বিকেল গড়িয়ে সন্ধে এল। সূর্যাস্তে দিগন্ত সোনার রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখন গোটা মরুভূমিটাকেই সুবর্ণময় বলে মনে হয়। তার মধ্যে থেকে ড্যানি রিক্ত হাতে ফিরে এল, মুখে কিন্তু হাসি, বলল—আবার সামনের রবিবার আসব।

ঘোর সন্ধের পর ফিরে, তারপর আর এক অধ্যাপকের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আমার ঘরে ফিরলাম অনেক রাতে। আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে পোয়েট্রি সেন্টারের অতিথি ভবনে। গোটা বাড়িটাতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। সকালবেলা একটি মেয়ে এসে শুধু বিছানার চাদর পাল্টে দিয়ে যায়—তারপর তো সারাদিন বাইরে বাইরেই কাটছে।

নির্জন জায়গায় ঘুম আসতে দেরি হয়। একটা বই নিয়ে শুয়েছিলাম। কখন তন্দ্রা এসে গেছে, তার মধ্যে যেন অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, কোথায় টেলিফোন বাজছে। আমার এ ঘরে টেলিফোন নেই। আরো দু'খানা ঘর পার হয়ে সামনের অফিস ঘরে টেলিফোন। শব্দটা সেখান থেকেই। উঠতে ইচ্ছে করে না। নিশ্চয়ই আমার জন্য নয়। শব্দটা কিছুতেই থামছে না। উঠতেই হলো।

—হ্যালো?

—তোমাকে কি বিরক্ত করলাম? ঘুমোচ্ছিলে?

'—না, মানে, কে আপনি? কাকে চাইছেন?

—আমি মার্গারিট। আমি কিন্তু তোমার গলার আওয়াজ শুনেই চিনতে পেরেছি।

—মার্গারিট? ভাবতেই পারিনি।

—শোন, এত রাত্রে টেলিফোন করলাম কেন জানো তো? রাত বারোটার পর লং ডিসটেন্স কল-এর চার্জ সস্তা হয় কিনা।

—ও, না না, বেশি রাত হয়নি, ওখানে কি কিছু হয়েছে?

—না, কিছু হয়নি। এমনিই ইচ্ছে হলো। তুমি ভালো আছ তো? ওদিকের লোকগুলো কেমন, তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই! তুমি কেমন আছ?

—তুমি এতদিন দেরি করছ কেন? কবে ফিরবে?

মাত্র তিন মিনিট সময়। বিস্ময় কাটতে না কাটতেই সময় ফুরিয়ে যায়। রিসিভারটা রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি। মনের মধ্যে তিরতির করছে একটা ভালো-লাগার অনুভূতি। আমার জন্য একজন প্রতীক্ষা করে বসে আছে! আমি কবে ফিরব? এটা নিশ্চয়ই নিছক ভদ্রতার প্রশ্ন নয়। তা হলে নিশ্চয় এত রাত্রে ফোন করত না। তা ছাড়া মেয়েটাও যে অন্যরকম।

পরদিনই বেরিয়ে পড়লাম লস অ্যাঞ্জেলিসের দিকে। ঘোরাঘুরি করতে আর একটুও ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এত কাছাকাছি এসে হলিউড-ফলিউড না দেখে গেলে লোকে বলবে কি!

লস অ্যাঞ্জেলিসের লোকরা বলে, তাদের শহরটা নিউ ইয়র্কের চেয়েও বড়। আসলে এটা একটা শহর নয়, পাশাপাশি কয়েকটা শহর জোড়া দেওয়া। আমার

মনের অবস্থার জন্যই হোক বা যে-কারণেই হোক, শহরটা আমার ভালো লাগল না। শুধুই যেন টাকা-পয়সার গন্ধ। এখানকার সিনেমা হলগুলোও অদ্ভুত। হলিউডের গা-ঘেঁষা বলেই বোধহয় এখানকার লোকেরা সহজে সিনেমা দেখতে চায় না। অনেক সিনেমা হলেই এক টিকিটে দুটো পুরো ছবি দেখানো হয় এবং আগে ও পরে বেশ কিছু জ্যান্ত মেয়ের ধেই ধেই করে ন্যাংটো নাচ। দেখতে দেখতে হাই ওঠে।

কন্ডাকটেড ট্যুরে হলিউডের স্টুডিও-ফুডিও দেখে নিলাম একবেলায়। বিকেলে নিজেই বাস ধরে চলে গেলাম সমুদ্রের ধারে। রাস্তা ছেড়ে, বাড়ির আড়ালগুলি পার হতেই চোখে ভেসে উঠল সমুদ্র। সমুদ্র আমি আগে অনেকবার দেখেছি, কিন্তু চোখের সামনে প্রশান্ত মহাসাগর। তাতেই কীরকম রোমাঞ্চ হয়। এই হচ্ছে সমুদ্রের রাজা। সোজা যেদিকে তাকিয়ে আছি সেদিকেই কোথাও এক জায়গায় এর সঙ্গে মিশেছে ভারত মহাসাগর। তারই এক টুকরোর নাম বঙ্গোপসাগর। তার কোলের কাছে কলকাতা! ঝাঁপ দেব এই সাগরে? সাঁতার তো মন্দ জানি না।

পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে ঢেউ। মনে পড়ল, কাল রাত্রে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, কবে ফিরবে। আর তো কোথাও কেউ আমার জন্য প্রতীক্ষা করে নেই!

এবার সানফ্রানসিসকো। এই শহরটা সত্যিই সুন্দর। প্রকৃতিকে আমরা যে অর্থে সুন্দর বলি, সেই অর্থে কোনো বড় শহরই সুন্দর নয়। বোধহয় সানফ্রানসিসকোই এর ব্যতিক্রম। এখানে প্রকৃতি আর মানুষে গড়া সভ্যতা চমৎকারভাবে মিলেমিশে আছে। শহরটা ঘুরতে ফিরতে হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে সমুদ্র। কী গাঢ় নীল জল!

বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের কাছে পল্ ওয়েগনার আগে থেকেই চিঠি লিখে রেখেছে। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। হোটেল থেকে কিছুতেই সেই অধ্যাপককে টেলিফোনে ধরতে পারছি না। এটাই আমার এখানে একমাত্র কাজ। তা ছাড়া বিশ্ববিখ্যাত বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় একবার চোখে দেখা। এখানকার ছাত্র আন্দোলন সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে দেয়।

কলাম্বাস এভিনিউ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা বইয়ের দোকান চোখে পড়ল। সিটি লাইটস্ বুক শপ। নামটা চেনা। এদের প্রকাশিত কিছু বই পড়েছি, চিঠিপত্রেও একবার যোগাযোগ হয়েছিল।

ভেতরে ঢুকে কাউন্টারে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মিঃ ফের্লিংগেটি আছেন কি?'

মেয়েটি আমার দিকে আপাদমস্তক একবার দেখে শুকনো গলায় বলল, 'তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা করা শক্ত।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরে আসছিলাম, মেয়েটি আবার ডাকল। সেই মুহূর্তে বাইরের দরজা দিয়ে একজন দীর্ঘকায় লোক ঢুকল, মাথার চুলগুলো কাঁচা-পাকা। গায়ে চেকচেক লাল জামা। মেয়েটি বলল, 'ইনিই তো লরেন্স ফের্লিংগেটি।'

আমি নিজের পরিচয় দিলাম।

ফের্লিংগেটি আমার কাঁধে এক থাবড়া মেরে বলল, 'সত্যি? সেই অত দূর ভারতবর্ষ থেকে এসেছ?'

সে আমাকে কাছাকাছি একটা এসপ্রেশো কফির দোকানে টেনে নিয়ে গেল। অনেক গল্প। মাঝে মাঝে অন্য ছেলেমেয়েরা আসছে, আলাপ হচ্ছে, কেউ চলে যাচ্ছে, কেউ থাকছে। ফের্লিংগেটি দারুণ আড্ডাবাজ, কিছুতেই আমাকে উঠতে দেবে না।

একটু বাদে দাড়িওয়ালা নোংরা জামা-প্যান্ট পরা একজন লোক এসে টেবলে বসল। ফের্লিংগেটি তাকে গ্রাহ্যই করল না। তখন সে নিজেই বলল, 'ল্যারি, এক কাপ কফি খাওয়াও!'

আমার দিকে ফিরে বলল, 'আমার নাম জো স্মিথ। হু ইউ?'

ফের্লিংগেটি অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত, সেই সুযোগে জো স্মিথ ফিসফিস করে বলল—ক্যাঁ ইয়া স্পেয়ার মি আ বব?

ফের্লিংগেটি মুখ ফিরিয়ে এক ধমক দিয়ে বলল, 'এই জো, এই ফাকিং ব্যাস্টার্ড, তোর লজ্জা করে না! তুই একজন গরিব ভারতীয়ের কাছ থেকে ভিক্ষে চাইছিস?'

আমি হেসে বললাম, 'আমি গরিব ভারতীয় বলেই এদেশের লোকদের ভিক্ষে দিতে আমার খুব ভালো লাগে। তা ছাড়া তোমাদের দেশের টাকাই তো খরচ করছি।'

এক ডলার বাড়িয়ে দিতেই জো স্মিথ নির্লজ্জের মতন সেটা নিয়ে সুট করে কেটে পড়ল।

এরা ঠিক না-খেতে পাওয়া ভিখিরি নয়। এদের বলে জাঙ্কি। নেশার জন্য যে-কোন উপায়ে টাকার জোগাড় করে।

তবে, খানিকটা আগে, রাস্তায় একজন লোক কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলেছিল—আ কোয়ার্টার, আ কোয়ার্টার (সিকি) প্লিজ। আর তাকে খাঁটি ভিখিরিই মনে হয়েছিল। এসব দেখলে আমি বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করি। এখন রাস্তায় কোন একটা লোককে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে দেখলেই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সানফ্রানসিসকোর চীনেরা বেশ বিত্তশালী। এখানকার মতন এমন বর্ণাঢ্য চীনে-পাড়া এখন খোদ চীনেও আছে কিনা সন্দেহ। বিরাট প্রশান্ত মহাসাগর নৌকো-টৌকোতে পার হয়ে কবে এরা এখানে এসেছিল কে জানে। কিংবা এসেছিল শ্লেভ লেবার হিসেবে। এখন এদের বিশাল বিশাল দোকান, বাড়িঘর, ব্যাঙ্ক, সিনেমা হল। যে-কোন দোকানে ঢুকলে এদের নম্র ও ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। যদি কোনদিন এরা সানফ্রানসিসকোর খানিকটা অংশ আলাদা চীনাস্তান হিসেবে দাবি করে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বিকেলের দিকে টেলিফোনে অধ্যাপককে পাওয়া গেল। উনি বললেন—আরে কি মুশকিল। আমিও তো তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। তুমি এক কাজ করো, বাস ধরে এক্ষুনি চলে এস ; ফেরার সময় আমি তোমায় পৌঁছে দেব। এখন আমার যেতে যেতে দেরি হয়ে যাবে, সন্ধের সময় গোল্ডেন গেট ব্রীজের অপূর্ব দৃশ্য তুমি মিস করো না—

সমুদ্রের ওপর দিয়ে সেতু। পৃথিবীর ঊনিশতম আশ্চর্য। এত আলোয় সাজানো যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দূরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়া সোনার জন্য বিখ্যাত ছিল এক সময়। এখনো সূর্যের আলো ও বিদ্যুতে চতুর্দিকে শুধু স্বর্ণসজ্জা। হঠাৎ মনে হয়, এই সবকিছুই একদিন প্রচণ্ড আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

৮

অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে এলাম আয়ওয়ায়। লাস ভেগাসে নেমেও জুয়া খেলার লোভ সংবরণ করেছি। নেভাদার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, বিরাট লবণ হ্রদের পাশ দিয়ে, নেব্রাস্কা হয়ে ঘুরে ঘুরে আসতে লাগলাম। আর বেড়াতে ভালো লাগছে না। বাড়ির জন্য মন কেমন করছে। এখন বাড়ি মানে অবশ্য মিড ওয়েস্টে, ছোট্ট শহরে রাস্তার পাশে একটা দোতলার ঘর।

ডাক-বাক্সে অনেক চিঠি জমে আছে। গেটের পাশে বেশ কয়েকদিনের খবরের কাগজ। সব কুড়িয়ে এনে ঘরের চাবি খুললাম। তারপর প্রথমেই টেলিফোন করলাম মার্গারিটকে—আমি এসে গেছি। তোমার কি এখন ক্লাস আছে? কখন দেখা হচ্ছে?

দশ-বারো মিনিটের মধ্যে মার্গারিট এসে গেল। ঘরে ঢুকেই আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু।

দারুণ চমকে গেলাম। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'এ কি?'

দু' হাত ছড়িয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে মার্গারিট বলল, 'এসো, তুমি এবার আমাকে একটা চুমু খাও।'

—কিন্তু এরকম তো কথা ছিল না?

—সেদিন আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। কবিতা পড়ার পর তুমি আমাকে চুমু খেতে চেয়েছিলে, তোমার মুখখানা তখন বাচ্চা ছেলের মতন দেখাচ্ছিল, ঠিক যেন একটা আবদার, তবু আমি রাজি হইনি। আমি অন্যায় করেছি সেদিন!

—না, না, ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়!

—জানো, এ নিয়ে পরে আমি অনেক ভেবেছি। একথাও মনে হয়েছে, তুমি হয়তো ভাবতে পারো, যেহেতু তুমি ইওরোপীয়ান বা হোয়াইট নও, সেইজন্যই আমি রাজি হইনি! ইস, ছি ছি ছি, যদি সে কথা ভেবে থাকো...।

—না, ভাবিনি সেরকম। সত্যি! বিশ্বাস করো।

—আমি চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করার সময় মনে মনে জিজ্ঞাসা করতাম, ভগবান, আমাকে বলে দাও কোনটা ঠিক! হঠাৎ একজনকে চুমু খাওয়া পাপ, না একজনের মনে দুঃখ দেওয়া বেশি পাপ? আমি কয়েকদিন আগে উত্তর পেয়ে গেছি।

—কি?

—এই যে তোমাকে চুমু খেলাম? এবার তুমি আমাকে খাও! এই শোন, আমি কিন্তু ঠিক মতন চুমু খেতে জানি না। তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে তো?

মার্গারিটকে স্পর্শ করতে আমার ভয় করল। যেন ও একটা দুর্লভ, দারুণ মূল্যবান জিনিস, আমার স্পর্শে নষ্ট হয়ে যাবে। একটা গাঢ় লাল রঙের সোয়েটার পরে আছে। মুখেও যেন সেই রঙের আভা। হাত বাড়িয়ে বলল, এস—। কোনদিন কোন নারী আমাকে এরকম ভাবে আহ্বান করেনি। অনেক প্রত্যাখ্যান পেয়েছি, আহ্বান পাইনি। এগিয়ে গিয়ে খুব নরম ভাবে ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখলাম।

মার্গারিট সত্যিই ঠোঁট দুটো শুধু একটু ফাক করে রইল আনাড়ির মতন। নাকে নাক লেগে যায়। চুমু খাওয়ার সময় যে নারী-পুরুষের নাক দুটো অদৃশ্য হয়ে যায়, তা ও জানে না।

চুম্বন সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মার্গারিট নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছটফটিয়ে উঠল। বলল, 'আমার একটুও সময় নেই। একটুও সময় নেই এখন! শুধু এলাম একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে। আমার ক্লাস আছে। কিছু বইপত্র এনেছ? কি কি জিনিস কিনলে? আচ্ছা, সব পরে দেখব। চলি, আমার চারটে পর্যন্ত ক্লাস, বিকেলে আবার আসবার চেষ্টা করব।'

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ও হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল।

কাঠের সিঁড়িতে ওর হাই হিল জুতোর এমন খটখট শব্দ হচ্ছিল যে আমার ভয় হলো, মেয়েটা পড়ে না যায়!

দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। সকাল এগারোটা বাজে। এখন অনেক কাজ। ঘরটা পরিষ্কার করতে হবে। রান্নার কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ফ্রিজ খালি, দোকান থেকে কিছু কিনে না আনলে চলবে না। পল ওয়েগনারকে আমার ফিরে আসার খবর দেওয়া উচিত। কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছে করল না। বিছানাটা খুলে শুয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্রোত বয়ে যাচ্ছে। নিজের ঠোঁটটায় হাত রাখলাম। এই সকালবেলা একটা মেয়ে ঝড়ের মতন এসে আমাকে চুমু খেয়ে গেল। একি সত্যি? না কি এটাও স্বপ্ন?

শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলাম। অল্প অল্প শীতের আমেজের মতন একটা ভালো-লাগার চাদর যেন আমার গায়ে জড়িয়ে আছে। একটু বাদে অনুভব করলাম, সত্যি শীত করছে। উঠে গিয়ে যে সেণ্ট্রাল হিটিং-এর সুইচটা চালিয়ে দেব, তাও ইচ্ছে করল না। গুটিসুটি মেরে শুয়ে সিগারেট ধরালাম। অ্যাশট্রেটা টেবিলের ওপর, উঠে সেটা আনতেও আলস্য লাগল। নিজের ঘরের মেঝেতে যদি ছাই ফেলি, তাতে আমায় কে কি বলবে? আমার যা খুশি করতে পারি।

ঘণ্টাখানেক বাদে দরজায় আবার খটখট শব্দ হলো। এবার তো উঠতেই হবে। কে হতে পারে? শার্ট-প্যাণ্ট পরেই আছি। সুতরাং দরজা খোলার কোন অসুবিধে নেই।

খুলেই দেখলাম মার্গারিট। মুখটা লাজুক লাজুক। একটু যেন অপরাধীর মতো ভাব।

—একি, তুমি ক্লাস করলে না?

—আমি কি আবার এসে তোমার কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম!

—না, না, এসো এসো।

ভেতরে এসে ও বলল, 'ক্লাসে গিয়ে দেখলাম, আমার আজ পড়াতে একটুও ভালো লাগছে না। কিছুতেই মন বসছে না। অন্যমনস্কভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো উচিত নয়।'

আমি একটু হাসলাম।

মার্গারিট কৃত্রিম রাগের সঙ্গে আমার বুকে একটা আঙুলের টোকা মেরে বলল, 'তুমিই তো আমার আজ সব কিছু এলোমেলো করে দিলে!'

—আমারও আজ কোন কিছু করতে ইচ্ছে করছে না।

কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মনে হলো যেন মার্গারিটের শরীরটা একটু একটু দুলছে। ঘোরের মতন অবস্থা। আমিও যেন পৃথিবীর আর সব কিছু ভুলে গেছি। একটা আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর একবার?'

ও নিজেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি ওর ঠোঁটে, কানের নিচে, গলায়, বুকে অজস্র চুমুতে ভরিয়ে দিলাম। যেন আমি অমৃত পান করছি, কিছুতেই আমার তৃপ্তি হবে না।

দুজনেই কখন এসে বিছানায় বসেছি। ও আমার গালে দু' হাত রেখে চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'শোনো, একটা কথা শোনো—'

—কি?

—তোমার ভালো লাগছে?

একথা তো মেয়েরা জিজ্ঞেস করে না, ছেলেরাই জানতে চায়। এ মেয়েটা কোন কিছুই জানে না।

—তোমার?

মার্গারিট রুদ্ধশ্বাসভাবে বলল, 'আমার এত অসম্ভব ভালো লাগছে যে আমি যেন সহ্য করতে পারছি না। এ আমার কি হলো বলো তো? এতদিন কিছু জানতামই না—

—মার্গারিট, তোমাকে আগে কেউ চুমু খায়নি?

—আমার বাবা, মা।

—না, সেরকম নয়। এতদিন এদেশে আছো—

মার্গারিট অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে বলল, 'এই আমেরিকান ছেলেগুলো? এঃ!'

—কেন, এদের কারুকে তোমার ভালো লাগেনি? অনেক ভালো ভালো ছেলে আছে।

—সে কথা বলছি না। তা থাকতে পারে। কিন্তু এরা শারীরিক ব্যাপারটা এত জল-ভাত করে ফেলেছে, আমার মোটেই পছন্দ হয় না!

—তবু এতদিনে কেউ তোমাকে চুমু খেতে চায়নি?

—না। চায়নি। অনেকে জোর করে খেতে এসেছে—জোর মানে, দে টেক ইট ফর গ্রান্টেড—কোন পার্টিতে কারুর সঙ্গে নাচলে বা একটু বেশিক্ষণ কারুর সঙ্গে কথা বললেই অমনি ঠোঁটটা এগিয়ে আনে—যেন এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ জিনিস। আমি সব সময় নিজের ঠোঁটে হাত চাপা দিয়েছি বা মুখ সরিয়ে নিয়েছি। কেউ আগে থেকে অনুমতি চায় না। তুমিই সেদিন প্রথম চাইলে, তোমার মুখখানা অবিকল একটা বাচ্চা ছেলের মতন দেখাচ্ছিল—সেইজন্যই মনে হলো,

এর মধ্যে কোন পাপ থাকতে পারে না—সত্যি তুমি খুব বাচ্চা ছেলের মতন এমন সরলভাবে বলেছিলে...।

মার্গারিট বারবার আমার মুখখানা বাচ্চা ছেলের মতন বলছে, সেটা আমার তেমন পছন্দ হলো না। আসলে ওর চোখমুখই যে একেবারে শিশুর মতন, সেটাই ও জানে না।

ও আবার বলল, 'তোমার ম্যাকগ্রেগরকে মনে আছে? ও একদিন আমাকে গাড়ির মধ্যে এমন বিশ্রীভাবে জোর করে আদর করার চেষ্টা করেছিল, আমি খুব চটে গিয়েছিলাম! আমাকে আমেরিকান মেয়েদের মতন চীপ মনে করেছিল!'

—তুমি কিন্তু আমাকে অবাক করেছ! গল্প-উপন্যাসে যা পড়েছি, আমারও ধারণা ছিল, ফরাসী মেয়েরা এইসব ব্যাপারে খুব ফ্রি হয়, তাদের কোন ইনহিবিশান থাকে না।

মার্গারিট দারুণভাবে আপত্তি করে বলল, 'না, না, না, না—একদম মিথ্যে কথা। মোটেই সত্যি না। ফরাসী মেয়েরা কক্ষনো ওরকম হয় না, পারীর মেয়েরা হতে পারে! প্যারিসিয়ান আর ফ্রেঞ্চ পিপল-এ অনেক তফাত। পারী হচ্ছে সারা ফ্রান্সের তুলনায় সম্পূর্ণ একটা অন্যরকম জায়গা।'

আমি বললাম, 'তা নয়। আসলে তুমিই অন্য ফরাসী মেয়েদের তুলনায় একদম আলাদা। তোমাদের বাড়ি প্যারিসে নয়? তাহলে কোথায়?'

—আমি তো গ্রামের মেয়ে। আমাদের গ্রামের নাম লুর্দা। এই নাম শুনে অবশ্য কেউ চিনবে না। কাছাকাছি শহরটার নাম পোয়াতিয়ে। আমাদের গ্রাম থেকে আমি আর আমার বন্ধু এলেনই শুধু পারীতে পড়তে এসেছিলাম।

—পারীতে পড়াশুনো করেও তুমি প্যারিসিয়ান হওনি।

—কোন জায়গার খারাপ জিনিসটাই কি নিতে হবে?

—মার্গারিট, তুমি কি আজ থেকে খারাপ হয়ে গেলে?

মার্গারিট ব্যাকুলভাবে আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'না, না, না, না। এই দেখ। তুমি দেখ, আমার গা কাঁপছে। আমার দারুণ আনন্দ হচ্ছে। কোন খারাপ কাজ করলে কখনো এত ভালো লাগে? আমি ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, কোন খারাপ কাজে আমার কখনো আনন্দ হয় না।'

—কোনটা খারাপ, কোনটা ভালো, তাই নিয়ে তো অনেক তর্ক আছে।

—আই ডোনট কেয়ার! আমি নিজের মনে মনে ঠিক বুঝতে পারি। কোন কিছু হলে, আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি। চার্চে প্রেয়ার করার সময়েও প্রশ্ন করি মনে মনে। আমি ঠিক উত্তর পেয়ে যাই।

আমি মার্গারিটের হাতের আঙুলে চুমু খেলাম। তারপর ওকে শুইয়ে দিলাম বিছানায়। তারপর ওর সোয়েটারের বোতামে হাত রাখতেই ও খুব সরলভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি আরো কিছু করব?'

—কেন, তোমার কি আপত্তি আছে?

—আমি ঠিক জানি না। মনের ভেতর থেকে একটা দারুণ ইচ্ছে বারবার যেন বলতে চাইছে, তুমি আমাকে আরো আদর করো, আরো অনেক আদর করো—কিন্তু আমি কি একদিনে এতখানি সইতে পারব?

—হ্যা পারবে। ঠিক পারবে।

—না, না, শোনো, আমরা বরং আর একটু অপেক্ষা করি। আজ না হয় কাল, না হয় আরো পরে—আমি ঠিক বুঝতে পারব, আমি নিজেই তোমাকে বলব...ব্যাপারটা যেন শুধু লোভ না হয়ে যায়, যেন সব সময় খাঁটি আনন্দ থাকে। এখন আমার নিজেরই খুব লোভ হচ্ছে, এটা যখন লোভহীন আনন্দ হয়ে যাবে, ঝর্ণার জলের মতন নির্মল, আমি একবার আলজাসলোরেনে এরকম একটা ঝর্ণা দেখেছিলাম, আমার মনে হয়েছিল, আঃ, জলটা এত সুন্দর পরিষ্কার, পৃথিবীতে কি আর কোন কিছু এত পরিষ্কার হতে পারে? তুমি আমার ওপর রাগ করলে?

—না, না।

—প্লীজ, রাগ করো না। আমার ওপর কক্ষনো রাগ করো না। তুমি আমার পাশে শুয়ে থাকো। শোনো, আমি কিন্তু আজ ক্লাসে যাব না, কোথাও যাব না, এইখানে শুয়ে থাকব। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। আর কারুকে দরজাও খুলে দেবে না। কেউ এলেও আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে থাকব —ভাববে ভেতরে কেউ নেই।

শুয়ে রইলাম পাশাপাশি। কোন মেয়ের পাশে যে এরকমভাবে শুয়ে থাকা যায়, আমি জানতাম না আগে। বিশেষত এরকম একটি যৌবনবতী অপরূপ সুন্দরীর পাশে। তবু আমার কষ্ট হলো না। একটা শান্ত মাধুর্যের স্বাদ পেলাম জীবনে প্রথম।

মার্গারিট আমার একটা হাত তুলে নিয়ে তাতে নিজের হাত বলোতে বুলোতে বলল, 'তোমার গায়ের রংটা কী রকম জানো? পাকা জলপাইয়ের মতন। দেখলেই মনে হয়; তোমার চামড়া অনেক রোদ্দুর শুষেছে, তাই একটা সতেজ টাটকা ভাব আছে। আমাদের রং সাদা, ফ্যাকাশে—তার মানে বেশি রোদ্দুর খাইনি! আমি এত রোদ্দুর ভালোবাসি!'

আমি বললাম, 'তোমার পাশে আমাকে কি রকম দেখাচ্ছে জান? আমার লজ্জা করছে। আমার গায়ের রং কালো হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু

আমার চেহারাটা কি বিচ্ছিরি! থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, গোদা গোদা হাত-পা —তোমার পাশে আমি যেন ঠিক বিউটি অ্যান্ড দা বীস্ট-এর জাজ্বল্যমান উদাহরণ।'

আমার গায়ে একটা চাপড় মেরে বলল, 'ঠিকই তো। তুমি একটা বীস্ট! এত জোর চুমু খেয়েছ যে আমার ঠোঁট ফুলে গেছে। আর একটা চুমু দাও।'

একটু বাদে বলল, 'আচ্ছা, কিস-এর বাংলা কি? দেখ সেদিন লাভ-এর বাংলা শিখিয়েছিলে, আমার মনে আছে।'

—কিস হচ্ছে চুমু।

—সু-মু?

—না, চুমু। চ অ্যাজ ইন চক।

—আই?

—আই হচ্ছে আমি।

—বেশ, এবার আমি একটা পুরো বাংলা সেনটেন্স বলতে পারব। দেখবে?

জলে ডুব দেবার আগে কিংবা দৌড় শুরু করার আগে লোকে যেমন দম নেয়, সেইরকম জোর নিশ্বাস টেনে মার্গারিট বলল—আমমি সুমু বালোবাশ্যা।

আমার হাসি আর থামতেই চায় না। দেশ ছাড়ার পর এমন প্রাণ খুলে একদিনও হাসিনি। এমন মিষ্টি বাংলাও শুনিনি এর মধ্যে।

ও বারবার বলতে লাগল, 'কি ভুল হয়েছে? ভুল বলেছি? কেন ভুল হলো?'

আমার মুখে আসল বাংলাটা শুনে বলল, 'তোমাদের ভাষা কিন্তু খুব শক্ত।'

—তোমাদের ফরাসীর চেয়ে অনেক সোজা! বাবাঃ ফরাসীতে তো ভার্ব মুখস্থ করতে করতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়!

—মোটেই না। ফরাসী খুব সহজ। তুমি শিখবে?

—ইউনিভার্সিটিতে তোমার ক্লাসে ভর্তি হবো?

—তা হলে খুব মজা হয় কিন্তু। আমার ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু সবাই বাচ্চা নয়। পি-এইচ ডি করতে গেলে এখানে ফ্রেঞ্চের একটা কোর্স নিতে হয়। তুমি বেশ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বসে থাকবে, আমি পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝে তোমার দিকে তাকিয়ে উইংক করব! তুমি উইংক করতে জান?

—কেন জানব না। এই তো!

—না, না তোমার ঠিক হলো না! একদম বাচ্চাদের মতন করলে, তোমার দু' চোখই বুজে আসছে। এই দেখ, ফ্রেঞ্চরা সবচেয়ে ভালো উইংক করতে পারে—

—তাহলে ফরাসী ভাষা শেখবার আগে উইংকিংটাই আগে ভালো করে শেখা যাক!

—নিশ্চয়ই। ফ্রেঞ্চ ভালো করে শিখতে গেলে তোমাকে ঠিক মতন কাঁধ শ্রাগ করা শিখতে হবে। ওনিয়ন সুপ খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, আড়াই শো রকমের চীজ-এর মধ্যে যে-কোন একটা মুখে দিয়েই তোমাকে বলতে হবে, সেটা কতদিনের পুরনো, হুইস্কির বদলে কোনিয়াক ভালো লাগাতে হবে।

কিছুক্ষণ আমরা চোখ টেপাটিপির খেলা খেললাম। তারপর আমি বললাম, 'ইস, ইংরেজদের বদলে যদি ফরাসীরা ভারতবর্ষটা দখল করতে পারত, তা হলে এসব আমরা কবেই শিখে যেতাম!'

—তুমি এর আগে কোন ফরাসী মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছ?

—অনেকদিন আগে, তখন আমি খুবই ছোট, পাঁচ-ছ' বছর বয়েস, চন্দননগর বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা চকোলেটের দোকানে একজন ফরাসী মহিলা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার নাম কি? তিনি আদর করে আমার গাল টিপে দিয়েছিলেন, মনে আছে।

—কোন জায়গাটা বললে?

—চন্দননগর!

মার্গারিট লাফিয়ে উঠে বসে উত্তেজিতভাবে বলল, 'ও, স্যানডোরনাগার। কারিক্কল, মাহে, স্যানডোরনাগার। ভূগোলে পড়েছি, ইন্ডিয়াতে আমাদের কলোনি ছিল! আমাদের ধারণা ছিল জায়গাগুলো বোধহয় পৃথিবীর উল্টো পিঠে। কলকাতা থেকে কতদূরে?

—খুব কাছেই। কলোনি ছিল বলে খুব গর্ব, তাই না?

—মোটেই না। কোন মানুষের উপরেই অন্য মানুষের রুল করা উচিত নয়। গড়ই তো সবাইকে রুল করছেন।

—মার্গারিট, আমি কিন্তু ঈশ্বর মানি না।

—তাতে ঈশ্বরের কোন ক্ষতি নেই। তোমার মানাটা আমিই মেনে দেব এখন। তোমাকে কিছু করতে হবে না। থাক গে, শোন না, আমার বাবার না একবার স্যানডোরনাগারে যাবার কথা ছিল চাকরি নিয়ে, আমিও তখন খুব ছোট। আমার মা কিছুতেই রাজি হলেন না, তাই যাওয়া হয়নি। কিন্তু ভেবে দেখো, যদি আমরা যেতাম সেখানে—তা হলে সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেতে পারত। আমরা এক সঙ্গে খেলা করতাম, কি মজা হতো না!

আমি হেসে বললোম, 'না। সেরকম কিছুই হতো না! তুমি থাকতে কলোনিয়াল অফিসারের মেয়ে, পাক্কা মেমসাহেব—আর আমি সামান্য একটা নেটিভের ছেলে। আমাদের দেখাশুনো হওয়ার কোন সুযোগই ছিল না।'

মার্গারিট ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কি জানি! কিন্তু হলে বেশ ভালো হতো!'

—তোমার সঙ্গে এখানে যে আমার দেখা হয়েছে, সেটাই এখনো ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। কোথায় আমি ছিলাম, কোথায় তুমি ছিলে!

—সত্যি, এটা কিন্তু সত্যি—আমিও তো ছিলাম লর্দা বলে একটা গ্রামে, কি করে এসে পড়েছি আমেরিকার একটি গ্রামে, সেখানে বন্ধুত্ব হলো পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার উত্তরাধিকারী এক ভারতীয়ের সঙ্গে।

—পাঁচ হাজার বছর-টছর বলো না। আমাকে কি অতটা বুড়ো মনে হয়?

মার্গারিট হেসে উঠল খুব। বলল, 'না, ঠিক অতটা না হলেও তোমার বয়েস অন্তত দু'তিন হাজার বছর মনেই হয়!'

দুপুর দুটো বাজে। আমাদের হঠাৎ খেয়াল হলো, আমরা কেউই কিছু খাবার খাইনি। মার্গারিট বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি কিছু খাবে না? আমার খিদে পেয়েছে কিন্তু। চলো, আমরা দু'জনে মিলে কিছু রান্না করি!'

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, 'রান্না করার মতন কিছুই নেই যে। এখানে ছিলাম না তো, ফ্রিজ খালি। চলো কোন দোকানে গিয়ে খেয়ে আসি।'

—দূর, ইচ্ছে করছে না!

—তা হলে তুমি বসো। আমি চট করে কিছু কিনে আনি।

মার্গারিট কয়েক মুহূর্ত কিছু চিন্তা করল। তারপর বলল, 'আচ্ছা এক কাজ করা যাক। খাবার-টাবারের ঝামেলা করে দরকার নেই। তুমি এক ডজন বীয়ার আর কিছু চীজ আর হ্যাম নিয়ে এস। আমরা সেগুলো নিয়ে কবিতা পড়তে বসব!'

আমি তাড়াতাড়ি জ্যাকেটটা পরে নিলাম। সেটা হিমের মতন ঠাণ্ডা! মার্গারিট বলল, 'একি, তুমি সেণ্ট্রাল হিটিং চালু করোনি! উ হু হু হু, আমার খুব শীত করছে! আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো!'

আমার বুকে মাথা রেখে মার্গারিট লাজুক লাজুক মুখ করে বলল, 'তোমাকে একটা সত্যি কথা বলব? সেদিন তোমার বাড়িতে আমি আমার বইখানা ইচ্ছে করে ফেলে গিয়েছিলাম!

—সত্যি? কি ভাগ্য আমার।

—সেদিন তো ডোরি আর লিন্ডার সঙ্গে এসেছিলাম। তোমার সঙ্গে বিশেষ কোন কথাই বলা হলো না! শকুন্তলার গল্পটা শোনার বিশেষ ইচ্ছে ছিল আমার।

তাই ভাবলাম, আবার আসবার একটা কিছু উপলক্ষ তো চাই—কতদিন ধরে গল্পটা জানার আগ্রহ ছিল—তুমি এত সুন্দর করে বললে!'

—তুমি আপোলিনেয়ারের কবিতাটা আরো অনেক বেশি সুন্দর করে পড়েছিলে! আপোলিনেয়ারকে ধন্যবাদ, উনি শকুন্তলার বিষয়ে না লিখলে তোমার সঙ্গে বোধহয় আমার আলাপই হতো না।

—এস, আজ আমরা শকুন্তলা আর আপোলিনেয়ারের স্বাস্থ্যপান করব।

৯

কয়েকদিন হলো বেশ জমিয়ে শীত পড়েছে। কিন্তু বরফ পড়া এখনো শুরু হয়নি। সবাই বলছে, ঠিক ক্রিসমাসের দিন তুষারপাত শুরু হবে। এখনো পনেরো যোলো দিন বাকি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সেমিনার ছিল বিকেলবেলা। রাশিয়া থেকে একজন কবি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, তাঁর কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভা। ক্রুশ্চেফের সফরের পর এই দুটি দেশের মধ্যে খুব শুভেচ্ছা সফর বিনিময় শুরু হয়ে গেছে। পল ওয়েগনারও কিছুদিনের মধ্যেই মস্কো যাবেন।

কবিটি কিন্তু নিতান্তই বাচ্চা। পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি বয়েস নয়। যদিও দোভাষী আছে, তবু সে নিজেই মাঝে মাঝে ছটফটিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলার চেষ্টা করে। বেশ জমে গেল সেমিনারটা। ছেলেটি চমৎকার হাসিখুশি! মাঝে মাঝে তার রসিকতায় শ্রোতারা হো হো করে হেসে উঠেছে। সুন্দর আনন্দময় পরিবেশ। দেখে কে বলবে যে, এই দুটি জাত পরস্পরের জন্মশত্রু!

আমি বসেছিলাম ক্রিস্তফের পাশে। ওর খুব সর্দি হয়েছে বলে গোড়াতেই আমাকে ফিসফিস করে বলেছিল— তুমি দূরে গিয়ে বসো, তোমার ছোঁয়াচ লেগে যাবে।

ও বেচারা সারাক্ষণ মুখ বেজার করে বসেছিল। কিছুই ঠিক মতন উপভোগ করতে পারছে না। অনবরত নাকে রুমাল চাপতে হচ্ছে।

সেমিনারের শেষে সাইডার পান। এখানে এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে মধ্যে কোন উৎসবে মদ্য পরিবেশন করা হয় না। সেটুকু সংস্কার রয়ে গেছে। শুধু দেওয়া হয় আপেলের রস অথবা কোকাকোলা। এখানে এরা বলে যে কোন বিদেশী যদি সকাল এগারোটার আগেই এক বোতল কোকাকোলা খাবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আমেরিকান সংস্কৃতি তাকে একেবারে গ্রাস করেছে।

সাইডার পার্টিতে আমি আর না থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'পাশে বিরাট বাগান। পেছনে নদী। খেলার মাঠ নেই। সমস্ত রকম খেলার জন্য নদীর ওপাশে স্টেডিয়াম আছে। অনেকে দুঃখ করে, আয়ওয়াতে মাত্র একটা স্টেডিয়াম, অন্যান্য বেশির ভাগ শহরেই স্টেডিয়াম তিন-চারটে।

বাগানের মধ্য দিয়ে শর্ট কাট করলে আমার বাড়িটা কাছে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভবন অর্থাৎ ক্যাপিটলের দক্ষিণ দিকে বলে আমার রাস্তাটার নাম সাউথ ক্যাপিটল। বাগানের নানা জায়গায় অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জন ছাত্রছাত্রী শুয়ে আছে। প্রত্যেকটি যুগলই দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ। ওদের দিকে তাকাতে নেই, তাকালেও খুব একটা দোষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইড বইতেই লেখা আছে যে, বিদেশী ছাত্র বা ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের পক্ষেও ডেটিং-এর সময় নেকিং-পেটিং-কিসিং পর্যন্ত চলতে পারে, তার বেশি দূরে না যাওয়াই ভালো! আমার শুধু আশ্চর্য লাগে ওদের চুম্বনের তীব্রতা দেখে। এতই দীর্ঘস্থায়ী যে মনে হয় পরস্পর পরস্পরের জীবনীশক্তি যেন একেবারে শুষে নিতে চাইছে। এতে কি ভালো লাগে? আর একটা ব্যাপার, এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ঘর আছে, এবং যে-কোন ছেলে বা মেয়ের ঘরে অন্য যে-কেউ আসতে পারে, কোন রকম বিধিনিষেধ নেই, তবু বাইরে, বাগানের মধ্যে এরা এই প্রদর্শনীটি করবেই। দেখতে অবশ্য আমার মোটেই খারাপ লাগে না।

মন্থরভাবে হাঁটছিলাম, হঠাৎ মনে হলো আমার গায়ে কি যেন পড়ছে। মুখ তুলে সামনে তাকালাম। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলাম না। চতুর্দিকে বাতাসে যেন অসংখ্য পেঁজা তুলোর টুকরো ভাসছে। মাটিতে সেগুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এই কি তুষারপাত? আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। অন্য কেউ কিছু গ্রাহ্যই করছে না যদিও, কিন্তু আমার জীবনে এই তো প্রথম তুষার দেখা। গায়ের ওপর পড়ছে, তাতে আমি ভিজে যাচ্ছি না তো! হয় ওভারকোটের হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অথবা খসে পড়ছে ফুলের পাপড়ির মতন! আজ বছরের প্রথম তুষারপাত, আমার কাছে কেন যেন মনে হলো একটা বিরাট সংবাদ। মার্গারিটকে জানাতে হবে তো, ও কি দেখেছে?

বাড়ির দিকে দৌড় লাগালাম। পৌঁছবার আগেই যদি থেমে যায়! চাবি দিয়ে দরজা খুলেই দেখলাম, মার্গারিট টেবিলের সামনে বসে বিনম্র আলোয় একটা বই পড়ছে। ঘরটা একেবারে ঝকঝকে তকতকে। সমস্ত পর্দাগুলো ফেলা।

ওর হাত ধরে টানতে টানতে জানলার কাছে নিয়ে এসে বললাম, 'কি করছ? বাইরেটা দেখোনি!'

পর্দাটা সরিয়ে দিলাম। তুষারপাত এখন আরো অনেক ঘন হয়ে এসেছে।

বাইরে শুধু এখন পেঁজা তুলো। মার্গারিট শিশুর মতন হাততালি দিয়ে উঠে বলল, 'ইস, কী সুন্দর, কী সুন্দর! আমি বোকার মতন এতক্ষণ দেখিনি!'

মার্গারিটও যে আমার মতন খুশি হয়েছে, এতে আমি খানিকটা কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। কোন কিছু ভালো লাগলেই প্রিয়জনকে তার ভাগ দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে যদি তাতে উৎসাহ না পায়, তাহলেই মনটা বড্ড খারাপ হয়ে যায়!

মার্গারিট আমার বুকে মাথা রেখেছে, আমি ওর চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বাইরের বরফ পড়া দেখতে লাগলাম। ও বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ করেছ? যখন স্নো পড়ে, তখন চারদিকটা কি অদ্ভুত নিস্তব্ধ হয়ে যায়? সবাই যেন একে সম্মান জানাচ্ছে। প্রত্যেক বছর প্রথম তুষারপাতের দিনটা আমার দারুণ এক্সাইটিং লাগে।'

—তোমাদের ফ্রান্সে এরকম পড়ে?

—নিশ্চয়ই! আরো অনেক ভালো করে পড়ে!

—দুষ্টুমণি। তোমাদের ফ্রান্সে তো সব কিছুই বেশি ভালো।

মার্গারিট ওর নীল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে চাইল, আমি ওকে ঠাট্টা করছি কিনা! আমি চুমু দিয়ে ওর চোখের পাতা বুজিয়ে দিলাম। ও আমার ওভারকোটের বোতামগুলো খুলতে লাগল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল—দা ল' ভিঈ পারক সলিতেয়ার এ গ্লাসে। দিঈ ফরম জ তু আ ল' অর পাসে...

—এর মানে?

—ইস, হঠাৎ এটা বললাম কেন? এটা দুঃখের কবিতা—মৃতদের কবিতা।

—তবু মানেটা বুঝিয়ে দাও।

—প্রাচীন নির্জন পার্ক, তুষারে ঠাণ্ডা, এর মধ্যে দিয়ে দুটি ছায়ামূর্তি এইমাত্র পার হয়ে গেল।

—জানি, এটা ভেরলেইনের কবিতা, অনুবাদ পড়েছিলাম।

মার্গারিট গলা জড়িয়ে ধরে প্রায় নাচতে নাচতে বলল—মঁ দিউ! কি চমৎকার! কেউ যদি কোন কবিতার লাইন শুনে চিনতে পারে, তা হলে কি যে ভালো লাগে, কি বলব!

—শোনো, শোনো, এটা বাই চান্স আমি একটা অনুবাদে পড়েছিলাম তাই, আমারই এক বন্ধু অনুবাদ করেছে।

—যাই বলো না কেন, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

—তোমার মতন এমন কবিতা-পাগল আমি আগে কখনো দেখিনি!

—তোমার একটা পুরস্কার পাওয়া দরকার। কি পুরস্কার নেবে বলো তো?

—আমি তোমাকে সম্পূর্ণ দেখতে চাই।

—সে পরে হবে, দাঁড়াও! চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

মার্গারিট জানে, আমি ঘরে ফিরেই শু-মোজা খুলে চটি পরি। তাড়াতাড়ি আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল।

—আরে, আরে, কি করছ কি?

—আমি আজ তোমার জুতো খুলে দেব।

—না, না, না।

কোন বাধাই মানল না। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, এ মেয়েটা কি শরৎচন্দ্র পড়েছে নাকি? শরৎচন্দ্রের নায়িকারা ছাড়া কোন মেয়ে কবে পুরুষের জুতো খুলে দিয়েছে? কিংবা সব দেশের মেয়েরাই এক! এই ক' মাসে একটা জিনিস বুঝেছি, ভাষার তফাত, কয়েকটি আচার-ব্যবহারের তফাত বাদ দিলে সব দেশের মানুষের মধ্যেই অনেক সাধারণ মিল আছে। হাসি কিংবা কান্নার মুহূর্তগুলো সকলেরই এক।

বাড়িওয়ালাকে লুকিয়ে আমার দরজার সামনের কার্পেটের চাবিটা আমি মার্গারিটকে দিয়ে দিয়েছি দেড় মাস আগেই। বাড়িওয়ালা বুড়ো অবশ্য একদিন দেখে ফেলেছে, মার্গারিট যে প্রায় সারাক্ষণই আমার ঘরে থাকে, সে কথাও জানে। কিন্তু এদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাবোধ এত তীব্র যে অন্যদের ঘরোয়া ব্যাপারে কিছুতেই মাথা গলায় না, কোন মন্তব্যও করে না।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার বাড়িটা বেশ কাছে বলেই মার্গারিট এখানে যখন-তখন আসে। মাঝখানে এক ঘণ্টা ক্লাস না থাকলে এখানে এসে বিশ্রাম নিতে পারে। এখানে স্নান করে। ওর কয়েক প্রস্থ জামাকাপড়ও এখানে রাখা আছে। ওর টাইপ রাইটারটা আমাকে ধার দিয়েছে, দু'জনে মিলে সুবিধেমতন ব্যবহার করি। আমার জন্য প্রায়ই ও গাদা গাদা বই কিনে আনে। সেগুলো এক সঙ্গে পড়া হয়। রাসিন নাকি শেক্সপীয়ারের চেয়েও বড় নাট্যকার। সেটা প্রমাণ করবার জন্য যে কত বই পড়ে শোনাল!

রান্নাবান্নার ভারও ও নিয়ে নিয়েছে। প্রথম প্রথম আমার রান্নার রকমসকম দেখে ও হেসে কুটি কুটি হতো! আমি ভেবেছিলাম, খিচুড়ি রান্নাই সহজতম উপায়। এখানে প্রায় সব কিছুই পাওয়া যায়। তবে নতুন করে নামগুলো শিখতে হয়। ওয়ার্ডবুকের বিদ্যেতে বিশেষ সুবিধে হয় না। বেগুনের ইংরেজি জানতাম ব্রিঞ্জাল, এখানে তাকে বলে এগ প্ল্যান্ট। কী অদ্ভুত নাম বাবা! এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার আরো আছে। এখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলার নাম ফুটবল, সেটা ওরা হাত দিয়ে খেলে। হেলমেট ও বর্ম পরা কিছু লোকের মাঠের মধ্যে হাতে বল নিয়ে

মারামারি করাই খেলা। ওটার নাম হ্যান্ড বল হওয়া উচিত ছিল, তবু ওরা ফুটবল বলবেই। আর আমাদের দেশের পা দিয়ে বল খেলাটার নাম নাকি সকার! ঠিক একই রকমভাবে এরা কমলালেবুকে বলে ট্যাঞ্জারিন, কিন্তু মৌসুম্বি লেবুকে বলে অরেঞ্জ। দই-এর ইংরেজি কার্ড নয়, ইয়োগার্ট। বিস্কুটকে বলবে কুকি। কত রকম তরকারির আগে নামই শুনিনি, যেমন আর্টিচোক, সেলারি ইত্যাদি। তবে, পটলের মতন চেহারার কোন কিছু এখনো দেখিনি! দেশ থেকে একটা বেঙ্গলি-টু-ইংলিশ ডিকশনারি আনিয়েছিলাম, তাতে আবার বেশির ভাগ আমেরিকান শব্দই নেই। সাধে কি আর একবার ইংরেজরা বলেছিল, আমেরিকান ফিলমগুলো ইংরেজিতে ডাব করা উচিত।

যাই হোক, ডিকশনারি দেখেই আমি টারমারিক অর্থাৎ হলুদ গুঁড়ো আর লেনটিল অর্থাৎ মুসুরির ডাল কিনেছিলাম। মুসুরির ডাল দেখে মার্গারিট বলেছিল —লেনটিল? লেনটিল সুপ তো ইটালিয়ানরা খুব খায়। তোমরাও খাও নাকি! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। কী বলব! বাঙালিকে মুসুর ডাল খাওয়াতে শেখাবে ইটালিয়ানরা! লেনটিল সুপ আর ফোঁড়ন দেওয়া মুসুরির ডাল কি এক হলো?

খিচুড়ি রান্না করা খুব সোজা। প্রথমে বড় সসপ্যানটাতে খানিকটা ডাল ঢেলে খুব করে ফোটালাম। তারপর তাতে ঢেলে দিলাম খানিকটা চাল। এবার ইনসট্যান্ট রাইস নয়, ক্যানসাসে উৎপন্ন বাসমতী চালের মতন সরু কাঁচা চাল। রং করার জন্য দিলাম হলুদ। খিচুড়িতে আলু থাকে বলে দিলাম চাকা চাকা করে কেটে কয়েকটা আলু আর পেঁয়াজ। মাঝে মাঝে হাতায় করে তুলে দেখছি সব ঠিক সেদ্ধ হয়েছে কিনা! ধৈর্য থাকে না। আরো কিছু যেন করা দরকার। কয়েকটা কাঁচা বীন ফেলে দিলাম ওর মধ্যে। সেদ্ধ করা ফ্রোজেন চিংড়ি ছিল। তাও দিলাম। তারপর কয়েক চামচ নুন। দু' একটা কাঁচালঙ্কা। আর কি দেওয়া যায়! হ্যা, টম্যাটো তো আছে। তা তো সব জিনিসেই চলে! এবার দিলাম কয়েকটা বড় সাইজের টম্যাটো। মাসরুম অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতাও খুব সুস্বাদু, এটাই বা বাদ যাবে কেন?

যখন রান্না শেষ হলো, তখন দেখলাম, যতটা খিচুড়ি হয়েছে তাতে পনেরো-কুড়ি জনের রীতিমতন ভূরিভোজন চলতে পারে। ঘন থকথকে একটা জিনিস। যতটা পারলাম খেলাম। অমৃতের মতন স্বাদ। নিজের রান্না বলে বলছি না, ও রকম খিচুড়ি পৃথিবীতে একবারই রান্না হয়েছে। বাকিটা ঢুকিয়ে রাখলাম ফ্রিজে।

পরদিন দেখি, সে জিনিসটা জমে শক্ত হয়ে আছে। ছুরি দিয়ে তা থেকে এক টুকরো কেটে নিলাম। বড় এক স্লাইস কেকের মতন। পরে সেটার সঙ্গে জল মিশিয়ে আবার ফুটিয়ে নেব ভেবে অন্য একটা সসপ্যানে রেখেছি, এমন

সময় মার্গারিট এসে উপস্থিত। দেখে বলল, 'এটা কি? কোন কেক?'

—না, এটার নাম খিচুড়ি।

—কে' স ক্য সে?

—তুমি বুঝবে না। খিচুড়ি খুব চমৎকার জিনিস। তোমাদের পিৎজা'র থেকে অনেক ভালো।

—দেন আই মাস্ট টেইসট ইট।

সেই ঠাণ্ডা শক্ত খিচুড়ি খানিকটা মুখে দিল। মুখ দেখে মনে হলো, ও যেন সক্রেটিসের হেমলক পানের দশা অভিনয় করছে। থু থু করে ফেলে দিয়ে বলল, 'এ রকম বিচ্ছিরি, বাজে, বীভৎস, জঘন্য, নুন পোড়া, অদ্ভুত গন্ধওয়ালা জিনিস আমি আগে কখনো খাইনি। কোন মানুষ খেতে পারে না। তুমি কি আত্মহত্যা করতে চাও?'

ফ্রিজ খুলে বড় সসপ্যানটা দেখে ও আবার চমকে উঠলো। চোখ গোলগোল করে বলল, 'তুমি কি তোমার এই সাধের 'কেচুড়ি'—এখানে যতদিন থাকবে কিংবা সারা জীবন ধরে খেতে চাও?'

আমি হাসতে লাগলাম। সেই সুযোগে মার্গারিট সমস্ত জিনিসটাই ফেলে দিল ট্রাস ক্যানে। আমি হা হা করে বাধা দিতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই যা হবার হয়ে গেছে।

মার্গারিট বলল, 'তুমি মায়োনেজ কি করে বানাতে হয় জানো? কিংবা দুধ দিয়ে ওমলেট? এসো শিখিয়ে দিচ্ছি।'

এখানে চিকেন সবচেয়ে সস্তা। তারপর হ্যাম, সবচেয়ে দাম বীফের। পাঁঠার মাংস পাওয়া যায় না, ভেড়ার মাংসে একটা বিটকেল গন্ধ, মাছ বিশেষ কেউ খায় না, আমাদের মাছের মতন স্বাদও নয়। আমি পর পর কয়েকবার মুর্গী কিনে আনলেই মার্গারিট বলত—তুমি কি গরীব হয়ে গেছ নাকি? তুমি কি টাকা জমিয়ে টেকসাসে তেলের খনি কিনবে?

টাকা-পয়সা সম্পর্কে মেয়েটি অদ্ভুত নির্মোহ। আমরা এক সঙ্গে রান্নাবাড়ি শুরু করার পর থেকেই মার্গারিট ওর পুরো মাসের মাইনে আমার টেবলের ড্রয়ারে রাখে, আমার টাকাও সেখানে রাখতে বাধ্য করে। তারপর যেমন খুশি খরচ হয়। ওর মতে, টাকা-পয়সার হিসেব করলে মানুষের আত্মায় কালো কালো দাগ পড়ে। ওর জামাকাপড় কেনার শখ নেই, কোন রকম জিনিসের প্রতি লোভ নেই, সব সময় তবু অদ্ভুত এক আনন্দে মেতে থাকে।

এমনও হয়েছে, কোন কোন মাসের কুড়ি-বাইশ তারিখে আমরা একেবারে নিঃস্ব। বাজার করার পয়সা নেই, সিগারেট কেনারও পয়সা নেই। মাস না ফুরোলে

আর কোন জায়গা থেকে কিছুই সম্ভাবনা নেই। আমার তো এরকম অভ্যেস আছেই, কিন্তু মার্গারিটও এই দৈন্য খুব উপভোগ করে। শুধু কফির সঙ্গে শুকনো পাঁউরুটি চিবোতেই ওর দারুণ আনন্দ! কখনো অবস্থা চরমে উঠলে ও আমাকে ষড়যন্ত্রের সুরে বলে—কার কার বাড়িতে নেমন্তন্ন জোগাড় করা যায় বলো তো? ডোরিকে ফোন করব? কিংবা ওয়াল্টার ফ্রীডম্যান তোমাকে একদিন বাড়িতে ডাকবে বলেছিল না? কিংবা ক্রিস্তফ? ক্রিস্তফ তো খুব সলিড!

কখনো কখনো আমরা হ্যাংলার মতন ঠিক সন্ধেবেলা খাওয়ার সময় নিচের তলায় ক্রিস্তফের সঙ্গে দেখা করতে যাই। ক্রিস্তফ খুব সাজানো-গুছোনো মানুষ, ঝকঝকে ঘর, নিজে একটা দুটো সিগারেট খেলেও সব সময় চার পাঁচ প্যাকেট সিগারেট মজুত রাখে। ওর কাছে যে-কোন সময় পঞ্চাশ, একশো ডলার ধার পাওয়া যায়। এবং ওর ঘরে গেলেই কিছু না কিছু খেতে বলে।

আমরা গেলে ক্রিস্তফ খুশিই হয়। ও এখনো খুব নিঃসঙ্গ। মাঝে মাঝে মুখখানা খুব বিষণ্ণ দেখায়। মেয়েদের সম্পর্কে ওর ঝোঁক খুব বেশি, কিন্তু ঠিক কোন সঙ্গিনী পায়নি। প্রথম কিছুদিন মার্গারিটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার অনেক রকম চেষ্টা করেছিল, এখন বুঝে গেছে, এখন মার্গারিটের প্রতি ওর ব্যবহার সম্ভ্রমপূর্ণ।

একদিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল। সেদিনও আমাদের হাতে পয়সা কড়ি কিচ্ছু নেই। সন্ধে থেকে মার্গারিট আর আমি গালে হাত দিয়ে বসে আছি। আমাদের শেষ ভরসাস্থল ক্রিস্তফও বেড়াতে গেছে শিকাগোতে। ভাঁড়ার শূন্য, রাত্রে কি খাব তার ঠিক নেই। এমন সময় টেলিফোন এল পল ওয়েগনারের স্ত্রী মেরি ওয়েগনারের কাছ থেকে। মেরি জিজ্ঞেস করলো—নীললোহিত, তুমি কি একলা আছ? তোমার কি খাওয়া হয়ে গেছে? তুমি কি একবার আসবে? আমার ভীষণ ভীষণ একা লাগছে। আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি মরে যাব! চলে এস, এক্ষুনি এস—

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে আমি মার্গারিটকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যাবে নাকি? বুড়ি কিছু খাওয়াতে পারে।'

মার্গারিট ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'না, না, না, না, তুমি খবরদার আমার নাম করো না! মেরি ওয়েগনার মেয়েদের একদম পছন্দ করে না, তুমি জানো না? ভীষণ প্যাগলামি করবে তা হলে। তুমি ঘুরে এস।'

—না, আমিও যাব না।

—ঘুরে এস না, আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য।

তবু আমার যাবার ইচ্ছে ছিল না, মেরিকে নানা রকম অজুহাত দেবার চেষ্টা করলাম, কিছুতেই সে শুনল না। ওদের বাড়িতে আমি প্রায়ই যাই, মেরি কক্ষনো

আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না, সুতরাং আমি বেশি রূঢ় হতে পারলাম না। মার্গারিটকে বললাম, 'বসো, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি।'

ট্যাক্সি ধরার পয়সা নেই, অনেকখানি রাস্তা প্রায় দৌড়ে দৌড়ে যেতে হলো। শীতের জন্য দৌড়তে খারাপ লাগে না। এই শীতের মধ্যেও মেরি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

এখন অনেক চালু হয়ে গেছি। এখন আর মাদার-টাদার নয়। এখন দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলি—হাই মেরি! তারপর কাছে গিয়ে ওর গালে ঠোনা মেরে চুমু দিই। মেরি আমার হাত ধরে বলল, 'নটি বয়! এত দেরি করলে কেন? ট্যাক্সি নিতে পারোনি?'

ট্যাক্সি খুঁজেও পাইনি, এই অজুহাত এখানে খাটে না। টেলিফোন করলে দু'মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি বাড়ির সামনে আসে।

বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ। পল্ ওয়েগনার ওয়াশিংটন ডি-সি-তে গেছে জানি। মেরি বলল, 'দেখো পল্ একটাও চিঠি লেখেনি, টেলিফোন করেনি। মেয়েটাও কিছুতেই আমার কাছে থাকবে না। মানুষ দিনের পর দিন একলা থাকতে পারে?'

আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে এসে বলল, 'শুধু নিজের জন্য কারো রান্না করতে ভালো লাগে? এই শীতের মধ্যে কারুর একা খেতে ভালো লাগে?'

টেবলের ওপর অনেক রকম খাদ্য। দু'জনের জন্য ডিনার প্লেট পাতা। মেরি বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন, বসো।'

মেরির কণ্ঠস্বর ঈষৎ জড়ানো। টেবলের ওপর একটা প্রায়-খালি জিনের বোতল। সারাদিন ধরে বোধহয় ঐ জিন খেয়েছে। বাড়ি থেকে কখনো বেরোয় না, পল্ না থাকলে এ বাড়িতে কেউ আসেও না, দিনের পর দিন বাড়িতে সম্পূর্ণ একলা কাটানো নিশ্চয়ই কষ্টকর। যথারীতি আজও সে প্যান্ট-শার্ট পরে আছে। কোনদিন ওকে স্কার্ট বা গাউন পরতে দেখিনি। খর্বকায় বলে ওকে প্রায় একটি কিশোরের মতন দেখায়।

এত ভালো ভালো খাদ্য, কিন্তু কিছুতেই আমার মুখে রুচছে না। বারবার মনে পড়ছে, মার্গারিট অভুক্ত হয়ে বসে আছে। চোখে জল এসে যাচ্ছে প্রায়। আমি কী স্বার্থপর! সেদিনই প্রথম বুঝলাম, অপরকে বঞ্চিত করে নিজে বেশি খাওয়ার মর্ম কি! ইচ্ছে করছে, সমস্ত খাবারদাবার ছুঁড়ে ফেলে দিই। মেরি বারবার তাড়া দিচ্ছে—একি, তুমি খাচ্ছো না কেন? তোমার যদি জিন না পছন্দ হয়, তুমি স্কচ নিতে পারো!

ও তো কিছুই বুঝবে না।

খাওয়া কোনক্রমে শেষ করে বললাম, 'এবার আমি যাই!'

—এক্ষুনি কি যাবে? বোকা ছেলে, জানো না, খাওয়া শেষ করে তক্ষুনি যাবার কথা বলতে নেই?

—আমার একটা জরুরি লেখা আজই শেষ করতে হবে যে!

—জরুরি লেখা অপেক্ষা করতে পারে। কোন মেয়েবন্ধু অপেক্ষা করে নেই তো?

—না, না।

—কোন মেয়েবন্ধু পাওনি এখনো?

—কোথায় আর পেলাম? কেউ পাত্তা দেয় না।

—পুয়োর, পুয়োর নীললোহিত। আমারই মতন লোন্‌লি!

মেরি কাছে এসে আমার ঠোঁটে চুমু খেল। এমনিতে ব্যাপারটা নির্দোষই বলা যায়। কিন্তু মেরি আমার মুখের মধ্যে ওর জিভটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। বুঝলাম, সেই যে একদিন মাদার বলেছিলাম, তার প্রতিশোধ!

মেরি বলল, 'এখানে শীত করছে? চল, স্টোভের পাশে গিয়ে বসি। লিফট মি, টেক মি দেয়ার! ওন্ট য়ু?'

বসবার ঘরে কৃত্রিম ফায়ার প্লেসের মধ্যে হীটার বসানো। মেরি খুব হাল্কা, তাই ওর কথা মতন ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম। আমার গলা জড়িয়ে ধরে ও আবার আমাকে চুমু খেতে লাগল। জানি এখন ও কি চায়। সোফার ওপর ওকে নামিয়ে দিয়ে বললাম, 'দুঃখিত, আমাকে যেতেই হবে, ভীষণ কাজ, যেতেই হবে...।' প্রায় দৌড়ে পালিয়ে এলাম।

ফিরে এসে দেখি মার্গারিট ঘুমিয়ে পড়েছে টেবলে মাথা দিয়ে। যেন বিষণ্ণ সুন্দর একটা ছবি। চুলগুলো লুটিয়ে পড়েছে বুকের ওপর। ওর পিঠে আলতো করে হাত ছোঁয়াতেই চমকে জেগে উঠল। বলল, 'তুমি খেয়ে এসেছ তো?'

—আমি বললাম, 'আমি খুব খারাপ, স্বার্থপর, পাজী, নোংরা।'

—কেন, কি হয়েছে কি?

—কেন আমি তোমাকে ফেলে চলে গেলাম? কেন আমি একা একা...

—তাতে কিচ্ছু হয়নি। আমি তো কবিতা পড়ছিলাম এতক্ষণ, খুব ভালো লাগছিল।

—পাগলি মেয়ে, খালি পেটে কি কবিতা পড়া যায়?

ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললাম, 'তোমার জন্য একটা কেক আর এক প্যাকেট সিগারেট চুরি করে এনেছি।'

ও হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল! আর কি চাই? ইউ ডিজার্ভ আ কিস্‌।'

—দাঁড়াও, আগে মুখটা ধুয়ে আসি।

সিঙ্কে খুব ভালো করে মুখ ধুয়ে মেরির চুম্বনের স্বাদ মুছে ফেললাম। তারপর এসে মার্গারিটকে পুরো ঘটনাটা বললাম। ও বলল, 'এ তো খুব স্বাভাবিক। এ তো এখানে প্রায়ই হয়, এদের প্রেমহীন জীবন কিনা! চল্লিশ বছর বয়েস পার হয়ে গেলেই আমেরিকান মহিলারা বড্ড নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েরা আলাদা হয়ে যায়, স্বামী বাইরে বাইরে ঘোরে, ওদের আর তখন কী করার থাকে বলো! তাছাড়া মেরি তো আজ ড্রাঙ্ক ছিল...'

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমরা তৃষ্ণার্তের মতন পর পর দু' তিনটে করে সিগারেট টানলাম। মার্গারিট বলল, 'ইস, এই সঙ্গে যদি একটা ওয়াইন বা এক বোতল কিয়াস্তি থাকতো! আচ্ছা, কল্পনা করে নাও না, আমরা শ্যাম্পেন খাচ্ছি, এই বোতল খোলা হলো, পং! এবার গেলাসে ঢালছি—তির তির তির তির—এবার চুমুক দাও।'

আমি ওর বুকে মুখটা ডুবিয়ে ছটফট করতে করতে বললাম, 'পাগলি, একদম পাগলি মেয়েটা! মার্গারিট, লক্ষ্মী সোনা, তুমি আমাকে এখনো ভালোবাসো না?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলে, 'কি জানি! এখনো বুঝতে পারি না!'

—আমি যে আর থাকতে পারছি না!

—আর একটু ধৈর্য ধরো! প্লীজ...

আমরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়েও এই একটা জায়গায় আটকে আছি। ভালোবাসার ওপব মার্গারিটের দারুণ বিশ্বাস। আমি আবার ভালোবাসা ঠিক কাকে বলে জানি না। ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর আমি আর-কোন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিনি, মার্গারিটও অন্য কোন ছেলের সঙ্গে একদিনও বাইরে কোথাও যায়নি, তবু এর নাম ভালোবাসা নয়? প্রথম যেদিন ওকে বলেছিলাম—তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি—ও আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল—বলো না, ও কথা বলো না, যদি মিথ্যে হয়? পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখের জিনিস যদি ভালোবাসাটাও মিথ্যে হয়ে যায়।

আমি একটু আহত হয়ে বলেছিলাম, 'মিথ্যে কেন হবে? তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না?'

ও বিষণ্ণভাবে উত্তর দিয়েছিল—কি জানি! সব সময় নিজেকে তো এই প্রশ্নই করছি। আশা করছি একদিন উত্তর পেয়ে যাব! একথা ঠিক, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। তোমার এখানে আসতে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে, তোমার আদর পেতে আমার যতখানি ভালো লাগে, তেমন আর কিছুই আমার ভালো লাগে না এখন। কিন্তু ভালো-লাগা আর ভালোবাসা কি এক?

ভালো-লাগা আর ভালোবাসার সূক্ষ্ম তফাত আমি বুঝতে পারি না।

যারা ওকে চেনে, অনেকদিন দেখছে, তারা সবাই জানে, মার্গারিট অত্যন্ত ধার্মিক, স্বভাবটাও নির্মল, কিছুতেই মিথ্যে কথা বলবে না একটাও। অথচ ও দারুণ বোহেমিয়ান এবং প্রচণ্ড রোমান্টিক। একটা ভালো কবিতার লাইন পড়ে পাগল হয়ে যায়। আমাদের দেশের মান অনুযায়ী মদ্যপান ও সিগারেট খাওয়া তো গর্হিত অপরাধ, বিশেষত কোন ধার্মিক মেয়ের পক্ষে; কিন্তু ওর এ সম্পর্কে কোন গ্লানি নেই। ও বলে—এই জন্যই তো আমি নান হইনি, আমার দু' বোন হয়েছে, আমিই শুধু বাদ। আমি গোমড়া মুখে ঈশ্বরের পুজো করতে পারব না। ঈশ্বর আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আনন্দ পাবার জন্য না কষ্ট পাবার জন্য!

আমার মতন নাস্তিক এবং রীতিদ্রোহী ওর আরো কিছু সংস্কার ভেঙে দিয়েছে। আমরা এখন এক বিছানায় শুয়ে ঘুমোই। মার্গারিট একদিন আমাকে স্নান করিয়ে দিয়েছিল পর্যন্ত। স্নানের ঘরে ঢুকে আমি তোয়ালে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, দরজা ফাঁক করে ওর কাছে তোয়ালে চেয়েছিলাম, ও তোয়ালে নিয়ে জোর করে ভেতরে ঢুকে এসেছিল।

আর একদিন আমার পেড়াপেড়িতে ও আমার সামনে সমস্ত পোশাক খুলে দাঁড়িয়েছিল। আমি বলেছিলাম—তুমি সুন্দর। আমি একটা সুন্দর জিনিস দেখব না কেন? এতে কি দোষ আছে?

তবু একটা জায়গায় একটা বাধা রয়ে গেছে। ওর ধারণা নারী-পুরুষের মিলন একটা পবিত্র ব্যাপার। নিছক লোভ বা বাসনার জন্য এটাকে ছোট করে ফেলা উচিত নয়। সত্যিকারের ভালোবাসা থাকলেই জিনিসটা স্বর্গীয় আনন্দময় হতে পারে। আমরা আরো কিছুদিন অপেক্ষা করি না? মানুষের জীবন এত বড়, ভালোবাসার সাড়া পাবার জন্য আমরা কি অন্তত একটা বছরও অপেক্ষা করতে পারবো না?

আমি বলেছিলাম, 'মার্গারিট, তুমি শরীরের এই একটা ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন? আজকাল তো বাচ্চা-টাচ্চা হবার ভয় নেই, কত রকম জিনিস বেরিয়েছে।'

ও তক্ষুনি দৃঢ়ভাবে বলেছে, 'তুমি পাগল হয়েছ? আমি রোমান ক্যাথলিক, আমি অন্য কিছু ব্যবহার করব? কক্ষনো না! যদি ভালোবাসার কথা টের পাই, আমি তখন কোন কিছুই গ্রাহ্য করব না—আমি বিয়ে-ফিয়েও গ্রাহ্য করি না, যদি বাচ্চা হয়, আমি তাকে পবিত্র প্রাণ হিসেবে মানুষ করব, যদি পথের ভিখিরিও হতে হয়, তবু তাকে নিয়ে আমি পথে পথে ঘুরব, কোনদিন অস্বীকার করব না..'

এক-একদিন আমি থাকতে পারিনি, ওর ওপর জোর করতে গেছি। সব রকম আদরের পর কি থেমে থাকা যায়? মার্গারিট তখন কেঁদে ফেলেছে। কান্নার সময়ে ফুলে ফুলে উঠেছে ওর শরীর। আমি লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেছি। এক সময় ও অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে বলেছে—তুমি জানো না আমারও কত কষ্ট হয়। এক এক সময় থাকতে পারি না, মনে হয় নির্লজ্জের মতন তোমাকে নিজেই মুখ ফুটে বলে ফেলি, টেক মি, টেক মি! তারপরই নিজের মুখ চাপা দিই। যদি ভালোবাসার অপমান করে ফেলি। এই দেখ, ছুঁয়ে দেখ, এখনো আমার শরীরে কত তাপ, ঠিক যেন জ্বালা করছে...শোনো নীল, তুমি যদি সহ্য করতে না পার, যদি তোমার শরীরের দাবি খুব বেশি হয়, তুমি অন্য যে-কোন মেয়ের কাছে যেতে পার, এরকম মেয়ে তো এখানে অনেক পাবে—আমি কিন্তু তবুও আসব, আমাকে তাড়িয়ে দিও না—

সেই সময় মার্গারিটের মুখ কী অপরূপ সুন্দর দেখায়। মনে হয় বাঁতচেল্লি ওকে দেখেই সব ছবি এঁকেছেন। মার্গারিটকে ছেড়ে আমি কি অন্য আর কোন মেয়ের কাছে যেতে পারি? আমি কি পশু!

মাসের গোড়ার দিকে যখন আমাদের হাতে বেশ টাকা-পয়সা থাকে, তখন আমরা ঘন ঘন পার্টি দিই আমার ঘরে। আমরা বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি করি না, অন্য বড় বড় পার্টিতেও যাই না, তাই অন্যদেরই ডাকি আমাদের এখানে। মার্গারিট এই ধরনের পার্টি খুব ভালোবাসে।

এখন আর শুধু তুষারপাত নয়, রাস্তাঘাটে কয়েক ফুট বরফ জমে আছে। উইলো গাছগুলোর গায়ে থোকা থোকা ফুলের মতন বরফ। নানারকম তাদের আকৃতি। গাড়ি চলার রাস্তাগুলো থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বরফ পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পথে একটা দোকানের মাথায় একটা বিরাট ঘড়ির মতন ব্যারোমিটার বসানো, তাতে দেখা যায় তাপাঙ্ক কত নামছে। যেদিন কাঁটাটা শূন্যের নিচে নেমে গেল, সেদিন আমরা সেই উপলক্ষে একটা মস্ত বড় পার্টি দিলাম।

কয়েক ডজন বীয়ার, দু' তিন বোতল স্কচ আর কিছু ওয়াইন কিনে আনলাম। মার্গারিট রান্না করল চিংড়ি মাছ আর মাসরুম মেশানো ভাত ; ম্যাসড্ পোটাটো বা আলুসেদ্ধ মাখা, মাছের রোস্ট, স্যালাড, আর গরম গরম স্টেক বা মাংসের চাক্তি ভেজে দেবে। তারপর স্ট্রবেরি আর ক্রীম। বেশ এলাহি ব্যবস্থা। পাঁচটি যুগল এসেছে, আমার ঘরে জায়গা কম বলে বসতে হয়েছে মেঝেতেই। কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলে আড্ডা জমে।

ক্রিস্তফের সর্দি সারেনি বলে ও আসতে চাইছিল না। নিচ থেকে জোর করে

ধরে আনলাম। এইটুকু জায়গায় নাচের সুবিধে নেই বলে সবাই মিলে গান ধরলাম। ডোরি বেশ ভালো পল্লীগীতি গায় এবং নিগ্রো ব্লু। একটা গান বার বার গাইতে লাগল—ভার্জিন মেরি হ্যাড ওয়ান সান, ও হেলিলুইয়া। সাম কল হিম মাইকল, আই কল হিম ডেভিড, ও হেলিলুইয়া।

মার্গারিট গাইল কয়েকটা ফরাসী গান। তার মধ্যে একটা গান প্যারিসের বেশ্যাদের, অথচ ফ্রান্সে স্কুলের ছেলেমেয়েরাও নাকি গানটা জানে : জ্য শার্শঅ ফরতুন তুতান্তু দু শা নোয়া ও ক্লেয়ার দ্য লা লুন আ মমার্ত ল্য স্যয়ার...কী করুণ সুর গানটার। এই গানটারই একটা লাইন পরে অনেকদিন আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করেছি : জ্য নে পা দারজঁ—আমার টাকা নেই, আমার টাকা নেই।

সবাই আমাকে একটা গান গাইবার জন্যও চেপে ধরল। খুব বেশি সাধাসাধির প্রয়োজন হলো না অবশ্য, আমি প্রায় আর একবার সাধিলেই গাহিব অবস্থায় বসে ছিলাম। কিছু না ভেবেচিন্তেই আমি একটা গান ধরলাম :

> অ্যারাইজ ই প্রিজনার অব স্টার্ভেশান
> অ্যারাইজ ই রেচেড অব দা আর্থ
> ফর ফাস্ট ইজ থাণ্ডার্স কনডেমনেশান
> এ্যান্ড দি নিউ ওয়ার্ল্ড ইজ ইন দা বার্থ...

খানিকটা গাইবার পর দেখলাম, কেউ কোন সাড়াশব্দ করছে না, সবাই গম্ভীর। একটু খটকা লাগল। আমার সঙ্গীত-প্রতিভার এমন সমাদর আগে তো কখনো দেখিনি!

একটু থামতেই স্ট্যান বলল, 'এটা কি গান? একটা বাংলা গান গাইছো না কেন?'

ক্রিস্তফ আমার দিকে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনার সুরে বলল, 'এটা তো কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল—এটা কি এখানে গাইতে হয়?'

—কেন, কি হয়েছে?

—তোমার পেছনে পুলিশ লাগলে বুঝতে পারবে।

মার্গারিট বলল, 'কিন্তু গানটা তো চমৎকার।'

সম্ভবত কিছুদিন আগে সেই রাশিয়ান কবিকে দেখে কিংবা মার্গারিটের গানে দারিদ্র্যের কথা ছিল বলেই গানটা আমার মাথায় এসেছিল। যাই হোক, গানটা একবার গেয়েছি যখন, তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করতেই হবে। আমি বললাম, 'পৃথিবীতে যত ভালো গান আমি শুনেছি, এটা তার মধ্যে একটা। ভালো গান হিসেবেই এটা বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। তাছাড়া এ গানটা পল রোবসনের রেকর্ড আছে, আমেরিকানরা কি শোনে না?'

ক্রিস্তফ বলল, 'তা শুনতে পারে। কিন্তু তুমি একজন বিদেশী, তোমার ব্যাপার আলাদা। যদি শুধু শুধু ঝঞ্ঝাটে পড়ো!'

মার্গারিট বলল, 'আমেরিকানরা অবশ্য এরকম অনেক বোকামি করতেও পারে। একবার আমি শুনেছিলাম নিউ ইয়র্কে...'

ক্রিস্তফ চুপ করে গেল। সে নিজে কমিউনিস্ট দেশের লোক, সেইজন্যই সে এখানে কোনরকম বিরূপ মন্তব্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে না।

কিন্তু মার্গারিটের কথায় স্ট্যান বেশ চটে গেল। সে শ্লেষের সঙ্গে বলল, 'যে-কোন সুযোগে আমেরিকানদের নিন্দে করতে পারলে ফ্রেঞ্চ পিপলদের বেশ আনন্দ হয়, তাই না? সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে আমরাই ফ্রান্স উদ্ধার করেছিলাম, প্যারিস শহরটাকে বাঁচিয়ে ছিলাম কিনা। উপকারীকে আক্রমণ করাই নিয়ম।'

মার্গারিট উত্তর দিতে যেতেই ঝগড়া বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলো। সবাই মিলে থামান হলো ওদের। জর্জি নামে একটি ছেলে ঈষৎ নেশাগ্রস্ত জড়িত গলায় বলল—টু হেল্ উইথ আমেরিকা, টু হেল্ উইথ ফ্রান্স। আর উই গড ড্যাম ডিপ্লোম্যাটস্ হিয়ার? সিংগ বেবি, সিংগ।

সে ডোরিকে একটা ধাক্কা মারল। ডোরি আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'নীল, তোমাকে একটা ব্যাপারে অ্যাসিওর করতে পারি, তুমি যে-রকম ইচ্ছে গান গাইতে পারো, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। ইট্‌স আ ফ্রি কান্ট্রি। আমরা চাইছিলাম, তুমি তোমার নিজের দেশের একটা বাংলা গান গাইবে।'

আমি যদি ঐ গানটারই বাংলায় নজরুলের অনুবাদ শুনিয়ে দিতাম, কেউ কিছু বুঝত না। চেপে গেলাম। অন্যরা গান শুরু করল। কিন্তু সুর কেটে গেছে, আর জমছে না।

পার্টিটা তার পরেও আর জমল না। খাওয়াদাওয়ার একটু পরই ক্রিস্তফ হঠাৎ সিঙ্কে গিয়ে বমি করল। ও সাধারণত হুইস্কি-টুইস্কি বেশি খায় না—কিন্তু কোনক্রমে মাথায় নেশা চড়ে গেছে। ওকে শুইয়ে দিয়ে আসা হলো ওর ঘরে।

তার একটু পরেই ডোরির একটা টেলিফোন এল আমার ঘরে। দারুণ দুঃসংবাদ। ডোরির বাড়ির একটি মেয়ে টেলিফোন করে জানাল যে লিন্ডা সাঙ্ঘাতিক একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে, বাচবে কিনা ঠিক নেই। লিন্ডা সেই টেক্সাসের মেয়েটি, যে মার্গারিট আর ডোরির সঙ্গে প্রথম এসেছিল আমার এখানে। পরেও অনেকবার দেখা হয়েছে, খুব ডাকাবুকো ধরনের মেয়ে, দুর্দান্ত গতিতে গাড়ি চালায়। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে সিডার র‍্যাপিডসে, ডোরি তক্ষুনি এখানকার একজনের গাড়িতে চলে গেল।

আস্তে আস্তে চলে গেল অন্য সবাই। মার্গারিট একটু রয়ে গেল জিনিসপত্র

খানিকটা গুছিয়ে রাখবার জন্য। জিনিসপত্র তুলতে আমি ওকে সাহায্য করলাম খানিকটা। মার্গারিট ডিসগুলো এখনই ধুয়ে রাখবে—এবং আমার সাহায্য ও চায় না। আমি ওকে সেখানেই রেখে ঘরে ফিরে এসে গেলাসে আরো খানিকটা স্কচ ঢেলে বসলাম। উৎসব অকস্মাৎ ভেঙে গেলে মেজাজটা ভালো লাগে না।

হঠাৎ একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি বেসিনের সামনে গিয়ে দেখি, মার্গারিট ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে?'

আরও বেশি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল—লিন্ডা...লিন্ডা—এত ভালো মেয়ে...

একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, 'ও তো এখনও...মানে...ওরা বলল...বেঁচে উঠবে।'

—এখন কত কষ্ট পাচ্ছে? লিন্ডা কত কষ্ট পাচ্ছে!

কোন্ ভাষায় ওকে সান্ত্বনা দেব! জানিই তো মার্গারিটের মনটা কত নরম। কিছুতেই ও অন্য কারুর বিপদ বা কষ্টের কথা সহ্য করতে পারে না।

ওকে ধরে ধরে নিয়ে এসে সোফায় বসিয়ে দিলাম। কিছুতেই ওকে সামলানো যায় না। একটু আগে যে আমেরিকানদের নিন্দে করছিল, এখন সে একটি আমেরিকান মেয়ের জন্য আকুল হয়ে কাঁদছে।

ওকে জোর করে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাওয়ালাম। বেশ খানিকক্ষণ বাদে খানিকটা শান্ত হলো। ওকে কথা দিলাম, কাল সকালেই ওকে সিডার র‍্যাপিডস-এর হাসপাতালে নিয়ে যাব। এবং ওকে কবিতা পড়ে শোনাতে হলো।

রাত দেড়টা বাজে। হস্টেলে ওকে একটার মধ্যে ফিরতে হয়। শনিবার দিন অতিথিরা রাত দুটো পর্যন্ত হস্টেলের মধ্যে থাকতে পারে। আমিও গেছি কয়েকবার ওর ঘরে; মেয়েদের হস্টেলে জীবনে আগে কখনো ঢুকিইনি। তাও রাত দুটো পর্যন্ত সেখানে থাকা! আমার নিজেরই খুব লজ্জা করছিল, কিন্তু অন্য কেউ কিছু মনেই করে না।

আজ অবশ্য মার্গারিট হস্টেলে ফিরবে না। আজ আবার যাবে বব বাকল্যান্ডের বাড়ি পাহারা দিতে। বব বাকল্যান্ড বিরাট ধনী, প্রায়ই সপরিবারে ইওরোপ যান, সেই সময় বাড়ি পাহারা দিয়ে মার্গারিটের একশো ডলার উপার্জন হয়।

তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তবু বেশি হুইস্কি খেয়েছিলাম বলে হঠাৎ একবার বুঝি আমার ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। মার্গারিট বলল, 'এই, তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ। আমি তাহলে চলি এবার।'

বই মুড়ে রেখে মার্গারিট উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

মার্গারিট প্রবল আপত্তি জানাতে লাগল। কিন্তু সেটা তো কোন কথা হতে পারে না। বাইরে নিঃশব্দে বরফ পড়ছে। তুষারপাতের সময় মোটেই বেশি শীত করে না। কনকনে শীত করে যখন হাওয়া দেয়, তখন মনে হয় নাকটা যেন খসে পড়বে শরীর থেকে। এখন তুষারপাত হচ্ছে সোজাসুজিভাবে, হাওয়ায় উড়ছে না, সুতরাং কোন বিপদ নেই। গরম গেঞ্জি, তারপর জামা, তারপর সোয়েটার, তার ওপরে ওভারকোট চাপিয়ে, গলায় মাফলার এবং হাতে গ্লাভস পরে নিলাম। মার্গারিটকেও পরিয়ে দিলাম যাবতীয় গরম জামাকাপড়। ওর ওভারকোটের নিচে জড়িয়ে দিলাম আমার দেশ থেকে আনা শাল।

নিঃশব্দে বরফ পড়ছে। রাস্তার আলোগুলো মিটমিট করছে এখন। চার-পাঁচ হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। মার্গারিটের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। এত জামা সত্ত্বেও শীতে মাঝে মাঝে কাঁপন ধরাচ্ছে অবশ্য, তবু তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড এক ভালো-লাগা। এর নামও কি ভালো-লাগা না ভালোবাসা? মাঝে মাঝে আমি ওর মুখ চুম্বন করছি। ও গ্লাভস পরেনি বলে হাতটা গরম করার জন্য ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমার কোটের মধ্যে। এক জায়গায় খানিকটা জলমতন জমেছে, সেখানটা আমি মার্গারিটকে কোলে করে নিয়ে গেলাম। আমাকে সব সময় শক্ত বরফের ওপর সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। একবার পা পিছলোলেই আলুর দম!

আয়ওয়া নদীটা একদম জমে শক্ত হয়ে গেছে। যেন ধপধপে শ্বেতপাথরের তৈরি একটা রাস্তা। মার্গারিট বলল, 'চলো, আমরা ব্রীজের ওপর দিয়ে না গিয়ে, নদীর ওপর দিয়েই হেঁটে যাই।'

—চলো।

ব্রীজ থেকে নামতে গিয়েও থেমে গিয়ে ও বলল, 'না, থাক। যদি তোমার কোন বিপদ হয়?'

—কেন?

—কোথাও বরফ একটু পাতলা থাকলে হুস করে ভেঙে ভেতরে ঢুকে যেতে পার। তখন আর কোন উপায় থাকবে না। দিনের বেলা আসব।

—ওরে পাগলি, তাতে শুধু আমার একার বিপদ হবে কেন? তুমিও তো পড়ে যেতে পারতে।

—সে আমার যা হয় হতো, কিন্তু তোমার কোন বিপদ হবে, এ কথা ভাবলেই আমার...

কি এর নাম? ভালোবাসা না?

অর্ধেকের বেশি পথ আসবার পর মার্গারিট থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আপন মনে বলল—আমি একটা ব্লাডি ফুল।

—কেন, কি হলো?

—এই ঠাণ্ডার মধ্যে তোমাকে নিয়ে এলাম কেন? আমিই তো তোমার ওখানে থেকে গেলেই পারতাম। কাল ভোরে চলে আসতাম।

—চলো, ফিরে চলো।

—এখন ফিরতে গেলে বেশি পথ যেতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ করো না—তুমি এসো—তুমি বাকল্যান্ডের বাড়িতেই থেকে যাবে। তোমাকে তো ভোরে ফিরতেও হবে না। রাজি!

—নিশ্চয়ই রাজি। কোন অসুবিধে নেই তো?

—কিসের অসুবিধে! বাড়িতে তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

বাইরে জুতোর বরফ ঝেড়ে ফেলে ঢুকলাম ভেতরে। হঠাৎ ভেতরে এলে যেন বেশি শীত করে। আমি মার্গারিটের মুখে আর বুকের জামার মধ্যে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ওকে গরম করে দিতে লাগলাম। ও আমার বুকে জোরে জোরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

একটা কুকুর ডেকে উঠল ঘাউ ঘাউ শব্দে। অন্তরাত্মা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। মার্গারিট বলল, 'ভয় নেই, বাঁধা আছে।'

বব্ বাকল্যান্ডের বাড়িটা হলিউডের ফিলমের বাড়ির মতন সাজানো। বিরাট বিরাট ঘর। বসবার ঘরের বাইরেই অলিন্দে একটা বার কাউন্টার রয়েছে, তাতে অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটি বোতল সাজানো। মার্গারিট বারের ওপাশে গিয়ে বলল, 'ইয়েস স্যার, হোয়াট ক্যান আই সার্ভ ইউ?'

কাউন্টারের ওপর কনুই রেখে মুখটা ঝুঁকিয়ে আমি বললাম, 'শ্যাল আই হ্যাভ টু পে? অর, অন দা হাউজ?'

—অন দা হাউজ, অফকোর্স।

—কোনিয়াক, সিল ভু প্লে।

গেলাসে ফরাসী ব্র্যান্ডি ঢেলে বলল—ইসি মঁসিউ।

—ম্যার্সি। আ ভতর্ সান্তে।

এইরকম খেলায় আমরা খানিকক্ষণ হাসাহাসি করলাম। তারপর আমি কাউন্টারের ওপর উঠে বসে ওর গলা ধরে কাছে টেনে এনে বললাম, 'দুষ্টুমণি, এ বাড়িতে আমাকে আগে নিয়ে আসোনি কেন?'

ও লাজুকভাবে বলল, 'আমি একটা বোকারাম কিনা। মনে আছে, যেদিন

তুমি প্রথম আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলে? সেদিনই আমি ভেবেছিলাম, এই ঠাণ্ডার মধ্যে ও ফিরে গেল কেন? এত বড় বাড়ি, ও তো অনায়াসেই এখানে থাকতে পারত। লজ্জায় তোমাকে কথাটা বলতে পারিনি। এখন ইচ্ছে করে ঠাস ঠাস করে নিজের গালে চড় মারতে।'

—মার্গারিট, আমাকে কি একটুও ভালোবাসো না?

—তোমাকেই, শুধু তোমাকেই ভালোবাসতে চাই।

—আমি তোমাকে যতটা ভালোবাসি, তার চেয়ে বেশি কি করে ভালোবাসতে হয় জানি না। শোনো, তোমাকে একটা কথা বলব?

—বলো।

—আমি এখানে আসবার আগে মনে মনে ঠিক করেছিলাম, কিছুতেই মেম বিয়ে করব না। কিন্তু তুমি তো মেম নও। তুমি তো কোন দেশেরই মেয়ে নও। তুমি শুধু আমার। কাল-পরশুই আমরা বিয়ে করতে পারি না?

মার্গারিট কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল। 'শোনো নীল, তুমি কি ভেবেছ, বিয়ের জন্যই আমার সব কিছু আটকে আছে? আমার ওরকম নীতিবোধ নেই। আই ডোন্ট কেয়ার ফর ম্যারেজ। ওটা একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা। মানলেও হয়, না মানলেও হয়—বেশির ভাগ মানুষই মানে কিছু সুবিধের জন্য। আমি তো কোন সুবিধের কথা ভাবছি না। আমি শুধু ভাবছি, আত্মার কাছে যাতে কোন ছলনা না করি। তুমি কি খুব ব্যস্ত হয়ে গেছ? আর কিছুদিন অপেক্ষা করা যায় না?'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, আচ্ছা, সত্যি, বড্ড অধৈর্য হয়ে পড়ি। তোমার চেয়ে আমি অনেক দুর্বল।'

আমরা দোতলায় গিয়ে সব কটা ঘর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। সব ক'টা ঘরই গোল। অন্তত চারখানা শয়নকক্ষ, তার প্রতিটিতেই আরামের সব রকম উপকরণ। প্রকাণ্ড খাটে দুধ-সমুদ্রের মতন বিছানা পাতা। মস্ত বড় কাচের জানালা, বাইরে দেখা যায় ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে, অথচ ভেতরটা উষ্ণ।

মার্গারিট বলল, 'দেখেছ, আমরা এখানকার যে-কোন ঘরের যে-কোন বিছানায় শুতে পারি। কিন্তু প্রতিবাদ হিসেবে আমরা এর কোনটাতেই শোব না।'

—কিসের প্রতিবাদ?

—এদের এত ঐশ্বর্যের! দিস ভালগার ডিসপ্লে অব ওয়েলথ! এদের এত আরামপ্রিয়তা, এদের কালচার মানেই হচ্ছে কমফর্ট—আমরা আজ ঘরের মেঝেতে শোব।

দুটো কম্বল নিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, তাও কম আরামদায়ক নয়। পাশাপাশি শুয়ে রইলাম অনেক অনেকক্ষণ ঘুমহীন চোখে।।

১০

দেখতে দেখতে বছর প্রায় ঘুরে এল। পল্ ওয়েগনার একদিন তার অফিস ঘরে ডেকে একটা ফর্ম দিয়ে বলল, 'এটায় সই করে দাও!'

—কি এটা?

—তোমার আগামী বছরের স্কলারশীপের জন্য দরখাস্ত। আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখতে হয় কিনা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, 'এতে তো অনেকগুলো ঘর ভর্তি করতে হবে। আমি পরে ফিল আপ করে তোমাকে দিয়ে যাব।'

কাগজটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মাথার মধ্যে হঠাৎ যেন ঝড় বইতে শুরু করেছে। আর একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আরো এক বছর এখানে থাকব কি থাকব না? কেন থাকব? কেন চলে যাব? আমার কোন পিছুটান নেই।

তবু একটা কথা কিছুদিন ধরে আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিচ্ছে। আমার জায়গা এখানে নয়। যারা বিজ্ঞানের ছাত্র বা গবেষক, তাদের এখানে অনেক রকম উপকার হতে পারে বটে, কিন্তু আমি কি মাথামুণ্ডু করছি?

আমি বেড়াতে ভালোবাসি। মাঝে মাঝেই এখান থেকে এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়ি, উঠে পড়ি যে-কোন দিকের বাসে, তখন চোখ ও মন ভরে যায়। প্রকৃতি এ দেশে সম্পূর্ণ অকৃপণ। সব কিছুরই মধ্যে যেন বিরাটত্বের স্পর্শ আছে। খুব উঁচু কোন পাহাড় নেই আমেরিকায়, এ ছাড়া আর সব কিছুই বিশাল।

ভ্রমণ ছাড়া, যখন থাকতে হয় আয়ওয়ায়, তখন কিছুই করার থাকে না। কিংবা কাজের নামে ছেলেখেলা। মাঝে মাঝে যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাছাড়া সর্বক্ষণ নিজের ঘরে। দু'একটা প্রবন্ধ, কিছু কবিতার অনুবাদ করেছি অতিকষ্টে, তবু সব সময়েই মনে হয় যেন পণ্ডশ্রম। অতি উৎসাহী দু' চারজন ছাড়া এসব জিনিস এদেশে আর কার কাজে লাগবে? সোয়াহিলি ভাষার কবিতা যদি অনুবাদ হয় বাংলায়, ক'জন পড়ে? তাছাড়া আমার ইংরেজি শুদ্ধ করে দেবার ভার পড়েছে যার ওপর, তার সঙ্গে প্রায়ই মতের অমিল হয়। শ্মশানবন্ধুর ইংরেজি যখন যে বলে 'পল বেয়ারার', তখন ঠিক মেনে নিতে পারি না। পল বেয়ারার শুনলেই কালো পোশাক পরা কিছু গম্ভীর চেহারার মানুষের চেহারা মনে পড়ে, তার সঙ্গে আমাদের দেশের কোমরে-গামছা-বাঁধা, বল হরি হরিবোল চিৎকার করা ছোকরাদের কোন মিলই নেই। তখন মনে হয়, এই অনুবাদ-ফনুবাদ আমার কম্মো নয়। আমার কাজ আমার নিজের দেশে। সেখানে আমি জলের মাছ।

পল ওয়েগনার অবশ্য আমার কর্মহীনতা বা আলস্যকেও উৎসাহ দেয়। সে বলে, কোন চিন্তা নেই, দেখ না, এর থেকেই একদিন না একদিন কাজের উৎসাহ বেরিয়ে আসবে। তোমার নিজস্ব কাজ। প্রত্যেক মানুষেরই প্রস্তুতি দরকার। সেই প্রস্তুতি যদি এক বছর, দু' বছর বা তিন বছরেও হয়, তাতেও তার আপত্তি নেই। লোকটি সত্যিই ভালো।

এদেশের সাধারণ লোকেরা অধিকাংশই তো ভালো মানুষ। পৃথিবীর সব দেশের সাধারণ মানুষের মতনই। এদের অবস্থা বেশি সচ্ছল বলেই অন্যান্য বিলাসিতার মতন দয়ালু হবার বিলাসিতাও করতে পারে। সারা সপ্তাহ দুর্দান্ত দৈত্যের মতন পরিশ্রমের পর সপ্তাহান্তে প্রাণভরে ফুর্তি করে—কিন্তু চার্চগুলি কখনো ফাঁকা থাকে না। এরা স্বভাবতই পরোপকারী, সচরাচর মিথ্যে কথা বলে না। আর একটা খুব বড় গুণ, এরা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে না। অন্যের কথা খুব মন দিয়ে শোনে, বিদেশী অতিথির নাম যতই কঠিন হোক, ঠিক মনে রাখার চেষ্টা করে এবং কোন একটা অজানা বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে পরিষ্কার বলে, এটা তো জানি না আমি। আমাদের মতন কোন একটা বিষয়ে কিছু না জেনে কিংবা অর্ধেক জেনেও অনেকক্ষণ কথা বলার অভ্যেস নেই এদের। এবং কিছুতেই অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলাবে না। যেহেতু আমেরিকানদের কোন ঐতিহ্য নেই এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকেরা এখানে এসে বাসা বেঁধেছে, তাই এদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ অত্যন্ত প্রবল।

এক এক সময় মনে হয়, বড় শহরের বদলে আমি এই আধা গ্রামে থেকেছিলাম বলেই এদেশের মানুষগুলোকে ভালো করে চিনতে পেরেছি। এই শান্ত নিরুপদ্রব জীবন দেখে বিশ্বাসই করা যায় না এদেশেই আছে কু ক্লুক্স ক্লান বা বার্চ সোসাইটির মতন হিংস্র দল! অ্যালাবামার পুকুরে দুটি নিগ্রোর মৃতদেহ ভাসতে দেখে কয়েকটি সাদা ছেলে মন্তব্য করেছিল, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে, আমরা তো মাছেদের খাদ্য হিসেবে মাঝে মাঝেই নিগারের মাংস ছুঁড়ে দিই! অবশ্য আমাদের দেশেও এখনো হরিজন হত্যা হয়, কিন্তু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তা প্রধান খবর হয় না।

শুধু সাদা-কালোর দ্বন্দ্বই নয়। দেশ জুড়ে অসংখ্য হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, দুর্ঘটনা বা রোমহর্ষক ডাকাতির খবর শুনে মাঝে মাঝে বুক কেঁপে ওঠে। তার ওপরে আছে এফ বি আই এবং সি আই এ-র কীর্তিকলাপ। যে-কোন সাধারণ লোকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ এত প্রবল, অথচ সরকারী নীতিতে যেন তার স্থানই নেই। এফ বি আই দেশের বিশিষ্ট লোকদের বাথরুমে পর্যন্ত ওত পেতে থাকে, আর সি. আই এ অন্য রাষ্ট্রগুলির রান্নাঘরেও নাক গলায়। সি আই এ-র কার্যকলাপ এতই গোপন

আর জটিল যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতন সে মাঝে মাঝে নিজের স্রষ্টাকেও আঘাত করতে যায়। সি আই এ নাকি তার প্রধান কর্তার ওপরেও তার অজ্ঞাতসারে নজর রাখে। কে সেই হুকুম দেয়? পৃথিবীর যে-কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান খুন বা বড় বড় হত্যাকাণ্ডের পিছনে সি আই এ'র ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠলে তা চট করে অবিশ্বাস করা যায় না, কারণ স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যার পরেও তার পেছনে সি.আই এ'র হস্তক্ষেপের দৃঢ় অভিযোগ উঠেছিল।

তবে, এদেশের সংবাদপত্রগুলি সি আই এ'র চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান এবং তৎপর। সি আই এ'র বীভৎস এবং অসংখ্য চোরাগোপ্তা কুকীর্তির খবর এদেশের বড় বড় সংবাদপত্রেই প্রমাণ সহযোগে ছাপা হয়ে যায়। সি আই এ আজ পর্যন্ত তার কোন প্রতিশোধ নিতে পারেনি। এদেশের বিপুল ঐশ্বর্য, বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ, বড় বড় মনীষী, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মতনই, এখানে অপরাধ ও পাপের আকারও প্রকাণ্ড। অধিকাংশ আমেরিকানের সঙ্গে আলাদা কথা বললে দেখা যাবে সে চমৎকার মানুষ, কিন্তু সব মিলিয়ে দেশটা কোন্ দিকে যাচ্ছে, কেউ জানে না!

অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলাম। একটা রাস্তার মোড়ে দেখলাম চমৎকার একটা টেবল ল্যাম্প পড়ে আছে। আমার একটা টেবল ল্যাম্প দরকার, এবং জিনিসটা এতই সুন্দর যে আমার নেবার ইচ্ছে হলো। নিলে কেউ কিচ্ছু বলবে না। এদেশে পুরোনো জিনিস বিক্রি হয় না বললেই চলে। মাত্র দু'তিন বছরের পুরোনো ঝকঝকে চেহারার হাজার হাজার মোটর গাড়ি ক্রেতার অভাবে অটোমোবিল গ্রেভ ইয়ার্ডে পড়ে থাকে। নিত্য নতুন ফ্যাসন অনুযায়ী জিনিসপত্র বদলানো এদেশের রেওয়াজ। পুরোনো অটুট জিনিসপত্র এরা অবশ্য নষ্ট করে না, বড় বড় রাস্তার মোড়ে সযত্নে রেখে আসে, অন্য কারুর দরকার হলে তুলে নিয়ে যেতে পারে। গরিবরা বা বিদেশী ছাত্ররা এইসব জিনিস নিয়ে গিয়ে ঘর সাজাতে পারে অনায়াসেই। অবশ্য পুরোনো মোটর গাড়ি এইভাবে ফেলে যাওয়া যায় না, পার্কিং স্পেশ নষ্ট হচ্ছে বলে পুলিশ ফাইন করে, সেইজন্যই অনেকে পুরোনো গাড়ি পাহাড়ী রাস্তায় নিয়ে গিয়ে নিচের খাদে ফেলে দিয়ে দুর্ঘটনা বলে চালায়। ভেতরে আরোহী না থাকলে এইসব 'দুর্ঘটনায়' ইনসিওরেন্স কোম্পানি টাকা দেয় না।

টেবল ল্যাম্পটা আমার বেশ পছন্দ হলো, কিন্তু সেটা তুলে নিয়েও আবার রেখে দিলাম। কী হবে এত সব জঞ্জাল বাড়িয়ে? আমি আর এখানে কতদিন থাকব? আমার কি এখানে শিকড় আছে? খাদ্যের অভাব নেই, প্রচুর আমোদ-প্রমোদের উপকরণের অভাব নেই, তবু মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা। এদেশে

কেউ কাজ না করে বসে থাকে না, সেইজন্যই মনে হয়, আমাকেও কিছু কাজ করতে হবে। এবং আমার কাজ এখানে নয়। বিভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল গরিব এক দেশেই আমার নিয়তি বাঁধা।

এখানে এখন একমাত্র আকর্ষণ মার্গারিট। ওকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেই পারি না! ওর জন্য আমি দেশ-কাল-সমাজ সবই ত্যাগ করতে পারি। এমন সারল্যময় মাধুর্যের স্পর্শ তো কখনো জীবনে আর পাইনি। এর চেয়ে বেশি কি আছে? যতক্ষণ ওর সঙ্গে থাকি—তখন আর পৃথিবীর কোন কথাই মনে পড়ে না।

যখন মার্গারিট থাকে না, যখন আমি একা, তখন প্রায়ই থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। পুরুষ মানুষ হিসেবে আমার মধ্যে একটা ছটফটানি জাগে। কাজ ছাড়া পুরুষ মানুষ বাঁচতে পারে না। এখানে একটা চাকরি-বাকরি অনায়াসে জুটিয়ে নেওয়া যায়—কিন্তু সেরকম কাজ তো কখনো করতে চাইনি। আমার নিজস্ব কিছু কাজ থাকার কথা ছিল না? কিছু লেখার চেষ্টা করলেও মন বসে না। বাংলা ভাষার সাহচর্য ছাড়া বাংলায় লেখা যায় না। এখানে একদিনও বাংলায় হাসতে পর্যন্ত পারি না। স্থানীয় বাঙালিরা আমার সংসর্গ ত্যাগ করেছে। আমার ঘরে সব সময়েই কোন মেয়েছেলে থাকে বলে তারা কেউ কেউ আমাকে হিংসে, কেউ কেউ ঘৃণা করে। তাদের সঙ্গে মেশার খুব একটা আগ্রহও আমি কখনো বোধ করিনি, কেউ ঠিক আমার টাইপ নয়।

মার্গারিটকে রিসার্চ শেষ করার জন্য এখানে আরও অন্তত দু' বছর থাকতে হবে। সেই দু' বছর আমি কি করব? টেবলের ওপর পল ওয়েগনারের দেওয়া ফর্মটা এখনো রাখা আছে—কয়েকদিন ওর সঙ্গে দেখাই করিনি।

শীত শেষ হয়ে বসন্তকাল এসে গেছে। রাস্তার দু'ধারের জমাট বরফ ফাটিয়ে প্রথম একদিন একটা ঘাসের মতন চারাগাছ উঠেছিল। কয়েকদিন বাদেই দেখলাম তার ডগায় সিঁদুরের টিপের মতন একটা লাল ফুল। এ যেন প্রাণশক্তির অপূর্ব প্রকাশ। এতদিন প্রচণ্ড শীত আর বরফের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিল গাছটা। মার্গারিট সেই ফুলটার গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিল, হোয়াট আ কিউট লিট্‌ল থিং! এদেশে লিট্‌ল কথাটা খুব সুন্দরভাবে উচ্চারণ করে। জিভের ডগায় আদর করার মতন বলে, লিল্‌ল!

আস্তে আস্তে আরো কয়েকটা ফুলগাছ মাথা তুলল। তারপর অজস্র ফুলের সমারোহ। নদীর দু'ধারে চেরি গাছগুলোতে থোকা থোকা সাদা ফুল। বড় বড় বাড়িগুলোর বিশাল দেওয়াল জোড়া নীলমণি লতা। আমাদের বাড়ির পর্চের সামনেই দুটি ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা গাছ। কে জানত এর ফুল এত সুলভ!

বসন্তকালে ব্লুমিংটন ইন্ডিয়ানায় বেড়িয়ে এলাম কয়েকদিনের জন্য।

একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে মার্গারিট ফিরে এল বেশ উত্তেজিতভাবে। হাতে একটা টেলিগ্রাম। ফ্রান্স থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, ওর মায়ের খুব অসুখ। এক্ষুনি চলে এসো।

টেলিগ্রামটা অনেকক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখল মার্গারিট। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে চায় না। বারবার বলতে লাগল—আমার মায়ের গত কুড়ি বছরের মধ্যে একবারও অসুখ করেনি! কোনদিন দেখিনি মাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে। বাবা তো খুব নিষ্কর্মা, মা-ই বাড়ির সব কাজ করেন!

আমি বললাম, 'কুড়ি বছর যার অসুখ করে না, তাঁর যে কখনো অসুখ করবেই না, এর তো কোন মানে নেই!'

—না, তুমি জানো না! এর অন্য মানে থাকতে পারে। আমি তো প্রতি বছর একবার করে বাড়ি যাই! এবার শীতকালে যাইনি, তাই হয়তো আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা।

তারপর লাজুকভাবে বলল, 'আজকাল বেশি চিঠিও লিখতাম না। তোমার জন্যই তো—একদম সময় পাইনি!'

-যাও না, তাহলে একবার ঘুরে এস।

—কিন্তু আমার যে অনেক কাজ। মঁসিউ অ্যাসপেলের সঙ্গে আমার থিসিসের স্কীম নিয়ে বসবার কথা—

সন্ধের দিকে মার্গারিট দুর্বল হয়ে পড়ল। যদি সত্যিই মায়ের অসুখ হয়? মাকে একবার দেখবে না? বছরের পর বছর বাড়ি থেকে অনেক দূরে থেকেছে মার্গারিট, কিন্তু এখন ওর অনবরত বাড়ির কথা মনে পড়তে লাগল। আমাকে বোঝাতে লাগল ওর খুঁটিনাটি বাড়ির বর্ণনা। কোথায় বাগান, কোন কোন গাছ ওর নিজের হাতে পোঁতা, কোন গাছের নিচে ওর বাবা রোজ চেয়ার পেতে বসেন, কোথায় ওর মা চীজ্ শুকোতে দেন—অবশ্য রোদ ওঠে খুবই কম।

খেতে বসে আমরা ঠিক করলাম, মার্গারিটকে যেতেই হবে। ও একবার শুধু ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'তুমি যাবে আমার সঙ্গে? আমার একলা যেতে ভয় করছে।'

আমি বললাম, 'আমি? তোমাদের বাড়িতে? তা কি সম্ভব?'

সত্যি সম্ভব নয়। ওদের গোঁড়া ধার্মিক বাড়িতে এরকম একজন অচেনা পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না। তবু মার্গারিট বলল, 'তুমি যদি যেতে, আমরা এক সঙ্গে ফ্রান্সে বেড়াতাম। তোমাকে নিয়ে যেতাম আলজাস লোরেনের সেই ঝর্ণাটার কাছে।'

—যেখানকার জল পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে পরিষ্কার?

—হ্যাঁ, এমন কিছু নাম করা নয় ঝর্ণাটা, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল...তোমাকে দেখাতাম...যদিও তোমারও সে কথা মনে হতো...

মার্গারিটের চোখের দিকে তাকিয়েই যেন আমি সেই ঝর্ণাটা দেখতে পেলাম। আস্তে আস্তে বললাম, 'নিশ্চয়ই যাব, পরে এক সময় নিশ্চয়ই যাব—'

এবার সমস্যা দাঁড়ালো টাকা জোগাড় করার। মার্গারিটের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাওয়া উচিত। শিকাগোতে লং ডিসটেন্স কল্ করে জানা গেল, পরশুর আগে টিকিট পাওয়া যাবে না। যাওয়া-আসায় অন্তত আটশো ডলার লাগবে।

আমাদের দু'জনেরই সঞ্চয় বলতে কিছু নেই। ব্যাঙ্কে দশ পনেরো ডলার আছে কিনা সন্দেহ। মার্গারিট পাগলের মতন টাকা খরচ করে। টাকা জিনিসটা ওর সহ্য হয় না, হাতে এলেই কোনক্রমে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে। মাসে বই কেনেই একশো দেড়শো ডলারের। কোন একটা ভালো বই দেখলে কিনবেই!

মাসের মাঝামাঝি বলে অবশ্য আমাদের দু'জনেরই কিছু টাকা ছিল ড্রয়ারে। শ' দেড়েক ডলারের মতন। বাকি টাকা কোথা থেকে আসবে? পরদিন মার্গারিট সারা সকাল ঘুরে একশো কুড়ি ডলার জোগাড় করে আনল, কারা যেন ধার নিয়েছিল। আমি পল্ ওয়েগনারের কাছে আমার দু' মাসের টাকা অগ্রিম চাইতে গেলাম, তাতে অন্তত শ' পাঁচেক ডলার পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দারুণ দুঃসংবাদ পেলাম, পল্ ওয়েগনার আগের রাত্রেই নিউ আর্লিয়েন্সে চলে গেছে। চারদিন বাদে ফিরবে।

মার্গারিট কিন্তু একটুও নিরাশ হলো না। বলল,—দাঁড়াও, আমি আর এক জায়গায় ঘুরে আসছি। এক ঘণ্টা বাদে ফিরে এল ছ'শো ডলার হাতে নিয়ে। —কোথা থেকে পেলে?—ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে এলাম।—দিল?—দেবে না কেন? আমি জোর দিয়ে বললাম, আমার খুব দরকার, আমাকে যদি এখন না দাও তাহলে ব্যাঙ্ক খুলে বসেছো কেন?

আশ্চর্য এখানকার ব্যাঙ্ক। যে-মেয়েটি এদেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, তাকেও টাকা ধার দেয়! মেয়েটি তো কোন কারণে আর এদেশে না ফিরতেও পারে! সম্ভবত ওর সরল সুন্দর মুখের দাবি ওরা উপেক্ষা করতে পারেনি। অবশ্য, এদেশের ব্যাঙ্কগুলোর কাছে পাঁচ-ছ'শো ডলার নিতান্ত খোলামকুচি।

পরদিন ভোরবেলা মার্গারিটের প্লেন। পাছে ঠিক সময় আমরা উঠতে না পারি, তাই সারা রাত জেগে রইলাম। গত সাত-আট মাসের মধ্যে আমরা তিন-চারদিনের বেশি পরস্পরকে ছেড়ে থাকিনি। এবার মার্গারিট ক'দিনের জন্য যাচ্ছে তার কোন ঠিক নেই। ওর মা-কে একটু সুস্থ দেখলেই চলে আসবে। কিন্তু ওর

মায়ের যদি কিছু একটা হয়ে যায়? আমরা মুখে কেউই সে-কথা বলছি না। ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছি খুব। দু'জনেই যেন দু'জনকে খুশি রাখার চেষ্টায় নানারকম মজার মজার কথা বলতে লাগলাম। ও আমাকে শোনাল ত্রিস্তান অর ইসল্টের কাহিনীর সাত আট রকম ভাষা। আমি ওকে শোনালাম বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের কাহিনী। অন্য আলো নিভিয়ে একটা বড় লাল রঙের মোমবাতি জ্বালা হয়েছে, সঙ্গে এক বোতল কোনিয়াক। যখন রাত ভোর হয়ে গেল, তখন মোমবাতি কিংবা কোনিয়াকের বোতল—কোনটাই শেষ হয়নি। ওর কোলে আমার মাথা। ও মুখটা নিচু করে শেষবার আমার ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, 'এবার চল।'

ঠিক সময় পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্টে। টাকা-পয়সা একেবারে টায়-টায়। আমার কোন অসুবিধে নেই, ঘরে যথেষ্ট খাবার আছে, তিন দিন বাদে পল এলেই আমি টাকা পেয়ে যাব। কিন্তু ফ্লাইটের কোন গোলমাল হলে মার্গারিট বিপদে পড়ে যাবে। তবু সেই টাকা থেকেই দেড় ডলার খরচ করে এয়ার ইনসিওরেন্স করে ফেলল। সেই কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'নাও, আমি যদি মরি, তাহলেই তুমি কুড়ি হাজার ডলার পেয়ে যাবে।'

আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। এই মেয়ের প্রাণের দাম মাত্র কুড়ি হাজার ডলার! আমি তো এর বিনিময়ে বলিরাজার মতন স্বর্গ মর্ত্যও দান করতে পারি। কিন্তু প্লেনটা আকাশে উড়ে যাবার পর আমার মনে হলো, সত্যিই যদি কিছু হয়, তা হলে কুড়ি হাজার ডলার আমার হাতে এসে যাবে? সে যে অনেক টাকা! বিমান দুর্ঘটনা তো যখন-তখন হয়! পরক্ষণেই চমকে উঠলাম। আমি মার্গারিটের মৃত্যু কামনা করছি? মানুষের মন এরকম সাঙ্ঘাতিক হয়! হাতের সেই কাগজটাকে মনে হলো ফণা তোলা সাপ। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলাম রাস্তায়।

মার্গারিট চলে যাবার পর কিন্তু নিজেকে অনেকটা স্বাধীন মনে হলো। এতদিন ওর সভতা ও নীতিবোধের জন্য আমিও অনেকখানি আটকে ছিলাম। যখন-তখন যা খুশি করতে পারিনি! একথা ঠিক, ওর সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠতা না হলে আমি অনেক বখে যেতে পারতাম। যে-দেশে নারী এবং সুরা এত সুলভ, সেখানে আমি ডুবে যেতে পারতাম সহজেই। আমার তো কোন দায় নেই। আমি পাপ-পুণ্যের জন্য কারুর কাছে দস্তখত দিইনি। কাজে ডুবে থাকতে না পারলে আমার মধ্যে দারুণ একটা অস্থিরতা জাগে। এখন আমি স্বাধীন, আমি যা খুশি করতে পারি।

দু' তিন দিন বাদেই বুঝলাম, মানুষ সব সময় সব রকম স্বাধীনতাও চায় না। মার্গারিট নেই বলে কিছু ভালো লাগে না। আমার ঘরটাকে শূন্য আর ঠাণ্ডা মনে হয়। সব জায়গায় ছড়ানো আছে ওর চিহ্ন। ওর রুমাল, ওর স্কার্ফ, ওর চটি। আমার গায়ে ওর কিনে দেওয়া ড্রেসিং গাউন। চিঠি লেখার কাগজও ও

কিনে এনেছে। রান্নাঘরের প্রতিটি জিনিসে ওর স্পর্শ। দূর ছাই, কে আর রান্না করে!

টেবলের ওপর ওর টাইপ রাইটার। কিছুদিন ধরে এটা আমিই ব্যবহার করছি। মনে পড়ছে, একদিন ও আমার একটা ইংরিজি বাক্যের ভুল ধরেছিল। আমি চটে উঠে বলেছিলাম—তুমি ফরাসী, তুমি ইংরিজির কি জানো? বলেছিল—যাও, যাও, তোমার চেয়ে অনেক ভালো জানি! আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম না? তুমি জানো, কখন প্রপোজাল আর কখন প্রপোজিশান হয়? হিউমিলিটি আর হিউমিলিয়েশনের তফাত জানো? আমাদের মধ্যে ঝগড়াটাই ছিল সবচেয়ে মজার ব্যাপার। আমি কখনো খুব রেগে উঠলেই মার্গারিট হাসতে হাসতে একেবারে ভেঙে পড়ত, ওর শরীরে যেন রাগ জিনিসটাই নেই। আমাকে বলত—ইউ লুক লাইক অ্যান অ্যাংরি গড। ওল্ড টেস্টামেন্টের গডের মতন...

কয়েকদিন পরেই আমার একাকীত্ব আরো অসহ্য হয়ে উঠল। প্রথম দিকের একাকীত্বের চেয়ে এটা আরো অনেক বেশি তীব্র। তখন পাবে আবার আড্ডা দিতে যেতে লাগলাম। পুরনো বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে এখানে দেখা হয়। গ্যালন গ্যালন বীয়ার খেয়েই নেশা হয়ে যায়। গাঁজাও চলছে অনেকের মধ্যে। আমি ভারতীয় বলে কেউ কেউ ভাবে, গাঁজা সাজার ব্যাপারে আমার বুঝি জন্মগত জ্ঞান আছে। দু' আঙুলের ফাঁকে গাঁজা ভর্তি সিগারেটটা কল্কের মতন ধরে হুস ক'রে টান দিয়ে ওদের তাক লাগিয়ে দিই।

ডোরির সঙ্গেও এখানে দেখা হতে লাগল। একদিন দেখলাম লিন্ডাকেও। লিন্ডা বেঁচে উঠেছে, কিন্তু চোখ দুটি সম্পূর্ণ অন্ধ। একুশ বছর বয়েস হয়ে গেছে তার, এখন সে পাবে আসতে পারে। কিন্তু এর ভেতরটা কী রকম, তা আর ওর দেখা হলো না!

একদিন সন্ধের পর পাব থেকে বেরিয়ে ডোরি বলল, 'চলো আমরা সবাই এখন আন্টি আইমারের জয়েন্টে যাচ্ছি, তুমি যাবে?'

বললাম, 'চলো!'

ডোরির সঙ্গে প্রায় সর্বক্ষণ থাকে এখন একটি অস্ট্রেলিয়ান ছেলে। ওর স্ট্যাম্প অ্যালবামে নতুন স্ট্যাম্প। সে আজ নেই। আমরা সাত-আট জন ছেলে-মেয়ে মিলে হাজির হলাম আন্টি আইমারের বাড়িতে। শহর ছাড়িয়ে, ডে ময়েনের দিকে যেতে রাস্তার ওপর ফাঁকা জায়গায় একলা একটা বাড়ি। আন্টি আইমারের বয়েস কিন্তু বেশি নয়। তিরিশ-বত্রিশ মাত্র, লম্বা ছিপছিপে চেহারা। এসেই বুঝলাম, এখানে ছেলেমেয়েরা গ্রুপ সেক্স এবং নানারকম নেশা করতে আসে। এটা অবশ্য আন্টি আইমারের পেশা নয়, টাকা-পয়সা নেয় না কারুর কাছ থেকে, বরং নিজেই অনেক

খরচ করে, এটা তার শখ। হলঘরের মধ্যে একটা বিদঘুটে চেহারার লোকের বিরাট ছবি মালা দিয়ে সাজানো, পাশে অনেকগুলো ধূপ গোঁজা। সে নাকি কোন যোগী। তিনটে ছেলেমেয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে, তারা এল এস ডি খেয়েছে, পোশাকের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। অন্যরা যার যেখানে খুশি বসে গেল, এ ওর গায়ের ওপর, গাঁজার কটু গন্ধে ঘর ভরে গেল। কে যে কি কথা বলছে, সকলের চেঁচামেচিতে তার কিছুই বোঝা যায় না। এর মধ্যে আবার কে একটা ক্যানকেনে আওয়াজের রেকর্ড চালিয়ে দিল।

আণ্টি আইমার আমার পাশে বসে বিনা আলাপেই মিষ্টি করে বলল, 'তুমি কি নেবে, ডার্লিং?'

অন্য নেশাফেসা আমার তেমন পছন্দ হয় না। বললাম, 'কোনরকম অ্যালকোহল আছে?'

এক বোতল স্কচ আর একটা লম্বা গেলাস নিয়ে এসে সে বলল—হেল্প ইয়োর সেলফ!

আমি চুক চুক করে সেই স্কচ খেতে খেতে ওদের দেখতে লাগলাম। খারাপ লাগে না। এর মধ্যে যৌবনের দুরন্তপনার একটা ছবি আছে। আমি জানি, এদের মধ্যে কয়েকজন পড়াশুনোয় সাঙ্ঘাতিক ভালো, চাষ করার সময় মাঠে গিয়ে দারুণ পরিশ্রম করতে পারে—পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় এদের নিয়ে ছেড়ে দিলেও ভয় পাবে না!

বুঝতে পারছি, বেশ নেশা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? নিজের সেই নির্জন ঠাণ্ডা ঘরটায় ফিরতে ইচ্ছে করে না কিছুতেই। এখানে নেশায় মাটিতে গড়িয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলবে না। আণ্টি আইমার সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে একজনের সঙ্গে নাচ শুরু করেছে, যাদের জ্ঞান আছে এখনো, তারা হাততালি দিচ্ছে।

ফ্রিজ থেকে খানিকটা বরফ আনবার জন্য আমি উঠে গেলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ডোরি। ওরও বেশ নেশা হয়েছে। চোখ দুটি চকচকে, ধারালো নাকটি দামাস্কাসের ছুরির মতন খাড়া হয়ে আছে। জিজ্ঞেস করল, 'কি, কেমন লাগছে?'

জড়ানো গলায় বললাম—গ্রেট! এভরিথিং ইজ গ্রেট!

ডোরি ওর ডান হাতটা উঁচু করে বগলটা দেখিয়ে বলল, 'এখানে একটা চুমু দাও।'

ঐ জায়গাটা যে চুমু খাওয়ার পক্ষে একটা আদর্শস্থান, এটা আর কারুকে বলতে শুনিনি। ওকে খুশি করার জন্য সম্পূর্ণ আলিঙ্গন করে সেখানে একটা চুমু দিলাম। ডোরি খিলখিল করে হেসে উঠল। ওর বগলে পাউডার, সেন্ট আর ওর

ঘামের গন্ধে আমার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল! আমি চোখ বড় বড় করে ডোরির দিকে তাকালাম। ওর বুকের জামাটা এতখানি কাটা যে সবই দেখা যায়। সেখানে আমার মুখ নামাতেই ও বলল, 'এসো—।'

হাত ধরে আমাকে নিয়ে এল পাশের ঘরে। বিছানা পাতাই ছিল। তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ডোরির পোশাকটা খুলে ফেলা অত্যন্ত সহজ কাজ, কেননা সব কিছুই প্রায়-খোলা, তবু আমি এমন টানাটানি করতে লাগলাম যেন ছিঁড়েই যাবে : ডোরি শুধু খিলখিল করে হাসছে। ওর শরীরটা দারুণ উত্তপ্ত। আমি পাগলের মতন ঝুঁকে পড়লাম ওর ওপরে, ওর চোখের দিকে চোখ গেল, যেন নীল আলো বেরুচ্ছে...

সামনেই একটা ড্রেসিং টেবলের আয়না। তাতে আমার মুখটা দেখলাম। এ কে? এ কি সেই আমি? আমার মুখখানা একটা জন্তুর মতন দেখাচ্ছে। আমি ডোরির বুকের ওপর শুয়ে আছি। এই জনাই মার্গারিট বলেছিল, চট করে ভালোবাসার কথা বলতে নেই। ভালোবাসার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। অনেক রকম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পৌঁছোতে হয় ভালোবাসার কাছে। ঠিকই বলেছিল মার্গারিট। আমি পারলাম না, আমি হেরে যাচ্ছি।

ডোরি ঠাস করে আমার গালে এক চড় মেরে বলল, 'ব্লাডি ফুল! তুমি অন্য কারুর কথা ভাবছ।'

আমি ওকে এক ধাক্কা দিয়ে বিছানা থেকে ফেলে দিলাম। ডোরি আঁচড়ে কামড়ে এবং গালাগাল দিয়ে আমার প্রায় বাপের নাম ভুলিয়ে দিতে চাইল। এক সময় দেখলাম আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। উঠে বেসিনে রক্ত ধুতে গেলাম —ডোরি হা-হা করে হাসতে লাগল। সেই হাসি শুনলে ভয় হয়। বেসিনের আরসির দিকে তাকিয়ে বললাম—মার্গারিট, আমাকে ক্ষমা করবে?

বাড়ি ফিরে চুপ করে বসে রইলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিছানায় নয়, চেয়ারে নয়, ঘরের মেঝেতে এক কোণে। মাথাটা এখনো পরিষ্কার নয়। নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় দুঃখবোধ অনেক তীব্র হয়। আমার কঠোর শাস্তি পাওয়া উচিত। নিজেকে শাস্তি দিলাম, ঘর থেকে আর একদম বেরুব না।

বেরুলাম না বেশ কয়েকদিন। কিন্তু এই রকমভাবে কতদিন থাকা যায়! ঘরের মধ্যে মার্গারিটের স্মৃতি, বাইরে নানারকম প্রলোভন। আমাকে বাঁচতে হবে তো!

মার্গারিটের চিঠি আসছে প্রায় প্রত্যেকদিন। ওর মায়ের সত্যিই খুব অসুখ। কবে আসতে পারবে ঠিক নেই। ফ্রান্সের আবহাওয়া এখন যা সুন্দর! কেন আমি ওর কাছে এখন নেই!

মার্গারিট জানে, আমার চিঠি লেখার অভ্যেস খুব কম। তাই প্রতি চিঠিতেই

লেখে, শোনো নীল, তোমাকে সব চিঠির উত্তর দিতে হবে না। তুমি সপ্তাহে একটা অন্তত ছোট্ট চিঠি লিখো আমাকে। পারবে তো? একা একা রান্না করে খেয়ো না! দোকান থেকেই কিছু কিনে নিও! আমাদের ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক আমেরিকা ঘুরে এসে কি বলেছিলেন জানো? ও দেশটা সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলা যায়, ওদের মাংসের কোয়ালিটি বেশ ভালো!

না-পড়া বইগুলো শেষ করি এখন। অনেক বই মার্গারিটের সঙ্গে এক সঙ্গে পড়ার কথা ছিল। রেকর্ড প্লেয়ারে এখনো চাপানো আছে ইভ্ মতাঁর গান, ফিউমে ল্য সিগার—মার্গারিট যাওয়ার আগের দিন দু'জনে মিলে শুনেছিলাম। তার নিচে এদিথ্ পিয়াফ। বাক্সের ওপর রাখা আছে আমার সংগ্রহ করা রবিশঙ্কর, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। পড়তে পড়তে যখন চোখ জ্বালা করে, তখন একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিয়ে হুইস্কির বোতল খুলে বসি। কখনো একা একা নাচি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাংলায় গালাগাল দিই বিশ্ব-সংসারকে। তারপর এক সময় খুব নেশা হলে ঘুমিয়ে পড়ি আপনিই।

দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও আমি ফেল করলাম। শনিবার অনেক রাত্রে আমার বাড়ির সিঁড়িতেই একটা কান্নার আওয়াজ শুনলাম। বাড়ির সব ছেলেমেয়েই আজ ডেটিং করতে গেছে, এমনকি ক্রিস্তফও গেছে একটা জাপানী মেয়ের সঙ্গে। এখন সিঁড়িতে কে কাঁদে? বাড়িতে তো আমি ছাড়া আর কারুর থাকার কথা নয়। বেরিয়ে এসে দেখলাম, সিঁড়ির ওপর বসে আছে তিনতলার মেয়েটি, সম্পূর্ণ নগ্ন। যাওয়া-আসার পথে সিঁড়িতে ওর সঙ্গে দু' একবার 'হাই' 'হাই' হয়েছে মাত্র। মেয়েটি লম্বা আর চওড়ায় এত বড় যে একটি ছোটখাটো মেয়ে-দৈত্য বলে মনে হয়, যদিও বয়েস বেশি নয়। এ রকম চেহারার জন্য ওর বিশেষ ছেলেবন্ধু হয় না। কোন ছেলেই নিজের থেকে বেশি লম্বা কোন মেয়ের পাশে হাঁটতে ভালোবাসে না।

কিন্তু মেয়েটি এই সময় এই অবস্থায় বসে কাঁদছে কেন? কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বার্বারা, কি হয়েছে তোমার?'

বার্বারা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে কাঁদছে। একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল, তারপর বলল—দ্যাটস নান অব ইয়োর ড্যাম বিজনেস!

মেয়েটি একদম মাতাল। আমার নিজেরও তখন বেশ নেশা, তবু মনে হলো, একে এর ঘরে পৌঁছে দেওয়া উচিত। পরোপকার করা মানুষের নেশা। একা কোন মেয়েকে দেখলে মানুষ আরো বেশি পরোপকারী হয়ে ওঠে।

আমি ওর হাত ধরে বললাম—কাম অন বেবী। চলো ঘরে চলো—

বার্বারা ঘ্যাঁক করে আমার হাতে কামড়ে দিল। উ হু হু হু করে আমি হাতটা সরিয়ে নিলাম। এ তো সাঙ্ঘাতিক মেয়ে দেখছি! কিন্তু যে-রকম ভাবে দুলছে,

যে-কোন সময় সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পারে। ওর পাশে বসে খুব নরম গলায় বললাম, 'এ কি করছো? লোকজন এসে পড়বে। তোমার মতন নাইস, ডিসেণ্ট গার্ল—।'

বার্বারা কান্না থামিয়ে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলল—ইউ ওয়াণ্ট টু হ্যাভ মী?

হ্যাভ কথাটার কতরকম মানে হয়। আমি যদিও পৃথিবীর হ্যাভ নটসদের দলে, তবু এখানে এই সহজতম বাক্যটি শুনে আমার সারা গায়ে একটা শিহরন বয়ে গেল। বার্বারার দ্বিগুণ আকারের শরীর, অথচ বেঢপ নয়, সুগঠিত বুক ও উরু—আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকিয়ে রইলাম।

আমার দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ঐটা তোমার ঘর?'

—হ্যাঁ।

—চলো, ওখানে যাব। আমার ঘরে যাব না! এক সান অব আ বীচ এসে জলটল ফেলে, বোতল ভেঙে আমার ঘর একেবারে নোংরা করে দিয়ে গেছে। আর যাব না ওখানে। তোমার ঘরে চল—

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—গেট মি, লাভার বয়!

দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে টেনে তুলতেই ও আমার বুকের ওপর এসে পড়ল। আদিম মানবী। ও এখন একটাই জিনিস চায়। আমিও তো এই পৃথিবীর আদিবাসী। তবে আর আমার দ্বিধা থাকবে কেন? আমি এখন একা, বার্বারাও একা। আমার হাতটা দিয়ে ওর কোমর জড়াল, তারপর নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—হোল্ড মী টাইট!

প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল আমার। তবু দরজার সামনে এসে থেমে গেলাম। এই ঘরে! মার্গারিটের এত স্মৃতিমাখা এই ঘরে কাকে নিয়ে যাচ্ছি? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? মার্গারিট নেই বলে বার্বারা নামের এই মাংসপিণ্ডের সঙ্গে? তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে দিয়ে বললাম—সরি! এখানে হবে না। দেয়ার ইজ অ্যানাদার গার্ল ইন দেয়ার!

মাতাল অবস্থাতেও বার্বারা এ কথাটার মানে বুঝল। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর প্রাণভরে গালাগাল দিতে লাগল—ইউ ডার্টি ডাবল ক্রসার! ব্লাডি স্কাঙ্ক! ব্যাসটার্ড! নীগার!

ওর হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে হাঁপাতে লাগলাম। সিঁড়িতে দুমদুম শব্দ হচ্ছে, ওপরে উঠে যাচ্ছে বার্বারা! আমি তো ওর উপকারই করেছি। আমি মিথ্যে কথা বললেও, ও তো সিঁড়ি থেকে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছে। তবে আমি হাঁপাচ্ছি কেন? আমি দুর্বল, আমি ভীষণ ভীষণ দুর্বল। এক হাতে মাথার

চুল খিমচে ধরলাম। অন্য হাতে সেতারের কানের মতন নিজের কান এমন মোচড়াতে লাগলাম যাতে তার-টার সব ছিঁড়ে যায়।

পরদিন সকালে মার্গারিটের চিঠি এল। মায়ের অসুখ অনেকটা ভালো। তবে এখন তো গ্রীষ্ম এসে গেল, শিগগিরই ছুটি পড়বে। সবাই আমাকে বলছে, এক্ষুনি ফিরে কি হবে? আরো একমাস দেড়মাস থেকে যেতে। এরা তো কেউ বুঝবে না আমি কেন ফেরার জন্য ব্যস্ত! আমার একটা দিনও এখানে থাকতে আর ইচ্ছে করে না! তোমাকে কতদিন যেন দেখিনি, যেন কত যুগ...। মা হাসপাতাল থেকে না এলে ফেরা যাবে না। বোনরা ছাড়ছে না কিছুতেই। তবে দু'-একদিনের মধ্যেই একবার পারী যাচ্ছি। ইস, তুমি যদি একবার আসতে পারতে! আমার বন্ধু মোনিক-এর ফ্ল্যাট আছে, থাকার জায়গার কোন অসুবিধে ছিল না! ইস্ এই যা একখানা সুযোগ না! তুমি একবার আসতে পার না? ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করো না! আমরা ফিরে গিয়ে সব শোধ করে দেব। দু'জনেই বেবী সিট করব রোজ রোজ, ঠিক শোধ হয়ে যাবে। আসবে না? কতদিন দেখিনি।

তৎক্ষণাৎ মন ঠিক করে ফেললাম। সেই ফর্মটা আজও ফিল-আপ করা হয়নি। সেদিনই পল্ ওয়েগনারের কাছে সেটা ফেরত দিয়ে বললাম, 'আর দরকার নেই। আমি আর থাকবো না!'

পল্ ওয়েগনার যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। চোখ বড় বড় করে বলল, 'কি বলছ তুমি!'

—তুমি যে বলেছিলে আমি যে-কোন সময় ফিরে যেতে পারি?

—তা তো পারোই। কেউ তোমায় আটকাচ্ছে না! কিন্তু কেন ফিরে যাবে? কোন অসুবিধে হচ্ছে? আমায় খুলে বলো। এখনো এত রকম সুযোগ রয়েছে, অনেক রকম কাজ করতে পারো।

কিন্তু আমার বাঙালের গোঁ। একবার যখন ফিরব ঠিক করেছি, আর মত বদলাবে না কিছুতেই।

অন্য কাউকে কিছু বললাম না। চুপি চুপি ব্যবস্থা করে ফেললাম সব। কারুর কাছে কোন ধার-টার আছে কিনা। কোথাও কোন কাগজপত্রে সই করা বাকি আছে কিনা। আমার একটা ভালো ইস্ত্রি ছিল, যাতে উল, টেরিলিন বা সুতির জামা-কাপড় ইস্ত্রি করার জন্য ইচ্ছে মতন উত্তাপ কমানো বাড়ানো যায়—ক্রিস্তফ সেটা মাঝে মাঝে ধার নিত। ওকে বললাম 'ওটা তুমিই রেখে দাও, আমার আর লাগবে না।'

ও অবাক হয়ে বলল, 'কেন, লাগবে না কেন? তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

আমি সাবধান হয়ে গেলাম। বললাম, 'না, না আমি এই কিছুদিনের জন্য একটু নিউ ইয়র্ক থেকে ঘুরে আসছি।'

ক্রিস্তফ নিজেকে আমার অভিভাবক মনে করে। ওকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারতাম না, কেন আমি এত তাড়াতাড়ি এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাই।

মার্গারিটকে সংক্ষেপে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম, আমার জন্য প্যারিসে অপেক্ষা করো। আমি আসছি।

এয়ারপোর্টে এসেও পল ওয়েগনার আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'নীললোহিত, এখন বলো, তুমি থাকতে চাও কিনা! এখনো সব ব্যবস্থা করা যায়। টিকিট ক্যানসেল করা যায়!'

আমি ভারী গলায় বললাম, 'না, পল, তা আর হয় না। তোমার দেশ খুব সুন্দর। আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু আমাকে ফিরতেই হবে। আমার কাজ আমার নিজের দেশে! সব কিছুর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বিদায়!'

১১

প্যারিসে পৌঁছে দেখলাম, সমস্ত দেয়ালে দেয়ালে আমার নাম। বিরাট বিরাট পোস্টারে লেখা, নীল! নীল! যেন গোটা শহর আমাকে সংবর্ধনা জানাচ্ছে। যখনকার কথা বলছি, তখনও আমার নামেরই আর একজন, প্রথম মানুষ হিসেবে চাঁদে পা দেয়নি। সুতরাং তার জন্য এ অভ্যর্থনা হতে পারে না। পরে অবশ্য জেনেছিলাম ওটা একটা নতুন বেরুনো সাবানের বিজ্ঞাপন।

এয়ারপোর্ট থেকে বাস নিয়ে শহরের মধ্যে এয়ার টার্মিনালে পৌঁছেই দেখি মার্গারিট দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে একেবারে হেসে-কেঁদে অস্থির হয়ে উঠল। সত্যিই যেন এক যুগ পরে দেখা। অথচ মাত্র দেড় মাস। তারপর বকুনি দিয়ে বলল তুমি কি কিপ্টে হয়ে গেছ, এয়ারপোর্ট থেকে বাসে এলে? ট্যাক্সি নিতে পারোনি? আমি কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি! ওকে আর কি করে বলব যে এখানকার ফ্রাঁ-এর হিসেব আমি এখনো বুঝিনি! ফরাসী দেশের মতন এমন মজার টাকা বোধহয় আর কোন দেশে নেই। আর কোন দেশে নোটের ওপর শিল্পী, সাহিত্যিকদের বড় বড় ছবি ছাপা থাকে!

একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম প্লাস পিগাল। এটা প্রধানত টুরিস্টদের পাড়া, হোটেলের দাম গলা-কাটা। বড় বড় নাইট ক্লাব আর ফটোগ্রাফির দোকান। যার যত খুশি অসভ্য ছবি কিনতে পারে এ পাড়ায়।

আমরা এসে থামলাম বিশ্ববিখ্যাত নাইট ক্লাব মুল্যাঁ রুজের সামনে। মেঘলা মেঘলা দুপুর, এখন তো কেউ নাইট ক্লাবে যায় না। মার্গারিট বলল, 'এসোই না!'

মুল্যাঁ রুজ যে বাড়িটার অংশ, সেটা একটা বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ি। প্রধান দরজার কাছে এসে মার্গারিট বাড়ির কঁসিয়ার্জের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। প্যারিসের কঁসিয়ার্জদের কথা আগে অনেক শুনেছি, এঁদের নেকনজর ছাড়া বাড়িতে ঢোকা-বেরুনোর উপায় নেই। এ বাড়ির ইনি একটি মোটাসোটা মহিলা। আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—অ্যালজিরিয়ান?

হা কপাল! ভারতীয়দের কেউ চেনে না। ভারত নামের দেশটার কথা সব সময় মনেই থাকে না এদের।

লিফট দিয়ে তিনতলায় উঠে এলাম। তারপরও বিরাট বারান্দা দিয়ে এতখানি হাঁটতে হলো, যেন রেড রোডের এপার ওপার। একেবারে শেষ প্রান্তে এসে মার্গারিট চাবি দিয়ে একটা দরজা খুলে বলল, 'এটা এখন শুধু আমাদের।'

ফ্ল্যাটটা একদম খালি। বড় বড় তিনখানা ঘর। নতুন কারুর সঙ্গে আলাপ হবে, তাও ফরাসী ভাষায়, এই ভেবে মনে মনে আমি শঙ্কিত ছিলাম। এখন সেই জড়তাটা কেটে গেল। আনন্দের চোটে মার্গারিটকে কোলে তুলে নিয়ে এক পাক ঘুরে গিয়ে বললাম, 'হুররে! একদম খালি! এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে!'

দেড় মাসের পাওনা সব ক'টি চুমু ওর কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বন্ধু মোনিক কোথায়?'

—সে তো অফিসে। সে খুব সকালে বেরিয়ে যায়। শোন, মোনিক তোমাকে বিঁয়াভন্যু (স্বাগতম) করে গেছে, তোমার জন্য একটা সুইট ডিস বানিয়ে রেখে গেছে।

—এত বড় ফ্ল্যাটে মোনিক একা থাকেন? এটা তো খুব খরচের শহর শুনেছি।

—এটা ছিল আগে আমার বন্ধু এলেনের। এলেনই আমার আসল বন্ধু যার সঙ্গে আমি পারীতে পড়তে এসেছিলাম—কালও দেখা হলো ওর সঙ্গে, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব—

—এলেন ছেলে না মেয়ে?

মার্গারিট শব্দ করে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'যদি বলি ছেলে? তোমার হিংসে হবে?'

—নিশ্চয়ই!

—বলেছিলাম না, তুমি ওল্ড টেস্টামেন্টের গডের মতন, যেমন অ্যাংরি, তেমনি জেলাসও বটে!

পরে জেনেছিলাম, এলেন আসলে, বাংলা বা ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি হেলেন। ফরাসীরা তো হ উচ্চারণ করবে না কিছুতেই!

এলেন আর মোনিক আগে এক সঙ্গে এই ফ্ল্যাটে থাকত। এলেন বিয়ে করে অন্য জায়গায় উঠে গেছে। মোনিক যদি শিগগির বিয়ে না করে, তাহলে সেও এটা ছেড়ে দেবে। বিয়ে করবে কিনা, সে সম্পর্কে মোনিক মত স্থির করতে পারছে না।

দুপুরবেলা এত বড় বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। সবাই কাজে বেরিয়ে যায়। মনে হয় যেন বাহান্নখানা অ্যাপার্টমেন্টওয়ালা এই পেল্লায় বাড়িটায় আমি আর মার্গারিটই শুধু দুটি মাত্র প্রাণী।

চট করে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা বিশ্রম্ভালাপ শুরু করলাম। মার্গারিট ওর মায়ের তৈরি দু' বোতল ওয়াইন নিয়ে এসেছে। পূর্ববঙ্গে যেমন বাড়ির তৈরি কাসুন্দি অন্যান্য বাড়িতে উপহার পাঠানো হয়, ফ্রান্সে সেই রকম বাড়ির তৈরি ওয়াইন। একটু চেখে বলেছিলাম—মার্গারিট, সত্যি অপূর্ব, এমন কখনো আগে খাইনি। কী মিষ্টি তোমার মায়ের হাত।

মায়ের প্রশংসায় ছেলেমানুষের মতন খুশি হয়ে বলল, 'জানো তো, মাকে আমি তোমার কথা বলেছিলাম!'

—কি বললেন তিনি!

—মা বললেন, নিয়ে এলি না কেন? আমি কখনো কোন হিন্দু দেখিনি!

ভারতের যে-কোন লোকই এদের কাছে হিন্দু। সেই হিসেবে আমার নিজেকে খুব একটা দ্রষ্টব্য মনে হলো না।

আমি বললাম, 'মার্গারিট, তুমি যতদিন ছিলে না, আমি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিলাম।'

—তুমি কতটা খারাপ হতে পারো?

—অনেক অনেক খারাপ!

—তুমি যখন খারাপ হও, সেই অবস্থায় তোমাকে আমার একটু দেখতে ইচ্ছে করে! তোমার খারাপ হবার ক্ষমতাই নেই। তুমি খারাপের ডেফিনিশান জান না!

—কি পাগল! তুমি আমাকে এতটা বিশ্বাস করো!

—শোন নীল, ওখানে এই ক'দিন আমার কথা তোমার মনে পড়ত?

—প্রতিদিন, প্রত্যেক ঘণ্টায় মনে পড়ত। বিশ্বাস করো, তুমি ছিলে না বলে আমার এক মুহূর্তও ভালো লাগেনি! আমার ঘরটাকে কী রকম বিচ্ছিরি আর ফাঁকা মনে হতো...বব্ বাকল্যান্ডের বাড়ির পাশ দিয়ে যখন দু' একবার গেছি, তাকাতে

পারিনি বাড়িটার দিকে...

—আমিও এখানে, তোমাকে ছেড়ে এসে এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারিনি। মায়ের অসুখ। তার খাটের পাশে বসেও আমি তোমার কথা ভেবেছি।

এর পরে আমার মুখে আর একটা প্রশ্ন এসে গিয়েছিল। তবু আমি চুপ করে রইলাম। মার্গারিট আমার মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়েই তা বুঝে গেল। চোখ নামিয়ে বলল, 'আমি তোমাকেই, শুধু তোমাকেই ভালোবাসতে চাই। আমি এখনো বুঝিনি ভালোবাসা কাকে বলে, কিন্তু আমি ভালোবাসতে চাই। সেই রকম ভালোবাসা—যা মানুষের জীবন থেকে আর কখনো ছাড়ে না। আমি এবার এসে বাইবেল তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, ভালোবাসা কাকে বলে, তা জানার জন্য। কেউ বলতে পারেনি। আমি জানি, এর উত্তর আছে শুধু মানুষের মনে। আমি বুঝতে পেরেছি, আমি খুব শিগগিরই এর উত্তর পেয়ে যাব!'

আমি বললাম, 'মার্গারিট, সারা ইওরোপ আমেরিকায় তুমিই বোধহয় এখন একমাত্র মেয়ে, যে ভালোবাসা নিয়ে এরকম চিন্তা করছে। আর কেউ করে না। সবাই এখন বোঝে সেক্সুয়াল প্লেজার অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ভালোবাসা নিয়ে কে মাথা ঘামায়! এ পর্যন্ত যতজনকে দেখলাম—'

মার্গারিট উত্তেজিতভাবে বলল, 'না, না, তা হতে পারে না! এ তো প্রিমিটিভ! একদম প্রিমিটিভ। শুধু সেক্সুয়াল প্লেজার অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং—এ প্রিমিটিভ ছাড়া কি! ভালোবাসা ছাড়া মানুষের সভ্যতা বাঁচতে পারে না!'

বিকেলবেলা মোনিকের সঙ্গে আলাপ হলো। কালো সিল্কের গাউন-পরা শ্বেতপাথরের এক মূর্তি যেন। মার্গারিটেরই মতন ছিপছিপে তন্বী, তবে ভুরু আঁকে এবং সাজগোজের দিকে বেশ নজর আছে। প্রথম আলাপে তাকে একটু গম্ভীর মনে হয়, আসলে তার একটা চাপা রসিকতা বোধ আছে। ফরাসী ছাড়া ইংরেজিতে সে এক অক্ষরও কথা বলবে না, আমি বুঝতে না পারলে আবার বলবে—না, না, মার্গারিটকে জিজ্ঞেস করো না, পেতি লারুস দেখো। ফরাসী ভাষায় বেশ মোটাসোটা একটা বিখ্যাত অভিধানের নাম পেতি লারুস্। ঐ যদি পেতি লারুসের চেহারা হয়, তা হলে গ্রাঁ লারুস কী রকম দেখতে হবে কে জানে!

মোনিক এসেছে বোর্দো অঞ্চল থেকে। শহরে একা চাকরি করে। এই জিনিসটা আমরা এখনো দেখিনি, একলা একলা মেয়েরা গ্রাম থেকে শহরে চাকরি করতে আসে এবং নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। মোনিকও অনেক কবিতা মুখস্থ বলতে পারে বটে, কিন্তু তার স্বভাব মার্গারিটের একদম বিপরীত। একদিন সে তার এক ইটালিয়ান ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিল, কিছুক্ষণ একসঙ্গে গল্প ও মদ্যপানের পর সে তার ছেলে-বন্ধুকে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে

দরজায় খিল দিল। কিছুদিন আগেই নাকি তার এক জার্মান বন্ধু ছিল, তার সঙ্গেও এরকম দরজায় খিল দিয়েছে—সে ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না। সে বিশ্বাস করে সিলেকশানে।

আমাদের কাছে আলাদা চাবি আছে, আমরা ইচ্ছে মতন যখন খুশি আসব-যাব, যখন ইচ্ছে খেয়ে নেব—মোনিক বলেছে তার জন্য আমাদের প্রোগ্রাম নষ্ট করার কোন দরকার নেই।

আমরা সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াই। নতুন লোকের পক্ষে প্যারিসের রাস্তা চিনতেই অনেক সময় যায়। আমার সে সমস্যা নেই। মার্গারিট একদিনেই আমাকে বুঝিয়ে দিল, কি করে মাটির তলায় নেমে এক জায়গায় বোতাম টিপে আলো জ্বাললেই মেট্রো রেলের সব জায়গার রুট জানা যায়। এর মধ্যে ঘুরে এলাম ভার্সাই। লুভর মিউজিয়াম দেখতেই দু'দিন কেটে গেল। আলাদা আলাদা আর্ট গ্যালারিতে আলাদা আর্টিস্টদের এক প্রদর্শনীর খবর মার্গারিট জোগাড় করে আনে। রুয়ো'র শেষ জীবনের বিপন্ন ম্লান ছবিগুলির একটা প্রদর্শনী দেখে এক সন্ধে মন খারাপ হয়েই রইল।

কখনো ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গেলে সাঁজেলিজে'র কোন কাফেতে বসি। চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার দৃশ্য দেখতেই ভালো লাগে। প্যারিসের সব কিছুর মধ্যেই একটা ছিমছাম সৌন্দর্যের ব্যাপার আছে। স্যেন নদী তো সামান্য ছোট্ট একটা খালের মতন প্রায়, অথচ তারই ওপর কতগুলো ব্রীজ—এবং প্রত্যেক ব্রীজে আলাদা কারুকাজ।

বাড়ির নিচেই মুল্যাঁ রুজ, সেখানে একদিনও যাওয়া হয়নি। অতিবিখ্যাত জায়গাগুলিতে মার্গারিট যেতে চায় না, আমারও আগ্রহ নেই। সেজন্য ইফেল টাওয়ারে ওঠাই হলো না। সকালবেলা মুল্যাঁ রুজের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখি, ভেতরের চেয়ার-টেবল সব উল্টোনো, মেয়েরা বাইরে বসে পায়ের ওপর পা তুলে কফি খাচ্ছে, তখনও তাদের গালে একটু একটু রং লেগে। তখন কে বলবে, এই মেয়েরাই রাত্রের মোহিনী, সারা বিশ্বের ভ্রমণকারীদের হৃদয়ে তুফান তুলে দেয়।

সেই সময়টায় আমি বাজার করতে যাই। শস্তা হবে বলে মঁমার্ত্রের বাজার থেকে ঘোড়ার মাংস কিনে আনি আর লাঠির মতন লম্বা লম্বা শক্ত রুটি। প্যারিসে ভাত খাওয়ার আশা বড় দুরাশা। এখানকার দোকানে ব্যাঙ বিক্রি হতেও দেখি না, যদিও ছেলেবেলা থেকেই আমরা শুনেছিলাম চীনেম্যানরা যেমন আরশোলা খায়, ফরাসীরা সেই রকম ব্যাঙ-খেকো। বরং আমেরিকায় প্রায় সব দোকানেই কাঁচা ব্যাঙের ঠ্যাং বিক্রি হয়। একবার মার্গারিট আর আমি কিনে এনে ভেজে খেয়েছিলাম। মার্গারিটেরও সেই প্রথম ভেক-ভক্ষণ।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার আগে আমরা আর বেরুই না। কারণ বাইরে খাওয়ার দারুণ খরচ। দু'জনে খুনসুটি করে কোথা থেকে যে সময় কেটে যায় বুঝি না! খবর এসেছে যে মার্গারিটের মা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছেন এবং ভালো আছেন। মার্গারিট বাড়ি থেকে আর একবার ঘুরে এসে তারপর আমার সঙ্গেই আমেরিকায় ফিরবে—এই রকম পরিকল্পনা করে প্রায়ই। এই সময় আমি চুপ করে থাকি। এই একটা কথা এ পর্যন্ত ওকে বলা হয়নি। কি করে বলব, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

একদিন দুপুরবেলা কাছাকাছি অ্যাপার্টমেন্টের এক বুড়ি দেখা করতে এসেছিল আমাদের সঙ্গে। ঠিক আমার দিদিমার মতন দেখতে, সেই রকম সৌম্য মুখ, ঠোঁটটা হাসি হাসি। আমার লজ্জা করছিল একটু। মার্গারিট আর আমার তো বিয়ে হয়নি, তবু আমরা একসঙ্গে এখানে থাকি—এই বৃদ্ধামানুষটি যদি পছন্দ না করেন? বৃদ্ধা কিন্তু সেদিকে গেলেনই না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বাঙালি শুনে তিনি বললেন—ও, ফই দ্য বেঙ্গাল! সে তো চার্চের একরকম আলোর নাম। আর একরকম পাখি আছে আমাদের গ্রামে, বেঙ্গালি—ছুঁচোলো ঠোঁট।

মার্গারিট হাততালি দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ দিদিমা, ঐ পাখির উল্লেখ আছে মালার্মের কবিতায়!'

বৃদ্ধা বললেন, 'কি জানি বাপু! আমি কি তোদের এইসব মালার্মে না ফালার্মের কবিতা পড়েছি নাকি! আমরা পড়েছিলাম ভিক্তর য়ুগোর কবিতা, আহা, অমনটি আর হলো না!'

ঠিক যেন আমার দিদিমার মুখে কাশীরাম দাসের প্রশংসা।

স্যেনের পাশে পাশে পুরোনো বইয়ের দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখা মার্গারিটের এক নেশা। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যায়। সন্ধে হয়ে আসে। তখন দেখা যায়, নদীর পারে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ের অন্তহীন চুমুর প্রদর্শনী। একদিন আমি বললাম, 'মার্গারিট, আমারও এইরকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে চুমু খেতে ইচ্ছে হয়। বেশ সকলের সামনে।'

মার্গারিট মুখ লুকিয়ে বলল, 'আমার লজ্জা করে। এই সব দেখলে কী রকম যেন লাগে!'

অন্য যে-কোন মেম-যুবতী একথা শুনলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। চুমু খেতে লজ্জা, এ আবার কি নতুন রকমের কথা!

একটু থেমে মার্গারিট বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার যখন এত ইচ্ছে, এসো—একটু অন্ধকার দেখে।'

—না। অন্ধকার নয়। ব্রীজের আলোর নিচে।

—আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

মার্গারিটকে জড়িয়ে ধরে ঠিক অনাদের কায়দায় ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে রাখলাম। মধ্যবয়স্কা পত্নীকে নিয়ে ভ্রমণরত এক ভারতীয় আমাকে দেখে একেবারে আঁতকে উঠল। ইস, এই সময় চেনাশুনো বাঙালি কেউ এসে দেখলে যে কী আনন্দই হতো আমার!

মার্গারিট ফিসফিস করে বলল, 'চল নত্‌র দাম গীর্জায় যাই। ইচ্ছে করে আর একদমই আলাদা থাকব না! এক বাড়িতেই থাকব সব সময়।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলাম। মার্গারিটের কাছে এ পর্যন্ত আর কোন কথা গোপন করিনি। কিন্তু এ কথাটা যে কি করে বলব!

একটু বাদে মার্গারিট বলল, 'চল নতর দাম গীর্জায় যাই। ইচ্ছে করেই এখানে তোমাকে এতদিন নিয়ে যাইনি। আজ রবিবার, আজ আমি ভেতরে গিয়ে প্রার্থনা করব, তুমি ঘুরে ঘুরে দেখবে। আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করবো, আমি আজ জিজ্ঞেস করবো...'

—কিন্তু তোমার ঈশ্বর কি আমার মতন হীদেন এবং নাস্তিকের প্রতি কোন দয়া দেখাবেন?

—ঈশ্বর সকলের।

—আমার জন্য নয়।

হাঁটতে হাঁটতে গেলাম নত্‌র দাম গীর্জায়। আমি ঠিকই বলেছিলাম, মার্গারিটের ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ। বহুদিন পর গীর্জাটায় রং করা হচ্ছে বলে কিছুদিনের জন্য জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

মার্গারিট দারুণ বিষণ্ন হয়ে গেছে। ফেরার পথে আর একটাও কথা বলতে পারল না। আমারও মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে বেশ। এই রোমান ক্যাথলিকদের ভালোবাসার মর্ম বোঝা আমার সাধ্য নয়! আমার আর এই মেয়েটির মধ্যে ঈশ্বর এসে দাঁড়ায় কেন? ঈশ্বরের কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই?

মোনিক সকালবেলা তার জার্মান বন্ধুর সঙ্গে শহরের বাইরে গেছে, রাত্রে ফিরবে না বলে গেছে। ফ্রিজ থেকে স্যাম্পেনের বোতলটা বার করে রান্নাঘরেই বসে গেলাম। আজ আর কিছুই ভালো লাগছে না, আজ নেশা করতে হবে! মার্গারিট জামা-কাপড় ছেড়ে আসতে দেরি করছে, ওকে ডাকতে গিয়ে দেখি, ও বিছানায় শুয়ে আছে।

—এই, তুমি শুয়ে আছো কেন? শরীর খারাপ লাগছে? মাথা ধরেছে?

—না, আমার কিচ্ছু হয়নি। তুমি যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

ফিরে গেলাম। সামনে গেলাস নিয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা। আমাকে কিছু

একটা কাজ করতেই হবে। এই লক্ষ্যহীন ভ্রাম্যমাণ জীবন আর কতদিন?

ঘন্টাখানেক পরে খেয়াল হলো মার্গারিট তখনও আসেনি। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? গেলাস হাতে নিয়ে ডাকতে গেলাম আবার। মার্গারিট চোখ মেলে শুয়ে আছে। গেলাসটা ওর ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম, 'একটু চুমুক দাও তো, লক্ষ্মীটি, মন ভালো হয়ে যাবে।'

গেলাস সরিয়ে দিয়ে মার্গারিট উঠে বসল। তারপর দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি আমাকে নাও!'

আমি তখনও বুঝতে পারিনি।

ও আবার বলল, 'তুমি যদি আমাকে ভালো না-ও বাস, যদি কখনো আমাকে ঘৃণাও কর, অন্য মেয়ের জন্য আমাকে পরিত্যাগ কর, তবু তোমায় আমি ভালোবাসব। আমি মন থেকে উত্তর পেয়ে গেছি আজ, তোমার চেয়ে আমি আমার মাকে, বাবাকে, এমনকি ঈশ্বরকেও বেশি ভালোবাসি না। তুমি আমাকে নাও।'

আমার বুকে যেন দুম করে একটা ধাক্কা লাগল। কিছুক্ষণ আমি কথা বলতে পারলাম না। গেলাসটা নামিয়ে রাখলাম পাশে।

মার্গারিট কাছে এসে আমার গা ছুঁয়ে বলল, 'একি, তুমি কোন কথা বলছ না কেন?'

আস্তে আস্তে বললাম, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে!'

—আমি নির্বোধ, তাই আমি বুঝতে এত দেরি করেছি।

—না, তা নয়। এতদিন আমি তোমার মুখ থেকে এই কথাটা শোনার জন্য প্রতীক্ষা করেছিলাম। আজ শুনে বুঝলাম, আমি এর যোগ্য নই! মার্গারিট, তুমি আমাকে ভালোবাসার জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলে। কিন্তু আমার ধৈর্য নেই। আমি অপেক্ষা করতে পারিনি। আমরা এক সঙ্গে থাকতে পারব না। তোমাকে আমেরিকাতে ফিরতেই হবে। আমার আর ফেরার কোন উপায় নেই।

—তুমি কি সব আজেবাজে কথা বলছ, নীল?

—আমার কথাটা সত্যি না হলেই এই মুহূর্তে আমি সবচেয়ে খুশি হতাম। কিন্তু এটাই কঠিন সত্যি। আমার আর ফেরার উপায় নেই, তুমি আর আমি আর একসঙ্গে থাকতে পারব না।

মার্গারিট আমার গেলাসের সবটা শ্যাম্পেন একসঙ্গে গলায় ঢেলে দিতেই কয়েকবার বিষম খেল। আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। ও টলটলে দুটি চোখ মেলে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?'

ওর পাশে বসে পড়ে আমি বললাম, 'না মার্গারিট, ঠাট্টা নয়। নদী পেরিয়ে

এসে নৌকোগুলো সব পুড়িয়ে ফেলা যাকে বলে, আমি তাই করেছি। আমার বাড়ি ফেরার টিকিট ব্যবহার করে আমি এ পর্যন্ত এসেছি। পরের বছরের স্কলারশিপের ফর্মে আমি সই করিনি। ভিসা রিনিউ করিনি। আমার ফেরার ভাড়া নেই। আর আমি ফিরতে চাইলেও ওরা ফিরতে দেবে না এখন।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মার্গারিট ব্যাপারটা বুঝল। তারপর শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কেন এরকম করলে? সত্যিই তুমি আর ধৈর্য রাখতে পারনি?'

—হয়তো তাই। তা ছাড়া আমি আমার নিজস্ব কিছু কাজ করার জন্য ছটফট করছিলাম। ওখানে আমার কিচ্ছু হচ্ছিল না।

—ওদেশে তোমাকে ফিরতে হবে না। তুমি ফ্রান্সেই থাকো। আমি এখানে চাকরি করব।

—আমি ভিখিরি কিংবা ক্লশার হয়েও থাকতে রাজি আছি। তবু কি আমাকে থাকতে দেবে? বিনা কাজে কোন বিদেশীকে কি থাকতে দেয়? তাছাড়া তোমায় আমেরিকায় ফিরতেই হবে মার্গারিট!

—কেন? না, আমি যাব না। দরকার নেই আমার রিসার্চের। তোমাকে আমি এখানে লুকিয়ে রাখব।

—তোমাকে ফিরতেই হবে মার্গারিট।

মার্গারিট আমেরিকার ব্যাঙ্ক থেকে ধার করেছে। আমি জানি, আত্মবিক্রয় করতে হলেও ও সেই টাকা শোধ দেবেই। কথার মর্যাদা যে ওর কাছে সাঙ্ঘাতিক।

অনেকক্ষণ আমরা বসে রইলাম চুপচাপ। তারপর মার্গারিট উঠে এসে আমার কোলের ওপর বসে গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি আর একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম। ভালোবাসার সঙ্গে তো মিলন বা বিচ্ছেদের কোন সম্পর্ক নেই। ভালোবাসা হচ্ছে ভালোবাসা। আমরা এক সঙ্গে থাকি বা না থাকি, তাতে কি আসে যায়? ভালোবাসা তো ভালোবাসা ছাড়া আর কোন কিছুই দাবি করে না! ত্রিস্তান আর ইসল্ট কি এক সঙ্গে থেকেছিল? রাধা আর কৃষ্ণ কি এক বাড়িতে থাকত!'

—তবু ওদের দেখা হতো।

—আমাদেরও দেখা হবে। আমি কোন না কোনদিন কালকুত্তায় যাব ঠিক।

—আমি আবার ফিরে আসব!

—সেসব তো পরের কথা। আজ রাত্তিরটা আমরা দুঃখ করে কাটাব কেন? ভালোবাসার জন্য যদি এক মুহূর্তেরও আনন্দ পাই, তাও তো জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস হয়ে থাকবে!

ওর মাথাভর্তি সোনালি এলোমেলো চুলে আমি হাত রাখলাম। শান্তভাবে

আদর করতে লাগলাম ওর সারা মুখে। ও চোখ বুজে আছে। আবেগে সারা শরীরটা কাঁপছে। এত নরম, এত সুন্দর এই বালিকাটিকে কি আমি আঘাত দিলাম? নিজেও তো কম আঘাত পাইনি।

আস্তে আস্তে খুলে দিলাম ওর জামা ও স্কার্ট। লাজুকভাবে ও আমার বুকে মুখ ডুবিয়ে রেখেছে। ঠিক যেন একটা শিশু। চুমুতে ভরিয়ে দিলাম সারা দেহ। আবার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চট করে রান্নাঘরে চলে গেলাম শ্যাম্পেনের বোতলটা আনতে। ফিরে এসে দেখি ও পিছন দিকে মুখ ফিরে তাকিয়েছে। চমকে উঠলাম। ও যেন মানুষ নয়, একটা ছবি। কোন মিউজিয়ামে যেন এই ছবিটা দেখেছি? হ্যাঁ Ingres-এর আঁকা, লা গ্রাণ্ড ওদালিস্ক। সত্যি সত্যি মার্গারিটের রক্তমাংসের শরীরটা যেন শিল্প হয়ে যায়। ঈষৎ উঁচু করা চিবুক, বুকের ওপর এসে পড়েছে নীলাভ আলো, কাছাকাছিই অন্ধকার—এ যেন অলৌকিক এক দৃশ্য। চোখ ভরে যায়, কাছে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। বুঝতে পারলাম, ভালোবাসার মধ্যে কতখানি মায়া। এই দেবোপম শরীর দেখেও তো ঠিক লোভ হয় না। মনে হয় যেন একটা পাহাড়ে লুকোনো ঝর্ণা, এখানে নিরালায় অবগাহন করি!

আমার বুকের মধ্যে এসে মার্গারিট কাঁপতে লাগল। যেন একটা পাখি। আমি ওকে কিছু একটা কথা বলতে গেলেও ও আমার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে কথা থামিয়ে দেয়। তারপর একটু পরে নিজেই ফিসফিসিয়ে বলে—আজ আমার বড় আনন্দের দিন, আজ আমি ভালোবাসাকে জেনেছি!

আমাদের বিচ্ছেদের দিন হঠাৎ খুব কাছে চলে এল। মোনিক ফিরে এসেই ঘোষণা করল, জার্মান ছেলেটিকে সে অবিলম্বে বিয়ে করছে। সুতরাং আর ঐ অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের থাকা চলে না। আর দু'দিনের সময় নিলাম।

মার্গারিট দারুণ উচ্ছল, আর বিষাদের চিহ্নমাত্র নেই। সে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, কিছুতেই আর মন খারাপ করবে না। সকালবেলা এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে মার্গারিট আমার জন্য কিনে নিয়ে এল একটা আলপাকার উলের দামি সোয়েটার। আমিও চুপি চুপি বেরিয়ে কিনে আনলাম ওর জন্য একটা ফারের কোট। ও খুব রাগারাগি করে বলল—তুমি কি পাগল হয়েছ? এত টাকা কেউ খরচ করে? তোমার এখন কত টাকা দরকার হবে!

আমি বললাম—আহা রে খুকি! তোর বুঝি আর টাকার দরকার হবে না? অতদূরে ফিরবি কি করে?

দুপুরবেলা ও আবার কিনে আনল আমার জন্য এক জোড়া সিল্কের জামা। এবার আমিও বকলাম খুব। ওর জন্য কিনে আনলাম প্যারিসের শ্রেষ্ঠ পারফিউম। ও বকতে যেতেই আমি বললাম—আমি চাই, এই পারফিউম মেখে আজ রাত্রে

তুমি আমার সঙ্গে শোবে। আমার হুকুম! ও আবার কিনে আনল একটা ঘড়ি। মার্গারিট নিশ্চয়ই টাকা ধার করছে। ওর কাছে এত টাকা থাকার কথা নয়। তা হলে আমারই বা সর্বস্বান্ত হতে বাধা কি? সাঁজেলিজের শ্রেষ্ঠ রেস্তোরাঁয় ওকে খেতে নিয়ে গেলাম। সেখানে দু'জনের ডিনারের বিলে কত লোকের এক মাসের মাইনে হয়ে যায়।

দু'দিন বাদে মার্গারিট যখন আমাকে ওর্লি এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এল, তখন আমরা দু'জনেই এমন হাসিখুশি গল্পে মেতে রইলাম, যেন দু'একদিনের জন্য আমি কাছাকাছি কোন জায়গায় যাচ্ছি।

অবশ্য এখন যাচ্ছি কাছাকাছিই। প্রথমে যাব লন্ডনে। বাঙালির ছেলে এদিকে এসে একবার বিলেত ঘুরে বিলেত-ফেরত না হলে কি চলে? ওখানে এক বন্ধু বিমানকে চিঠি লিখে দিয়েছি। পকেটে আমার এখন আছে ঠিক দশ ডলার। বিমান যদি কোন কারণে এখন লন্ডনে না থাকে বা এয়ারপোর্টে না আসে, তাহলেই লন্ডনে গিয়ে আমায় হাবুডুবু খেতে হবে। ঠিক শিকাগোতে প্রথম দিন যে অবস্থা হয়েছিল। সেরকম ভাবে ভ্রমণ শুরু করেছিলাম, সেরকম ভাবেই শেষ করছি। তাতে অবশ্য ভয় পাবার কিছু নেই। নিঃস্বের তো শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু হারাবার ভয় থাকে না!

কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেছে। ভিসায় ছাপ পড়া মানেই আমি এখন কার্যত ফ্রান্সের বাইরে। মার্গারিটও আজই একটু বাদে বাবা-মা'র কাছে ফিরে যাবে। কাস্টমস বেরিয়ার-এর ঠিক পাশেই আমরা একটা বেঞ্চে বসে আছি। আমি হাসতে হাসতে ওকে শোনাচ্ছি আমার প্রথমবার এই বিমান বন্দরের অভিজ্ঞতা। মার্গারিটও বলছে কাস্টমস সম্পর্কে অনেক মজার গল্প।

এক সময় বুঝলাম, আর বেশি সময় নেই। ওকে বললাম, 'আমার চোখের দিকে তাকাও! এবার বলো, একদম মন খারাপ করবে না!'

মার্গারিটও হাসি মুখে বলল, 'তুমিও আমার চোখের দিকে তাকাও। এবার বলো, একদম মন খারাপ করবে না।'

—মার্গারিট, আমরা হাসি মুখে বিদায় নেব!

—নীল, আমাদের প্রতিটি মুহূর্তই তো আনন্দের।

ফ্লাইট নম্বর ধরে ডাক দিয়েছে। এবার যেতে হবে। সত্যিই আমি ফিরে যাচ্ছি? এক মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে ছিলাম, মার্গারিটের হাসিমুখ দেখেই সামলে নিলাম। ও যদি ঠিক থাকতে পারে, আমি পারব না?

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'চলি মার্গারিট। অ রেভোয়া। দু'তিন বছরের মধ্যে আবার নিশ্চয়ই ফিরে আসব।'

—আমিও কলকাতায় যাব। দু'তিন বছরের মধ্যেই। মন খারাপ করবে না?

—না। তুমি?

—দেখ, আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ, একটুও কাঁপছে?

একজন লোক এসে তাড়া দিল। আমি মার্গারিটের গালে ঠোঁট ছোঁয়ালাম।

নিচে নেমে এসে রানওয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম, ওপরে বারান্দায় একটা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে মার্গারিট। হাসিমুখে বারবার হাতে ঠোঁট ছুঁইয়ে আমার দিকে উড়ন্ত চুমু ছুঁড়ে দিচ্ছে। আমিও উত্তর দিলাম কয়েকবার পেছন ফিরে ফিরে। তারপর বিশাল প্লেনের গর্ভে ঢুকে গেলাম।

ভেতরটায় বেশ গুমোট। পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, রুমাল বাইরে রাখতে ভুলে গেছি। ইস, মার্গারিট জামা-প্যান্ট গুছিয়ে দেবার সময় মনে রাখেনি রুমালের কথা। যাক, তবু জানলার কাছে সীট পাওয়া গেছে। ওপরের হাওয়া ছেড়ে দিয়ে সীট বেল্ট বেঁধে গুছিয়ে বসলাম। জানলা দিয়ে কি মার্গারিটকে দেখা যায় এখনো?

ও কি? কি দেখছি? দূরে এয়ারপোর্টের বারান্দায় মার্গারিট রেলিং টপকে লাফিয়ে পড়তে চাইছে। দু'জন লোক চেপে ধরে আছে তার দু' হাত। আকুলি-বিকুলি করছে মার্গারিট। তার তন্বী শরীরটা যেন ঝড়ের মধ্যে একটা ফুল গাছ। কিছু না ভেবেই আমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। বিকৃত গলায় কি যেন বললাম। সহযাত্রীরা অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল। আর তক্ষুনি দৌড় শুরু করল বিমানটা।

আমি ধপ করে বসে পড়লাম। ঝড়ে যেন আমার শরীরটা কাঁপাচ্ছে! নিজেকে সামলাতে পারছি না, দরদর করে জল পড়ছে চোখ দিয়ে। ইস্, রুমাল নেই, মুছে ফেলতে পারছি না, অন্য লোকেরা ভাবছে কি! পাশের লোকটি হাঁ করে চেয়ে আছে। একবার সে জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে আপনার?

উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই! শৈশবের প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে আমি আবার কাঁদছি। নির্লজ্জের মতন। আমার হেঁচকি উঠে যাচ্ছে। হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছেও সে কান্না শেষ করা যায় না!

আবার জানলা দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করলাম। আর কিছুই দেখা যায় না। বাইরে শুধু মেঘ। আমি হারিয়ে যাচ্ছি। আমি একলা...আর এ কি অসম্ভব একাকীত্ব, বুক যেন ছিঁড়ে যেতে চাইছে—মার্গারিট, আমি আছি, তুমি আমার দিকে একবার তাকাও, চোখে চোখ রাখো, আর একবার বলো, আমাদের প্রতিটি মুহূর্তই তো আনন্দের!

স্বর্গের খুব কাছে

স্বাতী ও শুদ্ধশীল বসুকে

১

একটু আগে রোদ্দুর ছিল, হঠাৎ ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। ছুটে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা চিনার গাছের নীচে দাঁড়ালাম।

রোদ্দুরে হেঁটে আসার সময় একটা চিনচিনে গরমভাব ছিল, বৃষ্টি শুরু হতেই শীত লাগল একটু একটু। কোন গরম জামা আনিনি। বৃষ্টির মিহিন গুঁড়ো ঠিক অভ্রের মতন ওড়ে। চিনার গাছের ওপরের ঘন আড়াল থেকে ডেকে ওঠে দুটো পাখি। ঐ পাখিগুলোকে আমি চিনি না, খানিকটা মাছরাঙার মতন দেখতে। মাছরাঙার ডাক কিন্তু অনেকটা শাকচুন্নীদের মতন, এমন ভরাট নয়।

বৃষ্টি আরো ঝেঁপে এল। এখন আর অভ্রের গুঁড়ো নয়, কালো অ্যাসফল্ট বাঁধানো রাস্তার ওপরে চটাস চটাস শব্দে জুঁই ফুলের মতন বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। কলকাতা হলে এরকম বৃষ্টির মধ্যেও দৌড়ে চলে যেতাম। কিন্তু এখানে একবার মাথা ও গা ভিজে গেলে চট করে ঠাণ্ডা বসে যায়। আর পাহাড়ী জায়গার সর্দি মানেই দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগ।

আমার সামনের রাস্তা দিয়ে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে গেল নীল রেনকোট পরা একজন মানুষ। ওকে চেনা চেনা মনে হল। খুব সম্ভবত ড্রিম ফ্লাওয়ার বোটের মির্জা আলী। ছিপছিপে লম্বা, তীক্ষ্ণ নাক, গাঢ় ভুরু। ঠিক যেন একটি তরুণ অশ্বের মতন চেহারা। ঘোড়ার সঙ্গে মানুষের চেহারার কোন মিল হতেই পারে না। তবু মির্জা আলীকে দেখে সেই কথাই আমার মনে হয়। এমন রূপবান পুরুষ আমি খুব কম দেখেছি। অথচ লোকটি নিরক্ষর এবং এমনই বিনীত যে কাপুরুষ বলে ভ্রম হয়। তবু সুন্দর চেহারার একটা আলাদা মূল্য আছেই, আমি মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকি ঐ অপসৃয়মাণ মানুষটির দিকে। নীল রঙের রেনকোটটার জন্য ওকে আজ আরো সুদৃশ্য দেখাচ্ছে—ওরকম রেনকোট এদেশে পাওয়া যায় না, নিশ্চয়ই কোন সাহেব ওকে ওটা দান করে গেছে। আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মির্জা আলীর চেহারাটা একটু খারাপ হলে কোন ক্ষতি ছিল না, তার বদলে আমার চেহারাটা কী একটু ভালো হতে পারত না? শুধু চেহারার জন্যই প্রথম পরিচয়ে কেউ আমাকে গ্রাহ্যই করে না।

ছাতা নিয়ে বেরুনো অভ্যেস নেই কোনদিন। অনেকবার ভেবেছি একটা

রেনকোট কেনার কথা। কেন জানি না আমার ধারণা, রেনকোট পরলেই যে-কোন মানুষকে কোন ডিটেকটিভ বইয়ের চরিত্র বলে মনে হয়। অবশ্য মির্জা আলীকে সে রকম মনে হবার কোন উপায় নেই, ওর মধ্যে রহস্য নেই কোন।

এবার যাচ্ছে দুটি মেম। এদেরও সঙ্গে রেনকোট। তবু এদের পদক্ষেপ বেশ দ্রুত। আহা, এরা তো আর কালিদাসের কাব্য পড়েনি, তাই জানে না যে শ্রোণীভারে অলস-গমনা হওয়া সুন্দরীদের একটি লক্ষণ। দুর্ভাগ্য করে পশ্চিমে জন্মেছে, তাই এসব আর জানবে কী করে? মেয়ে দুটি ইওরোপীয়ান, না আমেরিকান? অনেকটা বিনা প্রমাণেই ওদের জার্মান বলে সন্দেহ হয় আমার। ক'দিন ধরেই, আমার নিজের দেশ ভারতবর্ষে বসেই আমি জার্মান আতঙ্কে ভুগছি।

বৃষ্টি একটু ধরে এসেছে। আর দেরি করা উচিত নয়। টেনে দৌড় লাগালাম, তথাকথিত জার্মান মেয়ে দুটিকে পেরিয়ে আমি পৌঁছে গেলাম টুরিস্ট সেন্টারে।

প্রথমেই একবার উঁকি দিলাম চিঠির খোপগুলোতে। কারুর চিঠি লেখার কথা নেই, কেউ হঠাৎ লিখবে না জানি, তবু চিঠির জন্য একটা অসম্ভব লোভ থাকে। যদি সম্পূর্ণ অচেনা কেউ চিঠি লিখে জানতে চায়, তুমি কেমন আছো?

আমার নামে চিঠি নেই, তবু আমার নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে যত লোকের পোস্টকার্ডে চিঠি এসেছে সেগুলো পড়ে পড়ে দেখতে লাগলাম। তেমন চিত্তাকর্ষক কিছুই নেই। একটা টেলিগ্রাম এসে পড়ে আছে দু'দিন থেকে। সেটা একবার খুলে দেখার দুর্দান্ত কৌতূহল হল। হয়তো কোন সাঙ্ঘাতিক খবর আছে এর মধ্যে, কিন্তু যার নামে টেলিগ্রাম, সে হয়তো গিয়ে বসে আছে গুলমার্গে।

তিন নম্বর কাউন্টারের সামনে একটু একটু গোলমাল শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ একজন মহিলা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ইয়েস, আই অ্যাম মিসেস চ্যাটার্জি! আপনি তার কি কোন প্রমাণ চান?

বাঙালি নাম শুনে ফিরে তাকাতেই হল। কাউন্টারের সামনে সাদা রঙের সিল্কের শাড়ি, তার ওপর সাদা চাদর জড়ানো একজন মহিলা দাঁড়িয়ে। প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁর চুল, খোলা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো, সমস্ত দেশ মহাদেশ জুড়ে। তাঁর গ্রীবার ভঙ্গিতে রয়েছে তীক্ষ্ণ ধরনের তেজ। তিনি কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়েননি, তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন সোজা, তিনি মোটেই-বেশি-বয়েস-নয় এমন যুবতী হলেও তাঁর সঙ্গে রজনীগন্ধার দণ্ডের তুলনা দিলে ভুল হবে। তাঁকে বলা যায়, কোন বিদ্যুৎ চমকের মতন—কিংবা এ তুলনাটাও বুঝি ভুল হল। ভুল হোক আর যাই হোক, মনে তো হল ঐ রকম।

মহিলাটিকে ঘিরে বেশ ছোটোখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। তিনি আবার

ঈষৎ উঁচু গলায় বললেন, ইংরেজিতে, না, আমি আপনাদের কোন অনুগ্রহ চাই না। আমি নিজেই নিজের দায়িত্ব নিতে পারব। কিন্তু আপনারা আমাকে সব ঘটনা জানাতে চাইছেন না কেন?

পর্যটক দপ্তরের একজন কর্মী বললেন, মাদাম, যা জানাবার তা তো আমরা আপনাকে জানিয়েছি?

মহিলা বললেন, না, জানাননি! আপনারা দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করছেন!

এই সময় আমি সুট করে সেখান থেকে সরে পড়লাম। প্রবাসে আমি বাঙালি সংসর্গ এড়িয়ে চলি পারতপক্ষে। এবং ইংরেজিতে ঝগড়া-করা-সুরে-কথা-বলা নারীদের থেকেও আমি দূরে থাকতে চাই। এখানকার মানুষজন অত্যন্ত ভদ্র, তাদের সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলার তো কোন দরকার পড়ে না।

চত্বর পেরিয়ে আমি চলে এলাম বুক স্টোরের দিকে। যে সদা-তরুণটি ঐ দোকানে বসে, তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেছে। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আখবর আয়া?

ছেলেটি হাতঘড়ি দেখে বলল, আভি আ জায়গা। অন্দর মে আ কে বৈঠিয়ে।

পৌনে একটার আগে যে বিমান-ডাকে কাগজ আসে না, তা আমিও জানি। তবু একটু আগে আসি বই দেখার লোভে। ছেলেটি আমাকে ভেতরে বসিয়ে সব বইটই নাড়াচাড়া করার সুযোগ দেয়। ওকে একটা সিগারেট দিয়ে আমি চেয়ার টেনে বসলাম।

চারপাশে ঝকঝকে সব নতুন বই, এই দৃশ্যটা চমৎকার লাগে। নতুন বইয়ের সুগন্ধও নাকে এসে ঝাপটা দেয়। সব ক'টি বই-ই ইংরেজি এবং বিদেশে ছাপা। পৃথিবীর আর এমন কোন সভ্যদেশের কথা কল্পনাই করা যায় না, যেখানকার কোন দোকানে সব বিদেশী বই থাকে, দেশের বই একটিও থাকে না।

সৌম্যদর্শন ছেলেটির নাম শমীম। তার ফর্সা রঙের সঙ্গে গায়ের গাঢ় হলদে জামাটি খুব সুন্দর মানিয়েছে। সে টেবিল থেকে আট-দশখানা বই তুলে নিয়ে বলল, স্যার, এগুলো দেখুন, নতুন এসেছে।

আমি এ পর্যন্ত ওর দোকান থেকে একটাও বই কিনিনি। তবু ও আমায় খাতির করে। নেড়ে চেড়ে দেখে দুটি বই বেশ পছন্দ হল। আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম।

ও হেসে বলল, নিয়ে যান না!

আমি বললাম, কাল ফেরৎ দেব?

শমীম জানে, আমি ওর নতুন বই ময়লা করে ফেলব না। ওর দোকান থেকেই খবরের কাগজ কিনি, সেই কাগজে বইগুলো সাবধানে মুড়ে রাখি।

এই সময় একটু-আগে-রাস্তায় দেখা সেই বিদেশী মেয়ে দুটি এসে কাউন্টারে দাঁড়াল। পিকচার পোস্টকার্ড চায়। শমীম ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল। না, আমার ধারণা ভুল, মেয়ে দুটি জার্মান নয়, কোন ল্যাটিন জাতি, কথার মধ্যে একটা ত ত ভাব আছে।

এবার ওদের পাশে এসে দাঁড়াল দুটি মোটাসোটা লম্বা লোক। চকচকে টেরিলিনের জামা, সেই রকমই প্যান্ট। মাথার চুলে চটচটে তেলতেল ভাব। একজনের হাতঘড়িতে সোনা রঙের ব্যাণ্ড। এই রকম ঘড়ির ব্যাণ্ডওয়ালা লোকেরা সব সময় সন্দেহজনক হয়। এই রকম কোন লোকের সঙ্গে আমার কোনদিন বন্ধুত্ব হবে না। বিদেশিনী দুটিকে প্রায় কনুই দিয়ে সরিয়ে ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাউন্টারের ওপর।

ওরা কী কিনতে চাইবে, আমি জানি। টুরিস্ট গাইড ম্যাপ। এই ধরনের লোক কোন একটা জায়গায় আসে নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য, তারপর বুভুক্ষুর মতন দৃশ্য দেখতে ছোটে। আজ এখানে, কাল সেখানে। বার বার জিজ্ঞেস করে, কেয়া কেয়া দেখনে কা হ্যায়? যেন একটাও বাদ না পড়ে। কোন পাহাড়ের চূড়া, কোন হ্রদ, কোন মন্দির অদেখা রয়ে গেলেই যেন দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে।

দোকানদারের সহকারীর মতন, আমি টেবিল থেকে টুরিস্ট গাইড ম্যাপগুলো গুছিয়ে শমীমের হাতে দিলাম। শমীম আবার ঝকঝকে দাঁতে হাসলো। ও কবিতা লেখে। ওর খুব ইচ্ছে ওর দু' একটা কবিতা হিন্দী সিনেমায় গান হয়। আমি আজ পর্যন্ত ধর্মেন্দর কিংবা হেমা মালিনীর কোন ফিল্ম দেখিনি শুনে ও একদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এখানে ধর্মেন্দরের একটা ডাকাতির ছবি চার সপ্তাহ ধরে চলছে।

কাউন্টার আবার ফাঁকা হয়ে গেলে শমীম জিজ্ঞেস করল, আপনি আর কোথাও বেড়াতে গেলেন না?

সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, যাব।

—আর কতদিন থাকবেন?

—ঠিক করিনি কিছু।

—আমার দেশ ভালো করে দেখতে গেলে আপনাকে অন্তত দু' মাস থাকতে হবে!

শমীমের দেশ যে আমারও দেশ তা সব সময় মনে থাকে না। না-থাকার অনেক কারণ আছে।

এর মধ্যে খবরের কাগজ এসে পড়ল। বাণ্ডিল খুলে শমীম প্রথম কাগজটা দিল আমাকে। টাটকা খবরের কাগজেরও একটা আলাদা গন্ধ আছে। পয়সা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এবার দেখি টুরিস্ট সেন্টারের সিঁড়িতে সেই মহিলাকে ঘিরে বেশ বড় একটা ভিড়। সেই মিসেস চ্যাটার্জি। এবং তিনি কাঁদছেন।

মহিলাটির পাশে এখন একটি চার পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়ে। মেয়েটি টলটলে চোখ মেলে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। মহিলাটি দু'হাতে মুখ ঢাকা দিয়েছেন, তবু তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ছে চোখের জল, তাঁর ফোঁপানির শব্দও শোনা যায়।

সব কান্নার পেছনেই একটা করে গল্প থাকে। বিশেষত কোন শিক্ষিতা সুন্দরী মহিলার এরকম প্রকাশ্য দিবালোকে কান্নার দৃশ্য খুবই বিরল, সুতরাং গল্পটি বেশ রোমাঞ্চকর হওয়ারই সম্ভাবনা। সেই গল্পটি জানার জন্য আমার কৌতূহল কিছুতেই দমন করতে পারলাম না। ভিড়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি যে ভদ্রমহিলার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে, আর কেউ নয়, সেই মির্জা আলী। সেই সুদর্শন যুবাকে দেখে তখন মনে হয় কোন ইটালিয়ান ছবির নায়কের মতন। দেখে কে বুঝবে যে, সে একটি হাউসবোটের সরল বোকাসোকা কর্মচারী মাত্র!

দেখতে দেখতে ভিড় আরো বড় হল। পর্যটন দপ্তরের কয়েকজন পদস্থ অফিসার ছুটে এলেন সেখানে। জলে পড়া মানুষের মতন অসহায় গলায় তারা প্লিজ ম্যাডাম, প্লিজ কাম ইনসাইড করতে লাগলেন।

ভদ্রমহিলা মুখ থেকে হাতটা সরালেন। আশ্চর্য, তাঁর মুখে দুঃখের চিহ্ন নেই। বরং অভিমান বা রাগের ছাপ। কোন কারণে তিনি অপমানিত হয়েছেন মনে হয়। তেজস্বিনী নারীরা দুঃখের চেয়ে রাগ বা অপমানেই হঠাৎ কেঁদে ফেলে।

আস্তে আস্তে ভিড়টা ঢুকে গেল হল ঘরের মধ্যে। সেখান থেকে আলাদা একটা কামরায়। কয়েকজন অফিসার ঘরের বাইরে ভিড়টাকে নিরস্ত করলেন। আমি লক্ষ করলাম, মির্জা আলী কিন্তু ঠিক ভদ্রমহিলার পাশে পাশেই রয়েছে।

আমার একবার মনে হল, আমার বোধহয় জোর করে ভিড় ঠেলে ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে বাংলায় কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। উনি যদি কোন বিপদে পড়ে থাকেন, তাহলে হয়তো বাঙালি দেখে...। কিন্তু আমি ভিড়ের মধ্যে আরো কয়েকজন বাঙালি দেখেছিলাম। বাঙালি এমন কিছু দুর্লভ প্রাণী নয়, পৃথিবীর সব জায়গাতেই তাদের দেখা পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ মহিলার ত্রাতার ভূমিকা আমাকেই যে নিতে হবে, তার কোন মানে নেই।

বেরিয়ে এলাম বাইরে। গল্পটা জানা হল না। কিছুক্ষণ আগেই ভদ্রমহিলা বেশ দর্পের সঙ্গে কথা বলছিলেন ইংরেজিতে, তারপরেই হঠাৎ এমন বাঙালি কান্না —ঠিক যেন মেলানো যায় না। সঙ্গে শুধু ঐটুকু বাচ্চা মেয়ে, আর কোন পুরুষ

মানুষ কই? কী হয়েছে ওঁর, টাকা হারিয়ে গেছে? সেটা খুব একটা বড় সমস্যা হবে না। শুনেছি এখানকার পর্যটন দপ্তর এতই ভদ্র যে বিশ্বাস করে টাকা ধারও দেয়।

আর বেশি চিন্তা করার সময়ও পেলাম না। আবার মেঘ নিচু হয়ে এসেছে। এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। কাছেই দু' তিনটে ট্যাক্সি খালি আছে। কিন্তু শুধু একটা খবরের কাগজ কিনতে এসে ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া উচিত নয়। দ্রুত হাঁটলাম বাস রাস্তার দিকে।

এখানকার বাসগুলো বেশ মজার। বাসে কোনো টিকিট নেই, কখন ছাড়বে, কোথায় থামবে তারও ঠিক নেই। ভর্তি হলে ছাড়ে, আবার পথের মাঝখানে যে-কোন জায়গায় অনুরোধ করলে থেমে পড়ে। কলকাতায় এরকম ব্যবস্থা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এখানে এই বে-নিয়মই বেশ তো চলছে, কোন অসুবিধে নেই।

খবরের কাগজটা সাবধানে ভাঁজ করে রাখলাম। বাসে কোনো সহযাত্রী ওটা দেখলেই হাত বাড়াবে। নতুন খবরের কাগজ আমার আগেই অন্য কেউ পড়বে—এটা আমার একদম পছন্দ নয়।

সৌভাগ্যবশত বড় রাস্তায় এসে একটু দাঁড়াতেই হজরতবালের বাস পাওয়া গেল। এবং একটা বসার জায়গা। বাসের ভেতরটা বেশ আরামদায়ক গরম।

২

সবাই বলেছিল, নাগিন লেক বেশ নিরিবিলি এবং শান্ত জায়গা। যারা চুপচাপ সময় কাটাতে চায়, তাদের পক্ষে ঐ জায়গাটিই আদর্শ। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা সুখকর নয়।

প্রথম রাত্রে এখানে এসে পৌঁছেই পর্যটন দপ্তরের এক সহকারীকে বলেছিলাম, নাগিন লেকে একটা ভালো জায়গা ঠিক করে দিন তো!

সহকারীটি তৎক্ষণাৎ পাশের একজন লোকের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, এই তো, এর সঙ্গে যান না!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বাসী তো?

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই; আমাদের এখানে এদের সকলের নাম রেজিস্ট্রি করা আছে। কোন অভিযোগ থাকলে জানাবেন, তাহলে এদের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে!

তবু আমি সাবধানতার জন্য সেখানেই টাকা পয়সার ব্যাপারটা ঠিক করে

নিলাম। কোনক্রমেই যেন পরে বেশি টাকা চেয়ে না বসে!

হাউসবোটের প্রতিনিধিটির নাম হাবীব মুহম্মদ। মির্জা বা শমীমের মতনই সুবেশ সুদর্শন এবং বিনীত মৃদুভাষী। আমার সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার, আপনার আর কোন মালপত্র নেই!

আর শুধু রয়েছে একটা ঝোলা। সেটা আমার কাঁধে। হাবীবকে নিয়ে আমি পর্যটন দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। রাত তখন সাড়ে নটা। এর মধ্যেই রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। হাবীব জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার, ট্যাক্সি নেবেন তো?

নতুন লোক দেখলেই যে ট্যাক্সিওয়ালারা ঠকায়, এ আমার জানা আছে।

—এখান থেকে কতটা দূর?

—আট ন' মাইল হবে!

এতদূরের রাস্তা হেঁটে যাওয়া যায় না। সারাদিন বাসে বসে থেকে শরীরটা বেশ ক্লান্ত। যদিও ট্যাক্সি চড়ার বাবুগিরি আমার পোষায় না, তবু প্রথম রাত্তিরে খানিকটা বিলাসিতা করায় দোষ নেই। দু' তিনটি ট্যাক্সি দরাদরি করে এগারো টাকায় রফা হল একজনের সঙ্গে।

ট্যাক্সি এসে থামল ঘুটঘুটে অন্ধকার এক মাঠের মধ্যে। একটু চোখ সইয়ে নেবার পর দেখতে পেলাম, দূরে জলের ওপরে কয়েকটা আলোর বিন্দু। খানিকটা হেঁটে আসার পর হাবীব বললে, দাঁড়ান, শিকারা আনছি।

দূরে কোথাও রেকর্ডে জ্যাজ সঙ্গীত বাজছে। আকাশে কালিগোলা মেঘের সামান্য নড়াচড়া পর্যন্ত নেই। এখানে এই অপরিচিত জায়গায় আমি একা দাঁড়িয়ে। ঠিক যেন মনে হয় অন্ধকারের মধ্যে আমি অদৃশ্য হয়ে গেছি! হাবীব যদি আর না আসে! না, সে এল একটু বাদেই। ছোট নৌকোয় চেপে একটুক্ষণের মধ্যেই হাউসবোটে পৌঁছোলাম। হাউসবোটের নাম 'সান ডাউনার', একটি বানান ভুল সমেত।

ভেতরে আর কোন মানুষজন নেই। শেষের দিকের ঘরটি আমাকে দেওয়া হল, মেঝেতে কার্পেট পাতা, পরিচ্ছন্ন বিছানা, পাশেই বাথরুম, বাথরুমের কল খুললেই জল পড়ে। বেশ পছন্দ হয়ে গেল।

জামা প্যান্ট না বদলেই টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। সারাদিন বাসের ঝাঁকুনিতে হাড়মজ্জায় পর্যন্ত ব্যথা হয়ে গেছে। প্রায় দিন দশেক ধরে নানা জায়গায় টো টো করছি, এমন নরম বিছানায় অনেকদিন শুইনি।

হাবীব জিজ্ঞেস করলো, সাব, খানা বানাব?

আমি বললাম, না, আগে এক কাপ চা নিয়ে এসো!

চা এসে পৌঁছোবার আগেই অন্য লোকের গলার আওয়াজ শুনলুম।

হাউসবোটের পাশে শিকারা এসে লাগল, কাঠের পাটাতনে মচমচ শব্দ হল। মেমসাহেবী গলায় কে যেন বলল, পেছনের ঘরে আলো জ্বলছে...কেউ এসেছে...হয় আমরা থাকব...অথবা সে চলে যাবে...কথাটা বুঝেছ, হয় আমরা থাকব, অথবা সে...কাল সকালের মধ্যেই...

কে কাকে এসব কথা বলছে, আমি খেয়াল করিনি। আমি স্থির নয়নে ওপারের দিকে চেয়ে আলস্য ভাঙছিলুম, কথাগুলো কানে আসছিল এই মাত্র। টের পেলুম, পাশের ঘরে কারা এসে ঢুকল।

নারীকণ্ঠ শুনলে পুরুষ মাত্রেরই একটু চাঞ্চল্য জাগে। মুখটা কিংবা চেহারাটা দেখার জন্য ব্যাকুলতা শুরু হয়ে যায়। গলার আওয়াজ শুনেই বোঝা গেছে, বয়েস বেশি নয়, কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে। মেমসাহেব সঙ্গে অন্য একজন আছে। কাকে অমন বকাবকি করছিল? যাক গে, এক হাউসবোটে আছি যখন নিশ্চয়ই আলাপ হবে কাল সকালে।

পাশের ঘরে জিনিসপত্র ফেলার ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। এত নির্জন রাত যে যে-কোন শব্দই প্রবল মনে হয়। সাহেব-মেমরা তো সাধারণত বেশি শব্দ পছন্দ করে না। আজকাল সব কিছুই বদলে গেছে। মনে হচ্ছে যেন মেয়েটি ছেলেটিকে বকছে।

একটু পরেই আমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ বলল, ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

আর একজন বলল, না, না, ছেড়ে দাও!

—কেন ছাড়ব! আমাকে বলতে দাও।

—এখন থাক!

—নো! ইউ স্টে বাহাইণ্ড, ইফ ইউ লাইক!

তারপরই মেম গলায় প্রশ্ন: মে উই কাম ইন?

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। জামার বোতামগুলো খোলা ছিল, লাগিয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। সাহেব মেম বলে কথা, যথোচিত সম্ভ্রম দেখাতে হবে।

পর্দা সরিয়ে বললাম, ইয়েস, কাম অন ইন!

ছেলেটি ও মেয়েটির বয়েস চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়। ছেলেটি পরে আছে খাঁকি হাফ প্যান্ট ও উলের গেঞ্জি। মেয়েটির গায়ে একটি পাতলা ফ্রক, তার নীচে অন্তর্বাস কিছুই নেই। এখানে শীত এখনো তীব্র না হলেও আমাদের একটা সোয়েটার লাগে। ওদের সে ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওদের দু' জনের বিবর্ণ মুখ ও জ্যোতিহীন চোখ দেখলেই বোঝা যায়, ওরা বটিকাসেবী। এখনো কোন বটিকার নেশায় রয়েছে।

দরজার বাইরে হাবীব এসে দাঁড়িয়েছে।

বিনা ভূমিকায় পুরুষটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কোন বাচ্চা ছেলেকে আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখেছ ?

আমি হকচকিয়ে গিয়ে উত্তর দিলাম, না তো !

এবার মেয়েটি বলল, তুমি কোন বাচ্চা ছেলেকে আমার ঘর থেকে চুপিচুপি বেরুতে কি দেখেছ ?

—না ! আমি তো এই একটু আগে এসেছি !

পেছন থেকে হাবীব ব্যস্তভাবে তার ভাঙা ইংরেজি আরো ভেঙে ফেলে বলল, স্যার, না, এখানে আর কেউ আসে না, কেউ আসতে পারে না, তা ছাড়া আমাদের ফ্যামিলিতে কোন বাচ্চা ছেলেই নেই !

মেয়েটি তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আমার দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি সেরকম কারুকে দেখনি ? অদ্ভুত ! তা হলে আমাদের ঘর থেকে যে পঞ্চাশ ডলার চুরি গেছে, তা কী করে ব্যাখ্যা করা যায় ? নিশ্চয়ই ঘরে কেউ ঢুকেছিল। তুমি কারুকে দেখনি ?

আমি বললাম, আমি তো এই একটু আগে এসেছি, ঘর থেকে একবারও বেরোইনি, আমি দেখব কী করে ? তোমাদের ঘর কি বন্ধ ছিল না ?

—আমরা কখনো ঘর বন্ধ রাখি না। আমাদের পঞ্চাশ ডলার চুরি গেছে, আমরা কালই পুলিশে খবর দেব ! ছাড়ব না।

মেয়েটির কণ্ঠস্বর অসম্ভব তীক্ষ্ণ। সে আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকায়নি। কথা বলছে দেয়ালের দিকে চেয়ে। তার মুখ ভর্তি অহংকার। এক সময় তার মুখখানি বেশ সুশ্রী ছিল বলেই মনে হয়, কিন্তু ঐ অহংকার এবং চোখের জ্যোতিহীনতা যেন তার রূপ কেড়ে নিয়েছে।

আমি তাদের ব্যবহারের মর্ম কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কেন তারা এত রেগে আছে ? পঞ্চাশ ডলার যদি চুরি গিয়েও থাকে, তার সঙ্গে কোন বাচ্চা ছেলের সম্পর্ক কি ?

হাবীব আবার কিছু বলার চেষ্টা করতেই মেয়েটি তাকে ধমক দিয়ে বলল, ছাড়ব না, বুঝলে ? ঠিক পুলিশে খবর দেব।

তারপর মেয়েটি পেছন ফিরে গটগট করে বেরিয়ে গেল। ছেলেটিও অনুসরণ করল তাকে।

হাবীব আমার ঘরে ঢুকে চায়ের কাপ রাখল ড্রেসিং টেবলে। তারপর অপরাধীর মতন মুখ করে চুপ করে রইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার হাবীব ? এখানে টাকা চুরি হয় ?

হাবীব কাতরভাবে বলল, না, সাব। আমি আল্লার নামে শপথ করছি, এখান থেকে কেউ কোনদিন এক পয়সা নেয় না। সাব, আমি অনেক সাহেব মেম দেখেছি, কিন্তু এদের মতন পাগল আর দেখিনি। এরা একদম পাগল। অন্য কোন মানুষ সহ্য করতে পারে না।

—এরা কী জাত?

—ক্যানাডিয়ান। এরা দশ দিন ধরে এখানে আছে!

আমি চুপ করে রইলাম। হাবীব নিঃশব্দে চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পর আমার খেয়াল হল, আমি চায়ের কাপে একবারও চুমুক দিইনি। ঘরের মাঝখানে সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি তখন থেকে। আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে, রাগে আমার সারা গা জ্বলছে। ঐ সাহেব মেম দুটো এসে হঠাৎ আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করল কেন? আমি কি ওদের দেশে গিয়ে কারুর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে সাহস করতাম! ওরা ভেবেছে কি? সাহেব মেম বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে?

সুটকেস খুলে আমি ব্র্যান্ডির বোতলটা বার করলাম। তার থেকে দুটো বড় বড় চুমুক দেবার পর সারাদিনের ক্লান্তি জড়তা কেটে গিয়ে শরীরে একটা চাঙ্গা ভাব এল। আমার চোখে লালচে ভাব দেখা দিল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হলো. আঙুলগুলোর ডগায় শিরশিরানি এল। আমি ঠিক করলাম, ওদের ক্ষমা চাইতে হবে।

ওদের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ভেতরে আসতে পারি?

ছেলেটি বলল, ইয়েস?

পর্দা সরিয়ে দেখলাম, মেয়েটি ছেলেটির কোলের ওপর বসে আছে। আমাকে দেখেও এক চুল নড়ল না। আমিও দ্বিধা করলাম না।

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমরা আমার ঘরে গিয়ে হঠাৎ এরকম ব্যবহার করলে কেন?

ছেলেটি বলল, আমাদের টাকা চুরি গেছে, তাই জানতে চাইলাম, তুমি কিছু জান কিনা!

—আমি কি করে জানব, আমি একটু আগে এসেছি।

—তাহলে তো ব্যাপারটা সেখানেই ফুরিয়ে গেল।

—না, ফুরিয়ে গেল না। হাবীব বলছে, এদের পরিবারে কোন বাচ্চা ছেলেই নেই। তাহলে এখানে কোন বাচ্চা ছেলে আসবে কী করে? তোমরাই বা আমাকে সে কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?

মেয়েটি বলল, আমাদের টাকা চুরি গেছে, সেটা তো সত্যি—

আমি বললাম, তাই তোমরা জানতে চেয়েছিলে টাকাটা আমি নিয়েছি কিনা?

ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না, সে কথা তোমাকে বলব কেন? তুমি কোন খবর জান কিনা—

—আমার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই। আমি যত দূর জানি, অপরিচিত কারুর সঙ্গে কথা বলতে গেলে আগে আত্মপরিচয় দেওয়াই তোমাদের নিয়ম। কিন্তু তোমরা যেভাবে আমার ঘরে ঢুকে কথা শুরু করলে, তাতে তোমাদের কোন সভ্য দেশের মানুষ মনে হয় না।

ছেলেটি কাঁধ ঝাঁকাল শুধু।

আমি আবার বললাম, শুনেছি তোমরা ক্যানেডিয়ান। সৌভাগ্যবশত তোমাদের দেশের আরো কয়েকজন নারী-পুরুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এবং তারা অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্র। তাদের না চিনলে তোমাদের দেশটা সম্পর্কেই আমার একটা খারাপ ধারণা হয়ে থাকত।

ছেলেটি এবার মৃদু গলায় বলল, আমরা দুঃখিত।

—নিশ্চয়ই তোমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত!

—আমরা সত্যিই দুঃখিত। তোমার সঙ্গে আমরা ইচ্ছে করে খারাপ ব্যবহার করতে চাইনি—

আমি আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। মনে মনে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব। খুব গায়ের ঝাল ঝাড়া গেছে। ব্যাটাদের দিয়ে ক্ষমা চাইয়ে ছেড়েছি তো!

নিজের ঘরে এসে ব্র্যাণ্ডির বোতলে আর একটা চুমুক দিতেই পাশের ঘরে মেয়েটির সরু গলায় হি-হি-হি-হি হাসি শুনতে পেলাম। আবার চড়াৎ করে রাগ চড়ে গেল। এ তো অপমানের হাসি নয়! ওরা নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে বিদ্রুপ করছে। আমারই দেশে বসে দুটি বিদেশী খারাপ ব্যবহার করবে আমার সঙ্গে!

মনে হলো, শুধু মুখের কথাই যথেষ্ট নয়। ওদের মার দেওয়া দরকার। দুটো মোদকখোর ছ্যামড়া-ছেমড়িকে মারবার জন্য বেশি গায়ের জোর লাগে না। ওদের মাথা ঠুকে দিয়ে বলল, যা ভাগ, পালা এদেশ থেকে।

সত্যিই ওদের ঘরে ফিরে যাচ্ছিলাম, এই সময় হাবীব এসে ঢুকল। মেঝের ওপর বসে পড়ে বলল, সাব, দুটো কথা বলব, রাগ করবেন না?

আমি বললাম, আগে বলো, সত্যিই ওদের টাকা চুরি গেছে?

—না। সাব, একদম মিথ্যে কথা। আল্লার কিরে দিয়ে বলছি।

—তাহলে ওরা এরকম কথা বলছে কেন?

—বললাম না সাব, ওরা একদম পাগল। এই তো নাগিন লেকে কত বোট

আছে, অনেক সাহেব আছে—কেউ এদের মতন নয়। এরা কারুর সঙ্গে কথা বলে না, সারাদিন বোটের মধ্যে নাঙ্গা হয়ে থাকে।

—কী হয়ে থাকে?

—নাঙ্গা, সাব। একদম নেকেড। আর দাওয়াই খায়, কেতাব পড়ে। আজ আপনি এসেছেন তো, তাই রেগে গেছে। ওরা এখন বলছে, পুরা বোটটা ভাড়া নেবে।

—পুরা বোট মানে? আমার ঘরটাও?

—তাই তো বলছে এখন।

—তার মানে? আমি এ ঘর ভাড়া নিয়েছি, ওরা কী করে নেবে? তুমি আগে আমাকে সে কথা বলনি কেন?

—সাব, ওরা তো আগে পুরা বোট নেয়নি। এতদিন এ কামরা খালি ছিল।

—ওরাও টাকা দিচ্ছে, আমিও টাকা দিচ্ছি। আমি আমার কামরা ছাড়ব কেন? ওদের পছন্দ না হয়, ওদের চলে যেতে বলো।

—সাব, আপনি যদি বলেন, আমি এখুনি ওদের লাথ্ মেরে ভাগিয়ে দেব। আমরা কখনো নিমকহারামী করি না। আপনি মেহমান, আপনি যতদিন খুশি থাকুন। ওদের ভাগিয়ে দেব, সাব? তবে ওরা ডবল টাকা দেয়!

—ডবল টাকা দেয়?

—হাঁ সাব! ঐ শ্লিপিং বেগটা দেখছেন, ওটাও ওরা দিয়েছে।

একটা চকচকে শ্লিপিং ব্যাগ বিছানার ওপর পাতা ছিল। দেখলেই বোঝা যায় জিনিসটা বিদেশী। আমি সেটার ওপরই বসে ছিলাম, ঘেন্নায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

হাবীব বলল, সাহেবলোগ বেশি টাকা দেয়, বহুৎ চীজ এইসাই আমাদের দিয়ে যায়। একবার যদি এই সাহেবদের আমার বোট থেকে তাড়িয়ে দিই, তাহলে আর কখনো কোন সাহেবলোগ আমার বোটে আসবে না। তবু আপনি বলুন, আমি এই রাত্রেই ওদের তাড়িয়ে দিতে পারি। আপনি টুরিস্ট ডিপার্ট-এ গিয়ে কমপ্লেন করলে আমার লাইসেন্স চলে যাবে। দু বছর কোন কাম পাব না। এখানকার গরমিন্ট খুব কড়া। সাব, তাহলে আপনিই থাকুন, আমি ওদের তাড়িয়ে দিই?

আমি চুপ করে রইলাম। তক্ষুনি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না।

হাবীব বলল, আর এক কাম করা যায়। কাছেই আমার কাকার বোট। সে বোট এর চেয়েও বঢ়িয়া। সেখানে থাকতে পারেন। এর থেকে অনেক বেশি আরাম পাবেন। টাকা এখানে যা দিতেন, ওখানেও তা-ই দেবেন—আমি নিজে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব—

অর্থাৎ অপমান সহ্য করে চলে যেতে হবে আমাকেই। কেন? এটা আমার দেশ, আমার ন্যায্য অধিকার নেই? এখনো আমি গোঁয়ারের মতন বলতে পারি, না, আমি যাব না, ওদের তাড়াও। তার ফলে কী হবে? আমি ওদের মতন বেশি টাকা দিতে পারব না। ওদের মতন ফেরার সময় দামি দামি জিনিস উপহার দিয়ে যেতে পারব না। আমি খুব জোর করলে, হাবীব ওদের বিদায় করে দিতেও পারে। তারপর সব সময় আমাকে নীরব অভিশাপ দেবে। ওর অনেক আয় কমে গেলেও কিছুতেই আমাকে আন্তরিকভাবে খাতির করবে না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, ঠিক আছে, আমিই চলে যাব!

হাবীব অত্যন্ত বিনীত হয়ে বলল, সাব, আপনি আমার ওপর রাগ করলেন না তো? আপনি এখনো বলুন, যদি আপনি থাকতে চান, আপনিই থাকবেন, ওরা চলে যাবে। বাঙ্গালীরা খুব শরীফ আদমি হয়—আগে অনেক বাঙ্গালী আসত, আমার বাপ-দাদার কাছে শুনেছি—

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, চলো, আমি এক্ষুনি যাব, তোমার সেই কাকার বোটে। অন্য কোথায়ও তো আর এত রাত্রে যাওয়া যাবে না—

ঐ ক্যানেডিয়ান যুগলের কাছে আমি হেরে গেলাম। ওদের শাদা চামড়া, তাই ওরা জিতবেই। না, শুধু শাদা চামড়া কেন, টাকাটাই আসল, টাকাই জেতে। একজন কোন মাড়োয়ারী যদি এরকম অভদ্রভাবে পুরো বোটটা ভাড়া নিতে চাইত, তখন আমি কী করতাম? বেশি অর্থ থাকলে কি মানুষ বেশি অভদ্র হয়? সেরকম তো কথা নয়। ঐশ্বর্য থেকে আসে আভিজাত্য। সূক্ষ্ম ভদ্রতা, সভ্যতা, শিল্পরুচি—এসব তো অভিজাতদের কাছ থেকেই এসেছে। তবে দু এক পুরুষে হয় না। এইসব ক্যানেডিয়ান আমেরিকান বা ব্যবসায়ী মাড়োয়ারীরা দু এক পুরুষের বড়লোক —টাকার আঁচটাই এদের গায়ে লেগে আছে, ঐশ্বর্যের দীপ্তি এখনো লাগেনি।

যাওয়ার আগে ছোকরাটিকে একটা অন্তত ঘুঁষি মেরে যাওয়া উচিত নয় আমার? ছেলেটির চেয়ে মেয়েটির ওপরেই আমার রাগ বেশি, কারণ তার কথার মধ্যেই ছিল বেশি হুল—কিন্তু মেয়েদের গায়ে তো হাত তোলা যাবে না! তাছাড়া ভারতীয়দের বিখ্যাত ভদ্রতাবোধ, অতিথির প্রতি মর্যাদা, ফরেন এক্সচেঞ্জ, ক্যানাডায় আমার এক আত্মীয়—এইসব চিন্তা মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেল। আমি ওদের ক্ষমা করে দিলাম। অক্ষমের ক্ষমা।

শিকারায় চেপে এলাম হাবীবের কাকার বোটে। এখানেও বসবার ঘরে জ্যাজ বাজনা চলছে। আমি এসে ঢুকলাম খাবার ঘর দিয়ে। বোটের মালিক এক বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন করে বলল, আমি সব শুনেছি, সাব! ছি ছি, কী অন্যায় কথা! আমি বহুৎ সাহেব মেম দেখেছি, কিন্তু এরকম বেহুদা আদমী আর কখনো

দেখিনি। আপনি চলে এসে ভালোই করেছেন সাব, ওরা পাগল, আপনাকে জ্বালিয়ে মারত!

আমি মনে মনে বললাম, পাগল হোক আর বেহুদাই হোক, তাদের যদি টাকা থাকে, তা হলে খাতির করতেই হয়। তাদের তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বৃদ্ধটি আবার বলল, সাব, আপনি তো বাঙ্গালী, আগে এখানে বহুৎ বাঙ্গালী আসত—বাঙ্গালীরা খুব আচ্ছা আদমী হয়, এত ভাল্লো ব্যবহার—

বুঝলাম, বাঙ্গালীর প্রশংসা করে আমার মন ভেজাবার চেষ্টা হচ্ছে। নির্লিপ্ত গলায় বললাম, আমার ঘরটা দেখিয়ে দাও, আর আমার খাবার আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও!

আগের বোটের তুলনায় এখানে আমার ঘরটা ছোটো। খাটের একটা পায়া নড়বড়ে। কম্বলের এক পাশে একটা গোল পোড়া দাগ, ড্রেসিং টেবলের আয়নার কাচটা ফাটা। যাক আজ রাতটা তো এখানেই কাটুক, কাল সকালে উঠে কী করা যায় দেখা যাবে!

একটু বাদে ডিমের ঝোল আর ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল বিকট শব্দে। মনে হলো যেন কাঠের বারান্দা দিয়ে দুটি দৈত্য দৌড়ে গেল। কাঠের ওপর দিয়ে কেউ হাঁটলেই বেশ মচমচ শব্দ হয়। কিন্তু এত জোর শব্দ?

উঠে এসে দরজা খুলে উঁকি দিলাম। খাবার ঘরের সামনে একটি দৈত্যাকার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এও সাহেব! এত বিরাট শরীর হলেও মুখখানি খুব সরল ও কোমল, বোঝা যায় বয়েস বেশি না, কুড়ি-একুশ হবে।

ছেলেটি আমাকে দেখে নিজের থেকেই বলল, সুপ্রভাত! তুমিই তো কাল রাত্রে এসেছ?

আমি বললাম, সুপ্রভাত। হ্যাঁ, আমিই কাল রাত্রির আগন্তুক।

ছেলেটি বলল, তোমার এত দেরি করে ঘুম ভাঙে? শিগগির বাইরে এসো, দেখো, বাইরেটা কী চমৎকার! আজ বৃষ্টি নেই, কুয়াশা নেই, পরিষ্কার আকাশ—

ছেলেটির কথার মধ্যে বেশ একটা আপনকরা ভাব আছে। শুনতে ভালো লাগে। যদিও তার ইংরেজি ভাষা ভাঙা ভাঙা। আমি বললাম, আসছি, একটু পরেই আসছি!

গত রাত্রের সেই বৃদ্ধটি বাইরে থেকে আমার জানলায় উঁকি দিয়ে বলল, সাব, আপনাকে চা দিইনি, ক'টার সময় বেড-টি দিতে হবে, কাল তো বলেননি কিছু!

—নিয়ে এসো, এখন নিয়ে এসো!

ঘড়িতে দেখি সাড়ে সাতটা বাজে। এমন কিছু দেরি করে তো উঠিনি। এর চেয়ে তাড়াতাড়ি কোন ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে চা খেয়ে মুখ-টুখ ধুয়ে বাইরে এলাম। গত রাত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতাটি অনেকখানি ফিকে হয়ে গেছে। তবু মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, আজই এ পাড়া থেকে হাওয়া হয়ে যাব!

যুবক দৈত্যটি তখনো খাবার ঘরে দাঁড়িয়ে। একটা টিনের কৌটো কেটে কী সব যেন বার করছে। আমায় দেখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমার নাম অমুক, আমি জার্মানির মিউনিখ থেকে আসছি।

আমি তার হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, আমার নাম অমুক, আমি কলকাতা শহর থেকে আসছি!

ছেলেটির নামটা বেশ দুর্বোধ্য ধরনের, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ছেলেটির কানে আমার নামটাও নিশ্চয়ই দুর্বোধ্য লাগল। কিন্তু কলকাতার কথা শুনে সে একটু বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে বলল, কলকাতা! সে তো অনেক দূর—

আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে মিউনিখের থেকে দূরে নয়।

ছেলেটি বলল, আমি আর আমার এক বন্ধু এসেছি। তুমি একলা এসেছ?

—হ্যাঁ।

—ঐ যে আমার বন্ধু। পরে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আলাপ হবে।

ওর বন্ধু বসবার ঘরের বারান্দায় উবু হয়ে বসে কয়েকটি স্থানীয় ছেলে-মেয়ের মাছ ধরা দেখছে। তার এমনিই সাধারণ ছোটোখাটো চেহারা। তা হলে দ্বিতীয় দৈত্যটি কোথায়?

তাকে দেখেছিলাম বেশ কিছুক্ষণ পরে। তার আগে—আমিও এগিয়ে গেলাম বোটের সামনের দিকের বারান্দায়। উবু হয়ে বসে থাকা ছেলেটি তেমন আলাপী নয়, আমার দিকে চোখ তুলে শুধু একবার বলল, হ্যালো! আমিও প্রত্যুত্তরে তাই জানিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে রেলিং-এ ভর দিলাম।

নাগিন হ্রদের জল ডাল হ্রদের চেয়ে অনেক পরিষ্কার। যদিও তলায় প্রচুর ঝাঁঝি আছে। মসৃণ কালচে নীল জল, সেদিকে তাকালেই একটা গভীর অথচ শান্ত অনুভূতি হয়। এক পাশে কিছু পদ্ম ফুটে আছে।

কয়েকটি ছোট ছোট নৌকোয় স্থানীয় ছেলেমেয়েরা মাছ ধরছে। বেশ মাছ এখানে। মাঝে মাঝেই বড়শির টানে মাছ উঠে আসছে চটাস চটাস করে। বেশি বড় নয়, তিন চার শো গ্রাম। জার্মান ছেলেটির নিশ্চয়ই নিজেরও মাছ ধরার নেশা, কারণ সে এই দৃশ্য দেখছে খুব আগ্রহের সঙ্গে।

আমি একবার তির্যকভাবে ডান দিকে আমার গত রাত্রে পরিত্যক্ত হাউস বোটটির দিকে তাকালাম। সেটা এখান থেকে দেখা যায়। কিন্তু ক্যানেডিয়ান দম্পতির (দম্পতি কিনা ঠিক জানি না। আজকাল এক ঘরে সহবাসকারী দুই নারী পুরুষ সম্পর্কে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না) কোন চিহ্ন নেই বাইরে। তবু সেই বোটটার দিকে তাকিয়েই আবার আমার রাগে গা পুড়ল। ওদের মুখ দর্শন করতে চাই না আর, দুপুরেই গিয়ে শ্রীনগরে কোন হোটেল ঠিক করে আসতে হবে।

এই হ্রদ ও হাউসবোটগুলি ছাড়িয়ে দূরে আকাশের গায়ে এক সুমহান দৃশ্য নিবদ্ধ হয়ে আছে। দু' দিকে যত দূরে চোখ যায়, সারি সারি পর্বত-শিখর তুষার ঢাকা। সকাল বেলার রোদে সেগুলিতে সোনার আভা লেগেছে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমার মনের ছোটোখাটো দুঃখ ও ক্ষোভ দূর হয়ে যায়। এক অদ্ভুত সুন্দর রকমের গাম্ভীর্য এসে মনকে ছেয়ে ফেলে।

এই সেই পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা। এরই একটি শৃঙ্গের পেটের ভেতরের গহ্বর দিয়ে আজকাল শ্রীনগরে আসতে হয়। আসবার সময় খুব কাছ থেকে একে দেখেছি, এখন খানিকটা দূরত্বে এর ব্যাপ্তি ও বিশালত্ব আরো বেশি চোখে পড়ে। খুব সুন্দর কোন ছবি একটু দূর থেকেই দেখতে হয়। পৃথিবীর নানা প্রান্তে আমি অনেক অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছি। কোন দৃশ্যই আর কোনটির তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে হয়নি কখনো। তবু এই রকম বরফ ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে যেন একটা চিরায়তের স্পর্শ আছে। এই পৃথিবীতে পাহাড়ই সবচেয়ে প্রাচীন। মানুষেরও জন্মের বহু আগে থেকে এই সব পর্বত মাথায় তুষার মুকুট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—হয়তো একদিন আবার মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তবু এরা থাকবে। সমুদ্রও এমনই প্রাচীন, এমনই চিরন্তন, কিন্তু সমুদ্র দর্শনে সে অনুভূতি জাগে না, অন্তত আমার। পর্বতই আমার অয়স্কান্ত মণি।

হ্রদের জলে ঝপাং করে একটা শব্দ হতে আমার ঘোর ভাঙল। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নৌকো থেকে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ছে। এখানকার ছেলেমেয়েরা সবাই টুকটুকে ফর্সা, টানা টানা চোখ, মাথা ভর্তি অযত্নের চুল—ঠিক দেবশিশুদের মতন দেখায়।

নিরীহ জার্মান ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছে। এত কাছাকাছি কেউ থাকলে দু' একটা কথা বলা উচিত বলেই আমি বললাম, এই ছেলেমেয়েরা কত অল্প বয়েস থেকে সাঁতার জানে, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে, তাই না?

ছেলেটি যেন থতমত খেয়ে গেল। তারপর বলল, ইয়েস, আই সুইম, বাট নট হিয়ার, নো সুইম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা এখানে কতদিন এসেছ?

—হোয়াট?

আমি আমার প্রশ্নের পুনরুক্তি করলাম। সে বলল, দু' মাসের বেশি।

—কী! এখানে দু' মাসের বেশি আছো?

—হিয়ার? নো। ফ্রম জার্মানি...মোর টু মানথ্‌স।

এবার বুঝলাম, এই ছেলেটি কেন কম-আলাপী। এ ভালো ইংরেজি জানে না। আমি গোপনে বেশ খুশি হয়ে উঠলুম। কোন সাহেবের ইংরেজি জ্ঞান কম দেখলেই আমার এরকম আনন্দ নয়। ভাষার দীনতা থাকলে মানুষ অনেকটা দীন হয়ে যায়। তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় না। এখন এর ওপর আমি অনায়াসে অনেক রকম চাল মারতে পারি। অবশ্য একজন জার্মান ছেলে যদি ইংরেজি কম জানে, সেটা তার পক্ষে দোষের কিছু নয়। তা বলে, আমার মতন একজন বাঙালি ছেলে দু' চারটে ভুল ইংরেজি বললে সেটাও তো দোষের কিছু না হওয়া উচিত। সেটা কেন অন্য লোকরা বোঝে না?

হাউসবোটের একজন পরিচারক আমাদের ব্রেকফাস্ট খাবার জন্য ডাকতে এল। আমি জার্মান ছেলেটিকে বললাম, তুমি যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি!

সাহেবসুবোর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানাপিনা আমার পছন্দ নয়। ঠিকঠাক কাঁটা চামচে ধরার সহবৎ কিংবা ফুরুৎ ফুরুৎ শব্দ না করে চা পানের কৃত্রিম চেষ্টা—এ আমার সব সময়ে ভালো লাগে না। এর চেয়ে একলা একলা খাবার খেতে আমার অনেক বেশি ভালো লাগবে।

আরও কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এলাকাটা সত্যিই খুব নিরিবিলি। শ্রীনগরের দুর্দান্ত টুরিস্ট ভিড়ের কোন চিহ্ন নেই। খানিকটা করে দূরত্ব রেখে পাশাপাশি অনেকগুলি হাউসবোট। কোথাও কোন শব্দ নেই। অনেক হাউসবোটের আবাসিকরাই জেগে উঠে বাইরে এসেছে। সবাই সাহেব মেম। জায়গাটাকে মনে হয় যেন শ্বেতাঙ্গদের একটা আলাদা উপনিবেশ, এর মধ্যে আমি এসে পড়েছি পথভ্রষ্ট হয়ে।

আমার ঠিক বাঁ পাশের বোটটাতেই দুটি তরুণ ও একটি তরুণী ছাদে এসে বসেছে রোদ পোহাতে। তরুণীটি খুবই সুশ্রী। সে পরে আছে একটি অতি ছোট জাঙ্গিয়া ও একটি রুমালের আকারের ব্রা। তার পায়ের নখ পর্যন্ত সবই অতি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। তার ফর্সা কোমল ত্বক, নীল চোখ, সোনালী চুল, হঠাৎ যেন তাকে মানুষ বলে মনে হয় না, মনে হয় অন্য কোন গ্রহের প্রাণী। তার উরুতে রোদ পড়ে ঝকঝক করছে, ঠিক মনে হয় সোনার; একেই বলা উচিত কাঞ্চনজঙ্ঘা। কাঞ্চনজঙ্ঘা নারী—শুনতে বেশ। জঙ্ঘা মানে হাঁটুর নীচের দিক?

এ ক্ষেত্রে উরুই মানায় ভালো। আজ থেকে জঙ্ঘা মানে উরু হোক, এই আমি ফতোয়া দিলাম।

মেয়েটি বা তার সঙ্গী দু' জনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি ঈষৎ লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, কোন স্বল্পবাসা তরুণী যদি প্রকাশ্য জায়গায় এসে বসে, তবে তা তো অন্যদের দেখবার জন্যই। এতে লজ্জার কী আছে? আবার সেদিকে চোখ যায়। বস্তুত, চিরাশ্রিত পাহাড়ের দৃশ্যের চেয়ে এই সাময়িক রমণী সৌন্দর্যই এখন আমার চোখ বেশি করে টানে। তবু বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারি না। খুব ভেতরে ভেতরে এক ধরনের লজ্জা থেকেই যায়। এতখানি প্রকাশ্য নয়, রমণীর এমন নিরাবরণ রূপ যেন কিছুটা আড়ালে বা গোপনে দেখার মধ্যেই বেশি তৃপ্তি।

তা ছাড়া, একবার আমার মনে হয়, ওর সঙ্গী দু'জন বোধ হয় ভাবছে, আমি জীবনে কখনো মেম দেখিনি। আমি হ্যাংলা বাঙালি, তাই এমন লোভীর মতন তাকাচ্ছি। যা, যা, তোরা কি জানিস রে? আমি ঢের মেম দেখেছি জীবনে। এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা মেম যুবতী ছিল আমার বান্ধবী। আমার আর মেম দেখার দরকার নেই!

বারান্দা থেকে চলে এলাম বসবার ঘরে। মনে একটা খটকা রয়ে গেল। একটি যুবতীর সঙ্গে দুটি সাহেব কেন? দু'জনকেই তো মনে হল, ওর সমান বন্ধু। এ কী রকম সম্মিলন? মেয়েটি কি নব দ্রৌপদী?

এ হাউসবোটটি বেশ লম্বা। সামনের দিকে বারান্দা, তারপর বসবার ঘর। বসবার ঘরটি বেশ সুচারুভাবে সাজান। মেঝেতে পুরু গালিচা। দেওয়ালের ঘড়ি থেকে প্রতিটি ক্যালেণ্ডার ও ছবিই বিদেশী। বোঝা যায় সাহেবদের দান। এর পর খাবার ঘর। সেটিও বেশ ঝকঝকে বাসনপত্রে ভর্তি। তার পাশ দিয়ে ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। পেছন দিকে পর পর তিনটি ঘর। আমার ঘরটাই প্রথম। সাধারণত হাউসবোটে দুটি শয়নকক্ষ থাকে, এখানে তিনটি। এর মধ্যে আমারটাই সবচেয়ে ঘুঁচা, কোনো রকমে জোড়াতালি দেওয়া। আর একটি ঘর খালি থাকতেও আমাকে দেখানো হয়নি, বোধ হয় সেটি এর চেয়ে ভালো। নিশ্চয়ই সেটি আর কোন সাহেবের জন্য সংরক্ষিত। আমার কাছ থেকে এরা বেশি টাকা পাবে না, যা গভর্নমেন্ট রেট তাই, কিন্তু সাহেবদের কথা আলাদা।

জার্মান ছেলে দুটির ব্রেকফাস্ট এখনো শেষ হয়নি। এরা ভারী ব্রেকফাস্ট খায়। খাক না যতক্ষণ খুশি, আমার তাড়া নেই।

বসবার ঘরের একটা র‍্যাকে কিছু বইপত্র রয়েছে। কাছে গিয়ে উল্টে উল্টে দেখলাম। বিচিত্র সমাহার। গোয়েন্দা কাহিনী, পর্নোগ্রাফি থেকে শুরু করে গম্ভীর

ইতিহাস কিংবা পশুবিজ্ঞান, মূল ফরাসী ভাষার কবিতা, জার্মান ভাষার অর্থনীতি। প্রত্যেকটি বইতেই আলাদা লোকের নাম লেখা। বোঝা যায়, আগেকার ভ্রমণকারীরা এই সব বই ফেলে গেছে। একটি বই আবার চীনে ভাষায়। এটি নিশ্চয়ই কোন স্পাইয়ের ছিল। কারণ নিকট ভবিষ্যতে কোন চীনের লোকের তো ভারতে ভ্রমণ করার সম্ভাবনা ছিল না।

বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম, এর মধ্যে জার্মান ছেলে দুটি খাওয়া শেষ করে উঠে গেল। আমি একটা গোয়েন্দা উপন্যাস বেছে নিয়ে খাওয়ার টেবিলে এসে বসলাম। একটি দশ এগারো বছরের ছোট ছেলে আমার প্লেট সাজিয়ে দিল। ছেলেটির মুখের সঙ্গে চিত্রাভিনেতা টনি কার্টিসের খুব মিল আছে। বড় হলে ঠিক সেই রকম দেখতে হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

সে লাজুক হেসে বলল, মিরাজ। মিরাজ দিল।

এটা একটা নতুন রকমের নাম শুনলাম। এর আগে দেখেছি সকলের নামই প্রায় এক রকম। জম্মু থেকে ঘুরতে ঘুরতে, নানা জায়গায় থেমে থেমে আমি আসছি, তার মধ্যে শুধু আলী মুহম্মদ নামেই অন্তত দশটা লোক দেখেছি।

—তুমি ইস্কুলে পড়ো, মিরাজ?

সে দু' দিকে মাথা নেড়ে জানাল, না। তারপর একটু থেমে বলল, আগে দু' বছর পড়েছি, এখন পড়ি না।

ছেলেটি কিন্তু বেশ ইংরেজি জানে। খানিকক্ষণ আগে দূর থেকে শুনছিলাম, সে জার্মান ছেলে দুটির সঙ্গে গড়গড় করে ইংরেজি বলে যাচ্ছে। ক্রিয়াপদহীন, কিন্তু উচ্চারণ মার্কিনীদের মতন।

খাবার ঘরের একটা জানলা দিয়ে খুব কাছেই একটা বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ দেখা যায়। মাঝে মাঝে কয়েকটি বেশি-উঁচু-নয় গাছ, তাতে টুকটুকে লাল রঙের ছোট ছোট ফল ফলে আছে অসংখ্য। পরে জেনেছিলাম, ঐগুলোই চেরী ফল, চমৎকার টক-মিষ্টি স্বাদ।

এই হাউসবোটটা ভূমির খুব কাছাকাছি বাঁধা। জলের ওপর একটা চওড়া তক্তা পাতা, তার ওপর দিয়ে ভূমিতে যাওয়া যায়। সামনেই একটি ছোট চালা ঘর, সেখানে এদের রান্নাবান্না হয়।

টোস্ট চিবোতে চিবোতে আমি বইটাতে মন দিয়েছিলাম, এমন সময় দ্রুম দ্রাম শব্দ হলো সেই তক্তার ওপর, তারপরই কিছু একটা প্রচণ্ড শব্দে লাফিয়ে পড়লো হাউসবোটের মধ্যে। সেই ধাক্কায় গোটা বোটটা কেঁপে উঠল। আবার দৈত্য? না, আমি তাকিয়ে দেখলাম, একটা নেকড়ে বাঘ!

আমার হাত থেকে বই আর টোস্ট খসে পড়ল। আমি আঁতকে উঠলাম। সেটা আমার দিকেই চেয়ে আছে। ঠিক নেকড়ে বাঘ নয় অবশ্য, তারই নিকটতম বংশধর, আজকাল অনেকে এদেরও কুকুর নামে ডাকে।

প্রকৃতপক্ষে কুকুরটা নেকড়ের চেয়েও আকারে বড়, হিংস্র দুটি চোখ, আমার দিকে তাকিয়ে হাড়-হিম-করা গ্রাউ গ্রাউ শব্দে ডাকল, তারপর দুই লাফে এগিয়ে এসে আমার গায়ের ওপর থাবা তুলে দিল।

আমার তখন বাবা-রে মা-রে মরে গেলাম-রে বাঁচা-রে—এই রকম চেঁচিয়ে ওঠার মতন অবস্থা, কিন্তু নিজেকে অতি কষ্টে সামলে চুপ করে রইলাম। শুনেছি, চেঁচালে কুকুররা আরো রেগে যায়। আমি এমনিতেই কুকুর সহ্য করতে পারি না, তার ওপর এই কুকুর নামে দৈত্য!

কুকুরটা আমার গায়ের ওপর থাবা তুলে তখনও সেই রকম ভাবে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ছুটে এল বিরাট চেহারার জার্মান ছেলেটি, মিরাজ আর গত রাত্রের বৃদ্ধ। জার্মান ছেলেটি কুকুরটার কলার ধরে নিয়ে গিয়ে ভর্ৎসনার সঙ্গে বলতে লাগল, হুকো! হুকো!

আমার গলা শুকিয়ে গেছে, সারা শরীর কাঁপছে। ক্রুদ্ধভাবে আমি বৃদ্ধের দিকে তাকালাম। বৃদ্ধ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, সব ঠিক হো গিয়া সাব! আর কুছ নেই হোগা।

জার্মান ছেলেটি বলল, দুঃখিত, কুকুরটির সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি,—এর নাম হুকো। এ আর তোমাকে কিছু বলবে না।

তারপর সে কুকুরটাকে জার্মান ভাষায় কী সব উপদেশ দিয়ে কলারটা ছেড়ে দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে খানিকটা গর্বের সঙ্গে বলল, এ খুব ভালো কুকুর। এ জার্মানিতে দু'বছর স্কুলে পড়েছে।

স্কুলে পড়েছে? কুকুর বাতিকগ্রস্তদের মুখে তাদের কুকুরের নানা গুণপনার কথা শুনেছি আগে, কিন্তু ইস্কুলে পড়ানোর কথা কখনো শুনিনি। তারপরেই বুঝতে পারি। অর্থাৎ এটা একটা ট্রেনিং দেওয়া পুলিশ-কুকুর। আরো ভয় ধরে যায়। শুনেছি, হিটলারের জার্মানিতে নাৎসীদের ট্রেনিং দেওয়া 'ডবারমান' না কী জাতের কুকুর যেন ইহুদীদের ধরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। এটা কি সেই জাতের একটা কিছু নাকি!

ছেলেটি কুকুর সম্পর্কে আরো অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল, আমি শুকনো ভদ্রতা জানিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। সকালবেলার প্রসন্নতা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। গুম হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। একটা কুকুরকে দেখে ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠা একজন পুরুষ মানুষের পক্ষে বোকার মতন কাজ—কিন্তু একটা কুকুরই বা

সে রকম ভয় দেখাবে কেন? সেই জন্য আরো বেশি রাগ হয়।

সুটকেসটা খুলে জিনিসপত্র গুছোতে শুরু করলাম। সেই সময়েই বোটের মালিক বৃদ্ধটি আবার এসে জানলা দিয়ে উঁকি মারল।

হাসি মুখে বলল, সাব, কুকুরটা আপনাকে খুব বিরক্ত করছিল তো? এ কুকুর দেখলে আমাদেরই ভয় লাগে। এই সাহেব তো কুকুর নিয়ে পাগল! জার্মানি থেকে গাড়ি করে ঐ কুত্তাকে নিয়ে এসেছে। নিজের হাতে খাওয়ায়। সাহেব নিজে আমাদের রান্না খায়, কিন্তু কুকুরের খাবার সব গাড়িতে আছে। একদম জার্মান মাল। এত এত টিনের কৌটো। কুকুরকে রেখে কোথাও যায় না, রাত্রে ঐ কুকুরের সঙ্গে ঘুমোয়—

আমি বললাম, আমার কত চার্জ হয়েছে বলুন তো। আমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাবো।

বৃদ্ধ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, চলে যাবেন? কেন সাব? আমরা কী দোষ করেছি?

—আমার এখানে ভালো লাগছে না।

বৃদ্ধ জানলার মধ্য দিয়ে আধখানা শরীর গলিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বলল, ঐ কুকুরের জন্য? আমি সাহেবকে বলে দেব, ঐ কুকুর আপনার কাছেও আর আসবে না...আপনি আমাদের মেহমান...আপনি চলে গেলে আমাদের পাপ হবে—

আমি বললাম, হাউসবোটে কুকুর রাখার কোন নিয়ম আছে? এরকম কুকুর রাখার জন্য লাইসেন্স লাগে না?

—কুকুর তো এখানে থাকে না—গাড়িতে থাকে, ঐ তো দেখুন না, মাঠের মধ্যে সাহেবের ভ্যান গাড়ি আছে।

—তবে যে এই মাত্র বললেন, ঐ সাহেব কুকুরের সঙ্গে শোয়! কুকুর হাউসবোটের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। আমি টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টে গিয়ে জিজ্ঞেস করব, এ রকম নিয়ম আছে কিনা। ব্যাপারটা কী? এক হাউসবোটে শুধু সাহেব মেম ন্যাংটো হয়ে থাকবে বলে আমরা থাকতে পারব না। আর এক জায়গায় এরকম হিংস্র কুকুর তাড়া করে আসবে। তা হলে নাগিন লেকটা কি শুধু সাহেবদের জন্য? আমাদের, মানে ভারতীয়দের থাকার জন্য নয়? সে কথা আগে বলে দিলেই হয়!

এত কড়া সুরে কথাগুলো বলাই আমার ভুল হয়েছিল। বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে একেবারে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। আমার পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, আমাকে সে কিছুতেই যেতে দেবে না, আমি যা চাই, আমার যা ভালো লাগে; তাই সে করবে, আমি অতিথি—অতিথি যদি রাগ করে চলে যায় তবে

তার চেয়ে দুঃখের কথা কাশ্মীরীদের কাছে কিছু নেই, টাকা পয়সা কিছু নয়, ইজ্জতই আসল—ইত্যাদি।

বুঝলাম, আমি টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে নালিশ করব শুনেই ও এত ভয় পেয়েছে। এরা গভর্নমেন্টকে বেশ ভয় পায়।

বৃদ্ধের কান্না মেশানো অনুনয় কিছুতেই আর থামে না। কান্না আমার সহ্য হয় না একদম। বিশেষত কোন বৃদ্ধলোকের কান্না শুনলে আমার গা রি রি করে। এ সময় কঠোরভাবে এর হাত ছাড়িয়ে উঠে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কান্না থামাবার জন্য আমাকে বাধ্য হয়েই বলতে হল, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি না, থাকছি।

বৃদ্ধ এবার চোখের জল মুছে বলল, আপনি বিশ্বাস করুন, সাব, ঐ সাহেবকে আমি কুকুর নিয়ে থাকার জন্য প্রথমে সত্যিই আপত্তি করেছিলাম। প্রথম দিন আমাকেও কামড়ে দিয়েছিল, এই দেখুন না, দাগ।

—আপত্তি করেছিলেন, তাও থাকল কেন?

—কী করব বলুন, কিছুতেই আমার কথা শুনল না। এই জায়গাটা পছন্দ হয়েছে, তাই থাকবে।

বোটের মালিক আপত্তি করলেও থাকবে? চালাকি নাকি? নিশ্চয়ই বেশি টাকা দিতে চেয়েছে, আর তাতেই আপত্তি-টাপত্তি সব ভেসে গেছে। ঐ সাহেবটির দেশে কোন হোটেলে গিয়ে যদি আমি এরকম কোন নিয়ম ভঙ্গ করতাম, তা হলে থাকতে দিত একদিনও! আমি জানি, দেয় না।

সাহেবরা সুসভ্য জাতি। কিন্তু ওরা শুধু সভ্য ওদের নিজেদের দেশে—বাইরে এলেই ওদের কদাকার অসভ্যতা প্রকাশ পায়। সেই জন্যই এক সময় কলোনিগুলিতে ওরা বীভৎস রকমের অসভ্যতা দেখিয়েছে। তখন অসভ্যতা করত গায়ের জোরে, এখন টাকায়। ওরা জানে, ওদের কারুর একটা ব্যবহৃত ক্যামেরা কিংবা এক প্রস্থ পোশাক এখানকার কারুকে দান করলেই সে ধন্য হয়ে যাবে।

যাই হোক, আমাকে ঐ নাগিন লেকেই থেকে যেতে হল।

৩

দিন আষ্টেক কেটে গেছে ওখানেই। এক ধরনের আলস্যও আমাকে পেয়ে বসেছে, আর কোথাও চট করে চলে যেতেও ইচ্ছে করে না। সারাদিন ছাদে শুয়ে শুয়ে

রোদ পোহাই, কখনো হাতে থাকে বই, কখনো চারপাশে তাকিয়ে এদের সব অদ্ভুত কীর্তিকলাপ দেখি। অনেক সময়েই মনে হয়, আমি যেন ভারতবর্ষে নেই, এই জায়গাটা যেন ইটালি বা সুইজারল্যাণ্ডের কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র। যদিও এমন বিপুল ব্যাপ্ত, তুষারমণ্ডিত পাহাড়শ্রেণী পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

এখান থেকে যাবার মতন আরো দু' একটা উপলক্ষ ঘটেছিল। আমি আসবার দু'দিন পরেই তিনটি মেয়ে, দু'জন জার্মান ও একজন আমেরিকান এক শিকারায় চেপে এখানে এসে হাজির। জার্মান যুবক দুটির সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছিল ইস্তাম্বুলে। এখন তারা থাকে ডাল হ্রদে, সেই জায়গাটা তাদের পছন্দ নয়।

মেয়ে তিনটির সঙ্গে পুরুষ কেউ নেই। তারা নিজেরাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশ্য এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সদ্য বিশ্ব নারীবর্ষ হয়ে গেল। ডাল হ্রদে তাদের বসবাসের অসুবিধের ঠিক কারণটা অবশ্য বোঝা গেল না, তবে সেখানে ভারতীয় ভ্রমণকারীদের ভিড়ই বেশি, মনে হয় তারা স্ববর্ণের সঙ্গীদের কাছে থাকতে চায়।

তিনজনের থাকার জায়গা নেই। একটা ঘরে তারা দু'জনে মাত্র থাকতে পারে কিন্তু তারা তিনজনেই অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে ইচ্ছুক। বসবার ঘরে বৃদ্ধের সঙ্গে তাদের বহুক্ষণ আলোচনা চলল। দু'একবার আমি বসবার ঘরের মধ্য দিয়ে যাই, অমনি তাদের আলোচনা থেমে যায়, সবাই চুপ করে আমার গমন পথের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকে। বুঝলাম, আমার অবস্থা যাকে বলে, কাবাব মে হাড্ডি। কিংবা একদল হংসের মধ্যে এক কাক। ওদের তুলনায় আমার গায়ের রং সেরকমই তো।

বৃদ্ধকে আমি ডেকে বলেছিলাম, ওরা যখন থাকতে চাইছে, তখন আমার ঘরটা ছেড়ে দিলেই তো হয়!

আমি তো অন্য যে-কোন জায়গায় চলে যেতে পারি!

বৃদ্ধ অমনি হা-হা করে উঠেছিল। আমার চলে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অন্য সবাই চলে গেলেও আমাকে একা থাকতে হবে এখানে। বৃদ্ধের অনুনয় বিনয়ের মধ্যে নিছক স্বার্থ নয়, ক্রমশ যেন খানিকটা আন্তরিকতার স্পর্শও পাই।

ফলে, একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার হল। সেই তিন মেম রয়ে গেল এক ঘরে। বেশি পয়সা দিয়ে এরকম গাদাগাদি করে থাকা এদের স্বভাব নয়, তবু কেন রয়ে গেল কে জানে। অবশ্য রাত্রের দিকে তারা জার্মান যুবক দুটির সঙ্গে ঘর ভাগাভাগি করে কিনা, তা আমার জানার কথা নয়।

দিনের বেলা বেশির ভাগ সময়েই ওরা বসবার ঘরটা অধিকার করে থাকে। আমি আর পারতপক্ষে ওদিকটা মাড়াই না। কখনো যাতায়াতের পথে ওদের সঙ্গে

দেখা হলে শুষ্ক সৌজন্যমূলক দু'একটা কথা হয় মাত্র, ওদের সঙ্গে আমার ঠিক ভাব হয় না। ওদেরও তেমন আগ্রহ নেই ভাব করবার।

কাছাকাছি মানুষজন রয়েছে অথচ তাদের সঙ্গে আলাপ হয় না—এমন অবস্থায় একটা অদ্ভুত একাকিত্ব বোধ আসে। খানিকটা অভিমান মেশান একাকিত্ব। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি এটা বেশ উপভোগ করতে থাকি, নিজেকে আরো বেশি অভিমানী করে তুলি। আমার প্রয়োজন নেই আমার কারুকে। আমি শুধু দেখে যাব। এ পৃথিবীতে সবাই সব কিছু পায় না। কিন্তু দেখার তো কোন বাধা নেই!

জানলায় বসে বসে চারপাশের একটি ছোটোখাটো জগতের খুঁটিনাটি ঘটনাও আমি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করে যাই।

এখানে পাশাপাশি তিন চারটি হাউসবোট, সবাই মিলে বেশ একটা যৌথ সংসারের মতন। আমাদের বোটের বৃদ্ধকে স্থানীয় ছেলে বুড়ো সবাই বাবা বলে ডাকে। বাবা ওর ডাকনাম। এই বাবা দারুণ পরিশ্রমী, সব দিকে এর তীক্ষ্ণ নজর, এমনকি ঠিক সময়ে জার্মান সাহেবের কুকুরের স্নানের জন্য গরম জল তৈরি করে দেওয়া পর্যন্ত। হ্রদের জল নোংরা বলে আমরা সেদ্ধ জল ছাড়া কিছুই পান করি না, কিন্তু ছোট ছোট কাশ্মিরী ছেলেমেয়ে ভোরে উঠে এই হ্রদের জলেই দাঁত মাজে, মুখ ধোয়। তাদের স্বাস্থ্য চমৎকার। ঐ জলেই তারা দাপাদাপি করে সাঁতার কাটে। তাদের ফুটফুটে চেহারার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। একদিন দুপুরবেলা বেরিয়ে আমিনা কাদালের কাছে একটি মেয়ে ইস্কুলের ছুটি হতে দেখেছিলাম। সেদিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, ভারতবর্ষের আর কোন জায়গার মেয়ে-ইস্কুলে এক সঙ্গে এত সুন্দরী মেয়ে পড়ে না। প্রকৃতি যেখানে এত সুন্দর, মানুষও সেখানে সুন্দর হয়।

কাশ্মীরীদের আর একটা গুণ, তারা কেউ বড় একটা চেঁচিয়ে কথা বলে না। এখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মৃদুভাষী। পথে-ঘাটে লোকজনের ঝগড়ার দৃশ্য বড় একটা চোখে পড়েনি। বরফ-ঢাকা পাহাড়ের দৃশ্যে যে শান্ত গাম্ভীর্য আছে, এখানকার মানুষের মধ্যেও তার প্রভাব আছে মনে হয়। এর একটি ভালো প্রমাণ পেয়েছিলাম আর একদিন বিকেলে।

শ্রীনগরে 'চার চিনার' নামে দুটি দ্বীপ আছে। এর মধ্যে বড় চার চিনারে মদ্যপানশালা এবং অন্যান্য আকর্ষণ থাকায় ভ্রমণকারীদের খুব ভিড় হয়। ছোট চার চিনারে সে রকম কোন আকর্ষণ নেই। তাছাড়া জায়গাটা বেশ দূর বলে সচরাচর কেউ যায় না। একদিন সন্ধেবেলা সেখানে শিকারায় চেপে উপস্থিত হয়ে দেখি, পনেরো-ষোলোজন লোক মাটিতে বসে নামাজ পড়ছে। তাদের কারুর মুখে কোন শব্দ নেই, কখনো উঠে দাঁড়ায়—সকলেই একসঙ্গে। কেউ কোন নির্দেশ

দেয় না, চারপাশে পাহাড় ও জলঘেরা সেই ছোট দ্বীপে সেই নিঃশব্দ প্রার্থনার দৃশ্য আমার শরীরে একটা শিহরন এনে দেয়। মনে হয় যেন সব ব্যাপারটাই অপ্রাকৃত।

প্রার্থনাকারী ছাড়া আরো আট-দশজন মানুষ সেই দ্বীপটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল। তার মধ্যে দু' জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা। বাকি লোকরা নিঃশব্দে কফি পান করছে। দ্বীপের একটি মাত্র দোকানে কফি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

দ্বীপ ভর্তি রাশি রাশি ফুল। সপ্তবর্ণের সমস্ত সমাহার তারা ফুটিয়ে রেখেছে। আমি কিছুক্ষণ ফুল গাছগুলির পাশ দিয়ে দিয়ে ঘুরি, তাদের গায়ে আঙুল ছুঁইয়ে আদর করি। 'যে ফুল ঝরে সেই তো ঝরে, ফুল তো থাকে ফুটিতে'—এই লাইনটা আমার মাথার মধ্যে ভোমরার মতন গুণগুণ করে—এবং এত বেশিবার ঐ লাইনটা আমাকে শুনতে হয়—মাথার মধ্যে কে যে ওটা সুর দিয়ে গাইছে তাও জানি না—আমি এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এক সময় এক কাপ কফি নিয়ে আমিও একটা বেঞ্চে বসলাম।

সেখানে আর দুটি যুবক বসেছিল। তাদের সঙ্গে আস্তে আস্তে আলাপ হল। তারা দু'জনেরই কলেজের ছাত্র। তাদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি হঠাৎ এই চার চিনারে এলেন যে? এখানে তো কেউ আসে না, কিছু তো দেখবার নেই।

আমি আঙুল তুলে দেখিয়ে বললাম, কেন—এই যে এত ফুল!

সে বলল, ফুল তো কাশ্মীরের সব জায়গাতেই। আপনি মোগল গার্ডেনসগুলো দেখেছেন? সেখানে অনেক বেশি ফুল আছে।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, তোমরা এখানে এসেছ কেন ভাই?

অন্য ছেলেটি বলল, জায়গাটা কী রকম অসম্ভব শান্ত দেখেছেন? যেন একটি শান্তির পর্দা ঝোলান আছে চারদিকে। সেইজন্য আমরা প্রায়ই এখানে এসে বসে থাকি!

আমি সকৌতুকে বললাম, ভাই, তোমরা কবিতা লেখো বুঝি?

ছেলে দুটি জানাল, না, তারা কবিতা লেখে না। দুজনেই বিজ্ঞানের ছাত্র!

এই ছেলে দুটি মুসলমান। কিন্তু তারা আধুনিক কলেজে পড়া যুবক বলে ঐ দূরের নামাজ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি। আমার শিকারাওয়ালা কিন্তু এসেই ঐ নামাজীদের মধ্যে বসে পড়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান পড়া দুটি কলেজের ছেলে শুধু শান্তিময় নিস্তব্ধতা উপভোগ করার জন্য এই দ্বীপে আসে—একথা জেনে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই! এই সময়ে ওদের রাজনীতি, সিনেমা, সাহিত্য কিংবা নারীর

প্রত্যঙ্গ নিয়ে হই-চই আলোচনায় মেতে থাকা উচিত ছিল না?

এই উপত্যকাবাসীরা হিমালয়ের প্রগাঢ় স্তব্ধতাকে শ্রদ্ধা করে। সেই জন্য তারা পারতপক্ষে উঁচু গলায় কথা বলে না। তবু মাঝে মাঝে যুদ্ধ হয়। তখন বিমান আর কামানের গর্জনে সব নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যায়!

আমাদের ঠিক পাশের হাউস-বোটের বিদেশিনী মেয়েটি সত্যিই দ্রৌপদী। ইতিমধ্যেই আমরা তাকে 'নাগিন সুন্দরী' আখ্যা দিয়েছি। নাগিন লেকে যত হাউসবোট কিংবা নাগিন ক্লাব নামের হোটেলেও যত মেয়ে এসেছে, তার মধ্যে এর চেয়ে সুন্দরী আর কেউ নেই। সকাল থেকে অনেকক্ষণ মেয়েটি সারা গায়ে ক্রিম মেখে বোটের ছাদে প্রায় নগ্ন অবস্থায় শুয়ে থাকে, তার পাশে দুটি সমবয়সী যুবক অবিরাম নানারকম হাস্য পরিহাস করে তার মন ভালো রাখে। দুপুরের দিকে মেয়েটি জলের ওপর স্কিয়িং করতে যায় মধ্য হ্রদে, তখনও যুবক দুটি থাকে তার দু পাশে। বস্তুত এমন একটা মুহূর্তও আমরা দেখিনি, যখন মেয়েটির দু' পাশে ছেলে দুটি নেই। সব সময়ে দু'জনেই থাকে। কখনো একজন নয়। এমনকি, রাত্রে যে ওরা তিনজন এক সঙ্গেই শোয়, সেটাও এ-পাড়ায় আমরা সবাই জেনে গেছি। কেউ অবশ্য এ সম্পর্কে কোন আলোচনা করে না। আমার একটু অদ্ভুত লাগে। প্রেম, ঈর্ষা—এই সব ব্যাপারগুলোও আস্তে আস্তে কী রকম বদলে যাচ্ছে! প্রেমিক-প্রেমিকা বললে সব সময় দু'জনকে বোঝায়, কিন্তু এরা তিনজন। অথচ কোন অশান্তি নেই।

আমার পাশের ঘরের দুটি মেয়ে অনর্গল জার্মান ভাষায় কী সব বলে যাচ্ছে। এরা বেশ জোরে জোরে কথা বলে। কাশ্মীরীদের নম্র গলায় কথা বলার ধরন এরা অনুকরণ করতে শেখেনি। এরা হয়তো ভাবে সেটা গরীব লোকদের বিনয়।

ক'দিন ধরেই শুনছি, ওরা ট্রাউট ফিসিং-এর তোড়জোড় করছে। সেই জন্য ঘোরাফেরা করছে কয়েকটি কাশ্মীরী যুবক। ইটালিতে যাদের জিগোলো বলে, সেই রকম কিছু ছেলে তৈরি হয়েছে এখানেও। পুরুষ সঙ্গীহীন মেমসাহেবদের তারা নানান জায়গায় নিয়ে যায়, সব ব্যবস্থাপনা করে দেয়। ট্রাউট মাছ ধরার জন্য কোন নির্জন পাহাড়ের খাঁজে ঝরনার পাশে অপেক্ষা করতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা—দু'এক রাত্রি থাকতেও হয় তাঁবু খাটিয়ে। এই সব ছেলেরা মেমদের নিয়ে যায় সেইসব জায়গায়, ফুট ফরমাস খাটে, রান্না করে দেয়, মাছ ধরার ব্যাপারটাও সববই ভাগ তারাই সারে—তারপর গহন পাহাড়ের শীতে-কাঁপা রাতে তারা মেমদের শয্যাসঙ্গীও হয়। তার বদলে উপহার পায় ক্যামেরা, কম্বল আরো টুকিটাকি জিনিস। কাশ্মীরী ছেলেদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় উপহার অবশ্য সবুজ রঙের ডলারের নোট, তারপরই বিদেশী ছিপ। শ্রীনগরে ডলারের ব্ল্যাক মার্কেটের ঢালাও

বাজার আছে। এবং হাউসবোট কর্মচারী যে-কোন সুদেহী কাশ্মীরী যুবকই তার নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে দু'তিনটি বিদেশী ছিপ অন্যদের দেখায়।

প্রায়ই দেখি, বিভিন্ন হাউসবোটের ছেলেমেয়েরা ট্রাউট ফিসিং অভিযানে যাচ্ছে। এরা অনেকেই নিজের দেশে কক্ষনো মাছ ধরেনি। কিন্তু কাশ্মীরে এসে ট্রাউট ফিসিং বিদেশীদের অবশ্য কর্তব্যের একটি।

এই জার্মান মেয়ে দুটি চায় জার্মান ছেলে দুটিও তাদের সঙ্গে যাক। কিন্তু ছেলে দুটি রাজি নয়, কারণ কিছুদিন আগেই তারা মাছ-শিকার সেরে এসেছে। তবু মেয়ে দুটি তাদের পেড়াপিড়ি করছে রোজই। আমেরিকান মেয়েটি অবশ্য নুই-ভক্ত, তার ওদিকে বেশি ঝোঁক নেই। জার্মান মেয়ে দু'টিকে দেখতে ভালো নয়. বিদেশী সৌন্দর্যের মাপে ওদের পা-গুলি মোটা মোটা এবং গালের মাংসে চোখ ঢেকে গেছে। আহা, বেচারীদের বিয়ে হবে না। তাই এত দূরে এসেছে প্রণয়ের সন্ধানে। ইস, ওরা যদি মাছ ধরার সঙ্গী হিসেবে আমাকে নিত!

ঘর থেকে বেরুবার সময় এখনো আমাকে সাবধানে চারদিকটা উঁকি মেরে দেখে নিতে হয়। জার্মান কুকুরটা এখনো আমাকে জ্বালাতন করতে ছাড়ে না। অতি পাজী কুকুর ওটা, অন্য লোকজন কাছাকাছি থাকলে ও আর এখন আমাকে কিচ্ছু বলে না, নিরীহভাবে লেজ নাড়ে। কিন্তু কোন সময় আমাকে একা পেলেই গ্রাউ গ্রাউ করে তেড়ে আসে। সেই ডাক শুনলেই রক্ত হিম হয়ে যায়।

এত লোক থাকতে কুকুরটা শুধু আমার দিকেই বা তেড়ে আসে কেন? আমি জীবনে নিশ্চয়ই অনেক অপরাধ করেছি, কিন্তু একটা জার্মান পুলিশ-কুকুর সেকথা জানবে কী করে? এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

দুপুরবেলা কিনে-আনা খবরের কাগজটা তন্নতন্ন করে পড়া হয়ে গেছে। নতুন বই দুটির একটিও প্রায় শেষ, আর ভালো লাগছে না, ব্যথা করছে চোখ। বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মিরাজ দিল-এর একটা ছোট্ট নৌকো আছে, ডিঙ্গি বা শালতি বলা যায়। এই মাত্র সে মাছ-ধরা সেরে ফিরল। আমি বললাম, মিরাজ, তোমার নৌকোটা করে আমি একটু ঘুরে আসব? দেবে?

সে বৈঠাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ইয়েস, সাব!

আমার নদীনালার দেশে জন্ম। এক সময় নৌকো চালাতে জানতাম। হঠাৎ আমার ইচ্ছে হলো, একলা একটু নৌকো নিয়ে ঘুরে আসতে।

কিন্তু বৃদ্ধ অর্থাৎ বাবা আমার কথা শুনতে পেয়েছে। সে তাড়াতাড়ি রান্না-কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, না, সাব। একলা যাবেন না। এ নৌকোটা যখন তখন উল্টে যায়। মিরাজ আপনার সঙ্গে যাক।

মিরাজ এই মাত্র মাছ ধরে ফিরেছে, এখন আমার সঙ্গে যেতে তার না-ও ইচ্ছে হতে পারে। বাবাকে আমি যত বোঝাই যে নৌকো উল্টে গেলেও ক্ষতি নেই, আমি যথেষ্ট সাঁতার জানি, সে কিছুতেই শুনবে না। আমার নিরাপত্তার সব দায়িত্ব যেন তারই। জোর করে মিরাজকে আমার নৌকোয় তুলে দিল।

মিরাজ ছেলেটি খুব ভালো। সব সময় তার হাসিমুখ। কথা কম বলে, হাসি দিয়েই অনেক কথা সেরে দেয়। এই ছেলেটি হয়তো সারাজীবন হাউসবোটের কর্মচারীই থেকে যাবে, অথচ চিত্রতারকা হলে ওকে চমৎকার মানাত।

জলের ওপর ছপ্ ছপ্ করে বৈঠার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ম্লান আলোয় সমস্ত পরিমণ্ডল যেন স্বপ্নময়। সূর্য ডুবে যাবার পরও এখানে অনেকক্ষণ আলো থাকে, এখন প্রায় আটটা বাজে, তবু অন্ধকার নামেনি। দূরের পাহাড়গুলি এখন মনে হয় চিত্রার্পিত। পুরো পাহাড়গুলি এখন আর দেখা যায় না, শুধু আকাশের গায়ে বসানো আছে সার সার তুষারমুকুট।

মধ্য হ্রদে এসে যেদিকে তাকাই, সব বোটেই সাহেব-মেম। এই ক'দিনে আমি এই বিদেশী পরিমণ্ডলে অনেকখানি ধাতস্থ হয়ে গেছি। তবু এত সব বিচিত্র চরিত্র যে, কিছুতেই একঘেয়েমি আনতে দেয় না। এখন আর এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবার কোন তাড়া অনুভব করি না। মন্দ কী!

নাগিন লেকের দূরতম প্রান্তে চলে আসি। এখানে আর হাউসবোট নেই। এখানে রয়েছে বেশ বড় একটি পদ্মবন। পদ্মবন? জলের মধ্যে এক সঙ্গে অনেক পদ্মলতা থাকলেও কি তাকে বন বলা যায়? তবে পদ্মবনে মত্ত হস্তী মানে কী?

রাশি রাশি রক্তকমল ফুটে আছে, এরা কারুর জন্য নয়। কোন পুজোতেই এ ফুল লাগে না এখানে। পদ্মবনে নাকি সাপ থাকে? কোন এক তিন প্রহরের বিলে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর খেলা করে—এরকম শুনেছিলাম ছেলেবেলায়। তা আর কখনো দেখা হয়নি।

একটা পদ্মের মৃণাল ধরে টান দিলাম। ওরে বাবা, কী দারুণ লম্বা এগুলো। এখানে জল বেশ গভীর, প্রায় তলা পর্যন্ত দেখা যায়। বেশ শক্ত মৃণালগুলো, সহজে ছেঁড়া যায় না। বেশ জোরে টানতেই নৌকোটা প্রায় উল্টে যাচ্ছিল আর কি! মিরাজ পকেট থেকে একটা ছোট্ট ছুরি বার করে কচ্ করে কেটে দিল ডাঁটাটা। সেটা আমার খুব পছন্দ হলো না। অনেকে কাঁচি দিয়ে গোলাপ ফুলের ডাল কাটে, সেই দৃশ্যটা আমার দেখতে ভালো লাগে না কখনো।

নৌকোর দু'পাশে পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারসাম্য রেখে আর একটা পদ্ম ছেঁড়ার চেষ্টা করলাম। এবার উঠে এল বিরাট একটা নাল। মিরাজও পটাপট কয়েকটা তুলে ফেলল। ওরা নাকি এগুলো রান্না করে খায়। দেখতে দেখতে প্রায় এক

নৌকো ভর্তি পদ্ম তোলা হলো। মিরাজেরই উৎসাহ বেশি।

হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই টপাটপ করে কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল গায়ে। পরিষ্কার আকাশ ছিল, হঠাৎ কোথা থেকে চলে এসেছে মেঘ। মিরাজ বলল, ফিরে যাব, সাব?

আমি ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালাম।

দুজনে বৈঠা চালাতে নৌকো বেশ তাড়াতাড়ি এগোতে লাগল। মিরাজ বাচ্চা ছেলে হলেও বেশ দক্ষ মাঝি। অনভ্যাসের জন্য আমার একটু বাদেই হাত ব্যথা করে।

অনেকখানি চলে এসেছি। এমন সময় একজন কে চেঁচিয়ে বলল, এই, আমায় একটা পদ্মফুল দেবে, এই, দেবে একটা পদ্মফুল?

একটি বাচ্চা মেয়ের গলা। বাংলায়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, একটা হাউসবোট থেকে একটি চার-পাঁচ বছরের বালিকা আমাদের ডাকছে।

৪

এই বাচ্চা মেয়েটিকেই আমি সেদিন দুপুরবেলা টুরিস্ট অফিসে দেখেছিলাম।

হাউসবোটটির দিকে আমার পিঠ ফেরান ছিল, সুতরাং আমাকে নিশ্চয়ই বাঙালি বলে চিনতে পারেনি। তবু যে মেয়েটি বাংলায় পদ্মফুল চাইছে, তার কারণ অতটুকু মেয়ে বাংলা ছাড়া আর কিছুই জানে না। নাগিন লেকে আমি এই প্রথম বাংলা কথা শুনলাম।

মিরাজ কিছুই বুঝতে পারেনি। আমি তাকে বললাম, ঐ হাউসবোটের কাছে একটু চলো তো।

লাল রঙের কোট পরে বাচ্চা মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে হাউসবোটের বারান্দায়। আমি তার কাছে গিয়ে একগোছা পদ্ম ফুল এগিয়ে দিয়ে বললাম, এই নাও!

মেয়েটি সব ফুলগুলো নিয়ে আবার এক হাত বাড়িয়ে বলল, আরো দাও! আরো তো অনেক আছে!

বেশ দুষ্টু মেয়ে তো। অল্পে সন্তুষ্ট নয়।

আরো কিছু ফুল তুলে দিলাম ওকে।

এই সময় ভেতরে বসবার ঘর থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। চিনতে দেরি হলো না। এক দুপুরে দেখা সেই মিসেস চ্যাটার্জি, যিনি একবার রাগের সঙ্গে চেঁচামেচি এবং খানিক পরেই কাঁদছিলেন। এখন মুখখানা গম্ভীর। সাদা রঙের

শাড়ির ওপর একটা মেরুন অল ওভার শাল জড়ানো।

প্রথমে তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে মেয়েকে ঈষৎ ধমক দিয়ে বললেন, কী হবে অত ফুল নিয়ে? একটা রেখে বাকি সব ফেরৎ দিয়ে দাও!

আমি বললাম, নিক না। আমার এত ফুলের কোন দরকার নেই, এমনিই তুলেছি। আরো অনেক রয়েছে।

তিনি তবু আমার দিকে না তাকিয়ে মেয়েকে আবার বললেন, লোকের কাছে কখনো এরকমভাবে জিনিস চাইতে নেই। কতবার তোমাকে বলেছি! দাও, ফেরৎ দিয়ে দাও!

ঐটুকু বাচ্চা মেয়ের কাছ থেকে ফুল ফেরৎ নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, কিচ্ছু হয়নি তাতে। ওকে বকবেন না। আর তো কিছু চায়নি, ফুল চেয়েছে।

এবার তিনি পরিপূর্ণভাবে তাকালেন আমার দিকে। মুখখানা বিষণ্ন উদাসীনতা মাখানো। একত্রিশ-বত্রিশের মতন বয়েস, সাধারণ বাঙালি মেয়েদের তুলনায় বেশ লম্বা।

তিনি অন্যমনস্কভাবে আমার দিকে তাকিয়ে চেয়েই রইলেন। আমার একটু অস্বস্তি হলো। সেটা কাটাবার জন্য আমি দু' হাত তুলে বললাম, নমস্কার।

এবার তিনি বলেন, আসুন। ওপরে আসুন!

কথাটার মধ্যে তার খানিকটা হুকুমের সুর আছে। সাধারণ ভদ্রতা বা অনুরোধ নয়।

প্রত্যেক হাউসবোটের সামনের বারান্দা থেকে একটা সিঁড়ি নামানো থাকে জল পর্যন্ত। সেটা দিয়ে আমি বারান্দায় উঠে এসে জানালাম, আমি একটু দূরেই একটা বোটে থাকি।

ভদ্রমহিলা বললেন, আপনার কি ফেরার কোন তাড়া আছে? একটু চা খাবেন?

—না তাড়া নেই, খেতে পারি।

মিরাজকে বললাম, তুমি যাও, একটু পরে আমি একটা শিকারা নিয়ে ফিরব!

সে বলল, না সাব। আমি থাকছি।

মিরাজের ওপর 'বাবা' আমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছে। সে আমাকে ফেলে যাবে না। কিন্তু ছেলেটিকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখব। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললাম, এখানে তো অনেক শিকারা পাওয়া যাবে, আমি পরে ফিরব।

এই বোটেও দুটি সাহেব মেম রয়েছে। তবে তাদের দেখলে মনে হয় বেশ নিরীহ বিয়ের পর বেড়াতে আসা দম্পতি। এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কোন পুরুষ

নেই। বেশ চমৎকৃত হলুম। বাঙালি মেয়েরাও তাহলে একলা বেড়াতে আসতে পারে, সঙ্গে আবার একটি পাঁচ বছরের শিশু। এই মহিলার সাহস আছে, স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু ইনি ওরকমভাবে প্রকাশ্যে কাঁদছিলেন কেন?

আমি বললাম, এই জায়গাটায় আমি আর আপনারা ছাড়া কোনো বাঙালি নেই। ভারতীয়ও নেই। আপনি এখানে এলেন কী করে?

উনি বললেন, আমার ইচ্ছে ছিল টুরিস্ট সেণ্টারে থাকার। শহরের মাঝখানে। কিন্তু সেখানে জায়গা নেই—কোন বড় হোটেলেও জায়গা নেই—তিন চার দিন ধরে অসম্ভব টুরিস্টের ভিড়। মির্জা আলী বলে একজন এখানে নিয়ে এলো। জায়গাটা তো ভালোই। কিন্তু নিরাপদ তো?

আমি বললাম, হ্যাঁ। সে রকম কোন ভয়টয় নেই। চুরি যায় না এখানে। তবে জিনিসপত্র কেনার ব্যাপারে সাবধান থাকবেন।

মির্জা আলীও একটি জিগোলো। আমাদের হাউসবোটের জার্মান মেয়ে দুটিকে ট্রাউট ফিসিং-এ নিয়ে যাবার জন্য সেও দু' একবার আনাগোনা করেছে। একা এই সুন্দরী মহিলাকে কি সে সেই রকম কোন মতলবেই এনেছে?

বারান্দাতেই চেয়ার টেনে বসা হলো। আমরা পরস্পর নাম ও বাসস্থান সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করলাম। ভদ্রমহিলার নাম শুভ্রা চ্যাটার্জি, দক্ষিণ কলকাতার মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি পাটনায়। ওঁর মেয়ের নাম মৌসুমী, ডাকনাম বুলবুল। দারুণ ছটফটে মেয়ে, সে সারা হাউসবোট দাপাদাপি করে দৌড়োচ্ছে। এক একবার দুটি তিনটি করে ফুল নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের ঘরে, আবার ফিরে আসছে।

ট্রেতে সাজিয়ে চা দিয়ে গেল মির্জা আলী। আমাকে দেখে সে একটি লম্বা সেলাম জানাল। আমি এ তল্লাটে প্রায় আট- ন'দিন আছি এবং একমাত্র নেটিভ ভ্রমণকারী হিসেবে বেশ দ্রষ্টব্য হয়ে গেছি।

চা দেবার পরও মির্জা আলী পাশে দাঁড়িয়েছিল, ভদ্রমহিলা তার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, আমাদের কিছু দরকার নেই। অর্থাৎ তিনি ওকে চলে যেতে বলছেন।

একটা প্রশ্ন গোড়ার থেকেই আমার জিভে সুলসুল করছে। উনি সেই দুপুরে ওরকমভাবে কেন কাঁদছিলেন? কিন্তু সে প্রশ্ন এখন উত্থাপন করা যায় না। ওঁর কোন দুর্বল মুহূর্তে ওঁকে দেখে ফেলেছি, সেটা জানালে উনি লজ্জা পাবেন।

আমাকে চা খাবার নেমন্তন্ন করলেন বটে, কিন্তু শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বলছেন না। মুখে একটা অন্যমনস্কভাব। নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন।

আমিও খুব একটা বাক্যবাগীশ নই যে চটপট করে আলাপ জমিয়ে তুলব।

আমি ওঁর সুন্দর হাতের আঙুলগুলি লক্ষ্য করতে লাগলাম।

বেশ লম্বা লম্বা আঙুল, শিল্পীর মতন। ভদ্রমহিলার শরীরে কোন প্রসাধনের চিহ্ন নেই, কিন্তু একটা ঢলঢলে সৌন্দর্য টের পাওয়া যায়।

হঠাৎ মুখ তুলে উনি বললেন, আমার একটা জরুরি কাজে পহলগাম যাবার কথা। কিন্তু পহলগামের রাস্তায় ধস নেমেছে, বাস চলছে না। কতদিন যে অপেক্ষা করতে হবে! বিরক্তিকর!

জরুরি কাজ? কাশ্মীরে আবার কে কবে জরুরি কাজ নিয়ে আসে? ভদ্রমহিলা কি ডাক্তার না বিজ্ঞানী? তাদের কিছু কিছু সেমিনার হয় বটে শ্রীনগরে। এই সব সেমিনারের নিয়ম এই, গ্রীষ্মকালে হয় কোন পাহাড়ী জায়গায়, শীতকালে সমুদ্রতীরে। কিন্তু পহলগামের মতন ছোট্ট জায়গায় কিসের সেমিনার। তাছাড়া সেমিনারের অতিথিদের যাতায়াতের ব্যবস্থা তো সরকারই করে।

আমি বললাম, বাস না চললেও ট্যাক্সি করে যাওয়া যায়। খরচ খানিকটা বেশি।

উনি একটু রাগতভাবে বললেন, বাসের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে ট্যাক্সিই বা কি করে চলবে?

—পহলগামের রাস্তা অনেকখানিই সমতল। পাহাড়ী রাস্তা খুব বেশি নয়। সমতলে তো আর ধস নামবে না—পাহাড়ে যদি নামেও সেই পর্যন্ত ট্যাক্সিতে গিয়ে বাকিটা পথ ঘোড়ায় কিংবা পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়।

—আপনি পহলগাম ঘুরে এসেছেন?

—আগে একবার এসেছিলাম, তখন দেখেছি।

—এবার যাবেন না?

—যেতেও পারি। ঠিক নেই! আপনি এই প্রথম এসেছেন?

—হুঁ।

উনি আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বোঝাই যাচ্ছে, খোলাখুলি কথা হবে না। এবার বোধহয় আমার বিদায় নেওয়া উচিত!

—ওকি, ওকি, বুলবুল।

ভদ্রমহিলা ধড়মড় করে উঠে ছুটে গেলেন। আমিও চমকে উঠলাম। আমাদের কথার ফাঁকে বুলবুল কখন বারান্দার রেলিং টপকে জলের কাছে ঝুঁকেছে। সে জলের মধ্যে একটা পদ্ম ফুল ভাসাতে চায়।

উনি বুলবুলকে টেনে এনে ধমকালেন। তারপর বললেন, এ জায়গাটা এমনিতে মন্দ নয়। কিন্তু আমার ভয় এই মেয়েকে নিয়ে। এমন দুরন্ত, হঠাৎ যদি জলে-টলে পড়ে যায়—

আমি বললাম, এত ছোট বাচ্চা নিয়ে হাউসবোটে না থাকাই ভালো বোধহয়। আপনি কোথাও জায়গা পেলেন না? লালচৌকে একটা বড় বাঙালি হোটেল আছে। সেখানে কোনো বাঙালি গেলে, জায়গা না থাকলেও ওরা একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেয় শুনেছি।

শুভ্রা চ্যাটার্জি দৃঢ়স্বরে বললেন, ঐ ধরনের কোন ব্যবস্থা আমি পছন্দ করি না। টুরিস্ট সেন্টারে ঘর খালি নেই বলে কয়েকজন অফিসার তাঁদের বাড়িতে আমাদের জায়গা দেবেন বলেছিলেন। আমি রাজি হইনি। এখানে আর একটা মুশকিল, শহর থেকে অনেকটা দূর। এখান থেকে ট্যাক্সি পাওয়া যায়?

—পাড়ে নেমে খানিকটা গেলেই দেখবেন একটা কলেজ আছে। সেখান থেকে ট্যাক্সি পাবেন।

একটু হেসে আমি আবার যোগ করলাম, আমি গোটা কাশ্মীর উপত্যকাটাই খুব ভালো চিনি। ইচ্ছে করলে আমাকে গাইড রাখতে পারেন।

—আপনি একা?

—হ্যাঁ, একাই তো। আপনার সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে আলাপও হয়নি।

—কলকাতায় কোথায় আপনার বাড়ি?

—গোলপার্কের কাছে। ব্রীজের পাশে।

—অরুণ রায়চৌধুরীকে চেনেন? অ্যাডভোকেট? তার স্ত্রী বন্দনা—

—চিনি না। পাড়ার কারুকে চিনি না—

—বন্দনা রায়চৌধুরী—এক সময় ভালো ব্যাডমিন্টন খেলত, খুব ভালো ছাত্রী ছিল, একটা অসুখে মাথার প্রায় সব চুল সাদা হয়ে গেছে এর মধ্যেই—

—ঠিক সামনা-সামনি চিনি না, ওঁর কথা শুনেছি। উনি কি রামকৃষ্ণ মিশনে ফ্রেঞ্চ পড়ান?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো ফ্রেঞ্চ জানে—

—বুঝেছি। উনি আমার ছোট মাসীর বন্ধু।

—আপনার ছোট মাসীর নাম কি!

—দীপান্বিতা—

—দীপান্বিতা? তাকে তো আমিও খুব ভালো চিনি! বন্দনা আমার পিসতুতো বোন, আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। দীপান্বিতা লেডি ব্রেবোর্নে পড়ত না?

—হ্যাঁ!

—দীপান্বিতা তোমার মাসী হয়। তুমি তো তা হলে আমাকেও মাসী বলতে পারো!

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! তুমি? ভদ্রমহিলা হঠাৎ আমাকে তুমি বলতে

শুরু করে দিলেন? সাহস তো কম নয়! এইজন্যই প্রবাসে এসে আমার বাঙালিদের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না। ঠিক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কোন না কোন রকমের চেনাশুনোর সূত্র বার করার চেষ্টা। আমার একদম পছন্দ হয় না এসব। অনেকেই যেমন এক জেলার লোক হলেই দারুণ আত্মীয় হয়ে যায়।

আমি মৃদু গলায় বললাম, দীপান্বিতা আমার মাসী হলেও আমার চেয়ে বয়েসে ছোট।

—হোক না ছোট। তবু মাসী তো! কি রকম মাসী, আপন?

—মায়ের খুড়তুতো বোন।

—তা হলে তো আপনই হলো। দীপান্বিতাকে আমার নাম বলো, ঠিক চিনতে পারবে। বিয়ের আগে আমি তো হিন্দুস্থান পার্কে থাকতাম। মাত্র ছ' বছর হলো পাটনা চলে এসেছি।

আমি আড়মোড়া ভেঙে বললাম, এবার আমি উঠি।

কাছ দিয়ে একটা শিকারা যাচ্ছিল, হাতছানি দিয়ে সেটাকে ডাকলাম। এখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। জলের ওপর বিভিন্ন হাউসবোটের আলোর লম্বা লম্বা রেখা।

বুলবুল হঠাৎ আব্দার ধরল, সে শিকারায় চাপবে। তার মা তাকে বারণ করলেন। কিন্তু বুলবুল সে কথা শুনবে না। সে হাত পা ছুঁড়ে চ্যাচাতে লাগল, না, আমি শিকারায় চাপব, শিকারায় চাপব—এই কাকুটা আমায় নিয়ে যাবে—তুমি নিয়ে যাবে না?

অগত্যা আমাকে বলতেই হলো, ঠিক আছে, ওকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি।

—কেন শুধু-শুধু—

—আসুক না, একটুখানি—আবার দিয়ে যাব।

বুলবুলকে আমি কোলে তুলে শিকারায় নিয়ে এলাম। তারপর শিকারাটা ছাড়ার পর আমার খেয়াল হলো বুলবুলের মাকেও তো অনুরোধ করা উচিত ছিল।

—আপনি আসবেন?

—না।

—আসুন না। একটু ঘুরেই ফিরে আসবেন?

—থাক তোমরাই ঘুরে এসো!

শুভ্রা চ্যাটার্জির তুমি সম্বোধন আমার গায়ে বিঁধছে। মেয়েদের এরকম বড়-বড় ভারিক্কী ব্যবহার আমার একদম সহ্য হয় না। এক অল্প-চেনা নারী আমায় তুমি বলছে? তাও মাসীর ভূমিকা!

বুলবুল কিন্তু একটুখানি ঘুরেই ফিরে আসতে রাজি নয়। শিকারা ঘোরাবার কথা তুললেই সে চেঁচিয়ে উঠছে, না, না, এক্ষুনি না, আমি আরো যাব!

শিকারাওয়ালা হাসছে। আমি বুলবুলের হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছি। যা দুরন্ত মেয়ে, একে সামলানোই শক্ত। পরের মেয়ের দায়িত্ব নেওয়াই এক ঝকমারি।

বুলবুল বায়না তুলল, ও আমার হাউসবোটটা দেখবে। সেটা না দেখিয়ে ওকে ফেরানো যাবে না বলেই শিকারাওয়ালাকে বললাম, চলো!

আমাদের হাউসবোটের সামনের বারান্দায় সেই জার্মান যুবক-যুবতীরা সকলেই এক সঙ্গে বসে বীয়ার পান করছে। সঙ্গে সেই কুকুর। বুলবুল সেখানে এসেই 'ওমা কী সুন্দর কুকুর' বলে অকুতোভয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি শিউরে উঠলাম। কুকুরটা অবশ্য বুলবুলের ছোঁয়ায় একটুও বিরক্ত হলো না।

জার্মান ছেলেমেয়েরা বুলবুলকে আদর করল, অনেক কথা জিজ্ঞেস করল তাকে। বুলবুল অনর্গল উত্তর দিয়ে গেল বাংলায়।

একটু পরেই তাকে আবার ফিরিয়ে দিতে গেলাম। বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন শুভ্রা চ্যাটার্জি। তাঁর ছায়া পড়েছে জলে। পিঠের ওপর এক রাশ চুল মেলা। মুখখানা আবার বিষণ্ন গম্ভীর। একটু আগে আমার সঙ্গে কথা বলার শেষ দিকে উনি খানিকটা উচ্ছল হয়ে গিয়েছিলেন। এখন মন আবার উধাও।

বুলবুলকে ওপরে তুলে দেবার পর উনি বললেন, ও খুব বিরক্ত করেছে নিশ্চয়ই।

—না, না, কিছু বিরক্ত করেনি। আমি চললাম।

উনি আর কিছু বললেন না।

শিকারাটা বেশ খানিকটা দূরে চলে আসার পর আমি আর একবার ফিরে তাকালাম। উনি তখনো এক দৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর পেছন দিকে হাউসবোটের আলো, সামনের দিকটা অন্ধকার। এত দূর থেকে আর মুখ দেখা যায় না।

কোন ছেলেই সাধারণত কোন মেয়েকে প্রথমে তুমি বলে না। শুভ্রা চ্যাটার্জির গাম্ভীর্য দেখে তাঁকে তুমি বলার কথা আমার মনেই পড়েনি। প্রথম আলাপে সে প্রশ্নই ওঠে না! তবু উনি কেন আমাকে তুমি বললেন? না, ওটা ঠিক হয়নি।

পরদিন আমার ঘুম ভাঙল জানলায় ঠকঠক শব্দে। চোখ মেলে দেখি, জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে 'বাবা'। মাত্র সাড়ে ছ'টা বাজে। আমি তো আগেই বলে দিয়েছি, সাড়ে সাতটার আগে আমাকে বেড টি দেবার দরকার নেই।

একটু বিরক্তভাবে বললাম, কী?

বাবা বললো, সাব, আপনাকে এক ভাই ডাকছে।

—কে ডাকছে?

—এক ভাই।

ভাই আবার কি? আমার আবার কোন্ ভাই এখানে আসবে? যত সব অদ্ভুত কথা।

পাজামা গেঞ্জির ওপরেই শালটা জড়িয়ে নিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় আমার ভাই?

বৃদ্ধ সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, এক ভাই আপনার জন্য শিকারায় অপেক্ষা করছেন।

উঁকি দিয়ে দেখলাম, শিকারা নিয়ে এসেছেন শুভ্রা চ্যাটার্জি, আর তাঁর মেয়ে বুলবুল। তখন বুঝলাম, ভাই নয়, বাঈ। আমরা এদের কাছে এখনো সাব হলেও ভারতীয় মেয়েদের এরা মেমসাহেব বলে না। তারা বাঈ।

কিন্তু শুভ্রা চ্যাটার্জি ভোরে এসেছেন কেন? কোন রকমে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে মুখের চেহারাটা একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে বললাম, কী ব্যাপার? কোন গোলমাল হয়েছে?

শিকারায় শুভ্রা চ্যাটার্জির সুটকেস ও অন্যান্য জিনিসপত্র সাজান। সিংহাসনের মতন জায়গাটায় উনি বসে আছেন সোজা হয়ে। আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, আমরা আজই পহলগাম যাব ট্যাক্সি নিয়ে। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে? তুমি পথঘাট চেন।

একটু থেমে উনি আবার যোগ করলেন, বুলবুল বার বার বলছে তোমার কথা। তুমি গেলে ও খুশি হবে।

আমি একটু হাসলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি তাঁর ব্যবহারে নিখুঁত থাকতে চান। তিনি একজন যুবতী, তিনি আমার মতন প্রায় একজন অচেনা মানুষকে ভ্রমণের সঙ্গী হতে আহ্বান জানাতে পারেন না। তাতে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সেই জন্যই তিনি তাঁর মেয়ের কথা বলছেন। যেন মেয়ের জন্যই তিনি অনুরোধ করছেন মাত্র।

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন, যদি তুমি যেতে চাও, তা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি হয়ে নাও, আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।

মন স্থির করতে আমার কয়েক মুহূর্ত লাগল মাত্র। মিসেস শুভ্রা চ্যাটার্জি ইতিমধ্যেই নিজেকে ঘিরে অনেকখানি রহস্য সৃষ্টি করে ফেলেছেন। হঠাৎ প্রকাশ্য দিবালোকে কান্না, আবার গাম্ভীর্য, আমাকে হঠাৎ তুমি বলা—এ সবের অর্থ কী? এখনো, তিনি যেন আমাকে অনুরোধ করতে আসেননি, আদেশ করছেন। সুতরাং

শুভ্রা চ্যাটার্জিকে এই অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। এর শেষ দেখতে হবে।

তা ছাড়া, আমার মনের যে ক্ষত লুকোবার জন্য আমি একাকিত্ব চেয়েছিলাম, তা অনেকটা সফল হয়েছে। ঢের একাকিত্ব ভোগ করা গেছে এই ক'দিনে। এবার বেরিয়ে পড়লেই হয়।

আমি বললাম, আমার তৈরি হয়ে নিতে খানিকটা সময় লাগবে। ততক্ষণ শিকারায় বসে থাকবার দরকার নেই। ওপরে উঠে আসুন।

উনি বললেন, না, ঠিক আছে, আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।

এবার আমিই খানিকটা ধমক দিয়ে বললাম, কী ছেলেমানুষের মতন কথা বলছেন? আমার যদি আধঘণ্টা লাগে, ততক্ষণ জলের ওপর বসে থাকবেন মেয়েকে নিয়ে? মালপত্র থাক, আপনারা উঠে এসে ডাইনিং রুমে বসুন, আমি চা-টা দিতে বলছি। বুলবুল যদি দুধ খায়, তাও পাওয়া যাবে।

হাত বাড়িয়ে আমি বুলবুলকে তুলে নিলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে নিজেই ওপরে উঠলেন। অনেকটা যেন কোন রানীর মতন অহংকারী ভাব। ডাইনিং রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় বললেন, আমি শুধু এক কাপ চা খাব, আর কিছু নয়, বুলবুল দুধ খেয়ে এসেছে।

একটি বাঙালি রমণীর সঙ্গে আমি চলে যাব শুনে বৃদ্ধ 'বাবা' আর কোন আপত্তি করল না। তাছাড়া সে বুঝে গেছে যে পর্যটন দপ্তরে গিয়ে আর নালিশ করার মতন মনের অবস্থা আমার নেই। আমি বেশি দিন রাগ পুষে রাখতে পারি না।

ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আমাকে বিদায় জানাল। সবাই বার বার বলতে লাগল, সাব, আবার আসবেন। সাব, আবার এখানে আসবেন। এমন কি, মিরাজের বড় বোন, এতদিনে যার সঙ্গে একটাও কথা হয়নি, দূর থেকে দেখেছি শুধু, সে পর্যন্ত মৃদু গলায় বলল, সাব, আবার আসবেন তো!

এদের আন্তরিকতায় হঠাৎ মনটা খুব ভিজে যায়। সকলকে খুব আপন মনে হয়। মনে হয়, আবার ঠিক কোনদিন ফিরে আসব এখানে। কত জায়গায় গিয়ে এরকম কথা মনে হয়েছে। আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভুলিনি।

শমীমের বই দুটো ফেরৎ দিতে হবে। সে কথা বাবাকে ভালো করে বুঝিয়ে, তারপর টাকা পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

শিকারায় যেতে অনেকটা সময় লাগবে। কিন্তু আগে থেকে বলে না রাখলে এদিকে এত সকালে ট্যাক্সি পাওয়াও প্রায় অসম্ভব। ট্যাক্সি ধরার জন্য ডালগেট পর্যন্ত যেতে হবে।

নরম, সুন্দর সকাল। সোয়েটারের ওপর শাল জড়িয়ে নিয়েছি, তাও বেশ শীত করছে। তবে, আমি লক্ষ্য করেছি, কাশ্মীরে যতই শীত পড়ুক, কখনো হাড়ে

কাঁপুনি ধরে না। এখানকার তুলনায় দার্জিলিং-এর শীতে কষ্ট বেশি। শুভ্রা চ্যাটার্জি একটা লাল রঙের কোট পরেছেন। রংটা এত বেশি উজ্জ্বল যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে জল দেখছেন। চার পাশের পাহাড় চেয়ে আছে আমাদের দিকে। খুব কাছেই হরি পর্বত। ওখানে একটা পুরোনো কালের দুর্গ আছে। ভেবেছিলাম একদিন দুর্গটা দেখে আসব। আগেরবারও ভেবেছিলাম। দেখা হলো না।

নাগিন লেক পার হয়ে পড়লাম খালে। দু'পাশে অনেক গাছ জলের ওপর ঝুঁকে আছে। হঠাৎ মনে হয় বাঁশবন। কিন্তু সরু সরু পাতা হলেও এগুলো বাঁশ নয়, নাম-না-জানা গাছ। এই রকম গাছ-ঝুঁকে-পড়ার দৃশ্যের জন্যই মনে হয়, এই রকম খালের ওপর দিয়ে নৌকোয় চেপে আমি বহুবার গেছি, এ সবই আমার দেখা। শ্রীনগরের এই সব জায়গার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের খুব মিল। এই রকমই জলের ধারে ধারে বাড়ি, এই রকমই জল-মেশানো সংসার। তবে, এখানে পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা আছে বিশাল বিশাল বরফ-ঢাকা পাহাড়।

বুলবুল এসে আমার কোলের ওপর বসে পড়েছে। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমি ঠিক ভাব জমাতে পারি না। অনেকে পারে। কিন্তু এই মেয়েটি নিজেই এত কথা বলে যে আমার দিক থেকে আলাদা কোন চেষ্টা চালাবার দরকার নেই।

বুলবুল বলল, কাকু, আমিও নৌকো চালাব। আমাকে একটা দাঁড় দিতে বলো না!

শিকারাওয়ালাকে সে কথা বলতেই সে সীটের তলা থেকে ছোট্ট একটা বৈঠা বার করে দিল। এর আগেও নিশ্চয়ই অনেক বাচ্চাই এরকম আবদার করেছে, তাই এরা তৈরিই থাকে।

বুলবুল সেই বৈঠাটা নিয়ে মহা উৎসাহে জল ছিটাতে লাগল। ঠাণ্ডা কনকনে জল আমার গায়ে লাগছে, বুলবুলের কোট ভিজে যাচ্ছে, তাকে বারণ করলেও সে আর থামছে না। এখন জল ছিটানোতেই তো তার আনন্দ। একে সামলানো আমার পক্ষে শক্ত।

আমি বুলবুলের মায়ের দিকে তাকালাম। তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। হাঁটুর ওপর থুতনি ঠেকিয়ে তিনি ওপাশের জলের দিকে তাকিয়ে আছেন। বোঝাই যায়, তাঁর মন নেই এখানে। মাত্র একদিনের আলাপের পর এত ভোরে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে পহলগাম যাবার প্রস্তাব জানানো যে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, এর পরও যে কিছু ব্যাখ্যা করার থাকে, তা নিয়েও উনি মাথা ঘামাচ্ছেন না। মনে হয়, ইনি হুকুম করায় বেশ অভ্যস্ত। ইনি যা বলবেন, সবাই তাই শুনবে। এই রকমই ইনি দেখে এসেছেন।

আমি ওঁকে ডাকলাম না। অনেক নারীকেই গম্ভীর অবস্থায় বিশ্রী দেখায়। সাধারণ অর্থে অনেক সুন্দরী মেয়েও যখন গোমড়া মুখে থাকে, তখন তাদের মুখখানা যে বাঁকা আয়নার মতন হয়ে যায়, তারা তা বোঝে না। কিন্তু এই উদাসীন গাম্ভীর্য শুভ্রা চ্যাটার্জির মুখে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। মনে হয়, এ জগতের নয়। আমি রূপের উপাসক, তাই ঐ রূপকে স্থির রেখে দিলাম।

শিকারা এখন চলেছে পুরোনো শহরের মধ্য দিয়ে। দু'পাশে বড় বড় বাড়ি। প্রত্যেক বাড়ি থেকেই ঘাট নেমে এসেছে জল পর্যন্ত। আমি ভেনিস যাইনি, সেই নগরী কি এর চেয়ে বেশি সুন্দরী? এখানকার অনেক বাড়িই আগেকার দিনের সরু সরু ইঁটের, অপূর্ব কারুকার্য করা। হায়, এখন আর কেউ এরকম বাড়ি বানায় না। এখন বাড়ি মানে দেশলাইয়ের বাক্স।

কয়েক বছর আগে যখন শ্রীনগরে এসেছিলাম, তখন দেখেছি এই জলপথের দু'ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত ভিখিরি বাচ্চারা। এমন কি সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির ফুটফুটে ছেলেমেয়েরাও আমাদের দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলত, রাজা সাব, সেলাম, দো পয়সা দেও। সেলাম রাজা সাব। ঝিলম নদীর ধারে এক সন্ধেবেলা একটি যুবতী নীরবে আমার দিকে ভিক্ষের হাত বাড়িয়েছিল, যাকে দেখে মনে হয়েছিল, এর রূপের কাছে সুচিত্রা সেন, বৈজয়ন্তীমালা লজ্জা পেয়ে যাবে। তবু এমন রূপসী ভিক্ষে করে কেন?

এবার শ্রীনগরে এসে একটাও ভিখিরি দেখিনি এ পর্যন্ত। এমনকি কোন হোটেল রেস্টুরেন্টের সামনেও কেউ ভিক্ষে চায় না। এজন্য একটু মনটা খুঁতখুঁত করে। ইওরোপ-আমেরিকাতেও আমি ভিখিরির সন্ধান পেয়েছি। আর ভারতবর্ষে ভিখিরি থাকবে না? এটা বড্ড বাড়াবাড়ি নয়?

একটা হেঁচকির শব্দে চমকে উঠলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি তাড়াতাড়ি মুখ লুকোলেন। তবু স্পষ্ট বোঝা গেল, উনি কাঁদছিলেন। আমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কোমরে-গোজা রুমাল বার করে চোখ মুছলেন।

বুলবুলও কান্নার শব্দ শুনেছে? সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, মা কাঁদছে কেন? ও কাকু। মার কি হয়েছে? বলো না, মা কাঁদছে কেন?

এই সব মুহূর্তে আমি বড্ড অসহায় বোধ করি। শুভ্রা চ্যাটার্জি কেন কাঁদছেন, সেটা উনি নিজে না বললে আমি কোনদিনই জিজ্ঞেস করব না। কারুর ব্যক্তিগত গোপনীয়তার মধ্যে আমি কখনো অনুপ্রবেশ করতে চাই না। কিন্তু এই ছোট মেয়েটিকে আমি কী বোঝাব!

আমি বললাম, ঐ দ্যাখো, জলের মধ্যে কী সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটেছে। এরকম জলের মধ্যে ফুলের গাছ আগে দেখেছ?

বুলবুল সেদিকে এক নজর তাকাল মাত্র। খুব একটা পছন্দ করল না। আবার মুখ ফিরিয়ে বলল, মা কাঁদছে কেন? বলো না।

—ঐ দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর মাছরাঙা পাখি? দেখতে পেয়েছ? একসঙ্গে তিনটে।

—হ্যাঁ, দেখেছি!

—তাকিয়ে থাক, দেখবে, এক্ষুনি একটা মাছ ধরবে!

—মা কাঁদছে কেন?

শুভ্রা চ্যাটার্জি এতক্ষণে সংযত হয়ে নিয়েছেন। তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, বুলবুল, তুমি মোজা ভিজিয়েছ? শিগগির মোজা খুলে ফেল!

বুলবুল অমনি চুপসে গেল। মিনমিন করে বলল, না, মোজা ভেজেনি, একটুখানি।

—বদলে নাও, শিগগির বদলে নাও, ঠাণ্ডা লাগবে!

শুভ্রা চ্যাটার্জি লাস্ট-মোমেন্ট-ব্যাগ থেকে অন্য মোজা বার করলেন। বুলবুল হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কাকু, তুমি পরিয়ে দাও!

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, না, নিজে পরো। কাকুকে বিরক্ত করবে না। আচ্ছা, এদিকে এসো, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যাক, উনি তবু এতক্ষণে মেয়ের দিকে নজর দিয়েছেন। বাচ্চাদের জামা-জুতোটুতো পরানোর কাজ আমার দ্বারা একদম হয় না।

মেয়েকে তৈরি করে দেবার পর শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার দিকে তাকালেন। সোজা দৃষ্টি। যেন উনি আমার মনের ভেতরটা দেখে নিতে চাইছেন। আমিও চোখ ফেরালাম না। ছেলেবেলায় অনেক স্ট্যাচু-স্ট্যাচু খেলেছি, এতে আমায় চট করে হারাতে পারবে না কেউ।

একটু পরে উনি মৃদু গলায় বললেন, তোমাকে হঠাৎ ডেকে আনলাম, হয়তো তোমার পহলগাম যাবার ইচ্ছে ছিল না। তুমি আগে যখন একবার পহলগাম দেখেছো, এবার আর বোধহয় যেতে না!

যাক, তাহলে এতক্ষণে কৈফিয়ৎ দেবার কথা মনে পড়েছে। আমি মুচকি হেসে বললাম, হয়তো যেত[illegible]!

—[illegible]?

—দেখুন, আমি যখন কোথাও বেড়াতে যাই, তখন কোন পরিকল্পনা থাকে না। কোথায় কখন যা[illegible] বা কোথায় থাকব, তা আগে থেকে ঠিক করে রাখি না কক্ষনো।

—তবু একবার দেখা জায়গায়—

—পহলগাম এতই সুন্দর জায়গা যে, বার বার দেখা যায়।

—যাক্। আমার এতক্ষণ একটু খারাপ লাগছিল, আমি ভাবছিলাম, শুধু শুধু স্বার্থপরের মতন তোমাকে ডেকে আনা হলো—

—বাসের রাস্তা যদি না খুলে থাকে, ট্যাক্সিতে যেতে হবে।

—ট্যাক্সিতেই যাব।

—পহলগাম যাওয়া কি এতই জরুরি?

—খুবই জরুরি। একটা দিনও নষ্ট করা যায় না। তুমিই কাল ট্যাক্সির বুদ্ধিটা দিলে। আর কেউ বলেনি যে, রাস্তা বন্ধ থাকলেও ট্যাক্সিতে সে পর্যন্ত গিয়ে তারপর পায়ে হেঁটে বা অন্যভাবে পহলগাম পৌঁছোনো যায়।

আমি একটু চুপ করে রইলাম। আশা করছিলাম, পহলগাম যাওয়াটা কেন এত জরুরি সে কথাও উনি বলবেন। কিন্তু বললেন না। বরং জিজ্ঞেস করলেন, আজকের মধ্যেই পৌঁছোনো যাবে তো? মানে, দিনের আলো থাকতে থাকতে—

আমি বললাম, তা যাবে। এমনিতে তো ঘণ্টা তিনেক লাগবার কথা, যদি রাস্তা খারাপ থাকে, ঘোড়া পাওয়া যাবে। কিন্তু আজ তো ফেরা যাবে না। রাত্তিরটা থাকতে হবে পহলগামে।

—থাকব। হয়তো বেশ কয়েকদিনই থাকতে হবে পহলগামে। তুমি ফিরে আসতে পারো, যখন তোমার খুশি—

শিকারা এসে থামল ডাল গেটে। এখানে অনেকগুলো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

শুভ্রা চ্যাটার্জির সঙ্গে একটা বড় সুটকেস, একটা বেডিং আর দুটি ব্যাগ। আমার একটা সুটকেস আর একটা ঝোলা। বুলবুলকে আগে পাড়ে নামিয়ে দিয়ে তারপর আমার সুটকেসটা নামালাম। আবার ফিরে এসে দেখি শুভ্রা চ্যাটার্জি নিজেই বড় সুটকেসটা নিয়ে নামবার চেষ্টা করছেন। আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, ওটা আমাকে দিন।

উনি বললেন, না, আমি নিজেই পারব!

—আহা, দিন না আমাকে।

উনি একটু ধমক দেবার ভঙ্গিতে বললেন, বেশি বাড়াবাড়ি করো না। তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ বলে তোমাকেই যে সব কাজ করতে হবে, তার কোন মানে নেই। আমি নিজেই সব ব্যবস্থা করতে পারি। পহলগামেও আমি একাই যেতে পারতাম। নেহাৎ মেয়েটা সঙ্গে রয়েছে বলে—

আমি ওঁর হাত থেকে সুটকেসটা কেড়ে নিয়ে বললাম, আপনি নিজেই নিজের

ব্যবস্থা করতে পারেন, এ তো খুব ভালো কথা। কিন্তু কোন মেয়ে কোন ভারী জিনিস হাত দিয়ে তুলছে, এই দৃশ্যটা আমার পছন্দ হয় না।

উনি শিকারা থেকে পাড়ে নেমে এসে বললেন, রাস্তায় কত মেয়ে কুলির কাজ করে, কত ভারী জিনিস নিয়ে যায়—তাদের সবাইকে দেখে তুমি বুঝি তাদের বোঝা বইবার জন্য ছুটে যাও?

—না। তা যাই না। তবে তাদের কারুর সঙ্গে এক নৌকোয় চেপে বেড়াতে বেরুলে নিশ্চয়ই তখন তার বোঝা আমিই বইতাম।

—আমাকে কি তোমার পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী চলতে হবে?

আমি সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললাম, নিশ্চয়ই। আমি যা পছন্দ করব না, সে রকম কিছুই আপনার করা চলবে না। অন্তত আমার সামনে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, আমি যা পছন্দ করব না, আশা করি এমন কিছু তুমিও করবে না।

কথাটা বলার সময়ে ওঁর মুখে একটুও হাসি ফুটল না।

৫

ট্যাক্সি ড্রাইভারটি বেশ ফুর্তিবাজ। মাঝে মাঝেই সে স্টিয়ারিং-এর ওপর চাপড় মেরে গান ধরে। বলাই বাহুল্য, চলতি হিন্দী সিনেমার গান। ভারত তো এখন হিন্দী সিনেমারই সাম্রাজ্য। লোকটির ছোটোখাটো ঝকঝকে চেহারা, একটা গাঢ় নীল টেরিলিনের জামা পরেছে, গলায় একটা সোনার হার। হঠাৎ হঠাৎ সে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে বলে, সাব একঠো সিগ্রেট! এর মধ্যে আমার এক প্যাকেট প্রায় শেষ করে এনেছে। সিগারেট চাওয়ার ব্যাপারে লোকটা নির্লজ্জ একেবারে।

হঠাৎ এক জায়গায় ঘ্যাঁচ করে ট্যাক্সি থামিয়ে সে বলল, আ গিয়া, আওয়ান্তিপুর। আব দেখিয়ে!

শুভ্রা চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, একি, এখানে থামল কেন?

আমি বললাম, জায়গাটার নাম অবন্তীপুর। এখানে অনেক পুরোনো কালের একটা হিন্দু মন্দির আছে। অনেকে দেখতে যায়।

শুভ্রা চ্যাটার্জি কপাল কুঁচকে বললেন, আমাদের এসব দেখবার সময় নেই। ওকে যেতে বলো।

ট্যাক্সি ড্রাইভার সেই কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল যেন। মহা বিস্ময়ের

সঙ্গে বলল, কেয়া? নেহি দেখ্‌না? ইয়ে আপলোগকা হিন্দু মন্দির হ্যায়। বহুৎ পুরানা—

—না, আমরা মন্দির দেখব না, চলো!

—ইয়ে আপলোগকা আর ডি ব্যানার্জি এক্সক্যাভেট কিয়া!

ট্যাক্সি ড্রাইভারের মুখে আর ডি ব্যানার্জির নাম শুনে বেশ মজা লাগল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কজন বাঙালি আর এখন মনে রেখেছে, কিন্তু কাশ্মীরের লোকরা আজও তাঁর নাম উচ্চারণ করে।

বুলবুল বলল, আমি মন্দির দেখব। ও কাকু, আমি মন্দিরে যাব!

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, ঠিক আছে ও যাক। বুলবুল, যাও দেখে এসো—একদম দেরি করবে না।

আগের বার আমি এই মন্দিরে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়েছিলাম। সামনের প্রবেশ স্তম্ভ ছাড়া আর বিশেষ কিছু অক্ষত নেই। ভেতরে বড় বড় পাথর এদিক সেদিক ছড়ান। বুলবুল একা গেলে আছাড় খেয়ে পড়তে পারে। তাই আমি ওর সঙ্গে গেলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি গাড়িতেই বসে রইলেন।

বুলবুলের হাত ধরে ফিরে এসে আমি তাঁকে বললাম, আপনিও মন্দিরটা একবার দেখে এলে পারতেন। কিছু কিছু চমৎকার প্যানেলের কাজ আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, কিছু কিছু মোটিফ কোনারকের মতন।

শুভ্রা চ্যাটার্জি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, আমি এবার কাশ্মীরে জায়গা দেখতে আসিনি। এসেছি অন্য দরকারে। পরে এসব দেখা যাবে। এখন চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কাছেই কয়েকটা লোক বসে চেরী আর স্ট্রবেরি বিক্রি করছে। বুলবুলের চোখ সেই দিকে। স্ট্রবেরিগুলো ঠিক পাকেনি, এক ঠোঙা চেরী কিনে নিলাম। পকেট থেকে টাকা বার করতে যাচ্ছি, শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, দাঁড়াও আমি দিচ্ছি।

আমি তাঁকে নিবৃত্ত করে বললাম, বেশি নয়, এক টাকা মাত্র। এক টাকার চেরীই খেয়ে শেষ করা যাবে না।

বুলবুল আবার আমার কোলে বসেছে। এ মেয়েটা কিছুতেই নিজে আলাদা বসবে না। মাঝে মাঝে এমনভাবে আমার গলা জড়িয়ে ধরছে, যেন আমার কতকালের চেনা! মেয়েরাই এরকম পারে। মেয়েটার নরম তুলতুলে গা, মাথার চুলগুলো সিল্কের মতন, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এমন ছটফটে যে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসবে না।

আবার খানিক দূর গিয়ে ট্যাক্সি থেমে পড়ল। ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, অনন্তনাগমে তো যায়েগা?

শুভ্রা চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কি?

আমি বললাম, খানিকটা দূরে অনন্তনাগের মন্দির আছে। সেখানে যেতে হলে দু-তিন মাইল বেঁকতে হবে। সেখানে অনেকে পুজো-টুজো দেয়।

—না। যাবার দরকার নেই। আমি পুজো-টুজো দিই না!

বাঙালি নারী মন্দিরের কাছে এসেও পুজো দেয় না, এরকম তো সহসা দেখা যায় না।

—তোমার পুজো দেবার শখ থাকলে তুমি অবশ্য যেতে পারো।

—আমি তো অন্ত্যজ, আমার আবার পুজো কি!

—তা হলে চলো, দেরি করবার দরকার নেই!

ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট নিয়ে বলল, সাব, বাঙ্গীকো লে যাইয়ে! সব হিন্দু জেনানা ইধার পুজা দেতা হায়।

শুভ্রা চ্যাটার্জি আমাকে বললেন, ওকে বলে দাও, আমি হিন্দু নই, আমি খৃষ্টান।

আমি হেসে বললাম, সিসটার নিবেদিতা নামে এক খৃষ্টান মহিলাও এখানে পুজো দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, আপনার সিঁথিতে সিঁদুব।

উনি এবার বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, কী আশ্চর্য, টাকা দিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া করেছি, তবু কি ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথা অনুযায়ী আমাকে চলতে হবে? আমি যদি মন্দির দেখতে না চাই—

আমি তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললাম, ওদিকে বেঁকবার দরকাব নেই, গাড়ি চালাও, সোজা—

তবু ভালো, এবার বুলবুল মন্দির দেখবার আব্দার ধরেনি। সে একমনে চেরী খেয়ে যাচ্ছে।

গাড়ি চলতে শুরু করবার পর শুভ্রা চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, কী রকম মন্দির, সাঙ্ঘাতিক কিছু দেখবার মতন?

আমি বললাম, তা অবশ্য নয়। এখানে লোকে পুণ্যের লোভেই যায়। মন্দিরটা এমন কিছু না। ভেতরে ঝর্না আছে, মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। মনে আছে, ওখানকার ঝর্নার জলে গন্ধকের গন্ধ পেয়েছিলাম।

উনি একটু আগেকার রাগের ভঙ্গি মুছে ফেলে বললেন, আমি এমনিতে মন্দির-টন্দির সব ঘুরে ঘুরে দেখতে ভালোই বাসি। কিন্তু এখন আমার মন ওসব দিকে নেই।

বুলবুল কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। তার হাতে তখনো চেরী ফলের ঠোঙা।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, ও ঘুমিয়ে পড়েছে দেখছি, ওকে মাঝখানে শুইয়ে দাও না!

উনি মেয়েকে টেনে নিয়ে তার মাথাটা নিজের কোলে রেখে পা দুটো ছড়িয়ে দিলেন আমাদের মাঝখানে। তারপর বললেন, বাবাঃ বাঁচলাম। যতক্ষণ জেগে থাকবে, ততক্ষণ স্বস্তি নেই।

আমি বললাম, কেন, ও তো কোন জ্বালাতন করে না!

—কিন্তু ওর সামনে সব কথা বলা যায় না। তোমাকে অনেক কিছুই বলা হয়নি।

আমি প্রতীক্ষা করে রইলাম।

—তুমি কমলেশ চ্যাটার্জির কথা শুনেছ?

—সকলের মাসতুতো বা পিসতুতো ভাইদের কি আমার পক্ষে চেনা সম্ভব?

—উনি আমার স্বামী।

আমি একটু থমকে গেলাম। উনি প্রথমেই ওঁর স্বামীর কথা শুরু করবেন. এটা যেন ঠিক আশা করিনি।

—তুমি কমলেশ চ্যাটার্জির ব্যাপারে কিছু শোনোনি?

—না।

—আজ থেকে ঠিক তেইশ দিন আগে উনি পহলগাম থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। একটা ডেলিগেশানে এসেছিলেন, আর সবাই ফিরে গেছে আমার স্বামী ছাড়া। কাশ্মীর সরকারের ধারণা, উনি কোন খাদ-টাদে পড়ে মারা গেছেন। ডেড বডি পাওয়া যায়নি!

আমি শুভ্রা চ্যাটার্জির কপালের সিঁদুরের টিপ ও সিঁথিতে সূক্ষ্ম সিঁদুরের রেখা একবার দেখে নিলাম। বোঝাই যায়, স্বামীর মৃত্যু উনি স্বীকার করেননি।

না, কমলেশ চ্যাটার্জির এ খবর আমার কানে আসেনি। আমি এখানে এসেছি প্রায় দিন দশেক, ঘটনাটা ঘটেছে তার অনেক আগে। তাও বাঙালি হোটেলে থাকলে কিংবা বাঙালি ভ্রমণকারীদের সঙ্গে মেলামেশা করলে হয়তো এর গুঞ্জন এখনো কিছুটা শোনা যেত—কিন্তু আমি ছিলাম সাহেব পাড়ায়, সেখানে এসব কথা কেউ তোলেনি।

আমি ভেতরে ভেতরে বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। মৃত্যু বা দুর্ঘটনার খবর শুনলেই আমার বুক কাঁপে। মৃত্যুর মতন একটি অসহ্য গোঁয়ারকে আমি এড়িয়ে চলতে চাই। জীবনে একবারই তার সঙ্গে দেখা হবে, তখন যা হোক দেখা যাবে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, খবর পেয়েই আমার ভাসুর আর খুড়শ্বশুর এখানে এসেছিলেন। আমার খুড়শ্বশুর পুলিসের ডি আই জি—তাঁরাই দেখেশুনে ঠিক করেছেন যে, ও মরেই গেছে। একটা লোক এমনি এমনি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু তাঁরাও ওর ডেড বডির কোনো হদিশ করতে পারেননি।

—তাই আপনি নিজে একবার দেখতে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আপনি একা, এত বড় জায়গায় কোথায় খুঁজবেন?

মাইলের পর মাইল বিশাল পাহাড়, সম্পূর্ণ নির্জন। অনেক দূরে দূরে সামান্য জনবসতি। এর মধ্যে কোন গিরিকন্দরে যদি দুর্ঘটনায় মরে পড়ে থাকে, কে তাকে খুঁজে পাবে? তা ছাড়া এখানে কিছু হিংস্র জানোয়ার, ছোটো ছোটো আকারের বাঘও আছে শুনেছি। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

—তা বলে আমি চেষ্টা করব না? লোকের কথা শুনেই মেনে নেবো?

—কী হয়েছিল ব্যাপারটা? উনি একা ছিলেন সে সময়?

—ও বিহার গভর্নমেন্টের ইরিগেশন প্রজেক্টের কর্তা ছিল। একটা অল ইণ্ডিয়া কনভেনশানে এসেছিল শ্রীনগরে। সবসুদ্ধ আঠারোজন। মিটিংফিটিং হয়ে যাবার পর সবাই মিলে দু' দিনের জন্য এসেছিল পহলগাম বেড়াতে। প্রথম দিন সবাই এক সঙ্গেই ছিল, এক হোটেলে। পরদিন বেলা এগারোটা আন্দাজ ও কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে যায়। তারপর ওকে আর কেউ দেখেনি। ওর খোঁজ পড়ে সন্ধেবেলা। কোথাও পাওয়া যায়নি। তখন বেশি খোঁজ করাও সম্ভব হয়নি, অনেকে ভেবেছিল, হয়তো অন্য কোন হোটেলে গিয়ে উঠেছে। পরদিন সকালে সার্চ পার্টি বেরিয়েছিল। তারপর ওরা অনেক রকম নাকি চেষ্টা করেছে।

—উনি তো জঙ্গলের দিকে একা একা গিয়ে হারিয়ে-টারিয়েও যেতে পারেন।

—পুলিসের মত হচ্ছে, বছর দুয়েক আগেও এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল—একজন লোক একা একা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে মারা যায়। তার বডিও পাওয়া যায়নি। পাইনগাছের পাতাগুলো খসে খসে পড়ে পাহাড়ের ওপর গদির মতন হয়ে থাকে। পাইনের পাতা তো সহজে পচে না। তাই অনেক দিন ধরে জমে জমে বেশ মোটা গদি হয়ে যায়, তাই যে-সব লোকের পাহাড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা নেই, তারা এখানকার পাহাড়ে এসে ভাবে ওপরে ওঠা বেশ সহজ। গদির ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় গর্ত আছে, কোথায় পাহাড় হঠাৎ ঢালু হয়ে গেছে, তা ঐ পাইন পাতার গদির জন্যই বোঝা যায় না। হঠাৎ পা পিছলে কোন খাদে পড়ে গেছে, কেউ আর কোনদিন তার চিহ্নও খুঁজে পাবে না। ওপরটা তো পাইন পাতা দিয়ে ঢাকা থাকবেই।

—এ সব কথা আপনি কী করে জানলেন?

—কাশ্মীর গভর্নমেন্ট আমাকে লিখে জানিয়েছে।

—মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ কোন বৈজ্ঞানিকের নিখোঁজ হয়ে যাবার কথা

কাগজে পড়ি। এটাও সে রকম কোন ব্যাপার নয় তো? লোকে বলে সেসবের পেছনে বিদেশী শক্তির হাত আছে। এখানে এত সাহেব—

—আমার স্বামী একজন ইঞ্জিনিয়ার। তাকে ঠিক বৈজ্ঞানিক বলা যায় না। বিহারের সেচ ব্যবস্থা নিয়ে কোন বিদেশী শক্তির আগ্রহ থাকার কথা নয়।

—তা হলে এটা যদি দুর্ঘটনা হয়, তা হলে আপনি একা, মানে আমরা কি সেটা খুঁজে বার করতে পারব?

—যদি দুর্ঘটনা হয়, তা হলে আমাদের আর কিছুই করার নেই। কিন্তু আমি আর একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাই। ও ছাত্র বয়েসে একবার মাস ছয়েকের জন্য বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। লছমোনঝোলায় সাধুদের সঙ্গে নাকি ছিল তখন। আমাদের বিয়ের পরেও দু'একবার বলেছে, চাকরি বাকরি ছেড়ে ওর কোথাও একা থাকতে ইচ্ছে করে। চাকরির ব্যাপারে কখনো কোন গণ্ডগোল হলেই ও এই রকম কথা বলত। সেই রকম কিছু যদি করে থাকে?

—এরকম সব কিছু ছেড়ে একা থাকার ইচ্ছে তো অনেক মানুষেরই হয়। কিন্তু সত্যি সত্যি পারে ক'জন?

—যদি হঠাৎ ওর সেই ইচ্ছেটা তীব্র হয়ে থাকে?

—হঠাৎ পহলগামে এসেই বা কারুর সাধু হবার ইচ্ছে হবে কেন? এটা তো কোন তীর্থস্থান বা সে রকম কিছু নয়—

—ঠিক কোন্ মুহূর্তে মানুষ আত্মহত্যা করতে চায় বা পাগল হয়ে যায়, তা কি কেউ বলতে পারে?

—কিন্তু আমার ধারণা, কোন চীফ ইঞ্জিনিয়ার এরকমভাবে সাধু হয় না। যারা অনেক রকম দায়িত্ব নিতে অভ্যস্ত, তারা সহজে দায়িত্ব কাটাতে পারে না।

—তোমাকে একটা চিঠি দেখাচ্ছি। এই চিঠিটা আমার কাছে এসে পৌঁছেচে, ওর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছোবার সঙ্গে, একই দিনে। চিঠিটা তুমি পড়বে?

শুভ্রা চ্যাটার্জি হাতব্যাগ খুলে চিঠিটা খুঁজতে লাগলেন। বুলবুল শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। ট্যাক্সিটা সমতল ছেড়ে পাহাড়ে উঠছে। রাস্তার পাশ দিয়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে এক দুর্দান্ত খরস্রোতা নদী। চিনি এই নদীটাকে। এর নাম লিদ্দার। শুধু পাহাড় কেন, এই নদীটাতেই যদি কেউ একবার পা পিছলে পড়ে যায়, বড় বড় পাথরের চাঙ্গারে ধাক্কা খেয়ে দু'এক মিনিটের মধ্যে মারা যাবে। তার মৃতদেহের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি চিঠিটা খুঁজে পেয়েছেন। একটা পিকচার পোস্টকার্ড। সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, পড়ো!

স্ত্রীকে লেখা কোন স্বামীর চিঠি, সেই স্ত্রীরই সামনে বসে পাঠ করা রীতিমতন অস্বস্তিজনক ব্যাপার। তবু আমাকে পড়তে হলো।

শুভ্রা,

এখানে আমার হোটেলের জানলা দিয়েই ছোটোখাটো একটা গ্লেসিয়ার দেখা যায়। ওটার নাম এখনো জানি না। পাহাড়ের ওপর থেকে অনেকখানি বরফ গড়িয়ে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গেছে। মাফলার আনতে ভুলে গেছি, একটা মাফলার সঙ্গে থাকলে বেশ ভালো হতো। বেশ শীত। আমার ঘরে শ্রীনিবাসন আছে। ওর ঠাণ্ডা লেগেছে। এখানে দুধ বেশ সস্তা।

ইতি

K. C. Chatterjee

চিঠিটার বৈশিষ্ট্য কিছুই খুঁজে পেলাম না আমি। সাধারণ চাকুরে লোকরা তো এই ধরনের চিঠিই লেখে। প্রথমে খানিকটা কবিত্ব করার চেষ্টা। তারপরই আজেবাজে কথা। বেশির ভাগ লোকই চিঠিতে কী লিখবে, সেরকম কথা খুঁজে পায় না। কোন রকমে জায়গাটা ভরায়। স্ত্রীর কাছে চিঠি, তাও ইংরিজিতে নাম সই! এই সব লোক কক্ষনো সাধু হয় না।

আমি বিনা মন্তব্যে চিঠিটা ফিরিয়ে দিলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বুঝলে?

—না।

—এটা অস্বাভাবিক মনে হলো না?

—না তো!

—দ্যাখো, চিঠিতে আমার বা বুলবুলের কোন উল্লেখ নেই। আমরা কেমন আছি সে কথা জানতে চায়নি, নিজে কেমন আছে বা কবে ফিরবে তাও কিছুই জানায়নি।

—পোস্টকার্ড তো, তাই ওসব আর লেখেননি।

—এরকম ভুল স্বাভাবিক নয়। তাছাড়া কথাগুলো কেমন ছাড়া ছাড়া, কোন মানে নেই। নেহাৎ যেন দায়সারা।

প্রত্যেক চিঠিতেই স্বামীদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভালোবাসা জানান বা তাদের কুশল সংবাদ নেওয়া একটা ডিউটির মধ্যে পড়ে কিনা, সে সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া কমলেশ চ্যাটার্জি মানুষটি কীরকম ছিলেন, তাও আমি জানি না।

বুলবুল মোচড় দিয়ে পাশ ফিরে শুলো। শুভ্রা চ্যাটার্জি তাকে আরো ঘুম পাড়াবার জন্য গায়ে মৃদু চাপড় দিতে লাগলেন। আমাকে বললেন, প্লিজ, এসব কোন কথাই যেন বুলবুল জানতে না পারে। ওকে আমরা এখনো কিছুই বলিনি।

—আপনার বাড়ির লোকেরা আপনাকে এরকম একলা আসতে দিল?

—আমি জোর করে এসেছি! মেয়েটা আমাকে ছেড়ে একলা থাকতে পারে না, তাই ওকে সঙ্গে আনতে হলো।

—আপনি ওকে ছেড়ে থাকতে পারতেন?

শুভ্রা চ্যাটার্জি ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, কখনো থাকিনি, তবু পারতাম বোধহয়। আমার শাশুড়ির কাছে রেখে আসা যেত।

কিছুটা দূরে রাস্তার ওপর একটা ভিড় জমে আছে। একটু আগে বাতাকুট ছাড়িয়ে এলাম। আমাদের ট্যাক্সিটা দেখে জনতার অনেকে হাত নেড়ে কী সব বলতে লাগল। কাছে আসবার পর বুঝলাম, ওরা বলছে আর যাবে না। ট্যাক্সি আর যাবে না।

আমি আর ট্যাক্সি ড্রাইভার দুজনেই নেমে এগিয়ে গেলাম সরেজমিন তদন্ত করতে। কাছে গিয়ে চক্ষু স্থির! একটা ছোটখাটো পাহাড় ভেঙে পড়ে আছে পথের ওপরে। সমস্ত জিনিসটা একটাই পাথর, ওপর থেকে গড়িয়ে নেমে এসেছে এবং তার তলায় চাপা পড়ে আছে একটা মিলিটারি ট্রাক। লোকের মুখে শুনলাম, ট্রাকটি খালি ছিল এবং এর চালকটি প্রায় দৈব উপায়ে বেঁচে গেছে। এত বড় পাথরটি কী করে সরানো হবে? দেখলে তো মনে হয় পঞ্চাশটা হাতিও এটাকে এক চুল নড়াতে পারবে না। আর একটা উপায় আছে, ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া।

পাথরটিকে মনে হয় জীবন্ত, এর মধ্যে একটা প্রবল বলশালিতার চিহ্ন আছে। যেন এই সব পাথরের মাঝে মাঝে উড়তে ইচ্ছে করে এদিক ওদিক। মৈনাক পর্বত যেমন উড়তে চেয়েছিল। ঐ পাথরটির রূপ আমাকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ করে রাখে। পাথরটি যখন গড়িয়ে নামছিল, তখন নিশ্চয়ই শব্দ হচ্ছিল শত শত বজ্রপাতের। সেই সময় আমি কাছাকাছি থাকলে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখতে পেতাম!

খবরের কাগজে পড়েছিলাম, একবার এই পহলগামেই হঠাৎ মেঘ ভেঙে পড়েছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্লাউড বার্স্ট। তাতে বেশ কিছু লোক মারা গিয়েছিল, ধ্বংস হয়েছিল কয়েকটি বাড়ি। নিশ্চয়ই একটি ভয়াবহ ঘটনা। তবু সেই খবরটা পড়ে আমার আফসোস হয়েছিল, ইস, কেন সেই সময়টাতে আমি ঐ জায়গায় উপস্থিত ছিলাম না। তাহলে আমিও দেখতে পেতাম অকস্মাৎ আকাশ থেকে মেঘ ভেঙে পড়ার মহাদুর্লভ দৃশ্য! কেমনভাবে মেঘ ভেঙে পড়ে, তা কি

সারা জীবনে আমার দেখা হবে না? জন্মেছি তো দেখবার জন্যই। মনে হয়, এখনো এ পৃথিবীর কিছুই দেখিনি।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটি হাতের তালু উলটে বলল, আউর ক্যা হোগা? আব লৌট চালিয়ে!

একপাশে খাড়া পাহাড়, আর এক পাশে ঢালু খাদ, এর মধ্য দিয়ে এখন ট্যাক্সি তো দূরের কথা, মানুষ গলাও দুঃসাধ্য। ফিরে এসে শুভ্রা চ্যাটার্জিকে ঘটনাটা জানালাম। উনি স্থিরভাবে শুনলেন। তারপর বুলবুলের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, বুলবুল ওঠো, এবার আমাদের নামতে হবে!

আমরা ফিরে যাব না শুনে ট্যাক্সি ড্রাইভার অবাক। তারপর সে ফরাসী কায়দায় কাঁধ ঝাঁকাল। তাকে সাড়ে তিনশো টাকা দিতে হবে, যাওয়া আসা মিলিয়ে।

আমি দরদাম করতে যাচ্ছিলাম, শুভ্রা চ্যাটার্জি হাত তুলে নিষেধ করলেন। তারপর ব্যাগ খুলতে খুলতে বললেন, আমি তোমাকে প্রায় জোর করে নিয়ে এসেছি, তুমি যখন তখন টাকা দেবার চেষ্টা করবে না। সব টাকা আমি দেব—আমি অনেক বেশি টাকা এনেছি।

আমি একটু ভর্ৎসনার সুরে বললাম, মেয়েদের মুখে টাকা পয়সার কথা শোনা আমি একদম পছন্দ করি না!

শুভ্রা চ্যাটার্জি হেসে ফেলে বললেন, ঠিক আছে, টাকার কথা উচ্চারণ করব না, চুপি চুপি দিয়ে দেব। তুমি আগে থেকে টাকা দিতে যেও না...।

একটু থেমে উনি আবার বললেন, প্লীজ!

আমি বললাম, আমি টাকা দেবার জন্য পেড়াপিড়িও করব না। কারণ তেমন বেশি টাকা নেই আমার।

ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাদের মালপত্তর নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। পথের ওপর সুটকেস নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড়।

৬

ঘোড়া পাওয়া গেল না। সব ঘোড়া পহলগামের ওদিকে। এদিকে কয়েকজন চাষীর কাছে ঘোড়া আছে বটে, কিন্তু সেগুলো শিক্ষিত নয়। হঠাৎ জোরে ছুটতে শুরু করলে আমরা নতুন লোক—মারা পড়ব। আমরা যদি বাত্তাকুটে ফিরে যাই, সেখানকার ফরেস্ট রেস্ট হাউসে থাকবার জায়গা পেতে পারি।

জনতার কয়েকজন আমাদের এই সব খবর জানাল। বাতাকুট ফেলে এসেছি মাইলখানেক আগে। সেখানে আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই শুভ্রা চ্যাটার্জির। যেমন করেই হোক পহলগামে পৌঁছোতে হবে। পহলগাম এখান থেকে মাত্র ছ'সাত মাইল দূর—যদিও পাহাড়ী রাস্তা, তবু ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। সমস্যা হচ্ছে মালপত্র নিয়ে। এই সুটকেস-ফুটকেস নিয়ে তো বেশিক্ষণ হাঁটা যাবে না।

আগেই লক্ষ্য করেছি, কুলি কথাটা এখানে চলে না। কুলি শব্দটার মধ্যে কেমন যেন হীনতা আছে। যে-কোন রেল স্টেশনে নেমে লোকে 'কুলি' 'কুলি' বলে চ্যাচায়, কিন্তু মালবাহকদের আজকাল পোর্টার বলাই রেওয়াজ। এটা তবু খানিকটা ভদ্রস্থ। খবরের কাগজে রিপোর্টার থাকে আর এরা পোর্টার, খুব বেশি তফাৎ নেই।

সে রকম একজন পোর্টারকে পাওয়া গেল। সে বারো টাকায় সব মালপত্র নিয়ে যেতে রাজি। উপরন্তু সে রাস্তা চেনে। আমাদের পহলগাম পৌঁছোবার এরকম গোঁয়ার্তুমি দেখে ভিড়ের লোকেরা খুব একটা অবাক হলো না। টুরিস্টদের নানারকম পাগলামি এদের গা-সহা।

খানিকটা পিছিয়ে এসে আমরা পাহাড়ের ওপরে ওঠার একটা সরু পথ পেলাম। বুলবুলকে আমি কোলে নিয়েছি, কিন্তু সে কিছুতেই কোলে থাকবে না, সে একলা একলা দৌড়ে দৌড়ে যেতে চায়। তাকে জোর করে চেপে ধরে রাখতে হয়েছে। বৃষ্টিতে পাথর পিছল হয়ে আছে, হঠাৎ কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ আমার মনে মনে একটু হাসি পায়। এত দূরের একটা জায়গায় আমি প্রায়-অচেনা এক মহিলার ছোট মেয়ে কোলে নিয়ে সামলাচ্ছি ! জীবনে কক্ষনো আমি এরকম কাজ করিনি। আমাকে অবিকল কোন ছোটমামার মতন দেখাচ্ছে।

একটু পরেই আমরা দেখতে পেলাম রাস্তার ওপর পড়ে থাকা সেই পাথরের চাঁইটাকে। তার নীচে চাপা পড়া মিলিটারি ট্রাকটা যেন ডিঙ্কি টয়। সেখানকার মানুষজন আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। সব পুতুল।

এখানে উপড়ে পড়ে আছে কয়েকটি পাইন গাছ। আশ্চর্য, পাথরটার নেমে যাওয়ার পথের নিশানা নেই। আমি ভেবেছিলাম এখানকার গাছপালা ঘাস সব প্লেন হয়ে মিশে থাকবে মাটিতে, তা তো নেই। পাথরটা কি হঠাৎ লাফ দিয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ল ! সাধে কি মনে হয়েছিল এই সব পাথর মাঝে মাঝে ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়ায় !

জায়গাটা সাবধানে পার হয়ে একটু বাদেই আমরা আবার নীচের পাকা রাস্তায় নামলাম। পোর্টারটি অবশ্য বলেছিল, ওপরের পাহাড়ী পথ দিয়ে গেলে অনেক শর্টকাট হতে পারে, কিন্তু তাতে রাজি হইনি। এখানে বুলবুলকে কোল থেকে

নামিয়ে দেওয়া যায়। বুলবুলকে কোলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইতিমধ্যেই আমি হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি যাতে সেটা না বুঝতে পারেন তাই আমাকে বড় বড় নিশ্বাসও গোপনে ফেলতে হয়েছে।

অবশ্য খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। শীতের জায়গার এই সুবিধে, পরিশ্রম করলেও ক্লান্ত হতে হয় না সহজে। শরীর থেকে ঘাম বেরোয় না, এটা কি একটা কম কথা! আমি শীত ভালোবাসি। আমি বর্ষাও ভালোবাসি। তা হলে কি আমি গ্রীষ্মকে কম ভালোবাসি? তা-ও তো নয়। না, না, কলকাতার দারুণ গরমের দুপুরও আমার খুব পছন্দ।

আকাশে ঝকঝক করছে রোদ, অথচ উত্তাপ নেই। দু'তিন দিন আগে এদিকে খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে শুনেছি, দুর্ঘটনাটিও ঘটেছে তার মধ্যে। দিনের বেলা। এখন সেসবের আর চিহ্নমাত্র নেই। চারপাশে প্রকৃতি আবার শান্ত সুন্দর হয়ে আছে। সামনের পাহাড়শ্রেণী ক্রমশ গভীর, গভীরতর হয়ে উঠছে, যেন এর কোন শেষ নেই। হিমালয়কে বলা যায় দিগন্ত-বিরোধী। হিমালয়ের মধ্যে এলে শুধু হিমালয়কেই দেখতে হবে, আর কিছু না, এমনকি আকাশও না।

অনন্ত নাগ নামটা বার বার ঘোরাফেরা করছে মনের মধ্যে। কথাটা কি আসলে অনন্ত নগ? নগ মানে পাহাড়। তা হলেই ঠিক যেন মানায়। এখানে অনেক নামই তো এরকম বদলেছে। একটা জায়গাকে সবাই বলে মাটন, আসলে জায়গাটার নাম মার্তণ্ড, কারণ ওখানে সূর্যের মন্দির আছে।

শুভ্রা চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞেস করলাম, হাঁটার অভ্যেস আছে তো?

তিনি সংক্ষেপে বললেন, না।

—তাহলে যদি কষ্ট হয় বলবেন, আমরা একটু থেমে বিশ্রাম নিতে পারি।

—কষ্ট হচ্ছে না।

—এক সময় তো লোকে এই পথ দিয়ে হেঁটেই যাতায়াত করত। এটা অনেকদিনের পুরোনো রাস্তা।

—এই রাস্তা দিয়েই তো পহলগাম হয়ে অমরনাথ যায় সবাই, তাই না?

—শুধু অমরনাথ কেন? শুনেছি যোজিলা পাস পর্যন্ত যাওয়া যায়।

—স্বামী বিবেকানন্দ সিস্টার নিবেদিতাকে নিয়ে এই রাস্তা দিয়েই তো হেঁটে গিয়েছিলেন?

আমি একটু চমকে গেলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি স্বামী বিবেকানন্দর ভক্ত নাকি?

আমিও হেসে বললাম, আমি খাঁটি আর্য। ভক্তি জিনিসটা আমার মধ্যে নেই।

—কেন, আর্য হলে বুঝি ভক্তি থাকতে নেই?

—না। ভক্তিবাদ এসেছে দক্ষিণ ভারত থেকে। আর্যরা দুর্গা বা সরস্বতীকে দেবীই বলতেন, মা বলতেন না।

—আমার স্বামী খুব বিবেকানন্দ ভক্ত।

আমি চুপ করে গেলাম। উনি আবার বললেন, তখন কী একটা মন্দিরের কাছে তুমি হঠাৎ সিস্টার নিবেদিতার নাম বললে, তাতে আমিও চমকে উঠেছিলাম। কমলেশ আমার সঙ্গে থাকলে ঠিক এইরকম কথাই বলত। ওর এই সব জিনিস মুখস্থ।

আমি বললাম, আমি অবশ্য এত সব কিছু জানি না। কী একটা বইতে পড়েছিলাম যে সিস্টার নিবেদিতা এদিকে এসেছিলেন তাই মনে পড়ল আর বলে দিলাম।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, কমলেশের মুখে অনেকবার এই সব গল্প শুনেছি। স্বামী বিবেকানন্দ সিস্টার নিবেদিতাকে অমরনাথের মন্দিরে নিয়ে তাঁকে শিবের কাছে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী নিবেদিতাকে কী দীক্ষা দিয়েছিলেন, তুমি জানো? উনি কিন্তু নিবেদিতাকে সন্ন্যাসিনী করেননি, শুধু ব্রহ্মচারিণী করেছিলেন।

আমি বললাম, নিবেদিতা সন্ন্যাসিনী হবেন কী করে? উনি তো পরে অনেক পলিটিকস-টলিটিকস করেছিলেন, বোমা-পিস্তলের ছেলেদের প্রেরণা দিয়েছিলেন শুনেছি।

—স্বামীজী হয়তো সেসব আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তাঁকে সন্ন্যাসিনী করেননি। ব্রহ্মচারিণী করাই যথেষ্ট মনে করেছিলেন। নিবেদিতার অবশ্য এজন্য দুঃখ ছিল খুব।

—স্বামীজীর সঙ্গে কি নিবেদিতার প্রেম ছিল?

—ছিঃ!

—আপনিও বুঝি একজন মরালিস্ট? যাঁকে ভক্তি করা হয়, তাঁর প্রেমের কথা উচ্চারণ করতে নেই!

—ধুৎ বোকা! প্রেম থাকলে কী আর কেউ তার প্রেমিকাকে ব্রহ্মচারিণী হতে বলে?

—এ অন্য ধরনের প্রেম। দান্তের সঙ্গে বেয়াত্রিচের যেমন ছিল, তারাও তো কেউ কারুর অঙ্গ স্পর্শ করেনি কোনদিন।

—এই সম্পর্কটার নাম প্রেম না হয়ে অন্য কিছু হলেই ভালো হয়। বাংলা ভাষায় শব্দ এত কম! নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে পিতা কিংবা রাজা বলে সম্বোধন করতেন।

—যাক গে! স্বামী বিবেকানন্দর প্রসঙ্গটা কেন এল?

—কমলেশ ওঁর ভক্ত, সেই জন্য হঠাৎ মনে এল। আমার মনে হয়, কমলেশও অমরনাথ যাবার চেষ্টা করেছিল।

—অসম্ভব! এ সময় অমরনাথ যাবার রাস্তা খোলা থাকে না। রাস্তা খুলবে জুলাইয়ের শেষ দিকে বা আগস্টে। এখন তো সবে মে মাস শুরু হয়েছে।

—রাস্তা খোলা না থাকলেও কেউ চুপি চুপি চলে যেতে পারে না? কারুকে ঘুষ-টুস দিয়ে!

আমি এবার হেসে উঠলাম। রাস্তা খোলা থাকে না বলতে উনি বুঝেছেন রাস্তার মাঝখানে কোন গেট তালা বন্ধ আছে। কেউ চুপি চুপি সেই গেট টপকে পালাবে।

হাসতে হাসতেই বললাম, রাস্তা খোলা থাকে না মানে যাওয়াই যায় না। সমস্ত রাস্তা বরফে বুজে গেছে। কেউ যেতেই পারবে না।

—তবু যদি কেউ যাবার চেষ্টা করে? এত দূর এসেও কি কমলেশ স্বামীজীর স্মৃতিজড়ানো একটা তীর্থস্থান না দেখে ছাড়বে?

—সেরকম ইচ্ছে থাকলেও সেখানে যাবার এখন কোন উপায় নেই। সব তীর্থস্থানে যাবারই তো একটা বিশেষ সময় আছে। অমরনাথের বিখ্যাত যে বরফের শিবলিঙ্গ সেটাও তো এখন দেখা যাবে না। এখন সবই বরফ! জুলাই মাস থেকে বরফ গলে যায় চারদিকে, তখন একটা গুহার ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে, গুহার ভেতরে সেই জলই জমে বরফ হয়ে একটা শিবলিঙ্গের মতন হয়—লোকে সেটাকেই অপ্রাকৃত ব্যাপার বলে পুজো করে। আপনার স্বামী এপ্রিল মাসে সেখানে যাবার চেষ্টা করবেন কেন? তিনি নিশ্চয়ই নির্বোধ ছিলেন না?

—ছিলেন? তুমিও অতীতকাল দিয়ে কথা বলছ? অর্থাৎ তুমিও ধরে নিয়েছ সে বেঁচে নেই?

আমি একটু লজ্জিত হয়ে পড়লাম। সত্যি কথাটা তাই, আমি সেই রকমই ধরে নিয়েছি। একটা মানুষ এমনি এমনি হারিয়ে যায় না সহসা। বরং মৃত্যুই অনেককে হঠাৎ হঠাৎ টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু এই মহিলাকে সে কথা জানাবার দায়িত্ব আমার নয়!

একটু তো তো করে বললাম, না, মানে, ওটা হঠাৎ মুখে এসে গেছে, সে কথা আমি বলতে চাইনি। তবে, যা বলছিলাম, এই সময় কেউ অমরনাথ যায় না, আমি যদ্দুর জানি। একা যাবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেউ তবু জোর করে যাবার চেষ্টা করেছে কিনা তা একটু চেষ্টা করলেই জানা যায়। সরকার থেকে নিশ্চয়ই সে চেষ্টা করা হয়েছে।

—তবু আমি একবার খোঁজ নিতে চাই।

—নিশ্চয়ই, আমরা ওখানে গিয়ে খবর নেবো।

বুলবুল খানিকটা দৌড়োদৌড়ি করেই ক্লান্ত। এক সময় সে আমার কোলে থাকতে চাইছিল না, এখন মাঝে মাঝেই এসে বলছে, একটু কোলে নাও, ও কাকু, একটু কোলে নাও।

শুভ্রা চ্যাটার্জি নিজেই কিছুক্ষণ মেয়েকে কোলে নিয়ে হাঁটলেন। আমি লক্ষ্য করলুম, উনিও খুব গোপনে বড় বড় নিশ্বাস ফেলছেন। অর্থাৎ উনিও জানাতে চান না আমাকে ওঁর ক্লান্তির কথা।

রাস্তার ধারে ধারে হোটেলের বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং দেখা দিতে শুরু করেছে। তার মানে আর বেশি দূর নেই। এর মধ্যে একবার মাত্র আমরা বিশ্রাম নিতে বসেছি। পোর্টার ছেলেটির কিন্তু একটুও ক্লান্তি নেই। মাথায় দুটি সুটকেস আর হাতে একটা ঝুড়ি ঝুলিয়ে সে দিব্যি হেঁটে যাচ্ছে।

পহলগামে এসে রীতিমতন হকচকিয়ে গেলাম। আগের বার এসে দেখেছিলাম একটা চুপচাপ শুনশান ছোট জায়গা। রাস্তার পাশে কয়েকটি দোকান আর দু চারটি হোটেল। এবং দুপা বাড়ালেই চারপাশ থেকে পাহাড় ঘিরে ধরে।

এখন একেবারে জমজমাট ব্যাপার। বড় বড় হোটেল, টুরিস্ট দপ্তরের শাখা, ব্যাঙ্ক আর বহুরকমের দোকানপাট। পেল্লায় পেল্লায় হোটেল। এক একটা হোটেলে এমনকি চীনে খাবার এবং নাচের ফ্লোর পর্যন্ত আছে। সব কিছু তো বদলাবেই। এমনকি পহলগাম শহরটিরও বড় হবার অধিকার আছে।

জায়গাটা মানুষের ভিড়ে গিসগিস করছে। অথচ এর উল্টোটাই ভেবেছিলাম! একটু বাদেই অবশ্য এত ভিড়ের কারণ বুঝতে পারা গেল।

পহলগামে অধিকাংশ ভ্রমণকারীই সকালে এসে বিকেলে ফিরে যায়। সকাল থেকে পঞ্চাশ ষাটটা বাস ভর্তি করে লোক আসে, তারা ঘোড়ার পিঠে চেপে কাছাকাছি কোথাও ঘুরে বেড়ায়, দুপুরে হোটেলে খেয়ে আবার চারটের সময় ফেরার বাস ধরে। এখানে কয়েকদিন থেকে যেতে আসে শুধু তারাই, যারা নিছক দৃশ্যলোভী নয়, যারা ভালোবাসে পাহাড়ের বিশাল নিস্তব্ধতা।

কিন্তু তিনদিন আগে যে দৈনন্দিন ভ্রমণকারীরা এসেছিল, তারা অনেকেই ফিরতে পারেনি। পথের ওপর দুর্ঘটনা হয়েছে দুপুরবেলা, বিকেলের সব বাস এদিকে আটকে গেছে। তার ফলে প্রচুর অনিচ্ছুক লোক থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে এখানে। হোটেলগুলো সব ভর্তি। আমরা ভুল সময়ে এসে পড়েছি এখানে। অবশ্য শুভ্রা চ্যাটার্জির তো দিনক্ষণ ঠিক করে আসার মতন মনের অবস্থা নয়!

আমাদের দেখে সবাই অবাক। এই তিনদিনের মধ্যে এখান থেকে কয়েকজন

পায়ে হেঁটে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছে বটে কিন্তু নতুন লোক একজনও এদিকে আসেনি। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির মাঝখান দিয়ে আমরা নিঃশব্দে হেঁটে গেলাম।

একটাই সোজা রাস্তা, তার দুদিকে যত হোটেল আর দোকানপাট। আমরা দুপাশের হোটেলে জিজ্ঞেস করতে করতে যাচ্ছি। কোথাও ঘর খালি নেই। অনেক হোটেলেই এক ঘরের মধ্যে সাত আটজন বাধ্য হয়ে গাদাগাদি করে আছে। আমাদের সঙ্গে মালপত্র রয়েছে, এ নিয়ে বেশিক্ষণ ঘোরাঘুরি করা যায় না।

শুভ্রা চ্যাটার্জি একটু নিরাশভাবে বললেন, থাকার জায়গা না পাওয়া গেলে তো খুব মুশকিল হবে। বিশেষ করে বুলবুলের জন্য—

আমি বললাম, একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। হোটেল না পাওয়া গেলে, তাঁবু আছে। তাঁবুতেও চমৎকার থাকা যায়।

বুলবুল জিজ্ঞেস করল, তাঁবু কী?

আমি বললাম, কাপড়ের তৈরি বাড়ি। ছবিতে দেখোনি, সৈন্যরা থাকে?

বুলবুল বলল, আমি তাঁবুতে থাকব। হোটেলে থাকব না, তাঁবুতে থাকব।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, দাঁড়াও। দুষ্টুমি করো না। সেখানে বাথরুম-টাথরুমের অসুবিধে...

শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটি বেশ বড় নামকরা হোটেল। সেখানে শেষ চেষ্টা করলাম। ম্যানেজার বললো, হ্যাঁ, পাওয়া যাবে ঘর, দোতলায়, হিল ফেসিং।

আমি বললাম, আমাদের দুটি ঘর চাই। পাশাপাশি হলে ভালো হয়, না হলেও ক্ষতি নেই।

ম্যানেজার অবাক হয়ে বলল, দুটি ঘর? কিন্তু আমাদের তো একটাই ঘর খালি আছে! আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না—ডাবল বেড রুম, আপনাদের বাচ্চার জন্য যদি আলাদা খাট চান।

আমি শুভ্রা চ্যাটার্জির দিকে তাকালাম। এ কথা আমি একটু আগেই ভেবেছি। অনেকেই আমাদের এরকম ভুল করবে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, আমাদের দুটি ঘরই চাই, পাশাপাশি হলে ভালো হয়।

—আর তো নেই। কোথাও এখন ঘর পাবেন না।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, তবে চলো, আগে তাঁবুগুলো দেখে আসি।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আমি বললাম, আর একটা কাজ করা যায়। আপনি আর বুলবুল এই হোটেলে থাকুন, আমি অন্য কোথাও একটা জায়গা খুঁজে নেব। আমার একার পক্ষে জায়গা পেতে অসুবিধে হবে না।

—তা হয় না।

—কেন হবে না? ছোট্ট জায়গা, যে-কোন সময়েই তো দেখা হতে পারে।

—তোমার জায়গা ঠিক না হলে আমি এখানে আসব না। তাঁবুতে কি খুব অসুবিধে?

—অনেকের কাছে হোটেলের চেয়ে তাঁবুই বেশি ভালো লাগে।

—কোথায় তাঁবু, আগে গিয়ে দেখি।

—তাঁবু তো আছে দোকানে। নদীর ধারে আমরা যেখানে বলব, সেখানেই তাঁবু খাটিয়ে দেবে। সেখানে খাট, বিছানা, বালিস, চেয়ার টেবিল এমনকি ড্রেসিং টেবলও পাওয়া যেতে পারে। আলাদা বাথরুম, সার্ভিস প্রিভি—সবচেয়ে ভালো তাঁবু হচ্ছে সুইস কটেজ টাইপ—দেখতে সুন্দর।

—তা হলে আমরা তাঁবুতেই থাকব। সেখানে কাছাকাছি মানুষজন অন্তত থাকবে না। খাওয়া?

—শহরের হোটেলে। কিংবা তাঁবুতেও রান্নার ব্যবস্থা করা যায়। এরা স্টোভ, ডেচকি এমনকি কাপ ডিস পর্যন্ত ভাড়া দেয়।

—তাহলে আর শুধু শুধু হোটেল খুঁজে মরছি কেন এতক্ষণ?

এখানে অনেকগুলো তাঁবু-সরঞ্জামের দোকান। যারা দূরে দূরে মাছ ধরতে যায়—তারা এখান থেকেই তাঁবু ভাড়া নেয়। অমরনাথের যাত্রীদেরও অনেক সময় তাঁবু লাগে। একটা দোকানে এসে আমরা সুইস কটেজ টাইপ তাঁবু আর যা যা জিনিসপত্র লাগবে, হিসেব করে অর্ডার দিলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম নদীর ধারে জায়গা নির্বাচন করতে।

শহর ছাড়িয়ে এসে লিদ্দার নদীর প্রথম ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে আমার একটা কথা মনে পড়ল। আপন মনেই বললাম, আমি একদম বোকা! ঠিক সময়ে আমার কিছু মনে পড়ে না!

শুভ্রা চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কী হলো?

—তাঁবুরই যখন অর্ডার দিলাম, তখন দুটো তাঁবুর কথা বলা উচিত ছিল। আপনারা দাঁড়ান, আমি বলে আসছি।

—কেন, দুটোর কী দরকার আছে? একটাতে জায়গা হবে না?

—জায়গা হবে। কিন্তু হোটেলের এক ঘরে যদি না থাকতে পারি, তাহলে এক তাঁবুতেই বা থাকব কী করে?

শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর নিজেই চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে না হয়। এখন তো একটাতেই উঠি আগে।

—না, না, কোন অসুবিধে তো নেই। আমি অর্ডার দিয়ে আসছি, ওরা এক সঙ্গেই দুটো খাটিয়ে দিয়ে যাবে।

ওদের দাঁড় করিয়ে রেখে আমি দৌড়ে ফিরে গেলাম। তাঁবুর দোকানে তাঁবুর অভাব নেই, আর একটিও পাওয়া যাবে। এখুনি ওদের লোকজন গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দেবে।

আবার সেই ব্রীজটার কাছে এসে দেখলাম শুভ্রা চ্যাটার্জি নদীর ধারে একটা পাথরের ওপর অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছেন, আর বুলবুল জলের একেবারে ধারে গিয়ে নুড়ি কুড়োচ্ছে। আমি নেমে গিয়ে বললাম, কী করছেন কি ? মেয়েকে একলা ছেড়ে দিয়েছেন ?

উনি চোখ তুলে বললেন, ঐ তো বুলবুল !

—ঐ জলের মধ্যে একটু নামলে কী হবে জানেন ? আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

—বুলবুল শিগগির উঠে এসো।

—এই তাঁবুতে থাকার এই এক বিপদ। বাচ্চাটাচ্চা থাকলে খুব সাবধানে থাকতে হয়।

—আমি বাচ্চাদের সব সময় তুতু-পুতু করে রাখা পছন্দ করি না।

—সে খুব ভালো কথা, কিন্তু এই নদী অতি সাঙ্ঘাতিক।

বুলবুলের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললাম, কক্ষনো জলে পা দেবে না। তাহলে কিন্তু মারব ভীষণ।

বুলবুল বলল, ইস্। তাহলে আমিও তোমাকে মারব।

নদীর ধারে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা তাঁবু পড়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে একটা সেনা-ছাউনি। কিন্তু রঙীন পোশাক পরা নানা জাতের নারী পুরুষ দেখলেই সে ভ্রম কেটে যায়। অসংখ্য দড়ি ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে হাঁটতে হয়, বুলবুল অনবরত লাফাচ্ছে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, আমরা এই ভিড়ের মধ্যে থাকতে চাই না। কোন ফাঁকা জায়গায় যাওয়া যায় না ?

—তা যায়। তবে নদীর এপারেই থাকতে হবে।

—তাই থাকব, তবে খানিকটা দূরে।

হঠাৎ এক তাঁবু থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন, আপনারা আজকে এলেন ?

আমরা যে বাঙালি সে সম্পর্কে মহিলা কোন সংশয়ই রাখেননি, সরাসরি এসে প্রশ্ন করেছেন। আমি একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। দু' চারজন বাঙালির সঙ্গে

এই সব জায়গায় দেখা হবেই। এবং তারা খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ধরে নেবে। এর মধ্যে বুলবুল যদি হঠাৎ আমাকে নীলু-কাকু বলে ডেকে বসে, তা হলেই ব্যাপারটা আরো জমবে। অন্যরা এর মধ্যে বেশ একটা রসালো কেচ্ছার সন্ধান পেয়ে যাবে।

অবিবাহিত নারী-পুরুষও নিশ্চয়ই অনেক সময় এই সব জায়গায় স্বামী-স্ত্রী সেজে আনন্দ করতে আসে। সেটা কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু সঙ্গে একটা বাচ্চা? বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে অবৈধ ফুর্তি করতে আসে কেউ?

শুভ্রা চ্যাটার্জি শুকনোভাবে কয়েকটা কথা বললেন ভদ্রমহিলার সঙ্গে। আমি বুলবুলকে নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তবু ভদ্রমহিলা কাছে এসে বুলবুলকে আদর করে গাল টিপে বললেন, বাঃ, ভারী মিষ্টি মেয়েটি! তোমার নাম কী? আমারও একটা ছেলে আছে এই বয়েসী। পিকলু, পিকলু, এদিকে এসো—

অর্থাৎ ভদ্রমহিলা ভাবছেন, তাঁর ছেলের জন্য একটি খেলার সঙ্গী পাওয়া গেল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা এই কাছাকাছিই থাকুন না, বেশ গল্প করা যাবে। আমাদের তো এখানে কতদিন থাকতে হবে তার ঠিক নেই, কবে যে রাস্তা খুলবে!

আমি যেন খুব একটা গম্ভীর মানুষ, অচেনা মেয়েদের মুখের দিকেও তাকাই না, এই ভাব দেখিয়ে নদীর দিকে চেয়ে রইলাম।

শুভ্রা চ্যাটার্জি এগিয়ে এসে বললেন, আগে সব জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে আসি বরং, চলো—

ভদ্রমহিলাকে কাটিয়ে, সব কটা তাঁবু ছাড়িয়ে আমরা বেশ দূরে চলে এলাম। এখানে দুটো পপ্‌লার গাছ রয়েছে, তাতেও খানিকটা আড়াল। অন্য কেউ এত দূরে তাঁবু ফেলেনি, তার কারণ শহরে খেতে যাবার জন্য অনেকটা হাঁটতে হবে। এখানে নদীর ধারে অনেকগুলো বড় বড় পাথর ফেলা, তাতে স্রোত কিছুটা ঘুরে গেছে, একটুখানি জলে পা দিলেই টেনে নেবার সম্ভাবনা খুব কম। লিদ্দার নদীতে সব সময় সমুদ্রের মতন শব্দ। আর জল এত ঠাণ্ডা যে মনে হয় যেন ছুরির ধার। শেষনাগ পর্বতের বরফ-গলা এই নদী, দুর্দান্ত এর রূপ।

জায়গাটা আমাদের পছন্দ হয়ে গেল বেশ। পাথরের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু বাদেই সমস্ত মোটঘাট নিয়ে তাঁবুর দোকান থেকে চারজন লোক এসে গেল।

ব্যবস্থা খুব পাকা। এখানে পুরো মেঝেতে পাতা হলো কাঠের পাটাতন, তার ওপর খাট বিছানা। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব কিছু সাজানো হয়ে গেল। কেন আমরা মাত্র আড়াইজন লোক হয়েও দুটো তাঁবু নিচ্ছি, সে ব্যাপারে এদের দারুণ

কৌতূহল। বার বার বলছে, একটা তাঁবুতেই তো খুব ভালো ব্যবস্থা হয়ে যেত, সাব? কেন দুটো তাঁবু নিচ্ছেন?

অর্থাৎ কেন আমরা বোকার মতন বেশি পয়সা খরচ করছি, সেটাও ওরা বুঝতে পারছে না। ওদের বোঝানোও যাবে না।

ওদের একজনকে শহরে পাঠিয়ে দিলাম কিছু খাবার নিয়ে আসবার জন্য। বাকি দুজনেরও কাজ শেষ হয়ে গেছে, একজন শুধু আমার তাঁবুতে বসে পেরেক ঠুকছে। লোকটি খুব শক্তিশালী, কিন্তু মুখটা বোকা ধরনের।

আমি খাটের ওপর বসে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী?

সে বলল, কিষণ।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিষণ আবার কী অদ্ভুত নাম, এখানে এসে এ পর্যন্ত তো একজনেরও এরকম নাম শুনিনি।

সে আবার বলল, হ্যাঁ, সাব। কিষণ। আপলোগ যিসকা কৃষণা বলতা হ্যায়!

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, সে বুঝিয়ে দিল, হাম হিন্দু হ্যায়, সাব।

কাশ্মীরে এসে এই প্রথম একজন সাধারণ হিন্দু দেখলাম। মানুষের ধর্ম নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। তবু নিছক সমাজতাত্ত্বিক কৌতূহলেই জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ঐ দোকানে কাজ করো?

সে বলল, না, সাব, আমি নোক্‌র! আমার বাড়ি ছিল গিলগিট।

অর্থাৎ এই লোকটি একজন রিফিউজি। জীবনে যে কত রকম রিফিউজি দেখলাম!

কাশ্মীরের বেশির ভাগ লোকই সিগারেট-প্রিয়। একে একটা সিগারেট দিয়ে বললাম, আচ্ছা কৃষাণ, তুমি একটা খবর দিতে পারো? আমাদের একজন চেনা লোক, কমলেশ চ্যাটার্জি—তিনি এখানে এসেছিলেন কিছুদিন আগে, তারপর আর তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর কী হয়েছিল, বলতে পার?

কৃষাণ বলল, হাঁ সাব, শুনেছি, আগের মাসে একজন বাঙ্গালী এখানে মারা গেছে।

—মারা গেছে? কী হয়েছিল তার?

—তা জানি না। সবাই বলে মারা গেছে।

বোঝা গেল, লোকটির কৌতূহলবৃত্তি তেমন তীক্ষ্ণ নয়। মারা গেছে এইটুকুই শুনেছে, আর কিছু জানবার আগ্রহ নেই। এর কাছ থেকে বিশেষ কিছু খবর পাওয়া যাবে না।

'সাব' ডাক শুনে তাঁবুর বাইরে এলাম। লম্বা কালো আলখাল্লা-পরা একজন

দীর্ঘকায় বৃদ্ধ এসে দাঁড়িয়ে আছে। সৌম্য মুখ, কোন সন্তের মতন চেহারা। এই লোকটিই তাঁবুর দোকানের মালিক। সে প্রসন্ন গলায় বলল, সাব, আপনারা জায়গা খুব ভালো বেছেছেন। লোকে এত দূরে আসতে চায় না—কিন্তু এখানে শুয়ে থাকলে মানুষজনের গলার আওয়াজ শুনতে হবে না, শুধু নদীর শব্দ শুনবেন। রাত্রে শুয়ে শুয়ে নদীর আওয়াজ শোনা যে কী আরামের, মন একেবারে সাদা হয়ে যায়।

লোকটির নাম মোহম্মদ ইউনুস। সে আরো বলল, এখানে কোন রকম অসুবিধে হলে আমি যেন তাকে জানাই। আমাদের ভালো লাগাটাই বড় কথা। টাকা পয়সা তো এই আছে, এই নেই।

প্রত্যেক তাঁবুতেই একটা ছোট টেবল আর দুটো চেয়ার দেওয়া হয়েছে। আমি একটা চেয়ার দেখিয়ে বললাম, ইউনুস সাহেব, বসুন। একটু গল্প করা যাক।

একথা সেকথার পর আমি কমলেশ চ্যাটার্জির প্রসঙ্গটা তুললাম। সে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ ভঙ্গিতে চুপ করে থেকে তারপর বলল, সাব, কত মানুষই তো বিছানায় শুয়ে মরে। এর মধ্যে কেউ যদি পাহাড়ের কোলে গিয়ে মরে, সে তো কত বড় সৌভাগ্য!

—কিন্তু ঐ লোকটি যে মারাই গেছে, তার কোন প্রমাণ আছে? মৃতদেহটা তো কেউ দেখেনি!

—প্রতি বছরই একজন দু'জন লোককে পাহাড় ডেকে নেয়। পাহাড় তাদের দেহকে ফুল-লতা-পাতা দিয়ে সুন্দর করে ঢেকে রাখে। আর কেউ তাদের দেখতে পায় না। আমার যদি শক্ত কোন অসুখ হয়, আমিও বিছানায় শুয়ে মরব না। পাহাড়ের মধ্যে হারিয়ে যাব।

লোকটি অতি সরল হিন্দীতে কথা বলছিল, বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। তাঁবুর দোকান খুলে বসলেও এ আসলে একজন দার্শনিক।

আমার প্রথম দুটি অনুসন্ধান থেকেই পাওয়া গেল শূন্য ফল। কমলেশ চ্যাটার্জির খোঁজখবর আর কী ভাবে নেওয়া যায়, বুঝতে পারলাম না। এখানকার লোকজনের কাছ থেকে যদি কিছু সন্ধান না পাওয়া যায় তাহলে পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করার কোন মানেই হয় না। যোজন যোজনব্যাপী বিশাল গিরিমালা—এর মধ্যে যদি কেউ হারিয়ে যায়, আর কোন মানুষের চোখ হয়তো সত্যিই তাকে কোনদিন দেখবে না।

বুলবুল এসে আমাকে পাশের তাঁবুতে ডেকে নিয়ে গেল। এই তাঁবুটা অনেক বড়, এর পেছন দিকে স্নানের জায়গা পর্যন্ত আছে।

খাবার এসে গেছে, শুভ্রা চ্যাটার্জি সেগুলো তিনটে প্লেটে ভাগ করে দিয়ে

বললেন, বসে পড়ো। কিন্তু খাবার জল? আমার সঙ্গে ফ্লাস্কে একটুখানি আছে—

—এই নদীর জলই খেতে হবে?

—না ফুটিয়ে? কত রকম নোংরা থাকে—

—যে নদীতে এত স্রোত, তাতে কোন নোংরা থাকে না। আর এই জল আসছে পাহাড়ের ওপরের বরফ থেকে, তার চেয়ে পরিষ্কার আর কী হতে পারে?

তাঁবুওয়ালারা দুটো বড় বালতি দিয়ে গেছে। সে দুটো নিয়ে গিয়ে আমি নদী থেকে জল তুলে নিয়ে এলাম। তারপর খাওয়া। রুটি আর মাংস, চমৎকার স্বাদ। বুলবুল ঝালের চোটে উঃ আঃ করতে লাগল। ওর মা কয়েকটা টফি বার করে দিলেন ওকে।

খাওয়া শেষ করে আমি বললাম, আপনারা এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন। বিকেলে বেরুনো যাবে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, আমি এক্ষুনি বেরুব। একবার সব জায়গায় খোঁজ খবর নেওয়া দরকার।

—এক্ষুনি যেতে হবে? বিকেলে গেলে হতো না? এখন একটু ঘুমিয়ে নিন বরং।

—আমি কি এখানে নিশ্চিন্তে ঘুমোবার জন্য এসেছি? তা কি আমার পক্ষে সম্ভব?

—কিন্তু বুলবুল, ও বেচারা এখন হেঁটে হেঁটে আবার অতটা দূর যাবে?

—না, বুলবুল থাকবে। আমি একাই যাব।

—আর আমি এখানে বসে বসে বুলবুলকে পাহারা দেব?

—পাহারা দিতে হবে না, ও এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে। তুমি ততক্ষণ যদি এই তাঁবুতে থাক—

বলতে বলতে উনি থেমে গেলেন। তারপর আবার ইংরিজিতে বললেন, বুলবুলকে তো সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে না ওর সামনে সব কথা বলা যাবে না। আমি জানি, আমি স্বার্থপরের মতন ব্যবহার করছি তোমার সঙ্গে, তোমাকে বাচ্চা সামলাবার কাজ দিচ্ছি—

এর উত্তরে কী বলা উচিত? বলা উচিত, হ্যাঁ সত্যিই আপনি আমার সঙ্গে স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করছেন? আপনি আমাকে এখানে শুধু শুধু টেনে এনেছেন? চাকরের কাজ করাবার জন্য?

আমি বললাম, আপনি ঘুরে আসুন। এসব কথা পরে হবে। চিনতে পারবেন তো? রাস্তা তো সোজা একটাই।

খোলা চুলে কয়েকবার চিরুনি চালিয়ে, মাঝখানে একটা রবার ব্যাণ্ড বেঁধে উনি চটপট তৈরি হয়ে নিলেন। তারপর বুলবুলের গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বললেন, মামণি, তুমি কাকুর সঙ্গে থাক আমি আসছি একটু বাদেই—

শুভ্রা চ্যাটার্জি যাবার পর আমি তাঁবুর দরজায় দড়ি বেঁধে বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে। যদি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ি, বুলবুল যাতে বেরিয়ে না পড়তে পারে। তারপর বুলবুলকে পাশে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বুলবুল প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করল, কাকু, আমার বাপী কোথায়?

আমি শিউরে উঠলাম একেবারে। শুভ্রা চ্যাটার্জি আমাকে সবচেয়ে শক্ত একটা কাজ দিয়ে গেছেন। একটা শিশুর কাছে কী করে মিথ্যে কথা বলব আমি? জীবনে সব সময় সত্যি কথা বলেছি, এমন অহংকার আমার নেই। বেঁচে থাকতে গেলে দু'-চারটে মিথ্যে, অন্তত অনেক সময় সত্যকেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অন্যরকমভাবে বলতেই হয়। কিন্তু একটা বাচ্চা মেয়ের কাছে মিথ্যে বলতে আমার দারুণ কষ্ট হয়।

বুলবুল আবার ঐ একই কথা জিজ্ঞেস করল। উত্তর না শুনে ও ছাড়বে না।

আমি বললাম, তোমার বাপী তো অফিসের কাজে এক জায়গায় গেছেন।

—না, বাপী তো অফিসের কাজে কাশ্মীরেই গিয়েছিল। মা-ও বলেছিল আমরা কাশ্মীরে যাব। কিন্তু আমরা কাশ্মীরে না গিয়ে পহালগামে এলাম কেন?

—এটাও তো কাশ্মীর। পহলগামও কাশ্মীর। তুমি তো কাশ্মীরেই এসেছ।

—তা হলে বাপীকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

—তাই তো, তোমার বাপী যে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। সেই জন্য আমরা তোমার বাপীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। হয়তো তোমার বাপী এর মধ্যে বাড়িতে চলে গেছেন।

—তুমি আমার বাপীকে চেন?

—উ ইয়ে হ্যাঁ চিনি!

—তবে তুমি আমাদের বাড়িতে কখনো আসনি কেন?

শীতের মধ্যেও আমি প্রায় ঘেমে উঠছিলাম এত মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে। আমরা ভাবি, বাচ্চারা কিছুই বোঝে না, তাদের যা খুশি বলে ভোলানো যায়। কিন্তু ওদের একটা আলাদা অনুভূতির জগৎ আছে, সেখানে ওরা সব কিছু নিজেদের মতন করে বুঝে নেয়।

আমি বললাম, এবার ঘুমিয়ে পড়ো তো, বুলবুল! না হলে মা এসে রাগ করবেন!

—না, আমি ঘুমোব না।

—কেন, ঘুমোবে না কেন?

—বাঃ, আমি যে গাড়িতে ঘুমোলাম। আবার এখন ঘুমোব কেন?

—তা হলে তুমি এখন কী করতে চাও?

—গল্প শুনব, তুমি গল্প বলো!

—এই রে, আমি যে একটাও গল্প জানি না!

বুলবুল তড়াক করে আমার পিঠের ওপর চড়ে বসে বলল, শিগগির গল্প বলো, নইলে আমি তোমাকে মারব!

—মার!

ও অমনি চটাস্ চটাস করে মারতে লাগল আমার ঘাড়ে। কে বলে বাচ্চাদের গায়ে জোর নেই! মার খেয়ে আমার ঘাড়টা রীতিমতন জ্বালা করছে।

—আর মেরো না, আর মেরো না, আমি গল্প বলছি।

—বলো!

—শোনো, একটা ছেলের নাম ছিল গুপী, আর একটা ছেলের নাম বাঘা, তারা একদিন বনের মধ্যে—

—ওটা আমি জানি!

—জানো! আচ্ছা তা হলে আর একটা...একটা লোক ছিল, তার নাম সিন্ধুবাদ, সে একবার জাহাজে করে—

—ওটাও আমি জানি! সেই বড় বড় পাখি, তাদের অ্যাত বড় বড় ডিম...সেটা তো!

—তুমি তো অনেক গল্পই জানো দেখছি! এত গল্প তোমায় কে বলে?

—দিম্মা!

—তা হলে তুমিই আমাকে একটা গল্প শোনাও না!

—না। তুমি গল্প বলো!

—এই রে, আর যে কোন গল্প আমার মনে আসছে না!

বুলবুল না গঁল্পো বঁলো বলে নাকি কান্না জুড়ে দিল। তাকে থামাবার জন্য আমি বানিয়ে বানিয়ে দু' একটা গল্প বলবার চেষ্টা করলাম, কোনটাই তার পছন্দ হয় না। বাচ্চাদের গল্প বলার অভ্যেসই নেই আমার কোনকালে। বয়স্ক পাঠকদের তবু খুশি করা সোজা। কিন্তু এই খুদে শ্রোতাটিকে আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট করতে পারি না।

বুলবুল তখনও আমার পিঠের ওপর বসে আছে। এক সময় সে কান্না থামিয়ে বললে, আচ্ছা, তুমি তা হলে ঘোড়া হও?

—এই তো ঘোড়া হয়েছি!

—না, তুমি নীচে নেমে ঘোড়া হও!

—লক্ষ্মীটি, আমি একদম ঘোড়া হতে জানি না। তোমাকে কাল সকালে সত্যিকারের ঘোড়ায় চড়াব!

—না, তুমি ঘোড়া হও! আমি তোমার পিঠে চাপব!

ওরে বাবারে, অতি বিচ্ছু মেয়ে! ইচ্ছে করছে দারুণ একটা চিমটি কাটি। কিন্তু তারপর যদি ও ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কান্না জুড়ে দেয়, তা হলে আর একটা বিপদ হবে।

অগত্যা মাটিতে নেমে উপুড় হয়ে ঘোড়া সাজতে হলো। বুলবুল আমার পিঠের ওপর চেপে কাঁধে জোরে জোরে চাপড় মেরে বলতে লাগল, এই ঘোড়া, হ্যাট, হ্যাট! একি, তুমি যাচ্ছ না কেন? হ্যাট হ্যাট।

দু' একবার এদিক ওদিক গেলাম হামাগুড়ি দিয়ে। কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া কি সোজা? আমার হাঁটু ছড়ে যাবার উপক্রম।

এক সময় হাসি পেয়ে গেল। মনে মনে বললাম, কি হে, নীললোহিত, এখন কেমন লাগছে? সব সময় তো ফুরফুরে রোমান্টিক সেজে থাক, এবার?

৭

দিনের বেলা নরম শীত ছিল, কিন্তু অন্ধকার হবার পরই কনকনে ঠাণ্ডা একেবারে। শহর থেকে রাত্তিরের খাওয়া সেরে ফেরবার সময় পথটা মনে হয় যেন আর ফুরোয়ই না। হাত-পা জমে যাবে, নাকটা টুপুস করে খসে পড়বে। হাত দুটো তো পকেট থেকে বার করতেই ইচ্ছে করে না। বুলবুলের হাতে দস্তানা ও মাথায় টুপি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাও সে চ্যাঁচাচ্ছে, উঃ কী শীত!

আমার গায়ে সোয়েটার, কোট, মাফলার, তবু মনে হচ্ছে মাথার একটা টুপি কালই কিনতে হবে। শুভ্রা চ্যাটার্জি গায়ের গরম চাদরটাই মাথায় ঘোমটার মতন দিয়ে নিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে টর্চ নেই। অন্ধকারে যে কোন সময়ে হোঁচট খাওয়ার ভয়। টর্চের কথাটা একদম খেয়াল করিনি, একটা কিনে নিলেও হতো।

আকাশ মেঘলা, চতুর্দিকে মিশমিশে অন্ধকার। শুধু লিদ্দার নদীর শব্দ আর জলের সামান্য আভাস চোখে পড়ে। সেই নদীর ধার দিয়েই পথ খুঁজে যাওয়া। তাঁবুগুলির দড়িতে মাঝে মাঝেই পা আটকে যাচ্ছে। বুলবুল তো দু'বার উল্টে পড়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত আমাদের তাঁবু দুটির কাছে এসে পৌঁছোলাম। এবার বোঝা গেল, কেন অন্যরা এত দূরে তাঁবু ফেলে না। রাত্তিরবেলা ফেরার সময়টা সত্যি কষ্টকর। যাক, কাল গোটা দুই টর্চ কিনে নিলে অনেকটা সহজ হবে।

যেদিকটায় বেশি তাঁবু আছে, সেখানে দু' একটা বিজলি বাতি জ্বলে। আমাদের এখানে হ্যারিকেন। চার পাশের পাহাড়গুলো যেন এই অন্ধকারের মধ্যে অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। আমাদের পেছন দিকের ত্রিভুজাকৃতি পাহাড়টাকে মনে হয় যেন বিশাল এক কালো রঙের তাঁবু, আকাশের অনেকখানি ঢেকে আছে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি ও বুলবুল ওদের তাঁবুতে ঢুকে যেতেই আমি চলে এলাম আমারটায়। দৌড়ে সুটকেসটা খুলে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বার করে বড় একটা চুমুক দিতে শীতের কাঁপুনি যেন একটুখানি কমল। বিছানা থেকে কম্বলটা তুলে গায়ে জড়ালাম। এবার বেশ আরাম।

এখনো ন'টা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি আছে। অথচ মনে হয় যেন মাঝরাত্রি। এক্ষুনি শুয়ে পড়লে তো ঘুমও আসবে না। হ্যারিকেনের আলোয় বই পড়াও যায় না। অবশ্য খুব ছেলেবেলায় গ্রামে থাকবার সময় হ্যারিকেনের আলোতেই তো লেখাপড়া করেছি, কিন্তু এখন আর তা চলে না।

ব্র্যাণ্ডির বোতলটা নিয়ে টেবিলে এসেই বসলাম। এই রে, গেলাস তো ওদের ঘরে। এক বালতি জল এনে রেখেছি আমার তাঁবুতে কিন্তু দুপুরবেলা খাওয়ার পর আমার গেলাসটাও পাশের তাঁবুতে রয়ে গেছে। ব্র্যাণ্ডিতে জল না মিশিয়েও বোতল থেকে ঢেলে খাওয়া যায়। কিন্তু রাত্তিরে জল তেষ্টা পেতে পারে। তখন কি বালতি থেকে চুমুক দিয়ে খেতে হবে?

শুভ্রা চ্যাটার্জি নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েননি। মেয়েদের জামা-কাপড় ছাড়া, চুল আঁচড়ানো, মুখে ক্রিম ঘষা—এই রকম কয়েকটা ব্যাপার থাকে শুতে যাবার আগে। আমার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম। পাশের তাঁবুর পর্দা ফেলা। আলো জ্বলছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, শুভ্রা, শুভ্রা! শুয়ে পড়েছেন নাকি?

পর্দাটা একটু সরিয়ে শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, কী ব্যাপার!

—একটা গেলাস। আমার তাঁবুতে গেলাস নেই।

শুভ্রা চ্যাটার্জি একটা গেলাস এনে দিলেন, আমি সেটা হাতে নিয়ে বললাম, আচ্ছা! আপনারা শুয়ে পড়ুন, কাল সকালে দেখা হবে।

নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে হঠাৎ নিজেকে খুব একা মনে হলো। আমি একা থাকতেই অভ্যস্ত তবু এক এক সময় এই একাকিত্ব ভূতের মতন ঘাড়ে চেপে বসে। আমার তাঁবুটা ছোট, তবু সেটাকে মনে হয় এক বিরাট গহ্বর। তাই আনাচে

কানাচে অন্ধকার। বাইরেও রাশি রাশি অন্ধকার। মন খারাপ হয়ে যেতে চায়। তবু, না, এর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

সিগারেট ধরিয়ে মাঝে মাঝে ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিতে লাগলাম। কখনো উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করছি, পাশের তাঁবুতে কোন শব্দ শোনা যায় কিনা। না, কোন শব্দ নেই, কোথাও কোন শব্দ নেই, নদীর শব্দ ছাড়া। এ কিন্তু কুলকুল ধ্বনি নয়, রীতিমতন গর্জন। কত বরফ থাকে একটা পাহাড়ের ওপরে যাতে এ রকম একটা নদী দিন রাত বয়ে গেলেও সে জল ফুরোয় না?

হ্যারিকেনের মিটমিটে আলোয় সিগারেটের ধোঁয়া নিয়ে আমি খেলা করতে লাগলুম। আর তো কিছুই করার নেই।

কতক্ষণ সময় কেটে গেছে জানি না, অন্যমনস্ক হয়ে আমি কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলাম। কলকাতা মানেই অনেক কাজ, কত কাজ অসমাপ্ত বা অর্ধ-সমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে, তারা হাতছানি দেয়। খুব মন খারাপ হলে আমি কলকাতার বাইরে কোথাও পালিয়ে যাই। আবার সেখানেও কয়েকদিন বাদেই কলকাতার জন্য মন কেমন করে। ঐ শহরটার সঙ্গে আমার যেন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন দাঁড়িয়ে গেছে। আমার মৃত্যুর পরেও কি ঐ শহরটা বেঁচে থাকবে? না, আমি আর কলকাতা বোধ হয় সহমরণে যাব।

এই সময় টেবিলের ওপর একটা ছায়া পড়ল। মুখ তুলে দেখি, শুভ্রা চ্যাটার্জি। হাউস কোটের ওপর একটা শাল জড়িয়ে এসেছেন। হাঁটুর তলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত নগ্ন। বাঙালী মেয়েদের এইটুকু পা দেখতে পাওয়াই ভাগ্যের কথা।

—তুমি একা বসে বসে কী ভাবছ?

—কী জানি!

—আমারও এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার অভ্যেস নেই। বুলবুলকে ঘুম পাড়ালাম এতক্ষণ ধরে। তোমার এখানে একটু বসব?

—বসুন না।

—তুমি তখন আমাকে শুভ্রা শুভ্রা বলে ডাকছিলে কেন? শুভ্রা আবার আপনি—এ আবার কী রকম!

—নাম ধরে ডেকে আপনি বলা আমাদের কলেজ জীবনে বন্ধুদের মধ্যে ফ্যাসান ছিল। আগেকার ব্রাহ্মদের মতন। আপনাকে কি তুমি বলা উচিত ছিল?

—মোটেই না। তুমি আমাকে শুভ্রা মাসী বলতে পারতে।

আমি হেসে ফেললাম। সেই সময় গলার মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়া ছিল; তাই দমক লেগে গেল। থামতেই চায় না।

শুভ্রা চ্যাটার্জি ঝুঁকে পড়ে আমার মাথার ওপর চাপড় মারতে লাগলেন। তাতে দমকটা কমে।

—এত হাসছ কেন? এতে হাসির কী আছে?

—আমি আপনাকে মাসী বলতে যাব কেন?

—আমি তোমার মাসীর বন্ধু, সেই হিসেবে—

—দীপান্বিতা নামে আমার কোন লেডি ব্রাবোর্নে পড়া মাসী নেই। রামকৃষ্ণ মিশনে ফ্রেঞ্চ পড়ান—এমন কোন মহিলাকেও আমি চিনি না।

—সে কি, তুমি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলে?

—হ্যাঁ, সাদা মিথ্যে। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু আপনিও তো সেই মিথ্যেটা মেনে নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলেন।

—তার মানে?

—আপনি আমার সঙ্গে চেনাশুনোর কোন একটা সূত্র খুঁজে বার করতে চাইছিলেন যে-কোনো উপায়ে। তারপরই ঝপ করে আমাকে তুমি বলা শুরু করলেন, বেশ একটা গুরুজনের ভাব দেখিয়ে, যাতে লোকে না কিছু মনে করে।

—লোক আবার কোথায়? এখানে কে কি বুঝতে যাচ্ছে?

—তবু বাঙালি মেয়ে তো, মনের মধ্যে একটা সংস্কার থাকেই। একেবারে অচেনা কোনো পরপুরুষের সঙ্গে কোথাও যাওয়া—বাঙালি মেয়েরা তা ঠিক পারে না—তার ওপর যদি হোটেলে এক ঘরে থাকতে হতো—সে তো এক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার—

—কিছুই না পাওয়া গেলে হোটেলের এক ঘরেই থাকতাম!

—না, তা হয় না। নিজের স্বামীকে খুঁজতে এসে কোন নারী আর একজন লোকের সঙ্গে হোটেলের এক ঘরে থাকে না।

—তুমি আমাকে একটু খোঁচা মারার জন্যই দুটো তাঁবুর কথা বলেছিলে?

—হোটেলের এক ঘর আর এক তাঁবু তো একই ব্যাপার!

—না, এক ব্যাপার নয়। সবটাই লোকলজ্জার ব্যাপার। হোটেলে আরো অনেক লোকজন থাকে। আমরা নিজেরা ঠিক থাকলেও অন্য লোক তা বুঝবে না। এখানে তো আর অন্য কেউ নেই!...তুমি হঠাৎ এত রেগে রেগে কথা বলছ কেন আমার সঙ্গে?

আমি সচকিত হয়ে গেলাম। সত্যিই আমার গলায় একটু ঝাঁঝ এসে গিয়েছিল। শুভ্রা চ্যাটার্জিকে আঘাত দিতেই চাইছিলাম আমি। কেন? নিশ্চয়ই এটা ব্র্যাণ্ডির প্রতিক্রিয়া। একটু নেশা হলেই আমার এরকম হয়। নিজেকে সামলে নিলাম। এটা ঠিক, শুভ্রা চ্যাটার্জির মনের মধ্যে এখন একটা দারুণ তোলপাড় হচ্ছে—এসময়

তাঁর সহানুভূতির প্রয়োজন। তাঁকে আঘাত দেওয়া অমানবিকতা।

ব্র্যাণ্ডিতে আর একটা চুমুক দিয়ে আমি হাসলাম। তারপর বললাম, মাঝে মাঝে আমার কথাবার্তা একটু রূঢ় হয়ে যায়, কিন্তু রাগিনি, রাগব কেন আপনার ওপর!

—আমার পায়ে খুব ঠাণ্ডা লাগছে। আমি চেয়ারের ওপর পা তুলে বসব? কিছু মনে করবে না?

—না, না, বসুন না।

উঠে গিয়ে আমি বিছানার ওপর থেকে আর একটা কম্বল এনে বললাম, এটা জড়িয়ে বসুন, আরাম লাগবে। কোন কোন জায়গায় খবর নিলেন আজ? নতুন কিছু পাওয়া গেল?

—নাঃ! সকলেরই কী রকম যেন একটা দায়সারা ভাব। আসলে এত টুরিস্ট এসেছে তো, সবাই তাই নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। কেউ আর অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। একজন লোককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অমনি সবাই ধরে নিচ্ছে যে, সে মারা গেছে!

—এখানকার পুলিস কী বলল?

—ঐ একই কথা। সরকারী তদন্তের রিপোর্টে যা বলা হয়েছে, তার বেশি আর কিছু বলার নেই! একটা লোক যে ইচ্ছে করে লুকিয়েও থাকতে পারে, সে কথা ওরা কিছুতেই বুঝবে না।

—মিঃ চ্যাটার্জি তো উড স্টক হোটেলে ছিলেন। ওঁর সব জিনিসপত্র সেখানেই পড়ে আছে?

—না, সে তো আমার ভাসুর যখন এসেছিলেন, তাঁর কাছেই সব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উড স্টক হোটেলেও আমি গিয়েছিলাম। ন্যাচারালি, সে ঘরে এখন অন্য লোক আছে। হোটেলের লোকরা কিছু বলতে পারল না।

—এরপর আপনি কী করতে চান?

—কী করা যায় তুমিই বলো তো!

আমি চুপ করে রইলাম। আমার কিছুই বলার নেই।

একটুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইলাম। তারপর শুভ্রা চ্যাটার্জি হঠাৎ বললে, এ কি, তুমি মদ খাচ্ছো?

—হ্যাঁ, এটা ব্র্যাণ্ডি! আপনি খাবেন একটু?

—রক্ষে করো। আমার বিচ্ছিরি লাগে—

—আপনি খেয়ে দেখেছেন কখনো?

—হ্যাঁ, স্বাদটা আমার মোটেই ভালো লাগে না। তোমাদের ঐ জিনিস সব

রকমই আমি চেখে দেখেছি, কোনটাই ভালো লাগেনি।

—আমি খেলে আপনার আপত্তি নেই তো।

—আমি আপত্তি করলেও কি তুমি শুনবে? তোমার ওপর জোর করার সে-রকম কোন অধিকারও আমার নেই। ও তো প্রত্যেক সন্ধেবেলা বাড়িতে এসে হুইস্কি খেত।

কমলেশ চ্যাটার্জি বড় ইঞ্জিনিয়ার, নিশ্চয়ই বিলেত বা আমেরিকা ফেরৎ, হুইস্কিসেবী, তার ওপরে আবার স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত—সব মিলিয়ে ছবিটা একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কিন্তু হুইস্কিসেবী লোকরা কি চট করে সাধু হয়ে যেতে পারে? কমলেশ চ্যাটার্জির ছবি আমি দেখেছি, বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, বেশ ধারালো চোখ ও নাক—সর্বত্যাগী হবার মতন কোন চিহ্ন নেই। হুইস্কির নেশা ছাড়তেই তো একটা লোকের ছ' মাস বা এক বছর লেগে যায়।

—আপনি বলছেন, উনি ইচ্ছে করে লুকিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু সে রকম কি লোকে করে? উনি নিশ্চয়ই ওঁর মেয়েকে এবং আপনাকে ভালোবাসতেন—হঠাৎ তাদের কথা ভুলে গিয়ে...এরকম গল্পে হয়—কাছাকাছি জীবনের মধ্যে দেখা যায় না।

—আমাকে ভালোবাসতেন কি না জানি না। তবে বুলবুলের ওপর টান ছিল।

—আপনাকে ভালোবাসতেন কিনা জানেন না আপনি?

—সত্যিই জানি না। এগারো বছর আগে বিয়ে হয়েছে, আমরা নিজেরাই বিয়ে করেছিলাম, আগে ভেবেছিলাম সেটা ভালোবাসা—পরে বুঝেছি আস্তে আস্তে, এটা ঠিক ভালোবাসা নয়, সুখী হবার চেষ্টা...আমরা তো তাই করি, একজন কারুকে ভালো লাগে, তার চেহারা, সামাজিক অবস্থা—এগুলোও ভেবে দেখি, তখন মনে হয় একে বিয়ে করলে সুখী হবো—এরকমই হয় না? এর নাম ভালোবাসা? ভালোবাসার উন্মাদনা বলতে যা বোঝায় তা কখনো আমি টের পাইনি! না, ওর সঙ্গে আমার ভালোবাসা ছিল না, অন্তত গত তিন চার বছর...তবু পরস্পরকে মানিয়ে নেওয়া, খানিকটা স্নেহ বা যত্ন।

শুভ্রা চ্যাটার্জি হঠাৎ টেবিলে মাথা রেখে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কান্নাটা এমনই আকস্মিক যে আমি একেবারে শিউরে উঠলাম। অসম্ভব নির্জন এই জায়গা, চার পাশে এত অন্ধকার, তার মধ্যে একটি নারীর কান্না—মনে হয় যেন সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিই কাঁদছে।

শুভ্রা চ্যাটার্জির কান্নার ধরনটাই এই রকম আকস্মিক। আগের মুহূর্তেও বোঝা যায় না। কান্নার সময় ওঁর বোধহয় মনে থাকে না যে কাছাকাছি কোন মানুষ আছে।

এখন আমার কী করা উচিত। কোনো সান্ত্বনা দিতে পারি আমি? তবু উঠে গিয়ে, পিঠে হাত রেখে? না, আমার ভয় করে। নিজেকেই। একবার ছুঁয়ে দিলেই যদি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যাই?

চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। কারুর কান্না দেখলে আমার বড্ড কষ্ট লাগে। অথচ দৃশ্য হিসেবে একটি সুন্দরী রমণীর কান্না খবুই সুন্দর। আমি ভেতরে ভেতরে কষ্ট পেয়েও মুগ্ধ হয়ে ওঁর দিকে চেয়ে রইলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি আমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। কেন এই কান্না? ভালোবাসা ছিল না বলে?

একটু পরে উনি মুখ তুললেন। অশ্রুবর্ষণের কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে বললেন, তোমার ঘুম পাচ্ছে না তো? আমি আর একটু বসব?

—হ্যাঁ, বসুন না! আমি অনেক পরে ঘুমোব।

—বুলবুল জেগে থাকলে তো সব কথা বলা যায় না। আচ্ছা, তুমি কখনো কারুকে ভালোবেসেছো?

—হ্যাঁ। একটি ফরাসী মেয়েকে। তার নাম মার্গারিট।

—ফরাসী মেয়ে? সে কোথায়? এদেশে থাকে?

—না।

—এদেশে নেই? কবে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—সে এক লম্বা কাহিনী। সে কথা আমি এখন বলতে চাই না। বরং আপনার কথাই শুনি।

—আমি খুব স্বার্থপর, তাই না? শুধু নিজের ব্যাপার নিয়েই তোমাকে বিব্রত করে রেখেছি। আর কেউ বোধহয় হঠাৎ প্রায় একজন অচেনা মানুষকে এরকম এত দূর টেনে আনে না!

—আপনি কিছু না জেনেশুনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন, আমি তো খারাপ লোকও হতে পারি!

—কেন, মানুষ কেন খারাপ হবে? বিনা কারণে, কেউ কেন অন্য একজনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে?

—তবু তো এরকম হয়—

—তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম, তুমি সেরকম কিছু করবে না!

—সেই জন্যই আমার সঙ্গে মাসীর সম্পর্ক পাতাতে চেয়েছিলেন? কিন্তু আমি কোন অনাত্মীয়া নারীর সঙ্গেই মাসী, পিসী, দিদি বা বোনের সম্পর্ক পাতাতে চাই না।

—নাই বা হলো সেরকম কোন সম্পর্ক। বন্ধুত্বও তো হতে পারে।

—মেয়েরা কখনো পুরুষদের বন্ধু হবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। তারা ভয় পায়।

—কেন, আমি তোমাকে ভয় পাব? কক্ষনো না।

—তুমি ভয় পাবে না?

আমি সোজাসুজি তাকিয়ে রইলাম ওঁর চোখের দিকে। উনিও চোখ সরালেন না। যেন এটাই একটা ভয়ের পরীক্ষা। আমার আঙুলের ডগায় একটা জ্বালা জ্বালা ভাব। এক্ষুনি লাফিয়ে গিয়ে যদি শুভ্রা চাটার্জিকে জড়িয়ে ধরি, উনি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবেন না? সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আমার দারুণ ইচ্ছে হয়। আমি ওঁকে জড়িয়ে ধরে বলব, বোকা মেয়ে এই শীতের রাতে কম্বল মুড়ি দিয়ে আলাদা দূরে দূরে বসে থাকার চেয়ে এক শয্যায় শুয়ে থাকা অনেক ভালো নয়?

কিন্তু আমার বুক কাঁপছে। এসব কথা মনে মনেই বলা যায়, মুখ ফুটে কোন নারীকে কখনো বলিনি। সাহস বাড়াবার জন্য আমি ব্র্যাণ্ডির বোতলটা তুলে আবার চুমুক দিলাম। সে জন্য চোখ সরাতে হলো, অমনি ঘোর কেটে গেল।

শুভ্রা বললেন, তুমি অত বেশি খেও না। আর খেও না, লক্ষ্মীটি!

—হ্যাঁ, আমাকে আরো অনেকটা খেতে হবে।

—খেতেই হবে? কেন?

—একথা থাক। অন্য কথা বলুন।

—কী আশ্চর্যভাবে তোমার সঙ্গে আলাপ, তাই না? যদি আগে দেখা হতো।

—আগে দেখা হলে কী হতো?

—তা জানি না, তবে এখন আমি শুধু নিজের কথা বলছি, তোমার কথা কিছুই শোনা হলো না—

—আমি সামান্য লোক, আমার সম্পর্কে কিছুই জানবার নেই—

—তুমি কি আমার ওপরে রাগ করে আছ?

—রাগ করব কেন? শুভ্রা, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তুমি একটা ছোট্ট মেয়ে।

—ছোট্ট মেয়ে? তুমি আমাকে হাসাতে চাও নাকি? আমি বয়েসে তোমার সমানই হবো—

—তোমার বয়েস অনেকদিন আগে এক জায়গায় থেমে আছে—

—আমার বিয়েই তো হয়ে গেল এগারো বছর। কমলেশ বলত—

—কমলেশ, ও, তোমার স্বামী? আমি এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম তার কথা। আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দিন তো! আপনি বললেন, আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর

মধ্যে তেমন ভালোবাসা ছিল না—তবু আপনি তাকে এমন পাগলের মতন খুঁজতে এসেছেন কেন?

—তুমি এটা বুঝতে পারছ না? ও যদি সত্যিই মরে না গিয়ে থাকে, যদি পালিয়ে যায়—তা হলে আমাকে কতবড় অপমান করেছে? ও যদি এমনি চলে যেতে চাইত, আমি কি ওকে আটকাতাম? আমার আত্মসম্মান নেই? কেন ও আমাকে কিছু বলে গেল না!

—আপনি কষ্ট পাবেন বলে আমি এতক্ষণ বলতে পারছিলাম না। আমার ধারণা, উনি বেঁচে নেই। ওঁর পক্ষে বেঁচে থাকা আর সম্ভব নয়। কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

—এরকম দুর্ঘটনা হতে পারে। তাতে কিছুই করার নেই। কষ্ট কি পাব না? নিশ্চয়ই পাব। এতদিন কাছাকাছি থাকার ফলে যে একটা সম্পর্ক দাঁড়ায়—সেটা প্রেম ভালোবাসা না হলেও খুব কম কিছু নয়। কষ্ট হবেই। কিন্তু ও যদি ইচ্ছে করে চলে গিয়ে থাকে, তবে এটা হবে আমার পক্ষে দারুণ অপমানের। সেটাই শুধু আমি জেনে যেতে চাই।

—আপনার স্বামী ছাড়া অন্য কারুকে ভালোবেসেছেন কখনো?

—জানি না। আমি হয়তো ভালোবাসতেই জানি না। কিন্তু ভালোবাসার জন্য দারুণ একটা প্রতীক্ষা ছিল মনের মধ্যে। বোধহয় শেষ পর্যন্ত বুঝতেই পারলাম না, ভালোবাসা চাই, না সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চাই! আচ্ছা, তোমাকে তখন জিজ্ঞেস করলাম তুমি কারুকে ভালোবেসেছ কিনা। তুমি সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বললে। তোমার মধ্যে কোন দ্বিধা নেই। আচ্ছা, তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে, কী ভাবে ভালোবাসতে হয়?

আমি একটু হাসলাম। মেয়েরা ভালোবাসার আলোচনা করতে ভালোবাসে। সত্যি কথাটা শুনতে চায় না। ভালোবাসার একটা রঙীন ছবি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে।

আমি বললাম, না, তাতে একটু অসুবিধে আছে।

—কেন?

—আমার ভালোবাসার ধারণাটা একটু উগ্র। তার মধ্যে একটা শরীর আছে। রক্ত-মাংসের শরীর বাদ দিয়ে কোন ধোঁয়াটে ভালোবাসায় আমি বিশ্বাস করি না।

—আমি বোধ হয় তোমাকে ভুল সময় কথাটা জিজ্ঞেস করেছি।

দেশলাইটা নীচে পড়ে গিয়েছিল। ঝুঁকে সেটা তুলতে গিয়ে আমার চেয়ারটা একটু টলে গেল। শুভ্রা চ্যাটার্জি হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরলেন, না হলে আমি পড়েই যেতাম। উনি বললেন, তোমার নেশা হয়ে গেছে। তুমি এবার শুয়ে পড়ো।

—না ভাই শুভ্রা, আমার নেশা হয়নি। কাঠের পাটাতনগুলো আলগা,

এমনিতেই সব কিছু নড়বড় করে। তোমার হাতটা কী গরম!

আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে শুভ্রা চ্যাটার্জি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, আমি এবার যাই!

—আচ্ছা!

—তুমি কি এখনো এখানে বসে থাকবে?

—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ!

—কেন?

—এমনিই। আপনি যান না শুতে?

—আমাকে এক একবার তুমি বলে ফেলেছ, তাতে আমি কিছু মনে করিনি। আমাকে তুমি তুমি বলতে পারো।

—ওতে কিছু যায় আসে না?

—সত্যিই কিছু যায় আসে না। কিন্তু তুমি আর কতক্ষণ এরকম একা একা বসে থাকবে?

—তাতে আপনার কী অসুবিধে হয়েছে? আপনি শুতে যান না। থাক—

—তুমি আবার আমার ওপর রেগে রেগে কথা বলছ?

সত্যি আবার শুভ্রা চ্যাটার্জির ওপর আমার খুব রাগ এসে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা ছটফটানি। কেন এই মহিলা আমাকে এখানে টেনে এনেছেন? কেন এমন নির্জন অন্ধকার রাত্রে আমার সামনে? আমি তো একটা নিতান্ত সাধারণ মানুষ। আমার কি লোভ, মোহ এসব থাকতে পারে না?

বাইরে থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এলো, শুভ্রা চ্যাটার্জি শীতে কেঁপে উঠলেন। আমার শীতবোধ অনেকটা কমে গেছে। আমি শুভ্রা চ্যাটার্জির কথার কোন উত্তর দিইনি, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, যেন অনেক সময় কেটে গেছে বহুক্ষণ...আমাদের দু'জনের মাঝখানে একটা বিরাট স্তব্ধতার দূরত্ব।

—তা হলে আমি যাই?

শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার অনুমতি চাইছেন, কেন? আমি হাত তুলে বললাম, দাঁড়াও!

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে ওঁর সামনে এসে বললাম, আচ্ছা শুভ্রা, তুমি যখন ছোটো ছিলে, খুব ছোটো না, কিশোরী, যখন তুমি বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেতে, তোমার সেই সময়টার কথা বলো তো!

শুভ্রা চ্যাটার্জির ভুরুতে নদীর বাঁকের মতন বিস্ময় ফুটে উঠল। সামান্য একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, এসব কী বলছ তুমি? আমি যখন ছোটো ছিলাম...সেকথা শুনে তোমার কী হবে?

—হ্যাঁ, বলো, সেইসব দিনের কথা, যখন তুমি কিশোরী, নিষ্পাপ, চোখে অনেক স্বপ্ন—তোমার সেই দিনগুলো আমি দেখতে চাই। তুমি একটা সাদা ফ্রক পরেছ, রাজহংসীর মতন...তখন তোমাকে আমি চিনতাম। চিনতাম না?

—কী পাগলের মতন কথা বলছ? আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে পারছ না? এটা কি গ্রীক? আমি তো খুব সরল কথা বলছি, তোমাকে আমি দেখতে চাই, তুমি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে লিখছ, চিঠি কিংবা অন্য কিছু, তোমার বয়েস পনেরো কিংবা ষোলো—আমি তোমাকে সেখানে দেখতে চাই।

—আমি কি আর সেখানে ফিরে যেতে পারি?

—পার না? তুমি তা হলে কী পার? তুমি কী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ এখান থেকে?

আমার মনে হলো, শুভ্রা চ্যাটার্জি কিছু একটা বলার জন্য আমার কাঁধে হাত রাখবেন। তাই, প্রায় হরিজনের মতন, আমি সন্ত্রস্তভাবে পিছিয়ে গেলাম একটু। তারপরই বুঝলাম, উনি আমার কাঁধে হাত রাখতে চাননি, কপালের ওপর থেকে এক গুচ্ছ চুল সরালেন। চোখ দুটি প্রায় নিষ্পলক। দুর্গা প্রতিমার মতন মুখ। সেই মুখে এখন দুঃখের আঁকা বাঁকা রেখা।

—আমি যাই?

—বার বার একথা জিজ্ঞেস করছ কেন? এবার বুঝি ভয় করছে আমাকে! আমি কি তোমাকে আটকে রেখেছি। না, না, তুমি যাও, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

—ভয়? না, ভয় পাব কেন? তুমি কি ভয় দেখাচ্ছ আমাকে? বুঝতে পারছি না তো?

—না, ভয় দেখাতে আমি চাই না। তুমি সেখানে আর ফিরে যেতে পার না—সত্যিই? না? সেই সারল্য, সেই স্বচ্ছ জীবন...

—ফেরা যায়?

—যায় না বুঝি? ঠিক আছে, তুমি তাঁবুতেই যাও। আমি পৌঁছে দিচ্ছি...

—না, আমি যাচ্ছি, তুমি আর এসো না। আমার মনটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে গেল। তুমি কেন আমাকে এইসব কথা বললে?

—আমি উল্টোপাল্টা কিছু বলেছি বুঝি? খুব দুঃখিত, আমি কিছু ভেবে বলিনি, এমনি যা মনে এলো।

কম্বলটা গা থেকে খুলে শুভ্রা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, ঠিক আছে, তা হলে কাল সকালে—

আমি ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। শুভ্রা টুপ করে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল। তারপর আবার ওর তাঁবুর সামনে হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোর মধ্যে জেগে উঠল! তাঁবুর দরজার কাছে ভাস্কর্য হয়ে স্থির রইল কয়েক মুহূর্ত। যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে। তারপর মিলিয়ে গেল ভেতরে।

সিগারেটটা শেষ করে একটু বাদে আমিও চলে এলাম বিছানায়। কী অসম্ভব ঠাণ্ডা এই বিছানা। নীচে দুটো কম্বল পাতা, গায়ে দুটো কম্বল, তবু যেন মাটি ভেদ করে শীত উঠছে। আমার হাতের তালু, পায়ের পাতা গরম, শুধু বুক আর পিঠের কাছে কনকনানি। হাত দুটো বার বার কাকে যেন ধরতে চাইছে। কত মধুর উষ্ণতা আসতে পারত এই বুকে...

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরেও টের পেলাম, ঘুম আসবার কোন চিহ্নমাত্র নেই। চোখ দুটো খরখর করছে। এইভাবে কী সারারাত জেগে থাকব? তখন মনে পড়ল, ব্র্যাণ্ডির বোতলটা পুরো শেষ হয়নি, খানিকটা তলানি পড়েছিল। ওটুকু আর রেখে লাভ কী?

আবার কম্বল জড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। বোতলটা খুঁজে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করলাম সবটুকু। তারপর তাঁবুর বাইরে এসে বোতলটা ছুঁড়ে দিলাম নদীর দিকে। ঝনঝন শব্দ হলো। জলে পড়েনি বোতলটা, পাথরে লেগেছে—শব্দটা খুব চমৎকার শোনাল।

শুভ্রা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

ও আমাকে একা বসিয়ে রেখে যেতে চাইছিল না। ওর মনে কষ্ট ছিল। ঘুম কি সেই কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে এতক্ষণে?

ওর তাঁবুর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম নিঃশব্দে। দরজার দড়িগুলো ভেতর দিকে বাঁধা, কিছুটা ফাঁক হয়ে আছে। বাইরে থেকে এই দড়ির বাঁধন খুলে ফেলা কিছুই শক্ত নয়। ভাগ্যিস এদিকে কোন চোর নেই।

ফাঁকের মধ্যে আমি চোখ রাখলাম। হ্যারিকেনটা পুরো নেভায়নি, কালিমাময় অল্প আলোয় শুভ্রার শায়িত দেহের রেখা অস্পষ্ট দেখা যায়। বোঝা যায় না, ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। ডাকব? ডেকে বলব, শুভ্রা, তোমার বুকের কাছে শীত করছে না? চলো আমরা ফিরে যাই নিষ্পাপ কৈশোরে, যেখানে তুমি সাদা ফ্রক পরা রাজহংসীর মতন, উজ্জ্বল দাঁতের আলো দেখিয়ে হাসবে, কোন দুঃখ নেই, গোটা পৃথিবীটা বিপুল সম্ভাবনায় উদ্ভাসিত—

এ কী অসম্ভব চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে? হঠাৎ শুভ্রার কৈশোর নিয়ে আমার এত মাথাব্যথা কেন? শুধু এখন বুকের কাছে শীত...ডাকব শুভ্রাকে? যদি না আসে? যদি না আসে, তা হলে পৃথিবীর আর কোন নারীকে কি আমি

ডাকতে পারব কখনো? যদি না আসে, আমি তো জোর করে এই দড়ির বাঁধন খুলে ভেতরে যেতে পারব না!

আর যদি উঠে আসে, তাহলে আর আমি ওকে ছাড়ব না। আমি ওকে আমার বুকের মধ্যে পিষে ফেলে...আমরা সারারাত এক বিছানায়, এক কম্বলের তলায়। ...কিন্তু তাহলে ওর সমস্ত খোঁজাখুঁজি মিথ্যে হয়ে যাবে!

এক তৃষ্ণার্ত প্রেতের মতন আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। ওর শরীরের সামান্য নড়াচড়া লোভীর মতন দেখছি। আমার নিশ্বাসের শব্দ সম্পর্কেও সতর্ক। শুভ্রা যেন কিছুতেই টের না পায়। আমার একমাত্র আশা, ও যদি নিজে থেকে একবার উঠে আসে। ও তো বলেছিল, আমাকে একা বসিয়ে রেখে ওর শুতে যেতে ইচ্ছে করে না!

কতক্ষণ যে কেটে গেল! শুভ্রা উঠল না। মেয়েদের সচরাচর নাক ডাকে না, তাই ও ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানার উপায় নেই। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের নড়াচড়ার শব্দও অন্যরকম। কিন্তু নদীর গর্জনে সেই শব্দ বোঝবার উপায় নেই। আমার দু পা দিয়ে সাপের মতন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে শীত, আমার কোমরের কাছটা অবশ করে দিচ্ছে। আর দাঁড়ানো যায় না। ফিরে এলাম তাঁবুতে। নিজের শরীরটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

৮

পরদিন সকাল থেকেই রটে গেল যে রাস্তার ওপর থেকে পাথর সরাবার কাজ আগের দিন সন্ধেবেলা থেকেই শুরু হয়ে গেছে। জম্মু থেকে বিশেষজ্ঞ দল এসেছে। আজ দুপুরের মধ্যেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমরা এতদূর থেকেও কয়েকবার ডিনামাইটের শব্দ শুনতে পেলাম।

অন্যান্য তাঁবুগুলোতে এবং পহলগামের রাস্তায় সকলের ফিরে যাওয়ার তোড়জোড়। অনেকের রেলওয়ে রিজার্ভেশনের তারিখ পেরিয়ে গেছে, তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা। আজ দুপুরেই পঁয়ত্রিশখানা বাস ছাড়বে শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে।

সকালবেলা চা খেতে গিয়ে আমরা এইসব তথ্য সংগ্রহ করে আনলাম। ফিরে এসে বসলাম বড় তাঁবুতেই। শুভ্রা চ্যাটার্জির মুখখানা ম্লান। একবার বললেন, কাল রাত্তিরে আমার একদম ভালো ঘুম হয়নি, কিছুতেই ঘুম আসতে চাইছিল না। আজ একটু স্নান করতে পারলে ভালো হতো!

তাঁবুর পেছনে পর্দা ফেলে ছোট একটা স্নানের জায়গা মতন করা আছে।

আমি বললাম, আমি নদী থেকে দু' বালতি জল এনে দিচ্ছি, স্নান করে নিন না।

কিন্তু বুলবুল নদীতেই স্নান করবে বলে বায়না ধরেছে। কিছুতেই তাকে নিরস্ত করা যায় না। বার বার সে নদীর দিকে ছুটে যেতে চায়। নদীর জল সকালের দিকে আরো বেশি ঠাণ্ডা। ভোরবেলা মুখ ধোওয়ার সময় এক গাল জল নিয়ে কুলকুচো করতে গিয়ে মনে হয়েছিল যেন খুব গরম কোন জিনিস মুখে নিয়েই যেমন ফেলে দিতে ইচ্ছে করে, এই জলেরও সেইরকম অবস্থা।

শুভ্রা চ্যাটার্জি মেয়েকে বার বার বকুনি দিয়েও সামলাতে পারছেন না। দুরন্ত মেয়ের সেই এক দাবি, আমি নদীতে চান করব।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি ওকে নদী থেকে চান করিয়ে নিয়ে আসছি।

বুলবুল চোখ পাকিয়ে বলল, আমি কিন্তু ডুব দেব, তুমি আমার মাথায় মগে করে জল ঢালতে পারবে না।

—ঠিক আছে, ডুব দেবে, তাই চলো।

আগে দু' বালতি জল তুলে শুভ্রা চ্যাটার্জির তাঁবুতে পৌঁছে দিলাম। তারপর বুলবুলকে বললাম, এবার চলো। চান করে উঠে গিয়ে কিন্তু কাঁদতে পারবে না!

শুভ্রা চ্যাটার্জি শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু হবে না তো?

আমি বললাম, কোন ভয় নেই। নদীর জল, এরকম রানিং ওয়াটার, এতে কোন অসুখ হয় না।

বুলবুলের দু' হাত ধরে উঁচু করে ঝুলিয়ে নিয়ে এলাম নদীর ধারে। বড় বড় পাথরগুলোর ওপর পা ফেলে ফেলে খানিকটা দূরে এলাম। প্রথমে অল্প জলে ওর পা ডুবিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী, কেমন ঠাণ্ডা? এখনো চান করবে?

বাচ্চাদের বোধহয় শীতবোধ কম। কিংবা ঐটুকু মেয়েরও জেদ সাংঘাতিক। সে তখনো বলে, হ্যাঁ, করব।

—ডুব দেবে?

—হ্যাঁ, দেব!

খুব শক্ত করে ওর দু' হাত ধরে আমি গভীর স্রোতের মধ্যে ওকে একবার ডুবিয়েই তুলে আনলাম। কিন্তু তার আগে আমার সারা দেহে একটা ঝাঁকুনি লাগল। কাজটা ঠিক হয়নি। স্রোতের এমনই তীব্র টান যে বুলবুল সমেত আমাকেও টেনে নিয়ে যেতে পারত—যদি আমার পা সামান্য পিছলে যেত।

জল থেকে তোলার পরও বুলবুল দম আটকে যাবার মতন আঁ আঁ করে চিৎকার করছে, চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেছে। আমি ওকে তোয়ালেতে জড়িয়ে কোলে করে নিয়ে ছুটে এলাম আমার তাঁবুতে। তারপর ওকে কম্বলের মধ্যে মুড়ে ফেললাম। সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে তারপর মুছে দিলাম ওর মাথা আর গা।

এখন ও সুস্থ হয়ে উঠেছে। দুষ্টুমি করে বলল, কাকু, তুমি চান করবে না নদীতে? কী ভালো লাগে!

বাইরে ঝকঝক করছে রোদ। জামা কাপড় পরিয়ে বুলবুলকে বাইরে রোদে এনে বসিয়ে দিলাম। কিন্তু ও তো ঠাণ্ডা হয়ে বসবে না এক মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। অর্থাৎ এখনো শীত কাটাচ্ছে। হাল্কা একটা প্রজাপতির মতন বুলবুল দৌড়তে দৌড়তে অনেক দূর চলে গেল। যাক, ক্ষতি নেই। ও আর এখন নদীর জলে নামতে চাইবে না।

স্নান সেরে শুভ্রা চ্যাটার্জি একটা নতুন শাড়ি পরে বেরিয়ে এলেন। হাল্কা তুঁতে রঙের সিল্ক। ভিজে চুলে মেয়েদের মুখে একটা চিক্কণ ভাব আসে।

স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, বাঃ বেশ দেখাচ্ছে। এই শাড়িটাতেও আপনাকে বেশ সুন্দর মানিয়েছে।

সদ্য স্নান করে প্রফুল্ল মুখটাতে একটু যেন ছায়া পড়ল এই কথা শুনে। উনি বললেন, এই শাড়িটা হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় পরলাম আজ। হয়তো উচিত হয়নি—

—কেন, কী হয়েছে?

—এই শাড়িটা...

উনি থেমে গেলেন। আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওঁর চোখ নীচের দিকে, কিন্তু বুঝতে পারছেন যে, আমি ওঁর দিকেই চেয়ে আছি।

আবার মুখ তুলে বললেন, তোমাকে বলা যায়। এই শাড়িটা—আমার ভাসুর এখানকার হোটেল থেকে ওঁর যে সব জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে এই শাড়িটা ছিল। তার মানে ও আমার জন্য এখান থেকে এই শাড়িটা কিনেছিল।

—তা তো ভালোই হয়েছে। কমলেশবাবু এই শাড়িটা তো আপনার পরবার জন্যই কিনেছিলেন। আপনি পরবেন না কেন? ওঁর বেশ পছন্দ আছে তো!

—ও জানে, এই রংটা আমি ভালোবাসি—

আমার চকিতে মনে হলো, যে-লোক বেড়াতে এসে নিজের স্ত্রীর জন্য শাড়ি কেনে, সে কি হঠাৎ সাধু হয়ে যায়? আর একটা কথাও আমার মনে এলো, কমলেশ চ্যাটার্জির মৃত্যু যদি প্রমাণিত না হয়, যদি নিরুদ্দিষ্ট হয়েই থাকেন, তা হলে শুভ্রা চ্যাটার্জিরও রঙিন শাড়ি পরা কিংবা মাছ মাংস খাওয়ার অধিকার বজায় থাকবে সারা জীবন। অবশ্য, এখনকার বিধবা মেয়েরা অনেকেই এসব মানে না। না-মানাই উচিত—তবু এখনো এসব চিন্তা মন থেকে একেবারে যায়নি।

আমি বললাম, একটা কথা জানা হয়নি, কমলেশবাবুর কাছে কি টাকা পয়সা ছিল, যখন উনি হোটেল থেকে বেরিয়ে যান—

—ওঁর কাছে ঠিক কত টাকা ছিল, তার হিসেব তো জানি না। তবে, ওর সুটকেসের মধ্যে বেশ কিছু টাকা পাওয়া গেছে। তাই মনে হয়, ওর পকেটে সামান্য কিছু টাকা থাকলেও থাকতে পারে, বেশি কিছু না—

—অর্থাৎ উনি ইচ্ছে করে নিরুদ্দেশ হলে সব টাকা নিশ্চয়ই সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

—কিন্তু যদি কেউ সাধু হয়ে যেতে চায়, তা হলে কী টাকা পয়সার কথা চিন্তা করবে?

—শিক্ষিত সাধু সন্ন্যাসীদের টাকা পয়সা লাগে নিশ্চয়ই। তারা কি ভিক্ষে করে আহার্য জোটাতে পারে? অবশ্য, উনি ইচ্ছে করে হোটেলের ঘরে সুটকেসের মধ্যে কিছু টাকা রেখে যেতে পারেন, যাতে অন্যদের এই ধারণা হয়, উনি ইচ্ছে করে কোথাও চলে যাননি। হয়তো, গোপনে ওঁর কাছে আরো বেশ কিছু টাকা ছিল।

—সে সম্ভাবনা খুবই কম। ওর ব্যাঙ্কের অ্যাকাউনট যেমন ছিল তেমনি আছে। আলাদা টাকা আসবে কোথা থেকে?

—আপনি তা হলে এখন কী করতে চান? আমরা এখন তাহলে এখানেই থাকব?

—তুমি কাল রাত্তিরে আমাকে তুমি বলছিলে। আজ আবার আপনি বলছ কেন?

—কাল বোধহয় বেশি ব্র্যাণ্ডি খেয়ে আমার নেশা হয়ে গিয়েছিল।

—কই, সেরকম মনে হয়নি তো! শুধু একটু অদ্ভুত ধরনের কথা বলছিলে। আমি তোমাকে আগ বাড়িয়ে তুমি বলেছি, তুমিও আমাকে অনায়াসেই তুমি বলতে পার।

—তা পারি। কিন্তু বুলবুল কী ভাববে? এতক্ষণ ওর মাকে আমি আপনি বলছিলাম, হঠাৎ যদি তুমি বলতে শুরু করি?

—ও কিছু বুঝবে না।

—বাচ্চারা অনেক কিছু বোঝে!

—আমি বলছি তো, তাতে কিছু হবে না। আমার স্বামীর বন্ধুরা অনেকেই আমাকে তুমি বলে। এতে অস্বাভাবিক কী আছে?

—প্রথম দিনই কেন এ কথা তোমার মনে পড়েনি?

—তখনো তো তোমাকে ভালো করে চিনতাম না।

—ভালো করে না চিনেই বুঝি একজনকে তুমি বলে ডাকা শুরু করা যায়?

—তুমি আবার আমার সঙ্গে রেগে কথা বলতে শুরু করলে? আমার সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে না।

—আচ্ছা, এইমাত্র যদি কমলেশ চ্যাটার্জি এখানে এসে হাজির হন, তাঁর কাছে আমার কী পরিচয় দেবে?

—বলব, তুমি আমার একজন নতুন বন্ধু।

হঠাৎ গলা চড়িয়ে শুভ্রা বলল, তুমি কি ভাবছ, আমি আমার স্বামীকে ভয় করি? ও যদি ফিরে আসে, আমি তার পরেও ওর সঙ্গে থাকব? কক্ষনো নয়! ও আমাকে অপমান করেছে। আমি শুধু আসল সত্যিটা জেনে যেতে এসেছি।

আমি একটু নরমভাবে বললাম, উনি যদি ফিরে আসেন, উনি নিশ্চয়ই তোমার কাছে ক্ষমা চাইবেন। উনি তোমাকে অপমান করতে চাননি। ধর্মের টানে যাঁরা ঘর ছাড়ে তারা কি কারুকে অপমান করতে চায়? চৈতন্যদেব কি তাঁর স্ত্রীকে অপমান করতে চেয়েছিলেন? অন্যদিকের টানটা হঠাৎ বেড়ে যায় বলেই—

—ওসব বড় বড় কথা আমি শুনতে চাই না। আমার স্বামী চৈতন্যদেব নন, নিতান্ত সাধারণ মানুষ।

—তাহলে আমরা এখন কী করব, এখানেই থাকব?

—আমি একবার অমরনাথ পর্যন্ত যেতে চাই।

—অসম্ভব! কাল সন্ধেবেলা আমি ভালো করে খবর নিয়েছি। জুলাই মাসের আগে রাস্তা খুলবে না। এখন ওদিকে যাওয়া অসম্ভব।

—পায়ে হেঁটেও যাওয়া যাবে না?

—না।

—কিন্তু অসম্ভব কাজও তো কেউ কেউ করতে চায়। কমলেশ স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত, ও কি একবার চেষ্টা না করে ছাড়বে? তুমি জানো পহলগামে, হয়তো আমরা যেখানে আছি এই জায়গাতেই স্বামীজী তাঁবু খাটিয়ে ছিলেন। নিবেদিতা খৃষ্টান বলে তাঁকে অমরনাথে যেতে দিতে অনেক সাধু আপত্তি জানিয়েছিল।

—শেষ পর্যন্ত তিনি গিয়েছিলেন তো?

—হ্যাঁ! কাল বললাম না, স্বামীজী নিবেদিতাকে অমরনাথে শিবের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন! শেষ পর্যন্ত নাগা সাধুরা বিবেকানন্দকে সমর্থন করেছিলেন।

ধর্মের গোঁড়ামিগুলো এরকম উদ্ভটই হয়। অমরনাথের রাস্তার চড়নদাররা সবাই মুসলমান। একদল মুসলমান রাখালই তো প্রথমে ঐ গুহা আর বরফের শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করে।

—তুমি ওখানে গেছ?

—হ্যাঁ, আগেরবার।

—সেইজন্যই তোমার আর যাওয়ার আগ্রহ নেই। শোনো, তোমাকে আমি জোর করে আটকে রাখতে চাই না। তুমি ইচ্ছে করলে আজই ফিরে যেতে পারো। আমি ঐ দিকে একবার যাবার চেষ্টা করবই। এতদূর যখন এসেছি, তখন শেষ না দেখে—

—এটা এক ধরনের পাগলামি ছাড়া কিছুই না।

—হয়তো তাই। সবাই আমাকে জেদী বলে।

—তোমার মেয়েটিও তোমার মতনই জেদী হয়েছে।

—তুমি কাল রাত্তিরে অনেকক্ষণ জেগে ছিলে?

—হ্যাঁ।

—আমাকে ডাকলে না কেন? তোমার সঙ্গে গল্প করতাম। আমারও তো ঘুম আসছিল না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। একটু হাসিও পেল। এই রকমই হয়, কোন জিনিসই ঠিক ঠিক মেলে না! যাক ভালোই হয়েছে!

আমি বললাম, সে তো কাল রাত্তিরের কথা। সে কথা হঠাৎ এখন কেন? এখন আমরা কী করব, তাই ঠিক করতে হবে। এই জায়গার সম্পর্কে আমার যা অভিজ্ঞতা, তাতে আমি জানি, কোন নতুন লোকের পক্ষে এখানে আত্মগোপন করে থাকা এমনকি সাধু সেজে থাকাও, বেশিদিন সম্ভব নয়। এখানকার জঙ্গলে ফলমূল পাওয়া যায় না। পাহাড়ের ওপর শুধু পাইন আর পপলার গাছ। সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে হলে কারুকে লোকালয়ে আসতেই হবে। তখনই তার কথা জানাজানি হয়ে যাবে।

—যদি পাহাড়ের ওপর ছোট্ট কোন গ্রামে গিয়েই সে থাকে, কে তার কথা এখানে জানবে?

—গভর্নমেন্ট থেকে যখন খোঁজ করা হয়েছে, তখন জানা যেতই।

—তবু আমি নিজে একবার খোঁজ নিতে চাই।

—বেশ তো ভালো কথা।

—তুমি আজ ফিরে যেতে চাও?

—আর তুমি পাহাড়ী রাস্তায় বুলবুলকে নিয়ে একা যাবে? আমাকে কি এতটা স্বার্থপর মনে হয়?

—না, স্বার্থপর আমিই। আচ্ছা, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। লোকে তো কাশ্মীরে সাধারণত একবারই আসে। তুমি দু'বার এসেছ কেন?

—এর একটা কারণ আছে। ছেলেবেলায়, তখন আমি স্কুলে পড়ি, বোধহয় ক্লাস নাইনে, আমাদের স্কুল থেকে কিছু ছাত্রকে কাশ্মীরে বেড়াতে আনা

হয়েছিল—আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এসেছিল, কিন্তু আমার বাবা আমাকে আসতে দেননি। ঠিক যে টাকা পয়সার অভাবের জন্য, তা নয়, তিনি আমাকে একা ছাড়তে চাননি। বন্ধুদের কাছে আমার কতটা অপমান হয়েছিল, ভাবো ? কান্নাকাটি করেছি, না খেয়ে থেকেছি, তবু বাবা রাজি হননি। তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বড় হয়ে নিজে যখন টাকা রোজগার করব, তখন বার বার কাশ্মীরে যাব। এই তো সবে দু'বার হলো, আরো অনেকবার আসব।

—বাবাঃ ! তুমিও তো দেখছি কম জেদী নও !

এই সময় বুলবুল ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো। আমার কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, কাকু তুমি যে বলেছিলে, আমাকে সত্যিকারের ঘোড়ায় চড়াবে ? চড়ালে না ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, চড়াব। চলো !

শুভ্রাকে ইশারা করলাম উঠে পড়তে। আমরা এগিয়ে গেলাম ব্রীজের দিকে। খটাখট শব্দে অনেক তাঁবুর খুঁটি ওপড়ানো শুরু হয়ে গেছে। জনস্রোত চলেছে শহরের বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। সবাই ফেরার জন্য ব্যস্ত।

ব্রীজের কাছে এসে আমি নিম্নস্বরে বললাম, তুমি একটু বুলবুলকে নিয়ে একা থাকো, আমি একটু এগোচ্ছি। কমলেশ চ্যাটার্জির ছবিটা আমাকে একটু দাও তো।

শুভ্রা হাত-ব্যাগ থেকে ছবিটা বার করল। সুট টাই পরা কমলেশ চ্যাটার্জি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর জন্য আমার দুঃখ হলো। নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছু চাওয়ার ও পাওয়ার ছিল এই মানুষটির।

ছবিটা হাতে নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম ঢালু জায়গাটার দিকে। এখান থেকে রাস্তাটা উঁচু হয়ে শহরে উঠেছে। এখানে ঘোড়াওয়ালারা সবাই দাঁড়িয়ে থাকে। আরু কিংবা কাছাকাছি দু একটা জায়গায় অনেক লোক এই সময়েও ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে যায়। আজ অবশ্য এদিকে যাত্রী একদম নেই।

আমি ঘোড়াওয়ালাদের জনে জনে সেই ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, এই লোকটিকে কেউ দেখেছে কিনা। না, ওরা কেউ দেখেনি। গভর্নমেন্টের লোকও ওদের এই লোকটির কথা জিজ্ঞেস করেছিল।

আমি আরো জানতে চাইলাম, এখন অমরনাথ যাওয়া কোনোক্রমে সম্ভব কিনা। ওরা সবাই একবাক্যে জানাল, সে প্রশ্নই ওঠে না। তবে ঘোড়া নিয়ে ঐ রাস্তায় চন্দনবাড়ি পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে—কিন্তু রাস্তায় এখনো অনেক জায়গায় বরফ। আর চন্দনবাড়ির ঠিক পরেই এমন বিশাল বরফের ঢল নেমে থাকে যা পেরুনো অসম্ভব বলা চলে।

'তিন সপ্তাহ আগে এই রাস্তায় আরো বেশি বরফ ছিল। সেই সময়, ঘোড়া

না নিয়ে, পায়ে হেঁটে কমলেশ চ্যাটার্জি ঐ দিকে যেতে চাইবে? যদি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়ে থাকে তো সে আলাদা কথা। আর অসম্ভবকে সম্ভব করে অমরনাথে পৌঁছেই বা তাঁর লাভ কী? সেই বরফের শিবলিঙ্গ তো এখন দেখা যাবে না। এখন তো সেখানে সবই বরফ—এখানকার বরফ আর সেখানকার বরফে কোনো তফাত তো নেই। কমলেশ চ্যাটার্জি কি এমনই কাণ্ডজ্ঞান হারাবে?

সব কথা ফিরে এসে শুভ্রাকে জানাতেই সে বলল, আমি তা হলে অন্তত চন্দনবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে দেখব।

আমি বুঝে গেছি যে এই জেদী নারীকে কিছুতেই নিরুদ্যম করা যাবে না। চন্দনবাড়ি পর্যন্তই যাওয়া যাক। সেখানে গিয়ে সে নিজের চোখে দেখুক যে আর সামনে এগোবার পথ নেই।

দুটো ঘোড়া ভাড়া করলাম। বুলবুল আলাদা একটা ঘোড়ায় চড়তে চায় সে অন্য কারুর সঙ্গে যাবে না। কিন্তু ওর জন্য আলাদা একটা ঘোড়া নেবার কোনই মানে হয় না। প্রথম কিছুটা পথ বুলবুলকে আমার ঘোড়ায় চাপিয়ে আমি হেঁটে হেঁটে গেলাম পাশে পাশে। ঘোড়াওয়ালা দুটোই প্রায় বাচ্চা ছেলে, তারা বুলবুলকে ধরে রইল। শুভ্রাকে ধরবার দরকার নেই, তার ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস আছে মনে হয়। ঘোড়ার ওপর তার ঋজু হয়ে বসে থাকা মূর্তি, প্রায় কোনো রাজেন্দ্রাণীর মতন দেখায়।

আমি ঘোড়ায় চেপে বিশেষ আরাম পাই না। অভ্যেস নেই বলে ভয় ভয় করে। এখানকার ঘোড়াগুলো অবশ্য ছোটো ছোটো আর এমনই শিক্ষাপ্রাপ্ত যে কিছুতেই দৌড়োয় না, শুধু হাঁটি হাঁটি পা পা করে। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ ঘোড়াওয়ালাগুলো ওদের গায়ে ছপটি মারলে এমন তড়বড় শুরু করে যে তখন বিচ্ছিরি লাগে। আর এই ঘোড়াগুলোর একটা দোষ, এরা একেবারে খাদের ধার ঘেঁষে ঘাস খাওয়ার জন্য মুখ বাড়ায়। তখন যে পিঠে একটা সওয়ারি আছে, সে কথা ভুলে যায় ওরা। সেই সময় খাদের মধ্যে একবার হুমড়ি খেয়ে পড়লেই একেবারে ঢাকী সুদ্ধু প্রতিমা বিসর্জন।

সমতল ছেড়ে রাস্তাটা পাহাড়ে উঠেছে। এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে দশ মাইল পথ, তারপর চন্দনবাড়ি। খানিকটা দূর যাবার পরই বিশাল বিশাল পাহাড় গোল হয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। প্রতিটি পাহাড়ের মাথায় বরফের মুকুট। না, মুকুট বলা চলে না, বলা উচিত বরফের রাজপ্রাসাদ। প্রত্যেকের আলাদা রূপ।

লিদ্দার নদী আমাদের পাশে পাশে ঠিক চলেছে। এক এক সময় সে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যায়, আবার একটু বাদেই ফিরে আসে। বেশ কিছুক্ষণ সে ছিল আমাদের খুব কাছাকাছি, এখন চলে গেছে পাহাড়ের অনেক নীচে—কোথাও সে

জলপ্রপাত হয়ে বিপুল শব্দে নীচে লাফাচ্ছে, কোথাও তার ওপর নুয়ে পড়েছে বড় বড় গাছ। প্রায়ই সে এদিক ওদিকের পাড় ভাঙে। বুলবুল ওর মায়ের ঘোড়ায়। আমার ঘোড়াটি তার পাশে পাশেই যাচ্ছে।

আমাদের পথ ক্রমশ ওপরে উঠে আসছে। বুলবুলকে এখন তুলে দিয়েছি ওর মায়ের ঘোড়ায়। আমার ঘোড়াটি তার পাশে পাশেই যাচ্ছে। কখনো কখনো ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যাচ্ছে গায়ে গায়ে। ঘোড়াগুলো এত বেতরিবৎ যে লাগাম টানলেও অন্যদিকে যায় না। ওরা শুধু মালিকের কথা ছাড়া আর কারুর কথা শোনে না। বুলবুল এতে বেশ মজা পাচ্ছে, কাছাকাছি এলেই সে চেঁচিয়ে উঠছে, আমরা ফার্স্ট হবো, আমরা ফার্স্ট মা, তুমি আগে চলো!

বেশ কিছুদূর আসবার পর এক জায়গায় কাঠের খটাখট শব্দ পেলাম। একটা বাঁক ঘুরতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। নতুন কাঠ দিয়ে একটা ব্রীজ সারানো হচ্ছে। ঘোড়াওয়ালাদের কাছে শুনলাম, পাহাড় থেকে ধ্বস নেমে ব্রীজটা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল, মাত্র তিনদিন হলো এটাকে ঠিক করা হয়েছে। এর আগে বেশ কিছু দিন কেউ এদিক থেকে ওদিকে যেতে পারেনি।

ব্রীজটার তলায় একটি চওড়া ঝরনা। ছোটোখাটো জলপ্রপাত বলা যায়। কারুর পক্ষে পায়ে হেঁটে সেটা পেরুনো অসম্ভব।

আমি শুভ্রার মুখের দিকে তাকালাম। আমার দৃষ্টি দিয়ে তাকে বোঝাতে চাইলাম, কমলেশ চ্যাটার্জি এদিকে এসে থাকলেও ওপারে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

শুভ্রা কোন কথা বলল না, সে গম্ভীরভাবে সামনের দিকে চেয়ে আছে।

ব্রীজটা পেরিয়ে যাবার খানিকটা পরেই একটা ছোট্ট লোকালয় এল। সেখানে একটি চায়ের দোকান আছে। অন্যরকম পানীয়ও পাওয়া যায়। সেখানে নেমে পড়লাম ঘোড়া থেকে।

দোকানের মধ্যে ঢুকে আমি কমলেশ চ্যাটার্জির ছবিটা দেখালাম। না, ঐ লোককে সে দেখেনি। এ দিক দিয়ে কি এর মধ্যে কোন লোকই যায়নি? হ্যাঁ গেছে, সাহেবরা গেছে, আর দেশী লোক দু' চারজন। ব্রীজটা ভাঙবার আগে কিছু লোক গেছে।

এদিকে কোন নতুন সাধু এসেছে?

না।

কোন বাঙালিবাবু এদিকে একা এসে আছে?

না। গভর্নমেন্টের লোকও তাকে এই কথাই জিজ্ঞেস করেছিল কিছুদিন আগে। শখের গোয়েন্দারা অনেক রকম চমকপ্রদ উপায় বার করে। কিন্তু আমার

সেদিকে কোন প্রতিভা নেই। আমার বদলে, শুভ্রা চ্যাটার্জি কোন গোয়েন্দার সাহায্য নিলে পারতেন।

দেখা যাচ্ছে, গভর্নমেণ্ট অনুসৃত পন্থার চেয়ে নতুন কিছু করতে পারছি না আমরা।

এ দোকানে এখন এক কাপ চায়ের দাম এক টাকা। কাপে করে চা দেয় না অবশ্য, দেয় গেলাস ভর্তি করে। সেই গরম চা ভর্তি গেলাসটা দু' হাত দিয়ে ধরে থাকলেই বেশ আরাম লাগে। গেলাসের মধ্যের জিনিসটাকে অবশ্য চা বলা শক্ত, খাঁটি ভেড়ার দুধে একটা বুনো পাতার গন্ধ। তাও খেতে খারাপ লাগে না।

ঘোড়াওয়ালারা তাড়া দিচ্ছে। ওরা চন্দনবাড়িতে থাকবে না, আজই ফিরে আসবে। আমাদের বেরুতে বেশ দেরি হয়ে গেছে—ফেরার সময় যদি অন্ধকার হয়ে যায়, তা হলে খুব মুশকিল হবে ওদের। মাঝে মাঝে রাস্তা খুব খারাপ।

সেখান থেকে বেরুবার পর প্রকৃতি আরো নিবিড় হয়ে এল। চারদিকে শুধু পাহাড়, তার মধ্যে আমরা মাত্র কয়েকটা বিন্দু। এখানে এলে মনটা এমনিতেই ভারী হয়ে আসে। কমলেশ চ্যাটার্জিকে খোঁজার উপলক্ষে হলেও এ রাস্তায় আমি দ্বিতীয়বার এসে ভুল করিনি। না এলেই ভুল করতাম। শুভ্রাকে আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না। কারণ এর আগেই একবার সে বলেছিল যে কাশ্মীরে সে দৃশ্য দেখতে আসেনি। প্রকৃতি দেখার দিকে এখন তার মন নেই।

এই রাস্তাটা এখন ফাঁকা হলেও দু'এক সপ্তাহের মধ্যে পর্যটকের ভিড়ে ভরে যাবে। পহলগাম থেকে অনেকেই চন্দনবাড়ি পর্যন্ত বেড়াতে আসে ঘোড়া নিয়ে। তারপর জুলাই মাস থেকেই তীর্থযাত্রীদের অগণন শোভাযাত্রা। এর চেয়ে ঢের দুর্গম পাহাড়ী পথ আছে, পর্বত অভিযাত্রীরা আরো কত বিপদের মধ্য দিয়ে যায়—কিন্তু তবুও অস্বীকার করা যাবে না, পহলগাম থেকে চন্দনবাড়ির পথের দৃশ্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৃশ্যাবলীর একটি।

মাঝে মাঝেই মেঘ নীচু হয়ে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে দু'এক পশলা। ভিজতেই হচ্ছে, কোন উপায় নেই। রাস্তার এক-একটা জায়গা এমন ফাকা যে কাছাকাছি কোন গাছও নেই যে দাঁড়াব। রেইন কোট আর শেষ পর্যন্ত আমার কেনা হয়নি। শুভ্রার সঙ্গে একটা রেইন কোট আছে, সেটা দিয়ে সে বুলবুলকে সুদ্ধু ঢেকে নিয়েছে।

শুভ্রা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এরকম বৃষ্টিতে কতক্ষণ ভিজবে?

আমি হেসে বললাম, উপায় কি? আর তো কিছু করার নেই।

ও বলল, তারপর তোমার যদি ঠাণ্ডা বসে যায়!

—না, কিছু হবে না। রোদ্দুর উঠলেই তো শুকিয়ে যাচ্ছে।

—আমার খুব খারাপ লাগছে। একটা কোন গাছতলা এলেই আমরা দাঁড়াব।

কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়াব? পাহাড়ের ওপর তো মাঝে মাঝে বৃষ্টি হবেই এ সময়।

একজন ঘোড়াওয়ালা একটা ব্যবস্থা করে দিল। ওরা দু'জন অনর্গল ভিজছে, ওদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এতখানি রাস্তা ওরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে আসছে তো বটে। এই পাহাড়ে আমরা এক শো গজ দৌড়লেই হাঁপিয়ে যেতাম। ওদের একজন তার ঘোড়ার জিনের তলা থেকে এক টুকরো তেরপল টেনে বার করল। সেটা আমার হাতে দিয়ে বলল, সাব, এটা মাথায় জড়িয়ে নিন।

সেই তেরপল গায় মাথায় জড়িয়ে আমার এক কিম্ভূতকিমাকার চেহারা হলো। বুলবুল আমাকে দেখে খিলখিল করে হাসতে লাগল। শুভ্রাও হাসি চাপতে পারছে না।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে আমরা প্রথম হিমবাহের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। প্রায় দু' তিনশো গজ জুড়ে বিশাল এক হিমবাহ নেমে গেছে পথের ওপর দিয়ে। অনেক নীচে লিদ্দার নদী।

কেউ কোদাল দিয়ে বরফের খানিকটা কেটে কেটে একটা রাস্তা বানাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওপর থেকে আবার বরফ গলে গলে সে রাস্তা প্রায় বুজে গেছে। তবু রাস্তার আভাস দেখা যায়।

এর ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া অসম্ভব। কোথাও বরফ সামান্য পাতলা থাকলে আর দেখতে হবে না। ঘোড়াওয়ালারা বলল, ওরা আগে ঘোড়া দুটোকে নিয়ে যাবে। ঘোড়ারা তাদের অনুভূতি দিয়ে বোঝে যে কোনখান দিয়ে যাওয়া নিরাপদ। ঘোড়াগুলোকে পার করে রেখে এসে তারপর সেই পথ দিয়ে ওরা আমাদের হাত ধরে ধরে নিয়ে যাবে।

ওরা ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যেতে লাগল, আমরা একটা পাথরের ওপর বসলাম। বুলবুলের খিদে পেয়েছে, তাকে দেওয়া হলো বিস্কুট আর টফি। এতক্ষণ ঘোড়ার ওপর বসে থেকে আমার হাতে এবং সারা গায়ে একটা ঘোড়া ঘোড়া গন্ধ হয়ে গেছে।

শুভ্রা মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চার দিকটা দেখছে। চতুর্দিকের পর্বত শৃঙ্গগুলিও যেন দেখছে আমাদের। নির্জনতা এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

যে দিক থেকে হিমবাহটি নেমেছে, সেই গিরিচূড়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে শুভ্রা জিজ্ঞেস করল, এটার নাম কী?

আমি বললাম, সবগুলো শিখরের নাম তো জানি না। এখানকার লোকেও জানে কিনা সন্দেহ। তবে ডান দিকের কোণে ঐ যে পাহাড়টা মাথা উঁচু করে আছে, ঐটাই শেষনাগ। ওর গা দিয়ে অমরনাথে যেতে হয়। লিদ্দার নদী ঐখান থেকে এসেছে।

শুভ্রা বলল, এখানে এলে মনে হয় না, মানুষের দুঃখ কত ছোট ? এত বিরাট জিনিস দেখলে দেবতা কিংবা ঈশ্বরের কথা মানতে ইচ্ছে হয়। এই সব কিছুর মধ্যে একটা অদ্ভুত শান্তি আছে—এর তুলনায় আমাদের দুঃখগুলো কত সামান্য। এখন যেন বুঝতে পারছি, কোনো আকর্ষণে মানুষ এখানে এসে থাকতে চায়...আরো একটা ব্যাপার খুব অদ্ভুত লাগছে, তিনদিন আগে তোমাকে চিনতামও না, অথচ আজ এই পাহাড়ের কোলে একটা পাথরের ওপরে আমরা বসে আছি, যেন আগে থেকেই এটা আমাদের নিয়তিতে নির্দিষ্ট করা ছিল, অথচ আগে কখনো ভাবিইনি, তোমার আশ্চর্য লাগছে না ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তবে পথে বেরিয়ে তো মানুষের সঙ্গে এরকম দেখা হয়ই !

শুভ্রা বলল, পথে...হ্যাঁ পথে বেরিয়েই তো...সবার সঙ্গে তো পথেই দেখা, একমাত্র নিজের মা ছাড়া মানুষ তো আর সবাইকে পথে বেরিয়েই চেনে...

—তাও সবার সঙ্গে পুরোপুরি চেনাশুনো হয় না। দেখা হয়, কিন্তু চেনা হয় না। যেমন তোমাকে আমি এখনো চিনতে পারিনি।

—আমি তো সামান্য একটি মেয়ে, আমার মধ্যে তো না-চেনার কিছু নেই।

—তবু কাল রাত্রে তোমাকে মনে হচ্ছিল অনেক দূরের কেউ, বহুদূরের, তোমাকে ছোঁওয়া যায় না।

শুভ্রা আর কোন কথা না বলে আমার হাতের ওপর একটা হাত রাখল। তখন আমার মনে হলো এ রকম একটু স্পর্শে মানুষ কত কাছাকাছি চলে আসে। কত স্বাভাবিক হওয়া যায়। বুকের মধ্যে আর ভার ভার ভাবটা নেই।

পাতলা মেঘগুলো ধোঁয়ার মতন উড়ছে। এক এক সময় চোখের সামনে থেকে সমস্ত পাহাড় আড়াল হয়ে যায়, আবার সরে যায় মেঘ। সব মিলিয়ে এই নিসর্গের মধ্যেও যেন অনৈসর্গিক কোন উপলব্ধি আসে। মানুষ তো এত বিরাটের কাছাকাছি খুব বেশি আসে না, তাই এরকম জায়গায়, মুগ্ধতার চেয়ে বেশি এক ধরনের আবিষ্টতা তাকে পেয়ে বসে। তার নামই বোধহয় সন্ন্যাস।

শুভ্রা একদৃষ্টে সেই ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ দেখছে। সে বলেছিল, এবার তার প্রকৃতি দেখার মন নেই। কিন্তু এখন সে অভিভূত হয়ে পড়েছে।

সে আবার আস্তে আস্তে বলল, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই জায়গাটার খুব কাছেই স্বর্গ, এই পাহাড়গুলো যেন সেখানে যাবার সিঁড়ি—এই যে মেঘ, ঠিক ধূপের ধোঁয়ার মতন, মনটা এমন শান্ত হয়ে আসছে...সত্যি এসব জায়গা থেকে ফিরতে ইচ্ছে করে না—

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। ঘোড়াগুলো খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে এইমাত্র অন্যদিকে পৌঁছোলো। এবার ছেলে দুটি ফিরে আসছে। পা পিছলে যাবার ভয়ে ওরা ওদের হাতের ছপটি দিয়ে ভর রাখছে বরফের ওপর। আমাদেরও সঙ্গে একটা করে লাঠি থাকলে হতো। কাছাকাছি সে রকম কোনো গাছ নেই যে ভেঙে নেওয়া যায়। আমি গাছ খোঁজবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মা বলে একটা চিৎকার শুনলাম। তারপরই শুভ্রার আর্তনাদ, বুলবুল!

একটুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে আমরা বুলবুলকে দেখিনি। সে নিজের খোবার ফেলে একটা ফড়িং ধরবার জন্য ছুটে গিয়েছিল। এখন সে বরফের ওপর গড়াচ্ছে। শুভ্রা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে ধরবার জন্য ছুটল।

আমি বুলবুলকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা না করে কোনোরকমে শুভ্রার একটা হাত চেপে ধরবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না নিজেও তাল সামলাতে। সঙ্গে সঙ্গে আমি উল্টো দিকে ফিরে একটা পাথর চেপে ধরলাম। আমার ধাক্কায় শুভ্রা হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে একটা ঘোড়াওয়ালা ছুটে এসে শুভ্রাকে মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরেছে। অন্য ঘোড়াওয়ালাটি হিমবাহের ওপর দিয়েই কোনাকুনি ছুটে গিয়ে বুলবুলকে পেরিয়ে গেল, তারপর বরফে পা গেঁথে দাঁড়িয়ে, বুলবুল গড়িয়ে তার কাছে আসতেই বুকে জড়িয়ে ধরল।

শুভ্রা ঘোড়াওয়ালাটিকে ঠেলে সরিয়ে উঠে বসে পাগলের মতন চ্যাঁচাতে লাগলো, বুলবুল, বুলবুল!

আমি এবার সাবধানে ওর কাছে গিয়ে বললাম, সব ঠিক আছে, ঐ তো বুলবুলকে নিয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছ না?

শুভ্রা তখনও বুঝতে পারেনি কেন আমি ওকে ধাক্কা দিয়েছি, কেন একজন ঘোড়াওয়ালা ওকে মাটির ওপর চেপে ধরেছিল। ঘোড়াওয়ালাটাই তাকে বুঝিয়ে দিল। সে ঝাঁঝালো ভাষায় শুভ্রাকে ধমকাতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে! মাইজী কি বাচ্চা, কিছুই জানেন না? পাহাড়ে কেউ নীচের দিকে দৌড়োয়? এতে ঐ লেড়কি শুধু নয়, মাইজীও মরতেন।

বুলবুলের হালকা শরীর, সে কয়েক পাক গড়িয়ে গেলেও তার লাগেনি বিশেষ। কিন্তু বয়স্কদের ভারী শরীর একবার গড়াতে শুরু করলে আর থামে না। পাহাড়ে অনভিজ্ঞ হয়ে যে অন্যকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, সে-ই আগে মরে। বরফ এখন শক্ত আর পিচ্ছিল হয়ে আছে, হাত দিয়ে ভাঙা যায় না পর্যন্ত। প্রায় আধ মাইল নীচে নদী। সেই পর্যন্ত গড়িয়ে পড়লে শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত।

শুভ্রার এখনো ঘোর কাটেনি। বুলবুলকে সে হাত বাড়িয়ে কোলে নিয়ে নীচেই

বসে রইল, উঠতে পারছে না। বিহ্বলের মতন বলল, বুলবুল যদি মরে যেত, তাহলে আমি কী করতাম?

—এমন দুরন্ত মেয়ে, একটুও চোখের আড়াল করার উপায় নেই।

—যদি বুলবুলের কিছু হতো, তা হলে আমি কী করতাম বলো না? তাহলে তো আমার বেঁচে থাকবার কোন মানেই থাকত না।

আমি বললাম, কিছু তো হয়নি! উঠে পড়ো! পাহাড়ে এরকম প্রায় মরে যাবার মতন ঘটনা অনেকবার হয়। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

শুভ্রা তবু বুলবুলের মাথায় হাত বুলোচ্ছে। চুলগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে দেখছে, যদি কোথাও লেগে থাকে!

আমি বললাম, কী বুলবুল, কেমন লাগল? বেশ গড়িয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে—

বুলবুল বলল, আমার একটুও লাগেনি।

—আর একবার যাবে নাকি?

—হ্যাঁ যাবো!

—এসো, এবার আমরাই তোমাকে ফেলে গড়িয়ে দিই!

ঘোড়াওয়ালাদের হাত ধরে ধরে আমরা হিমবাহটা পার হলাম। নীচের দিকে তাকালে বুক দুরদুর করে। খানিকটা ঢালু হয়ে যাবার পর একদম খাড়াভাবে নেমে গেছে নদীতে। সেখানে লিদ্দারের জল ফুলে ফেঁপে লাফাচ্ছে একেবারে। জলের মধ্যে সাদা সাদা বরফের চাঁই ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

আবার ঘোড়ায় উঠলাম এপারে এসে। কিছুটা যাবার পর আরো দু'বার বরফ পাওয়া গেল পথে। তবে আগেকার মতন ঢালু জায়গা নয়, প্রায় সমতল, বরফও বেশ নরম, অনেকটা প্যাচপেচে কাদার মতন। এখানেও আমরা কিছুক্ষণ থেমে বুলবুলকে বরফের ওপর খেলা করতে দিলাম। মুঠো-মুঠো বরফ তুলে গোল্লা পাকিয়ে সে আমাদের গায়ে ছুঁড়ে মারছে। ঠিক বরফের ওপর এলে শীত তেমন বেশি লাগে না। গায়ে বরফ পড়লেও জামা কাপড় ভেজে না।

আর এক জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে খানিকটা হাঁটতে হলো। এখানে বরফ নেই, কিন্তু রাস্তার মাঝখানটা ভেঙে বসে গেছে। সেখান দিয়ে ঘোড়া পার করার উপায় নেই। খানিকটা পিছিয়ে এসে খাড়া পাহাড়ের ওপর উঠতে হলো, বুলবুল অবশ্য বসে রইল একটা ঘোড়ার পিঠে, আমি আর শুভ্রা হাঁটতে লাগলাম। জায়গাটা ছোট ছোট আলগা পাথরে ভর্তি। খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়। শুভ্রা নিজে থেকেই আমার একটা হাত চেপে ধরল। খুব শক্ত করে। দু'জনে ধরে ধরে উঠলে ব্যালান্স হারাবার ভয় কম থাকে।

শুভ্রা বলল, সবাই কি এত কষ্ট করে এই পথ দিয়ে যায়?

—আগেকার তীর্থযাত্রীদের নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি কষ্ট হতো। তখন তো এরকম রাস্তাও ছিল না। তবে, আর দু'এক সপ্তাহ পরে টুরিস্ট সিজন শুরু হয়ে গেলে, এইসব ভাঙা রাস্তাও ঠিকঠাক হয়ে যাবে, তখন এত কষ্ট হবে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ যখন এ পথ দিয়ে যান, তখন তাঁর শরীর ভালো ছিল না। শেষের দিকে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মনের জোর তো ছিল অসাধারণ, অমরনাথের গুহায় ঢোকার সময় নদীতে স্নান করেছিলেন!

—তুমি তো বিবেকানন্দ সম্পর্কে অনেক পড়াশুনো করেছ।

—কমলেশ পড়ত খুব—ওর মুখেই শুনতাম। কিন্তু একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করেছ? এইসব রাস্তায় যতই কষ্ট হোক, কক্ষনো ইচ্ছে করে না ফিরে যেতে।

—তা ঠিক। কেউ বোধহয় মাঝ পথ থেকে ফিরে যায় না।

—আচ্ছা, এরকম কষ্ট করে, কিংবা এর চেয়েও হয়তো বেশি কষ্ট হবে—তবু কেউ এই সময় অমরনাথ যেতে পারে না?

—চন্দনবাড়িতে গিয়েই সেটা বোঝা যাবে।

চন্দনবাড়িতে পৌঁছতে প্রায় দুটো বাজল। আগেরবার এসে দেখেছিলাম, এখানে তিন চারটে খাবারের দোকান আর কয়েকটা চটি ছিল। এখন যাত্রী সমাগম নেই বলে, কোনটাই খোলা নেই। আমাদের সঙ্গে অবশ্য পাঁউরুটি আর জেলি আছে। তবু এক চটিওয়ালাকে ধরে গরম ভাত আর ভিণ্ডির সবজি তৈরি করে দিতে রাজি করালাম। একটা পাকা টুরিস্ট বাংলোও তৈরি হয়েছে, নেহাৎ রাত্রে থাকতে হলে ওখানে ঘর পাওয়া যাবে।

খাওয়া-দাওয়ার আগেই শুভ্রা সামনের রাস্তাটা আর একটু এগিয়ে দেখতে চায়। ঘোড়াওয়ালা থেকে সবাই বলল যে, একটু পর থেকেই রাস্তা একেবারে বন্ধ, এই সময় অমরনাথে কেউ যায় না। সেখানে কোন মানুষজনও থাকে না। দু'একজন সাধু থাকে অবশ্য। সেইসব সাধুরা কী ভাবে যায়, কী তারা খায়, তা বলতে পারবে না কেউ।

শুভ্রা আর বুলবুলকে নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। বেশি দূর যেতে হলো না। চন্দনবাড়ি একটা ছোট্ট উপত্যকা, দু'তিন শো গজ যেতেই আবার পাহাড়ের দেশ। প্রথমেই একটা নিকষ কালো রঙের শক্ত চেহারার বরফহীন পাহাড় খাড়া হয়ে আছে, সেটা যেন অমরাবতীর সিংহদ্বার। সেটার পাশ দিয়ে আসতেই সামনে জেগে উঠল এক ধবল দেশ। যতদূর চোখ যায়, শুধু বরফ। সামনের দিকের সমস্ত পাহাড় থেকে নেমে এসেছে এক বিরাট্ মহিমময় বরফের ঢল। ওপরের দিকে তাকালে মনে হয়, সেই হিমবাহ যেন নেমে এসেছে আকাশ থেকে। হতে

পারে এটা একটা সিঁড়ি, কিন্তু এ সিঁড়ি মানুষের জন্য নয়।

জুন জুলাই মাসে এখানকার পথের বরফ অনেক গলে যায়! কিন্তু চন্দনবাড়ির এই হিমবাহ কখনো সম্পূর্ণ গলে না, তীর্থযাত্রীদের এই বরফের ওপর দিয়েই যেতে হয়। যুগ যুগান্ত ধরে এই বরফ এখানে রয়েছে।

যে লিদ্দার নদী সারা রাস্তা আমাদের পাশে পাশে আসছিল, এখান থেকে সে ঢুকে গেছে ঐ হিমবাহের নীচে। এর পর থেকে সে অদৃশ্য। স্পষ্ট দেখা যায় লিদ্দার নদীর ওপর ঝুঁকে পড়েছে একটা বরফের দেয়াল, তার তলা দিয়ে নেমেছে অবিকল স্তম্ভের মতন মোটা মোটা বরফের চাঁই।

আমরা স্তম্ভিতভাবে সেই হিমবাহের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন ধর্মোন্মাদ হয়তো প্রতি মুহূর্তে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দিনের পর দিন ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এটা পার হবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু আমাদের পক্ষে যে আর এগোনো সম্ভব নয় সে কথা শুভ্রাকে বোঝাতে হলো না। সে বুঝে গেছে।

হিমবাহের যে-দিকটা রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, তার কাছাকাছি খানিকটা অংশ তেমন ঢালু নয়—সেখানে ছড়িয়ে আছে চূর্ণ বরফ। সেখানে স্থানীয় কিছু ছেলেমেয়ে খেলা করছে, বরফ দিয়ে দিয়ে তারা তৈরি করেছে একটা দানবের মূর্তি।

বুলবুল বলল, নীলুকাকু, আমি ঐখানটায় একটু যাব?

সেখানে কোন বিপদের ভয় নেই বলে বললাম, যাও, কিন্তু এক্ষুনি আসবে, বেশি দেরি করবে না।

শুভ্রা বলল, চলো, নদীটা কী করে বরফের নীচে ঢুকল, একটু দেখে আসি।

এখান থেকে একেবারে খাড়া নীচে নদীটাকে দেখা যায়। হিমবাহের নীচে অন্ধকার গহ্বরে সে ঢুকে গেছে। অদ্ভুত দৃশ্য ঠিকই।

নদীর দিকে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি। এমন সময় শুভ্রা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চক্ষু দুটি স্থির। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি তাকালাম।

নদীর ধারে একটা চৌকো পাথরের ওপর জোড়াসনে বসে আছে একজন মানুষ। সামনের পাহাড়ের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে। গায়ে একটা সাদা পাঞ্জাবি, মাথার চুলও সাধারণ মানুষের মতন। কিন্তু লোকটিকে এমনই ধ্যানমগ্ন মনে হয়, যেন শরীরটি পাথরের মূর্তির মতন অনড়।

এই কি কমলেশ চ্যাটার্জি? আমার চকিতে মনে পড়ল, ছবিটা তো এখানকার লোকজনকে দেখানো হয়নি! দু'একটি চটির বারান্দায় কাচা শার্ট প্যান্ট ঝুলতে দেখেছি। তার মানে বাইরের মানুষ দু'একজন আছে এখানে। তাহলে এই কমলেশ

চ্যাটার্জি ? উত্তেজনায় আমার বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগল। সেই সঙ্গে একটা আরামও বোধ করলাম। যে-কোন জিনিসই খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলে এইরকম আরাম হয়।

শুভ্রা ফিসফিস করে বলল, আমি যাব না।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন ? কী হয়েছে ? ইনিই কি কমলেশ ?

—জানি না ! হোক বা না হোক। আমি যেতে চাই না ওখানে !

—কেন ?

—চুপ, চলো আমরা ফিরে যাই !

—সেকি ! ঠিক আছে, আমি গিয়ে ওঁকে ডেকে আনছি !

—না !

শুভ্রা আমার হাতটা চেপে ধরল শক্ত ভাবে। বুঝতে পারলাম, ও কাঁপছে থরথর করে ! উত্তেজনায় ওর বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আমায় মিনতি করে বলল, প্লিজ, ও যেন আমাকে দেখতে না পায়, আমি এক্ষুনি চলে যাব !

—এরকম করছ কেন, শুভ্রা ! এতদূর এসে—

—আমি ওকে আর বিরক্ত করতে চাই না। কী রকমভাবে বসে আছে, দেখছ না ? একেবারে তন্ময় হয়ে আছে। এই রকম পাহাড়ের দিকে চেয়ে বসে থাকা...এই জীবন যদি ওর এত ভালো লাগে, তাতে আমি কেন ব্যাঘাত করব ? আমি শুধু ওর স্ত্রী বলে ? আমি কি এত স্বার্থপর ? আমি কি ওর বন্ধন ? কেন, আমিও তো একলা বাঁচতে পারি—

—ঠিক আছে, একবার দেখা করে আসা যাক অন্তত !

—না, তা হয় না। আমাদের দেখলে ও দুর্বল হয়ে যাবে ! বুলবুলকে দেখলে...কেন আমি ওকে ঘরে ফেরাব, যদি ঘর ওর ভালো না লাগে ? আমার কি অধিকার আছে ? আমি ভুল করেছিলাম, আমার মেনে নেওয়া উচিত ছিল...পাহাড়ের দিকে চুপ করে চেয়ে বসে থাকলে একজন মানুষকে যে এত ভালো দেখায়, তা কি আমি আগে জানতাম ? বুলবুলকে আমি একাই মানুষ করতে পারব...চলো।

—আমাকে তো উনি চেনেন না, আমি অন্তত একবার পাশ থেকে দেখে আসি।

—না, দরকার নেই, আমি জানতে চাই না, আমার খোঁজা শেষ হয়ে গেছে। আমি মনে মনে উত্তর পেয়ে গেছি, প্লীজ, চলো—

শুভ্রা আমার হাত ধরে জোর করে টানল। আমি, ঠিক কী করা উচিত বুঝতে পারলাম না।

—কিন্তু এত দূর এসেও একবার অন্তত দেখা না করে চলে যাব আমরা?

—চুপ। এখানকার শান্তি নষ্ট করো না—চারপাশটা কী অপরূপ সুন্দর, এখানে সামান্য স্বার্থ, মানুষে মানুষে সম্পর্ক এসবের যেন কোন মানে নেই। আমি বুঝতে পেরেছি, আমার খোঁজা শেষ হয়ে গেছে, ফিরে চলো—

বুলবুল কখন আমাদের কাছে ফিরে এসেছে টের পাইনি। সে বলল, মা, ওখানে কে বসে আছে?

শুভ্রা বলল, কেউ না!

বুলবুল তবু বলল, বাপীর মতন দেখতে। বাপীকে ডাকছ না কেন?

—না, বাপী নয়। চলো, আমরা এক্ষুনি যাব।

—আমি দেখে আসি তো বাপী কিনা—

বাপী বলে চিৎকার করে ডেকে বুলবুল সেই দিকে দৌড়োল! শুভ্রা হাত বাড়িয়েও মেয়েকে ধরতে পারল না। আমি সেই দিকে চেয়ে রইলাম। শুভ্রা পেছন ফিরে দৌড়ে চলে যেতে চাইল, এবার আমিই তার হাত ধরে রাখলাম শক্ত করে।

লোকটির কাছাকাছি গিয়ে বুলবুল একটি আছাড় খেল। তার বেশ লেগেছে। লোকটি সেই শব্দে পেছন ফিরে তাকাল। তাড়াতাড়ি উঠে বুলবুলকে তুলে নিল কোলে। তাকিয়ে দেখল আমাদের দিকে। তারপর বুলবুলের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

সংকট মুহূর্তেই এরকম ভুল হয়। লোকটি কমলেশ চ্যাটার্জি নয়। একজন সৌম্য চেহারার অবাঙালি ভদ্রলোক। পাঞ্জাবির বোতামগুলো খোলা, চওড়া বুকে কাঁচাপাকা লোম।

শুভ্রার দিকে বুলবুলকে বাড়িয়ে দিয়ে প্রসন্নভাবে বলল, আপ কি বেটী গির গ্যয়া...নদীর দিকে একা যেতে দেবেন না।

শুভ্রা বুলবুলকে কোলে নিয়ে কম্পিত গলায় বলল, আপনি ধ্যান করছিলেন। ও গিয়ে আপনাকে বিরক্ত করল...

লোকটি উদারভাবে হেসে বলল, না, না, ধ্যান-ট্যান কিছু করছিলাম না। এমনিই...রোদ্দুরের মধ্যে বসে থাকতে বেশ ভালো লাগে।

আমি লক্ষ্য করলাম, শুভ্রার শরীর তখনও কাঁপছে। হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি, আমি কথাবার্তা স্বাভাবিক করার জন্য বললাম, আপনি এখানে কতদিন আছেন? খুব চমৎকার জায়গা।

এরপর সাধারণ সৌজন্যমূলক কিছু কথা হলো। আমরা কী করে এলাম, রাস্তার অবস্থা কী রকম, এখানে খাবার দাবার পাওয়া খুব শক্ত...না, এখানে কোন বাঙালি তো নেই...

ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ফিরলাম। বুলবুলকে শুভ্রা কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছে, সে আমার হাতের একটা আঙুল ধরে লাফাতে লাফাতে আসছে। একটু আগে সে বাপী বলে একজনের দিকে দৌড়েছিল, এখন তার কিন্তু কোন নৈরাশ্য নেই। সে আপনমনে আমাকে অনেক কথা বলে যাচ্ছে, আমি শুনছি না। আমি তার মাকে দেখছি।

শুভ্রার মুখ এখনো স্বাভাবিক নয়। দৃষ্টি উধাও ! সে আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল, আমার খোঁজা শেষ হয়ে গেছে। আমি উত্তর পেয়ে গেছি...।

তারপরই সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। কমলেশ—বলেই সে তার ডান বাহুতে মুখ চেপে হু-হু করে কাঁদতে লাগল।

বুলবুল আমাকে জিজ্ঞেস করল, মা কাঁদছে কেন ? কী হয়েছে ?

আমি উত্তর দিলাম না।

বুলবুল আমাকে ছেড়ে মাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, মা, কাঁদছ কেন, মা ! বলো না ? মা—

আমি বুঝতে পারলাম, এই প্রথম শুভ্রা তার স্বামীকে হারাবার শোকে কাঁদছে ! এ কান্না অভিমান বা অপমানের নয়। খাঁটি দুঃখের, কারণ সে নিজেই তার স্বামীকে মুক্তি দিয়েছে।

এই কান্নায় বাধা দেওয়া উচিত নয়। আমি একটু দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ছবিঘরে অন্ধকার

কল্যাণ মজুমদার

প্রিয়বরেষু

প্রৌঢ় লোকটি তাঁর রোগা লম্বা মুখখানি তুলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্থির দৃষ্টি। আমিই চোখ নামিয়ে নিলাম। একটা খটকা লাগল। চেনা? কোথায় দেখেছি? কী নাম? কিছুই মনে পড়ল না।

আবার আমি চোখ তুলতেই তিনি বললেন, কী রে, কেমন আছিস? মায়ের শরীর কেমন?

গলার আওয়াজ শুনেই চিনতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত ভাবে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম, রমেশ জ্যাঠামশাই! চিনতে পারিনি আগে। খুব রোগা হয়ে গেছেন।

উনি 'খুঁ' করে নাকের শব্দ দিয়ে হাসলেন। তার মধ্যে একটা বিদ্রুপের ভঙ্গি আছে। যেন ওঁর রোগা হওয়া বিষয়ে কথা বলে আমি একটা বোকামি করেছি। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, সত্যিই খুব বোকামি করেছি আমি।

কথা হচ্ছিল একটা পানের দোকানের সামনে। রাস্তা পেরিয়ে এসে আমি সিগারেট কিনতে চেয়েছিলাম। রমেশ জ্যাঠামশাইকে আগে চিনতে পারলেই ভালো হতো। তাহলে দূর থেকে দেখেই সটকে পড়ে অন্য সিগারেটের দোকানে চলে যেতাম। রাস্তাঘাটে এইসব গুরুজন টাইপের লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া আমার মোটেই পছন্দ হয় না। মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ টিপ করে কারুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেও বিশ্রী লাগে। অথচ আগে যাঁকে প্রণাম করেছি, অনেকদিন পর তাঁর সঙ্গে দেখা হলে প্রণাম করতেই হয়। এঁরাও আশা করে থাকেন।

সিগারেটের প্যাকেটটা চট করে পকেটে লুকিয়ে ফেললাম। অর্থাৎ একটা লুকোবার ভঙ্গি করলাম, উনি সেটা আগেই দেখেছেন। রমেশ জ্যাঠামশাই কিনলেন পাঁচটা বিড়ি। একটা বিড়ির সামনে ও পেছনে দুবার ফুঁ দিয়ে নিয়ে তারপর ধরালেন দড়ির আগুনে। আবার আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, তোরা এখনো সেই টালিগঞ্জেই আছিস?

আমি বললাম, না, এখন গোলপার্কের দিকে উঠে এসেছি।

—নিজেরা বাড়ি করেছিস?

—না, ভাড়া বাড়ি।

—তোর দাদা তো একটা ব্যাঙ্কে—

—হ্যাঁ।

—আর তুই?

—আমি এখনো ঠিক কোথাও—

—কতদিন যোগাযোগ নেই! তোর বাবা মারা যাবার পর তো আর—

কথা বলতে বলতে উনি হাঁটতে লাগলেন পার্কের দিকে। আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে যেতে হলো। এইসব ক্ষেত্রে মিনিট তিনেক কথা বলার পর হঠাৎ এক সময় বলতে হয়, আচ্ছা, আজ চলি, আমার একটা জরুরি কাজ আছে।

বেশি বয়স্ক আত্মীয়-স্থানীয় কারুর সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়ির প্রত্যেকের খবর নেবেনই। ইনিও আমার মা, দুই দাদা, দুই কাকা—সবার খবর আলাদা আলাদা ভাবে নিলেন, যেন এগুলি খুবই জরুরি সংবাদ। বাধ্য হয়ে তখন আমাকেও বলতেই হলো, আপনার বাড়ির সবাই কেমন আছে?

উনি আবার নাক দিয়ে সেই 'খুঁ' শব্দ করে বললেন, আছে। আছে এখনো।

পার্কটার পাশেই একটা সিনেমা হল। বহুদিন হলো এই সিনেমা হলের গেটে তালাবন্ধ। সামনে চাটাই ও মাদুর পেতে কয়েকজন লোক বসে থাকে। তাদের পেছনে একটা লাল শালুতে লেখা ২০৮ দিন অনশন। ট্রামে-বাসে যেতে যেতে এই দৃশ্যটি দেখেছি অনেকবার। লাল শালুর ওপর কাগজ সেঁটে দিনগুলো বদলে দেওয়া হয়। মনে আছে, আগের বার দেখেছিলাম, '১৯৬ দিন অবিরাম অনশন'। যতবার দেখেছি, ততবারই মনে হয়েছে, ১৯৬ দিন অবিরাম অনশন কখনো মানুষের পক্ষে সম্ভব? নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা গাঁজাখুরি ব্যাপার আছে।

রমেশ জ্যাঠামশাই আমাকে চমকে দিয়ে সেই সিনেমা হলের সামনে অনশনকারীদের পাশে বসে পড়লেন। এবং চাটাইয়ের এক কোণের ওপর হাত চাপড়ে বললেন, আয় বোস।

আমি দোনামনা করারও সুযোগ না নিয়ে বসে পড়লাম। কেননা, যারা অনশন ও ধর্মঘট করে রয়েছে, তাদের প্রতি সমর্থন জানানোই নিয়ম। আমি যে কোন অজুহাত দেখিয়ে বসতে না চাইলে, কিংবা দেরি করলে নিশ্চয়ই সবাই আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাত। হয়তো মনে করত আমি শোষক শ্রেণীর কেউ, কিংবা স্রেফ চালিয়াৎ।

কিসের জন্য ধর্মঘট বা কোন কারণে অনশন, তা আমি কিছুই জানি না। এখন আমার চেনা কেউ আমাকে দেখলে চমকে যাবে নিশ্চয়। আমি একটা সিনেমা হলের সামনের ফুটপাথে চাটাইয়ের ওপর বসে আছি। সিনেমা হলের কর্মচারীরা সম্ভবত মাইনে বাড়ানোর দাবিতে ধর্মঘটে নেমেছে। কিন্তু তাতে আমার কী আসে যায়?

রমেশ জ্যাঠামশাই পাশের কয়েকজন লোককে বললেন, ইটি আমার এক ভাইপো। লেখে-টেখে। অনেক ম্যাগাজিনে লিখেছে।

চেনাশুনো বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ আমার লেখা-টেখার উল্লেখ করলে আমি মরমে মরে যাই। অনেকেই আমার লেখা পড়েনি। অনেকেই নাম শোনেনি। অনেকে লেখা ব্যাপারটাকে গুরুত্বই দেয় না। আমার কোন হোমরা-চোমরা আত্মীয়কে হয়তো আমার মামা বা কাকা বললেন, জানেন তো, আমাদের অমুক আজকাল লেখে। তিনি তখন সাদা মুখ করে বলেন, অ! তাই নাকি? কী লেখ তুমি?

এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। এই সব ধর্মঘটীরা কখনো ঘুণাক্ষরেও আমার নাম শোনেননি। তাঁরা কয়েকজন তাশ খেলায় ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে একবার দেখেই বুঝলেন আমি কিছু মনোযোগের যোগ্য নই, তাই আবার চোখ ফেরালেন তাশের দিকে। শুধু একজন খানিকটা উৎসাহ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কোন পেপারে লেখেন?

ভূর্জপত্রে কিংবা শ্লেটে যে লিখি না, ফুলস্ক্যাপ সাইজ কাগজেই লিখি, একথা ওদের বলতে পারতাম। কিন্তু পেপার মানে ওঁদের কাছে খবরের কাগজ। সুতরাং মাথা দু'দিকে নেড়ে বললাম, না।

লোকটি অভিমানী গলায় বললেন, কোন পেপারেই আমাদের আন্দোলনের কথা ছাপালো না। কতবার নিজে গিয়ে দিয়ে এসেছি।

আমি চুপ করে রইলাম।

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে কোন পেপারের লোকজনের সঙ্গে চেনা নেই? দেখুন না, আমাদের খবরটা যদি একটু ছাপানো যায়—

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, আমার সঙ্গে সে-রকম চেনা নেই কারুর।

ভদ্রলোক বিশ্রীভাবে মুখ কুঁচকোলেন। নিশ্চয়ই আমাকে ভাবলেন একটা অপদার্থ। আপন মনেই বললেন, সব শালা কাগজগুলো তো আজকাল বিজ্ঞাপন দিয়েই পাতা ভরায়, খবর আর ছাপবে কী?

আমি এমন একটা মুখের ভাব করে রইলাম, যার মানে হয়, তা তো বটেই, তা তো বটেই!

কিন্তু দুশো আট দিন অনশনের রহস্যটা কী—এই লোকগুলি সবাই দুশো আট দিন না খেয়ে এখানে বসে আছে?

আমার রমেশ জ্যাঠা সমেত? তারপরও উনি হেঁটে গিয়ে দূরের দোকান থেকে বিড়ি কিনে আনলেন? এ কখনো সম্ভব?

আমি আজ দুপুরেই খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজা খেয়েছি আমার ছোট মাসীর বাড়িতে। ইলিশ মাছটার পেট ছিল ডিম ভর্তি। ইলিশ মাছের ডিম ভাজার চেয়ে সুখাদ্য এ পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। কাস্পিয়ান সাগরের একরকম মাছের ডিমের নাম ক্যাভিয়ের। ইওরোপ-আমেরিকায় সেটা একটা দারুণ দামী ও শৌখিন খাবার। ডেলিকেসি যাকে বলে। আমি সেই ক্যাভিয়েরও খেয়ে দেখেছি। আমার মতে সেটা গঙ্গার ইলিশের ডিমের তুলনায় কিছুই নয়! আজ দুপুরে সেই ডিমের লোভে লোভে অনেকখানি খিচুড়ি খাওয়া হয়ে গেছে। ভরা পেট নিয়ে আমি বসে আছি এতগুলো ক্ষুধার্ত লোকের সঙ্গে। নিজেকে এখন আমি কী বলব? হংসদের মধ্যে বক? না বকদের মধ্যে হংস?

লোকগুলিকে আমি একবার ভালো করে দেখে নিলাম। সকলেই রোগা রোগা, সকলেরই মলিন পাঞ্জাবি ও ধুতি। পাঞ্জাবির পকেটের ধারগুলি খুব ময়লা। পকেটে হাত ঢোকাবার সময় ঐ ময়লা লাগে। অর্থাৎ এইসব লোক সাবান মাখে খুব কম। রমেশ জ্যাঠামশাইয়ের শুকনো পাকানো চেহারা। বয়েস ষাটের কাছাকাছি তো হবেই। ওঁকে শেষ দেখেছিলাম বছর দশেক আগে, যতদূর মনে পড়ছে উনি সে সময় হাওড়ায় কোন একটা কারখানায় কাজ করছিলেন। তিনি যে কবে এসে 'রোহিণী' সিনেমা হলে জুটেছেন, তা কে জানে! দুশো আট দিন অনশন? তার মানে ছ'মাসেরও বেশি? হ্যাঁ, রোহিণী সিনেমা হলটা বহুদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে ঠিকই। এতদিন এই কর্মচারীরা মাইনেও পাননি। মানুষ কতরকম আশ্চর্যভাবে বেঁচে থাকতে পারে, তাই না? তাই এসব কথা ভাবলেই গা শিরশির করে।

দুপুর পর্যন্ত আমি ছিলাম ছোট মাসীর বাড়িতে। বিকেল চারটেয় এখানে ফুটপাথে চাটাইয়ের ওপর। আজ ছোট মাসীর নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটের বসবার ঘরে একটি নতুন কার্পেট পাতা হলো। সেই উপলক্ষে আমি গিয়েছিলাম টাকা ধার চাইতে। সাতাশ শো টাকা দিয়ে যিনি কার্পেট কিনেছেন তিনি নিজের বোনপোকে পঞ্চাশটা টাকা ধার দিতে পারেন না? ছোট মাসী কিন্তু আমার প্রস্তাব শুনেই কৃত্রিম ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন। বললেন, দেখছিস এইসব জিনিসপত্র কিনে-টিনে এখন একেবারে হাত খালি, এর মধ্যে তুই আবার টাকা চাইছিস!

সত্যি অভাব-অনটন সকলেরই থাকে। যে কার্পেট কেনে, মোটর গাড়ি কেনে, তারও থাকে। যে এ মাসে সপরিবারে দার্জিলিং বেড়াতে যায়, পরের মাসে তাকে একটু টেনে-টুনে চালাতে হয় না? আমি তবু মুখখানা খুব কাতর করে বলেছিলাম, অন্তত চল্লিশটা টাকা ধার দাও। বিশেষ দরকার।

ছোট মাসী আমার পিঠে এক চাঁটি মেরে বললেন, ফের যদি ধার কথাটা উচ্চারণ করবি তো মার খাবি আমার কাছে। কতবার এরকম ধার নিয়েছিস?

ধার নিলে শোধ দিতে হয়, তা জানিস না? এর পর থেকে আমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে বলবি, দান করো কিংবা ভিক্ষে দাও। তা হলে পাবি।

তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলাম। ছোট মাসী তিরিশ টাকা দিলেন। জানতাম, ছোট মাসীর কোমল মন, উনি এর থেকে আর কমাবেন না। আমার গোটা পঁচিশেক টাকা পেলেই আজকের মতো চলে যেত। পাঁচ টাকা বেশিই পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে খিচুড়ি আর ইলিশের ডিম ভাজা।

বিকেলবেলা আমি রমেশ জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে। বাঙালদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই এরকম বৈচিত্র্য থাকে। কোন আত্মীয় দারুণ অবস্থাপন্ন, বাড়িতে তিনখানা গাড়ি। আবার বেশ নিকট আত্মীয়ের মধ্যেই কেউ রাস্তায় বসে ছিটের জামা বিক্রি করে।

কিন্তু আমি এখানে কতক্ষণ বসে থাকব? ঠিক কোন্ কথা বলে উঠে পড়া উচিত, সেটাই মনে পড়ছে না। সিগারেট খেতে পারছি না বলেও মুখের মধ্যে একটা উসখুসে ভাব। এঁদের অনশন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে আমার ভয় করছে। আমার নিজেরই অনেক সমস্যা আছে, আবার অপরের সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় না। রমেশ জ্যাঠার শুকনো বিবর্ণ মুখখানার দিকে আমি ভালো করে তাকাতে পারছি না পর্যন্ত। কয়েকজন অনশনকারী অবশ্য বেশ উৎসাহের সঙ্গেই তাশ খেলে চলেছেন।

রমেশ জ্যাঠা জিজ্ঞেস করলেন, তুই এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?

—শিয়ালদায়।

—শিয়ালদায়? ট্রেনে কোথাও যাবি?

আমি খুব নরম করে মিষ্টি সুরে বললাম, নৈহাটিতে আমার এক বন্ধু থাকে—তার কাছে যাবার কথা।

রমেশ জ্যাঠা ব্যস্ত হয়ে বললেন, তা হলে তোর ট্রেনের লেট হয়ে যাবে না? বসে আছিস কেন—একথা আগে বলতে হয়! তুই যা—

আমি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে সকলের দিকে আলতোভাবে নমস্কার জানিয়ে এগিয়ে গেলাম। প্রথমে একটু ধীরভাবে হেঁটে তারপর গতি বাড়িয়ে দিলাম। খানিকটা দূরে গিয়ে পেছন ফিরে দেখলাম আর একবার।

রাস্তা দিয়ে অন্যান্য যে-সমস্ত মানুষজন যাচ্ছে, তারাও ঐ ফুটপাথের চাটাইয়ের ওপর বসে থাকা রোগা-রোগা লোকগুলিকে দেখে যাচ্ছে দু-এক পলক। ভুরুর ভঙ্গিতে সামান্য কৌতূহল, তার বেশি কিছু না।

খুব ছোটখাটো মিথ্যে কথায় তেমন দোষ হয় না। নৈহাটিতে আমার যাবার

কথা নেই। ট্রেনে করে কোথাও যাব না। কিন্তু এর চেয়ে আর ভালো ছুতো কী দেখাতে পারতাম? ফুটপাথে আমি অনেকবার অনেক জায়গায় বসেছি। আর ধর্মঘটীদের সঙ্গে বসে থাকার মধ্যে খানিকটা গর্বের ব্যাপার থাকে। বেশ একটা মহৎ-মহৎ ভাব আসতে পারে। কিন্তু আমার ভরা পেট আর ঐ লোকগুলি বহুদিন না খেয়ে আছে, এজন্যই দারুণ অস্বস্তি লাগছিল। একজন নর্দমার মধ্যে পড়ে-যাওয়া লোক যদি ধোপ-দুরস্ত কাপড় পরা একজন লোককে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে, তাহলে যেমন হয়। তবে, কে নর্দমার মধ্যে পড়ে-যাওয়া লোক? ওরা, না আমি? সেটা ঠিক করা শক্ত।

কিন্তু দুশো আট দিন অনশন করে থাকা একটা গাঁজাখুরি ব্যাপার নয়? বিপ্লবী যতীন দাস জেলখানার মধ্যে বাষট্টি না তেষট্টি দিন যেন অনশন করে মারা গিয়েছিলেন। সেটা একটা ইতিহাস হয়ে আছে। দুশো আটদিন না খেয়েও যদি বেঁচে থাকা যায়, তাহলে আর খাদ্যের জন্য এত পরিশ্রম করে লাভ কী?

শিয়ালদার ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে একটু পরে আমি একটা বাসে উঠে পড়লাম।

এরপর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করা, আড্ডা, বইয়ের দোকানের ধার শোধ দেওয়া ইত্যাদিতে জড়িত হয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়ছিল। দু'শো আট দিন। দু'শো আট দিন......। বেশ একটা খটকার ব্যাপার।

রাত্রে বাড়ি ফিরে মাকে বললাম, তোমার রমেশ জ্যাঠাকে মনে আছে?

মা প্রথমটায় চিনতে পারলেন না। তারপর বর্ণনা দিতে বুঝলেন। বললেন, ও, কোথায় দেখা হলো?

সব ঘটনার বিবরণ শুনে মা কিন্তু একটুও সহানুভূতি দেখালেন না। বরং চটে উঠলেন দারুণভাবে। ধমকের সুরে বললেন, ওঁর কী আক্কেল? তোকেও বসতে বললেন ঐ রাস্তার মাঝখানে?

আমি বললাম, যাক গে, তাতে এমন কিছু হয়নি।

মা বললেন, হয়নি মানে? ভদ্রলোকের ছেলে রাস্তায় বসতে যাবে কেন? হাজার লোকের পায়ের ধুলো।

—চাটাই পাতা ছিল, মা। আর যারা ছিল, তারাও তো ভদ্রলোক। আজকাল তো অনেকেই রাস্তায় বসে ধর্না দেয়।

—সে যারা দেয় তারা দিক। ওরা ধর্মঘট-মর্মঘট যা খুশি করুক, তার সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক? যতসব অলক্ষুণে ব্যাপার। যা, ভালো করে চান করে আয়।

কিছু লোক যে দুশো আট দিন না খেয়ে আছে, সেকথা শুনেও মায়ের মনে একটুও দাগ কাটল না। এমনকি রমেশ জ্যাঠার কথাটাতেও গুরুত্ব দিলেন না।

তিনি প্রথমেই নিজের ছেলের মঙ্গল-অমঙ্গলের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মাতৃস্নেহ জিনিসটা এই রকম।

মায়ের মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা করবার জন্য আমি একটু কথা ঘুরিয়ে বললাম, আচ্ছা মা, ভাবতে পারো, ওঁরা দুশো আট দিন না খেয়ে আছেন!

মা এতেও বিচলিত না হয়ে বললেন, বাজে কথা। অতদিন কেউ না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে? কেতকীর বাবার কোন কথা আমি বিশ্বাস করি না। ওনাকে চিনি ভালো করে, সারাজীবন ধরে মিথ্যে কথা বলে আসছেন।

—উনি একলা নন। দশ-বারো জন লোক। সবাই তো আর মিথ্যে কথা বলবেন না।

—নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে খায়।

—টাকাই বা পাবে কোথায়? দুশো আট দিন ধরে তো মাইনেও পায়নি।

মা এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সরমার কপালটাই খারাপ। এমন একটা মানুষের হাতে পড়েছে, সারা জীবন একটুও সুখ পেল না। কেতকীর বাপটা তো বরাবরই উড়নচণ্ডী।

রমেশ জ্যাঠার সঙ্গে আমাদের কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। উনি আমার বাবার পিসিমার সৎ ছেলে। খুব অল্প বয়েসে নিজের মাকে হারান। বাবার পিসিমাই ওকে মানুষ করেছিলেন। এক সময় উনি আমাদের বাড়িতে খুব আসতেন। তাশ খেলতেন বাবার সঙ্গে। আমার বাবার থেকে বয়েসে বড় হলেও রমেশ জ্যাঠা বেশ সমীহ করে চলতেন আমার বাবাকে। বেশ মনে আছে, উনি এলে আমরা খুব বিরক্ত হতাম। এক একদিন সকালে এসে রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত থাকতেন। বাবা বাড়িতে না থাকলেও অপেক্ষা করতেন তাঁর জন্য। ফলে, আমাদের বসবার ঘরটা সারাক্ষণ জোড়া থাকত, আমাদের বন্ধু-বান্ধব এলেও বসাতে পারতাম না। জ্যাঠামশাই সম্পর্কের কারুর সামনে তো আর বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা যায় না!

দূর সম্পর্কের ভাসুর হলেও মা ওঁর নাম মুখে আনতেন না। সেইজন্য কখনো কেতকীর বাবা, কখনো সরমার বর বলে উল্লেখ করছেন। তখন আমার ক্ষীণভাবে মনে পড়ল, কেতকী নামের মেয়েটিকে আমি দু-একবার দেখেছি। কোন উপলক্ষে রমেশ জ্যাঠা সপরিবারে নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা। তার মধ্যে কেতকী নামের মেয়েটি ছিল আমারই বয়েসী। আমার তখন দশ-এগারো বছর বয়েস। মনে আছে, ছাদে খুব দৌড়াদৌড়ির খেলা খেলেছিলাম কেতকীর সঙ্গে। কালো রঙের বেশ মোটকা-সোটকা মেয়েটা।

রাত্তিরবেলা খেতে বসে রমেশ জ্যাঠা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানতে

পারলাম মায়ের কাছে। আমার দাদাও অনেক কিছু জানেন। দাদা তো বেশি বয়স পর্যন্ত দেখেছেন ওঁকে।

আমার দাদা একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। সুতরাং বেশ অফিসার-সুলভ হাবভাব। মেজদা আবার হাসি-ঠাট্টা ভালোবাসেন কথায় কথায়। কলেজে পড়ান মেজদা। বাড়ির মধ্যে আমিই বেকার। এমনকি, দাদার ছেলে বিল্টু পর্যন্ত ডাক্তারি ক্লাসে সদ্য ভর্তি হয়েছে, ওকেও চাকরির চিন্তা করতে হবে না।

খাওয়ার টেবিলে চারটি মাত্র চেয়ার বলে আমরা পুরুষরা এক সঙ্গে খেতে বসি, বৌদিরা পরিবেশন করেন। তাছাড়া, বাঙাল বাড়িতে শাশুড়ির সামনে ছেলে আর বৌদের একসঙ্গে খেতে বসার রেওয়াজ এখনো তেমন চালু হয়নি। বিশেষত শাশুড়ি যদি তেমন জাঁদরেল হন। আমার মায়ের সামনে আমার বৌদিরা একটু উঁচু গলায় কথা বলতে পারেন না পর্যন্ত।

দাদা বললেন, রমেশ জ্যাঠা শেষ পর্যন্ত সিনেমা হলের চাকরি নিয়েছিলেন? হুঁ! কত ভালো ভালো চাকরি আগে জুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাবাই তো ওঁকে একবার মার্টিন বার্নে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন একজনকে বলে-কয়ে। সে চাকরিও উনি রাখতে পারলেন না।

মেজদা বলল, উনি নিশ্চয়ই রোজ রোজ সিনেমা দেখার লোভে ঐ চাকরিটা নিয়েছিলেন। আমি একসময় দেখতাম, উনি প্রায়ই সিনেমা হলের সামনে দশ আনার লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন! কলেজ থেকে আমরা যখন মেট্রো সিনেমায় যেতাম দশ আনার লাইনে, ঠিক দেখতাম রমেশ জ্যাঠা দাঁড়িয়ে আছেন একেবারে প্রথমে।

মা বললেন, দূর দূর! ও চাকরিতে কতই বা মাইনে, অতগুলো ছেলেপুলের সংসার চালায় কি করে?

দাদা বললেন, যাদের সংসারে টানাটানি থাকে, যারা ভালো চাকরি-বাকরি করে না, তাদেরই ছেলেপুলে বেশি হয়। এটা ভগবানের একটা বিচিত্র খেয়াল।

মেজদা টেবিলে তবলা বাজানো থামিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে বেচারা ভগবানকে দোষ দিচ্ছ কেন? গরীবদের বেশি ছেলেপুলে হবার তো সামাজিক কারণই রয়েছে।

মা বললেন, মেয়েই তো বোধহয় গোটা চারেক। একটা ছেলেও আছে, কিন্তু সেটা তো মানুষ হয়নি শুনেছি। গোল্লায় গেছে। ছেলেটা নীলুরই বয়েসী হবে বোধহয়।

মেজদা বলল, আমার কাছ থেকে রমেশ জ্যাঠা একবার দু'টাকা ধার

নিয়েছিলেন। ফেরত দেননি। তখন আমি কলেজে পড়ি, দু'টাকার অনেক দাম।

দাদা মুখ তুলে তাকালেন মেজদার দিকে। তারপর দুর্লভ একটু হাসি দিয়ে বললেন, আমার কাছ থেকে কয়েকবারে মিলিয়ে অন্তত গোটা পঞ্চাশেক টাকা নিয়েছেন। ধার করার ব্যাপারে রমেশ জ্যাঠার ছোটবড়'র ভেদাভেদ ছিল না কখনো।

মা বললেন, কেন দিয়েছিলি? আর কক্ষনো দিবি না।

দাদা বললেন, অনেকদিন আগে, অন্তত বছর দশেক হবে।

মা বললেন, ঐ তো বদ স্বভাব মানুষটার। চারদিকে ধার করে বেড়ায়। তোর বাবার কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছে কে জানে!

মেজদা বলল, বাবার একটা সফ্‌ট কর্নার ছিল ওঁর সম্পর্কে। আমি দেখেছি, যারা লুজার, যারা ভাগ্যের হাতে অনেক মার খেয়েছে, বারবার হেরে গেছে, সেই ধরনের লোকদের সম্পর্কে বাবার খানিকটা দুর্বলতা ছিল।

মা দাদার পাতে খানিকটা ছোলার ডাল দিয়ে বললেন, আর একটু ভাত নে। দেব, একটু ভাত?

দাদা হাত তুলে নিষেধ করলেন।

মেজদা বলল, আমাকে আর একটু ফুলকপির তরকারি দাও তো। বেশ হয়েছে এটা।

দাদা বললেন, এক সময় রমেশ জ্যাঠার অনেক টাকা ছিল, সব নষ্ট করেছেন। মামাদের সম্পত্তি পেয়েছিলেন, কোন্নগরে একটা বাড়ি ছিল। সব বিক্রি করে দিয়ে ব্যবসা করতে গেলেন। আমার বেশ মনে আছে, বৌবাজারে রমেশ জ্যাঠা একটা ক্যামেরা-ট্যামেরার দোকান খুলেছিলেন, কয়েকবার গেছি সেখানে, আমার তখন পনেরো-ষোলো বছর বয়স।

মেজদা বলল, আমিও গেছি।

দাদা বললেন, তুই তখন অনেক ছোট, তোর মনে থাকবার কথা নয়।

মেজদা বলল, হ্যাঁ, মনে আছে, দুদিনেই তো সে দোকান লাটে উঠে গেল।

মা বললেন, সরমা অতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে কী করে চালাচ্ছে, কে জানে। মেয়েটার কপালটাই খারাপ।

দাদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, রমেশ জ্যাঠাও অনশন করেছেন?

আমি বললাম, তাই তো দেখলাম। দুশো আট দিন।

মেজদা বলল, ঐ তো সামান্য চাকরি। ওর জন্য আবার অনশন। অন্য চাকরি খুঁজলেই পারেন!

দাদা বললেন, কে ওঁকে চাকরি দেবে? শুধু তো ম্যাট্রিক পাশ। তাছাড়া বয়েসও তো কম হলো না।

রমেশ জ্যাঠার বয়েস কত? বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর এখন বয়েস হতো আটষট্টি। রমেশ জ্যাঠা বাবার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়ো, তাহলে প্রায় সত্তর বছর বয়েস? চেহারা দেখলে কিন্তু অতটা বোঝা যায় না। সত্তর বছর? ওরে বাবা, এই বয়েসে তো সবাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে যায়।

রমেশ জ্যাঠার প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল মাছের মুড়ো এসে পড়ায়। বড় মাছ বাড়িতে রোজ আসে না। যেদিন আসে, সেদিন মুড়োটা কাকে দেওয়া হবে, সে ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট হিসেব আছে।

আমাদের বাড়িতে বড় মাছের মুড়ো কক্ষনো দু'ভাগ করা হয় না। আস্তই থাকে। এবং সেই আস্ত মুড়োটি দেওয়া হবে বাড়ির কোন না কোন পুরুষকে। এটাও বাঙাল বাড়ির প্রথা! মেয়েদের মধ্যে মুড়ো খেতে কেউ ভালোবাসে কিনা, সেকথা কোনদিন কেউ জিজ্ঞেস করেও দেখে না। মাছের মুড়োর ব্যাপারে যেন শুধু পুরুষদেরই ক্রমাগত অধিকার।

আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে দাদাকেই বেশি ভালোবাসেন মা। প্রথম সন্তানের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব তিনি লুকোতেও পারেন না। মা মাছের মুড়োটা দাদার দিকে এগিয়ে দিতেই দাদা বললেন, আমাকে কেন?

মেজদা সব কিছুর হিসেব রাখে। মেজদা বলল, এর আগের দিন কে খেয়েছিল? গত সোমবার...ও, আমিই তো খেয়েছিলাম। আজ নীলুর।

আমি বললাম, থাক, আমার আজ চাই না। আজ বরং বিল্টুকে দাও।

বিল্টু খাবার টেবিলে বসে বই পড়ে। আজও সে এতক্ষণ একটা বইতে মগ্ন ছিল, আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনি। এবার সে মুখ তুলে বলল, না, আমি আজ মুড়ো খাব না। আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

বিল্টু আসলে মুড়ো খেতে ভালোবাসে খুব। লজ্জা পাচ্ছে। আমি বললাম, খা না বিল্টু। আমি আজ ছোট মাসীর ওখানে ইলিশ মাছটাছ অনেক খেয়েছি—

বিল্টু বলল, না, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

মা মাছের মুড়োটা হাতায় তুলে রেখেছিলেন, এবার সেটা আবার দাদার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, তুই-ই নে, ওরা যখন কেউ চাইছে না।

দাদা গম্ভীরভাবে বললেন, না, নীলুকেই দাও।

বাবা মারা যাবার পর দাদাই এখন হেড অব দা ফ্যামিলি। তাঁর ভারিক্কী চালচলন দেখে সবাইকে সমীহ করতে হয়। এমনকি মা-ও দাদার কথা অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

মেজদা মিটিমিটি হাসছে। কারণ, তাকে একবারও অনুরোধ করল না কেউ। মা মুড়োটা আমার পাতে ফেলে দিলেন।

আমার একটু গুরুভোজনই হয়ে গেল। ও বেলা খিচুড়ি, মাছ ভাজা, ইলিশ মাছের ডিম, আবার এবেলা এতবড় মুড়ো—

মুড়োটা ভেঙে, কিছুক্ষণ পর ভেতরের ঘিলুটা চুষতে চুষতে হঠাৎ আমার আবার মনে পড়ল রমেশ জ্যাঠার কথা। দুশো আট দিন অনশন? দুশো আট দিন! একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার।

২

রমেশ জ্যাঠাকে নিয়ে কিছু লেখার প্রশ্নই আসত না, যদি না এরপর আর একটি বিচিত্র যোগাযোগ ঘটত। সেটাই একটু সবিস্তারে বলতে হবে। রীতিমত নাটকীয় ব্যাপার।

এর দু'দিন বাদেই আমার বন্ধু দেবরাজের সঙ্গে আমি একটা অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম। দেবরাজের নেশা ছিল দুর্লভ বই সংগ্রহ করা। এখন সেটাই পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সে পুরোনো দুষ্প্রাপ্য বই খুঁজে আনে। পণ্ডিত, গবেষক বা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলো বেশ ভালো দামে কিনে নেয়। দেবরাজ খবর রাখে কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এরকম বই। এই বই-সংগ্রহ অভিযানে বেরিয়ে নানা রকম উত্তেজক অ্যাডভেঞ্চারও হয় প্রায়ই। আমি সঙ্গে যাই সেই লোভে।

পুরোনো আমলের রাজা-মহারাজা বা জমিদার বাড়িগুলোতে অযত্নে অনাদরে এরকম বহু বই পড়ে আছে। কোন এক সময়, কোন বইপ্রেমিক রাজা বা জমিদার শখ করে বই কিনে বানিয়েছিলেন লাইব্রেরি, বর্তমান বংশধররা সেসব বইয়ের খোঁজও রাখে না। অবহেলায় ফেলে রাখা সেইসব বই উইপোকায় কাটে। আমরা সেইসব বাড়িতে হানা দিই। টাকা দিয়ে কিনে অথবা মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অথবা তাতেও না হলে চুরি করে সেই সব বই আমাদের আনা চাই-ই। এজন্য আমাদের বিবেক-দংশন হয় না। কারণ, বই জিনিসটা এমনই যা অযত্নে ফেলে রাখার চেয়ে আগ্রহী পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া একটা পবিত্র কাজ।

এবার আমরা গেলাম পূর্ণিয়ায়। দেবরাজ আগে থেকেই গুপ্তচর মারফত খবর পেয়েছিল যে পূর্ণিয়ায় এক জমিদার বাড়িতে কিছু অত্যন্ত দামী বই আছে। অনেক রাজা-মহারাজার বাড়িতে গিয়ে আমাদের দারুণ দারুণ মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে

এর আগে। হয়তো গ্রামের মধ্যে এক রাজবাড়িতে গেছি। এককালের বিশাল এক প্রাসাদ এখন ভাঙাচুরো। বাড়ির সামনেই একটা পুকুরে একজন রোগা মতন লোক মাছ ধরার জন্য ছিপ ফেলে আছে আর বিড়ি টানছে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, বর্তমান রাজার সঙ্গে কখন দেখা হবে বলতে পারেন? লোকটি বিড়ি ফেলে দিয়ে বলল, আমিই রাজা। কী চাই, বলুন?

আর একজন প্রৌঢ় রাজাকে দেখেছিলাম সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াতে। এককালে তাঁদের হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল।

পূর্ণিয়ার জমিদারকেও আমরা বিশেষ পাত্তা দিইনি। জমিদারী ঘুচে গেছে বহুদিন, এখন আর রবরবা নেই। এঁরা অনেকেই এখন আগ্রহের সঙ্গে বই বিক্রি করে দেন।

ভাট্রা বাজারে একটা হোটেলে উঠে আমরা আমাদের স্ট্রাটেজি ঠিক করে নিলাম। প্রথমে কিনতে চাইব। তাতে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে বাড়ির কোন চাকর-বাকরকে হাত করে চুরির ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা শুনেছিলাম, বর্তমান জমিদারের নাম অ্যালবার্ট। সে আবার একটি কী রকম প্রাণী হবে কে জানে।

পরদিন সকালে স্থানীয় লোকজনের কাছে অ্যালবার্টের খোঁজ করতেই অনেকে একটা মোটর গ্যারেজ দেখিয়ে দিল। সেখানে একটা ট্রাকের তলায় শুয়ে পড়ে একজন মিস্ত্রি কাজ করছিল, আমাদের কথা শুনে একটু বাদে সে বেরিয়ে এল। তার নামই অ্যালবার্ট। সারা গায়ে তেল-কালি লেগে আছে যদিও, তবু তাকে দেখে বোঝা যায়, খাঁটি সাহেবী রক্ত আছে তার গায়। মাথার চুল লালচে। সে আমাদের হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

আমরা বললাম, আপনার সঙ্গে একটা-দুটো বইয়ের ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছি।

'বই', বলে লোকটি এমন ভাবে তাকাল যেন ঐ শব্দটা সে প্রথম শুনছে। সাহেবদের মতন চেহারা হলেও সে ইংরেজি ভালো বুঝতে পারে না।

একটুক্ষণ কথা বলেই নিরাশ হতে হলো আমাদের। আমাদের খবরে একটু ভুল ছিল। অ্যালবার্ট হচ্ছে আগেকার জমিদারের মেম-রক্ষিতার ছেলে। সম্পত্তির কোন ভাগই সে পায়নি। কোন ক্রমে এই মোটর গ্যারেজ করে পেট চালায়। বর্তমান উত্তরাধিকারীর নাম তেজেন্দ্রনারায়ণ সিং। সে-ই সব কিছুর মালিক।

নাম শুনে মনে হয়েছিল কোন গোঁফওয়ালা মোটকা-সোটকা লোক হবে। জমিদার বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলো তাঁর সেক্রেটারি মারফত। নিখুঁত স্যুট-টাই পরা ছিমছাম চেহারার একজন ভদ্রলোক সেই তেজেন্দ্রনারায়ণ সিং। কথা বললেন ইংরেজিতে, মার্কিন উচ্চারণে। এই সব লোকের কাছ থেকে

ভুলিয়ে-ভালিয়ে বই আদায় করা খুব শক্ত।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কী ব্যাপারে এসেছেন?

জমিদার বাড়ির ঝকমকে চেহারা দেখেই বুঝেছি, এখনও এঁদের বেশ পয়সাকড়ি আছে। লেখাপড়ারও চর্চা আছে এ বাড়িতে। সুতরাং এখানে বই কেনার প্রস্তাব দেওয়া যাবে না।

আমরা এজন্যও আগে থেকেই তৈরি হয়ে এসেছিলাম। একটা দুষ্প্রাপ্য ইতিহাসের বইয়ের নাম বলে আমরা জানালাম যে, আমরা দুজনেই ইতিহাস নিয়ে রিসার্চ করছি। আপনার লাইব্রেরিতে এ বইখানা যদি একটু দেখতে দেন।

তেজেন্দ্রনারায়ণ ভুরু কুঁচকে বললেন, ঐ বইখানা দেখবার জন্য আপনারা কলকাতা থেকে এত দূর এসেছেন? আমার লাইব্রেরিতে ঐ বইটা আছে, কে বলল আপনাদের?

বললাম, পূর্ণিয়ারই এক ইতিহাসের অধ্যাপক একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন।

কিন্তু ঐ বইটার তো আরো দুটো কপি এদেশে পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটা আছে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। সেখানে বইটা না দেখে আপনারা এত দূর এলেন কেন?

বাবাঃ, এ দেখছি অনেক কিছু জানে। আমাদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।

তক্ষুনি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ঐ বইটা আছে আমরা জানি। কিন্তু সেটা দ্বিতীয় সংস্করণ। আপনাদের কাছে আছে প্রথম সংস্করণ, সেটাই একটু দেখতে চাই।

তেজেন্দ্রনারায়ণ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে। তারপর মৃদু হেসে বললেন, আপনাদের উৎসাহ দেখে খুশি হলাম। আজকাল এইসব বইয়ের খোঁজ-খবর বিশেষ কেউ রাখে না। তবে, ঐ বইটা আপাতত আমার এখানে নেই। আমার স্ত্রীর খুব উৎসাহ আছে ইতিহাসে। আমার স্ত্রী বছরে তিন-চার মাস দার্জিলিং-এ থাকেন। অনেক বইপত্র, বিশেষত ইতিহাসের বইগুলো সেখানে নিয়ে গিয়ে সাজিয়েছেন।

আমরা নিরাশ হচ্ছিলাম, কিন্তু তেজেন্দ্রনারায়ণ এর পরের কথাটিতে আমাদের চমৎকৃত করে দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা উঠেছেন কোথায়?

আমরা হোটেলের নাম বললাম।

তিনি বললেন, ইঃ, ঐ নোংরা হোটেলে! আপনারা এক কাজ করুন, আপনারা

আমার গেস্ট-হাউসে এসে থাকুন। কালই আমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি দার্জিলিং, আপনারা চলুন আমার সঙ্গে।

আমি আর দেবরাজ চোখাচোখি করলাম। দার্জিলিং বেড়াবার এটা একটা চমৎকার সুযোগ বটে, কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য এতে সফল হবে না।

দেবরাজ বলল, না থাক। আমরা আপনাদের এতটা বিরক্ত করতে চাই না।

তেজেন্দ্রনারায়ণ বললেন, না, না, চলুন, কোনো অসুবিধে নেই। আপনারা একটা বই দেখতে চেয়েছেন—কেউ তো আর এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে আসে না। বইটা যখন আমাদের রয়েছে, তখন দেখবেন না কেন?

তাঁর পেড়াপিড়িতে আমাদের থেকে যেতেই হলো। রাজবাড়ির অতিথি আমরা, দারুণ খাতির-যত্ন, বিকেলবেলা তেজেন্দ্রনারায়ণ আমাদের তাঁর গাড়িতে করে জঙ্গলের দিকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। এদিককারই কোন জঙ্গল নিয়ে বিভূতিভূষণ 'আরণ্যক' লিখেছেন।

জমিদারি উচ্ছেদ হয়ে গেলেও তেজেন্দ্রনারায়ণ সিং যথেষ্ট ধনী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে তাঁর বাড়ি আছে। এছাড়া তিনি বেশ কয়েকটি চা-বাগানের মালিক। মানুষটি বেশ ভদ্র এবং রুচিবান।

পরদিন ভোরে গাড়িতে চেপে আমরা রাত্রের মধ্যে দার্জিলিং পৌঁছে গেলাম। ওঁদের বাড়িটা দার্জিলিং শহরের একটু আগে, ঘুম-এর কাছাকাছি। এ বাড়িটাও চমৎকার। আটখানা ঘর। তার মধ্যে আমাদের জন্য দেওয়া হলো যে-ঘরটি, সেটা থেকে নাকি পরিষ্কার দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।

তেজেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী সহাস্যে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। খুব সম্ভব ইনি ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বয়েসের তফাৎ অনেকখানি। হালকা ছিপছিপে চেহারার এক তরুণী, চোখে-মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। এঁর নাম শান্তা। যদিও উত্তরপ্রদেশের মেয়ে, তবু বেশ ভালো বাংলা বলতে পারেন, কারণ শান্তিনিকেতনে দু'বছর পড়েছেন।

তেজেন্দ্রনারায়ণও ভালোই জানেন বাংলা। কারণ কাজের জন্য ওঁকে প্রায়ই কলকাতায় আসতে হয়। তাছাড়া পূর্ণিয়ার লোকের কাছে বাংলাটা খুব দূরের ভাষা নয়।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বললেন যে, আমরা ওখানে যতদিন খুশি থেকে লাইব্রেরিতে পড়াশুনো করতে পারি। শান্তার একদম গরম সহ্য হয় না বলে মে মাস থেকে আগস্ট পর্যন্ত দার্জিলিং-এর এই বাড়িতে থাকেন। এখানে অনেক বই আছে।

রাত্তিরবেলা এমন বিপুল খাওয়া-দাওয়া হলো যে মনে হলো, তিন চারদিন যদি এখানে থাকি, তাহলে খেতে খেতেই মরে যাব। দেবরাজ অবশ্য বেশ

ভোজনরসিক, কিন্তু সে-ও তিনরকম মাছ-মাংসের পর চার রকম মিষ্টি খেয়ে বলল, আর পারছি না।

এঁরা আমাদের ইতিহাসের গবেষক বলে খাতির করছেন, কিন্তু আসলে আমরা বই-চোর। সেজন্য একটু কিন্তু-কিন্তু বোধ করছিলাম। যদিও আমাদের মুখ চোখ দেখে কেউ আমাদের চোর বলে সন্দেহ করবে না।

পরদিন সকাল থেকেই আমরা মনোযোগী ছাত্রের মতন লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনোয় লেগে গেলাম। ইতিহাসের সেই দুর্লভ বইটি হাতে নিয়ে দেবরাজের চোখে প্রায় জল এসে গেল। সে বুঝে গেছে, এই বইটা কিছুতেই এখান থেকে সরানো যাবে না।

কিন্তু চোর কখনো সম্পূর্ণ সাধু হয়ে যেতে পারে না একদিনে। লাইব্রেরিতে হান্টার সাহেবের খুব পুরোনো দু'খানা গেজেটিয়ার দেখে দেবরাজ আর লোভ সামলাতে পারল না। আমাকে কানে কানে ফিসফিস করে বলল, এই দু'খানা নিতেই হবে রে নীলু।

দুটো দিন সে বাড়িতে আমরা চমৎকার আনন্দে কাটিয়ে দিলাম। সকালে কয়েক ঘণ্টা আমরা পড়াশুনোর ভান করি। তারপরই দুপুরে এলাহি খাওয়া-দাওয়া। তারপরে লাইব্রেরিতে দরজা বন্ধ করে ঘুমোই। বিকেল থেকে শুরু হয় আড্ডা। তেজেন্দ্রনারায়ণ একটু গম্ভীর প্রকৃতির হলেও শান্তা অজস্র কথা বলে। আমাদের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেছে। আমাদের একটাও পয়সা খরচ হয় না, পরের বাড়িতে তোফা খাতির-যত্ন পাচ্ছি।

বাড়ির সামনের বারান্দাটা সত্যি অপূর্ব। সামনে বহুদূর পর্যন্ত ঢালু উপত্যকা। বিরাট বিরাট পাইন গাছ মাথা উঁচু করে স্বর্গ ছুঁতে চাইছে। আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসে বিকেলের আলো। হঠাৎ হঠাৎ কুয়াশা বা উড়ো মেঘ এসে ঢেকে দেয় আমাদের। তার মধ্যে শান্তা চায়ের কাপে যখন চিনি মেশায়, তখন চামচের শব্দটা সঙ্গীত হয়ে যায়।

দার্জিলিং-এর বাড়ি, তেজেন্দ্রনারায়ণ আর তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী স্ত্রী আর আমরা দু'জন চোর—এই নিয়ে একটা রোমহর্ষক উপন্যাস লেখা যেতে পারত। চমৎকার পরিবেশ, পাত্র-পাত্রীরাও বেশ উৎকৃষ্ট। কিন্তু এটা অন্য গল্প।

তৃতীয় দিন বিকেলে আমরা বেড়াতে গেলাম ম্যাল-এ। আমার বেশ কয়েক বছর পর দার্জিলিং-এ আসা। রীতিমত ঘিঞ্জি হয়ে গেছে শহরটা। এখন গরমকাল বলে, দু-চার পা হাঁটলেই কলকাতার কোন-না-কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

আমাদেরও সেরকম হলো। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ একজন আমার পিঠে

চাপড় মেরে বলল, কী রে নীলু! শ্রীমান নীললোহিত, দার্জিলিং-এ কী করছিস?

তাকিয়ে দেখলাম, সুজিত। কলেজে আমার সহপাঠী ছিল। সে আমার মতন বেকার নয়, তার বাবার মেডিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস-এর ব্যবসা আছে। শুনেছি, কিছুদিন আগে সে একটি বেশ বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছে। সে বিয়েতে আমি নেমন্তন্ন পেয়েও যাইনি। বিয়েবাড়িতে গেলেই উপহার-টুপহার দেবার ঝামেলা থাকে।

—আয়, আলাপ করিয়ে দিই।

সুজিতের সঙ্গে অনেকে রয়েছে। চারজন মেয়ে, যাদের বয়েস তেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে, প্রত্যেকের মুখের ধাঁচ অনেকটা এক রকম। চারজনই ফর্সা এবং সুন্দরী। দেখলেই বোঝা যায় ওরা সহোদরা। সবচেয়ে ছোটটি পরেছে স্কার্ট, মাঝখানের দু'জন ফ্লেয়ার, বড়টি শাড়ি। সুজিতও খুব সাজগোজ করে আছে, যাকে বলে হেভি মাঞ্জা। ওর টকটকে লাল রঙের ফুল হাতা সোয়েটারটা নিশ্চয়ই ইম্পোর্টেড।

বড় মেয়েটির নাম সুজাতা। তার ফাঁপানো চুলের মধ্যে সিঁদুরের রেখা অদৃশ্য হলেও সে-ই সুজিতের স্ত্রী। বাকি তিনজনের মধ্যে দু'জনের নাম আমি ভুলে গেলাম, কিন্তু অন্য জনের নাম আমার মনে গেঁথে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তার নাম বিশাখা। সে বলল, ও, আপনিই নীললোহিত! আপনার লেখা আমি পড়েছি, সেই যে কাশ্মীরে এক ভদ্রমহিলার স্বামী হারিয়ে গিয়েছিল...।

আমার লেখার কেউ প্রশংসা করলে আমি একেবারে গদগদ হয়ে পড়ি, মুখখানা বিনীত হতে হতে বোকা-বোকা হয়ে যায়, মাথা নিচু হয়ে আসে। আর, কোন মেয়ের মুখ থেকে প্রশংসা শুনলে তো কথাই নেই। অবশ্য জীবনে একবার বা দেড়বারই এরকম শুনেছি।

আমার মনে হলো, বিশাখা মেয়েটি স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক দেবদূতী। কী সরল আর সুন্দর তার মুখখানা ইত্যাদি। আমি যখন নিজেকে নিয়ে এইভাবে ব্যস্ত তার মধ্যে দেবরাজ অনেকখানি ভাব জমিয়ে ফেলেছে সুজিতের সঙ্গে।

সুজিত আমাকে উদ্দেশ করে বলল, তোরা কোন হোটেলে উঠেছিস? ইচ্ছে করলে আমাদের ওখানে এসে থাকতে পারিস। অনেক জায়গা আছে। আমার শ্বশুরের একটা বাড়ি আছে এখানে। পাঁচখানা ঘর।

সুজিতটা বরাবরই এরকম চালিয়াৎ। আমাদের অন্যরকম ভাবে আমন্ত্রণ করা যেত না? পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই জানিয়ে দিতে হবে যে ওর শ্বশুরের বাড়ি আছে দার্জিলিং-এ? ওর শ্বশুর-ভাগ্য এবং শ্যালিকা-ভাগ্য বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে।.

ইচ্ছে হলো আমিও একটু চাল মেরে বলি, আমরা কোন হোটেলে উঠিনি, উঠেছি এক রাজার বাড়িতে, সেখানে আটখানা ঘর, সেখানেও এক অতি সুন্দরী রানী খুব যত্ন করে দু'বেলা আমাদের চর্ব-চোষ্য-লেহ্য পেয় খাওয়াচ্ছেন।

আমি কিছু বলবার আগেই দেবরাজ বলল, না, আমরা দু-একদিনের মধ্যেই চলে যাব, আমাদের থাকবার জায়গা আছে। আপনাদের বাড়িটা কোথায়?

সুজিত বলল, স্টেপ অ্যাসাইডের কাছেই, বাড়িটার নাম শান্তি ভবন—ওখানে গিয়ে ডঃ বিনয় লাহিড়ীর বাড়ি কোন্‌টা জিজ্ঞেস করলে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। বাড়িটা বানিয়েছিলেন সুজাতার ঠাকুর্দা। তিনি শেষ জীবনে টানা আট-দশ বছর এখানেই ছিলেন। সবাই চিনত তাঁকে। এই তো গত বছর ঠিক এই সময় মারা গেছেন।

দেবরাজ জিজ্ঞেস করল, কোন বিনয় লাহিড়ী? যিনি এক সময় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির হিস্ট্রির হেড অব দা ডিপার্টমেন্ট ছিলেন?

সুজিত বলল, হ্যাঁ।

—যিনি 'টেম্পলস ইন উত্তরপ্রদেশ' বইটা লিখেছিলেন?

সুজিত এ কথাটার ঠিক উত্তর দিতে না পেরে তার স্ত্রীর দিকে তাকাল। সুজাতা বলল, হ্যাঁ, উনি আরো অনেক বই লিখেছেন।

চকচক করে উঠল দেবরাজের চোখ। কোনাকুনি একবার তাকাল আমার দিকে। আমি এই দৃষ্টির অর্থ জানি। অর্থাৎ ডঃ বিনয় লাহিড়ীর ভাণ্ডারে অনেক দুর্লভ বই থাকবার কথা। নিশ্চয়ই দেবরাজ এরকম দু-একটা বইয়ের সন্ধান রাখে।

দেবরাজ বলল, চলুন, হাঁটা যাক। আপনারা অন্য কোন দিকে যাচ্ছিলেন না তো?

সুজিত বলল, না, আমরা এখন ফিরছিলাম।

—চলুন, আপনাদের বাড়িটা দেখে আসা যাক।

ম্যালের ভিড় ছাড়িয়ে এসে আমরা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। ভালো বইয়ের খবর পেলে দেবরাজ সুন্দরী মেয়েদের দিকে তাকাতেও ভুলে যায়। সে সুজিতের কাছ থেকে বিনয় লাহিড়ী সম্পর্কে নানা রকম খবর জোগাড়ের চেষ্টা করতে লাগল। আমি হাঁটতে লাগলাম বিশাখার পাশাপাশি। বিশাখা বোনদের মধ্যে সেজো, ফোর্থ ইয়ারে পড়ে লেডি বেবোর্ন কলেজে। তার সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য আমার বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করছিল। কিন্তু আমি কথা বলতে জানি না। টুকটাক দু'একটা কাটা-কাটা কথা শুধু মনে আসে। আমার বন্ধু শুভ্রাংশু যদি এখানে থাকত, তাহলে এরই মধ্যে সে এদের তিনজনের মধ্যে যে-কোন একজনের কাঁধে হাত রাখত অবলীলাক্রমে।

এদের বাড়িটা পুরোনো হলেও সুন্দর। সামনের কম্পাউণ্ডে অনেকগুলো লতানে-গোলাপগাছ। আশেপাশে কয়েকটা নতুন বাড়ি উঠে জায়গাটা একটু ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। এককালে নিশ্চয়ই আরো সুন্দর শোভা ছিল।

সুজিত বলল, আয় ভেতরে একটু বসে যা।

দেবরাজ এজন্য তৈরি হয়েই ছিল। সে তো শুধু বাড়িটা দেখতে আসেনি। বাড়ির ভেতরে যাবার জন্যই এসেছে। আমার দিকে চোখের একটা ইঙ্গিত করে বলল, হ্যাঁ, একটু বসা যাক। অনেকক্ষণ হেঁটে-হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গেছে।

দোতলায় যে-ঘরটায় এসে আমরা বসলাম, সে-ঘরে একটাও বই নেই। দেবরাজ চঞ্চলভাবে চারিদিকে তাকাচ্ছে। একসময় সুযোগ পেয়ে আমাকে জানাল, ডঃ বিনয় লাহিড়ী ফার্গুসনের কালেকশন কিনেছিলেন। দারুণ দারুণ বই থাকবার কথা কিন্তু এদের বাড়িতে।

সুজাতাদের মা এসে আলাপ করলেন আমাদের সঙ্গে। ভদ্রমহিলার বয়েস অন্তত পঞ্চাশ হওয়া উচিত, কারণ একটু আগে শুনেছি, সুজাতার ওপরে এক দাদা আছে, কিন্তু ভদ্রমহিলাকে দেখে এখনো তরুণী মনে হয়। মাথার একটা চুলও পাকেনি, চামড়ায় ভাঁজ নেই। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। ওঁর বয়েস পঁয়তিরিশ বললে কেউ অবিশ্বাস করবে না।

তিনি আমাদের মিষ্টি আর চা খাওয়াবেনই। যদিও আমাদের খাবার ইচ্ছে নেই একটুও। এবার দেবরাজের সঙ্গে বেরিয়ে আসল উদ্দেশ্য যেমন কিছু সফল হয়নি, কিন্তু অন্যদিকে আমাদের ভাগ্য খুবই ভালো দেখা যাচ্ছে। ভালো ভালো খাবার জায়গা আর অঢেল খাদ্য। সুজাতার মা আমাদের একটু মিষ্টিমুখ করাবার নাম করে তিন রকম খাবার এনে দিলেন এবং জোর করতে লাগলেন।

বিশাখা বলল, মা, সাবধান থেকো কিন্তু। উনি হয়তো তোমার এই মিষ্টি খাওয়ানো নিয়ে জোর করার কথা আবার কোন গল্পে লিখে দেবেন।

ভদ্রমহিলা মিষ্টি হেসে বললেন, তাই নাকি? তুমি লেখো বুঝি? তা আমাকে নিয়ে আর কী লিখবে? বুড়িদের সম্পর্কে লেখা কে আর পড়বে?

আমাকে উৎসাহের সঙ্গে বলতেই হলো, না, না, আপনি বুড়ি কে বলেছে?

ঘরের দেয়ালে অনেকগুলো ছবি। তার মধ্য থেকে ডঃ বিনয় লাহিড়ীকে দেবরাজ সহজেই চিনে নিল। ভদ্রলোকের মুখে রবীন্দ্রনাথের কায়দায় পাকা দাড়ি। তিনি শেষ জীবনে দার্জিলিং-এর গরীব নেপালীদের মধ্যে বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিলি করতেন।

দেবরাজ সুজাতার মাকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, ওনার তো প্রচুর বইপত্র ছিল শুনেছি ; সেগুলো এখানে নেই?

সুজাতার মা অলকা দেবী বললেন, আমার শ্বশুরমশাইয়ের বই কেনার বাতিক ছিল সাঙ্ঘাতিক। হাজার হাজার বই বাড়িতে। সেসব বই এখন রাখবার জায়গাই হয় না। এ বাড়িতেও ছিল অনেক বই। উনি মারা যাবার পর কিছু বিলি করে দেওয়া হয়েছে। কিছু নিয়ে রাখা হয়েছে কলকাতার বাড়িতে। এ বাড়িতে তো সারা বছর কেউ থাকে না। বছরে বড় জোর একবার আসা হয়। বড্ড চুরি হয় এখানে।

সরল ভালোমানুষের মতন মুখ করে দেবরাজ জিজ্ঞেস করলো, বই-ও চুরি হয়?

আমি হাসি চাপবার জন্য মুখ ফেরালাম।

অলকা দেবী বললেন, ছিঁচকে চোররা ঢুকে যা পায় তাই নষ্ট করে। সেইজন্য এখানে আর কিছু রাখি না।

দেবরাজ বলল, একদিন আপনাদের কলকাতার বাড়িতে যাব। বই দেখে আসব। পুরোনো বই দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। 'টেমপলস ইন উত্তরপ্রদেশ' বইটা অনেকদিন আউট অব প্রিন্ট, যদি একটু পড়বার সুযোগ পাই।

অলকা দেবী বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই এস আমাদের বাড়িতে। কলকাতায় আমাদের বাড়ি সি আই টি রোডে, পার্ক সার্কাস ময়দানের একটু আগে।

বুঝলাম, দেবরাজ লাইন তৈরি করে নিয়েছে। ওঁদের কলকাতার বাড়িতে সে নিশ্চয়ই হানা দেবে এরপর।

রাস্তার দিকের কাচের জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিল বিশাখা। ওর সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য আমি দেয়ালের ছবি দেখবার ছুতোয় সেদিকে উঠে গেলাম।

একটা ছবির দিকে আমার চোখ আটকে গেল। পণ্ডিত রবিশঙ্করের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করছেন একজন দীর্ঘকায় মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। কোঁচানো ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি পরা। ভদ্রলোকের চেহারায় বেশ ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। রবিশঙ্করের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন যখন, তখন ইনিও নিশ্চয়ই একজন কেউকেটা হবেন। অথচ আমি চিনি না। কিষেণ মহারাজ কিংবা আল্লারাখা নয় তো?

আমি বিশাখাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে?

বিশাখা বলল, আমার বাবা।

—ও, উনি বুঝি গান-বাজনা করেন?

বিশাখা হেসে ফেলে বলল, না, না। আমার বাবা কোথাও গান গাইতে যান না। তবে গান ভালোবাসেন খুব। ঐ ছবিটা তোলা হয়েছিল...

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ঠাকুর্দার মতন আপনার বাবাও বুঝি কোথাও পড়ান-টড়ান?

—না। বাবা বিজনেস দেখেন।

—রবিশঙ্কর আপনাদের বাড়িতে এসেছিলেন?

—বাড়িতে নয়, আমাদের হলে। রবিশঙ্কর একবার একটা চ্যারিটি ফাংশানে এসেছিলেন।

—কোথায় এসেছিলেন?

—আমাদের একটা সিনেমা হল আছে, রোহিণী, সেখানে।

—রোহিণী? শিয়ালদার কাছে?

—হ্যাঁ। এখন অবশ্য অনেকদিন সেটা বন্ধ। স্ট্রাইক-ফাইক কী যেন চলছে।

আমি হঠাৎ মূর্তির মতন স্থির হয়ে গেলাম। আমার হাতে খাবারের প্লেট, তাতে দুটি করে শোনপাপড়ি, রসকদম্ব আর ছানার জিলিপি। মাত্র কয়েকদিন আগে আমি রোহিণী সিনেমার সামনের ফুটপাথের ওপর অনশনরত ধর্মঘটীদের সঙ্গে বসেছিলাম কিছুক্ষণ। আর আজ, সেই সিনেমা হলের মালিকের বাড়িতে, তাঁর সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে লোভনীয় সব খাবার খেতে-খেতে গল্প করছি।

আমার ঠোঁটে একটা হাসি ফুটে উঠল।

৩

সকালবেলা চা খাওয়ার সময় খবরের কাগজ পড়তে পড়তে দাদা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর কাগজটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, পাঁচের পাতায় তিনের কলমের নিচের দিকটা পড়ে দ্যাখ। ওদের খবর বেরিয়েছে।

—কাদের খবর?

—পড়েই দ্যাখ না।

এত ছোট হেডিং যে খবরটা সহজে খুঁজে পাওয়াই যায় না। তারপর চোখে পড়ল। দশ-বারো লাইনের একটা টুকরো সংবাদ। রোহিণী সিনেমা হলের কর্মচারীদের ধর্মঘট দুশো-সতেরো দিনে পড়েছে। এঁদের মধ্যে একজন গুরুতরভাবে গতকাল অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ছাঁটাই রোধ ও বেতন-বৃদ্ধির দাবিতে এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে গত বছর নভেম্বর মাস থেকে।

যাক, এতদিন বাদে ওদের খবর তা হলে বার হলো কাগজে। অনশনকারীদের

মধ্যে কেউ মারা গেলে বোধহয় আরো বড় খবর হবে। জীবন্মৃতদের নিয়ে কোন সংবাদ হয় না।

আমি মুখ তুলতেই দাদা বললেন, বোধহয় রমেশ জ্যাঠামশাই?

আমি চুপ করে রইলাম। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় যাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, তিনি আমাদের রমেশ জ্যাঠামশাই হতেই পারেন। সেটাই বেশি সম্ভব।

দাদা বললেন, একবার খোঁজ নেওয়া উচিত মনে হয়।

একথাটা বলার উদ্দেশ্য আমি জানি। অর্থাৎ খোঁজ নিতে হবে আমাকেই। দাদা নিজে সব সময় দায়িত্ব এড়িয়ে চলেন। যা কিছু সাংসারিক ঝুটঝামেলা চাপে আমার কাঁধে। কারণ আমি বাড়ির বেকার ছেলে।

মেজদা নিজের ঘরে বসে রেডিওটা নিয়ে গুটগাট করছিল। দাদা ডেকে পাঠালেন তাকে। মেজদাকেও খবরটা পড়িয়ে বললেন, আমাদের একটা কিছু করা দরকার নয়? তুই কি বলিস?

মেজদা বলল, হুঁ।

দাদা বললেন, একবার রমেশ জ্যাঠার বাড়িতে—

মেজদা বলল, বোধহয় বেলেঘাটার ওদিকে...এক সময় তো ওদিকেই থাকতেন জানি।

দাদা বললেন, তা হলে দুপুরের আগেই একবার—

মেজদা চঞ্চল হয়ে বলল, আমার কলেজে আজ আবার বিশেষ কয়েকটা কাজ আছে, ইউনিয়ানেব মিটিং, আমি না গেলে হবেই না। নইলে আমি—

দাদা উঠে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুলে মানি ব্যাগটা বার করলেন। ভেতরের নোটগুলো নিয়ে একটুক্ষণ নাড়াচাড়া করে দু' তিনবার পাল্টাবার পর একটি পঞ্চাশ টাকার নোট তুলে নিলেন, দু' আঙুলে। মেজদার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই তিরিশটা টাকা দে। আর নীলু কুড়িটা টাকা নিজে জোগাড় করুক। এই একশোটা টাকা অন্তত পৌঁছে দিয়ে আসা দরকার।

ইতিমধ্যেই মা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার কাছে। সবটা না জেনেও দুটো একটা টুকরো কথা শুনেই অনুমান করে নিলেন ব্যাপারটা। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কাকে টাকা দিচ্ছিস? কেতকীর বাবাকে? কেন, তোদের কী দরকার?

মাসের তিন তারিখ, দাদা আর মেজদা, দু'জনেরই হাতে এখন টাকা আছে। সুতরাং কিছু টাকা খসিয়ে বিবেকটা পরিষ্কার করতে দু'জনে খুব ব্যস্ত।

মা আবার বললেন, কেন, টাকা পাঠাতে যাচ্ছিস কেন তোরা? টাকা-পয়সা কি অঢেল হয়েছে? খালি তো সংসারে শুনি নেই আর নেই। মাস ফুরোবার আগেই তেল ফুরিয়ে যায়, বাজার থেকে মাছ আসে না।

দাদা বললেন, কাগজে বেরিয়েছে রমেশ জ্যাঠার অবস্থা খুব খারাপ।

মা বললেন, সে আমরা কী করব? গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা করতে পারে না? তাছাড়া, ওনার অতবড় ছেলে রয়েছে, সেও রোজগার করে, বাপকে দেখতে পারে না সে?

দাদা এবার মায়ের দিকে চোখ তুলে গম্ভীর শান্ত গলায় বললেন, শোনো, আমি জানি, বাবা বেঁচে থাকলে এই সময় রমেশ জ্যাঠাকে কিছু-না-কিছু সাহায্য করতেনই। বাবা নেই বলে আমরা সামান্য কিছুও করতে পারব না?

একথা শুনে মা নিবৃত্ত হলেন না। গজগজ করে বলতে লাগলেন, যেমন ছিল তোদের বাবা, দান-ধ্যান করে সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে। নিজেদের যে কীভাবে চলবে সে খেয়াল ছিল না...।

বোঝা গেল, কোন কারণে রমেশ জ্যাঠার ওপর মায়ের বিশেষ রাগ আছে।

মেজদা বলল, রমেশ জ্যাঠা দিনের পর দিন আমাদের বাড়িতে খেয়ে গেছেন। উনি খেতে ভালোবাসতেন বলে বাবা জোর করে ওঁকে খাওয়াতেন। তোমার সেসব কথা মনে নেই মা?

মা বললেন, মনে থাকবে না কেন? কতদিন জ্বালিয়েছে আমাকে।

মেজদা বলল, সরমা জ্যাঠাইমা নিশ্চয়ই ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুব বিপদে পড়েছেন এই সময়।

মা এইবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওর তো ভাগ্যটাই খারাপ। ওর আবার বাপের বাড়ির দিকেরও কেউ নেই...

দাদা আমাকে বললেন, ক'দিন ধরে আমার বড্ড কাজ, নইলে আমি নিজেই যেতাম, তুই টাকা নিয়ে জ্যাঠাইমার হাতে দিবি। রমেশ জ্যাঠার হাতে দিস না। বলবি, মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দাদার স্বভাব আমি জানি। নিজে কোথায়ও যায় না। এই রকম কিছু ব্যাপার হলেই সব সময় টাকা দিয়ে দায় সারতে চায়।

আমি বললাম, আর যদি রমেশ জ্যাঠাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়ে থাকে?

দাদা, মেজদা দু'জনেই একটু অস্বস্তিতে পড়ল। তাহলে আরো দায়িত্ব পড়ে যায়। রমেশ জ্যাঠা আমাদের এমন কিছু আত্মীয় নন যে, ওঁর জন্য আমাদের সত্যি-সত্যি উদ্বেগ বোধ করতে হবে। নেহাত বাবার সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই যেটুকু কর্তব্যবোধ।

দাদা কিছু বলতে পারলেন না। কিন্তু মেজদা বেশ কায়দা করে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল। মেজদা বলল, হাসপাতালে চিকিৎসা হবে নিশ্চয়ই। যদি কোন ওষুধ-টসুধের দরকার হয় আমাকে একটা খবর দিস। আমার বন্ধু পবিত্র ঘোষ একটা

ওষুধ কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার, ওকে বলে কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

দাদা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খবর দিস।

ব্যস, ওরা দু'জনে দায়মুক্ত হয়ে গেল।

রমেশ জ্যাঠার বাড়িটা ঠিক কোথায়, সেটা জানা গেল না। দাদা, মেজদা কারুরই ঠিক মনে নেই। মা বললেন, ঐ বেলেঘাটার ওদিকে কোথায় যেন!

সুতরাং মুড়ি ও ডিম সেদ্ধ খেয়ে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হলো। রোহিণী সিনেমা হলের কাছে গেলেই রমেশ জ্যাঠার খোঁজ পাওয়া যাবে।

কিন্তু আমি অন্য একটা সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

দাদা আর মেজদা মিলে দিয়েছে আশি টাকা। বাকি কুড়ি টাকা আমাকে দিতে হবে। টাকা আমার কাছে নেই তা নয়। মাসের গোড়ায় টিউশানির মাইনে পেয়েছি, আমার কাছে রয়েছে এখনো বিরানব্বই টাকা। কিন্তু এর থেকে হঠাৎ কুড়ি টাকা এইভাবে খরচ করলে সারা মাসে আমার চলবে কী করে? ট্রাম-বাস ভাড়া, চা-সিগারেটের খরচাও তো আছে। দাদা-মেজদা মিলে পুরো একশো টাকা দিতে পারত না?

সরমা জ্যাঠাইমার হাতে যদি আমি আশি টাকা দিই? দাদা-মেজদা কোনদিন জানতেও পারবে না, আমি আশি টাকা দিয়েছি, না একশো! আর রমেশ জ্যাঠারা তো আমাদের কাছ থেকে টাকা পাবার কোন আশাই করেননি। সুতরাং আশি টাকা পেলেই বা কম কী? অবশ্য গোল সংখ্যা বা রাউন্ড ফিগার দেওয়াই নিয়ম। পঞ্চাশ, পঁচাত্তর বা একশো। পঁচাত্তর? আমারও যাতায়াতের খরচ আছে।

রোহিণী সিনেমা হলের সামনে রমেশ জ্যাঠাকে দেখতে পেলাম না। অন্যরা আছেন। এই ক'দিনের পরিবর্তনের মধ্যে শুধু এই দেখলাম যে, চাটাইটা আরো ছিঁড়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ফুটপাথের ওপরেই বসেছে সবাই। আজও তাশ খেলা চলেছে।

সেদিন যে লোকটির সঙ্গে রমেশ জ্যাঠা আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর পাশে উবু হয়ে বসে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, রমেশ মুখার্জি আপনাদের এখানে ছিলেন, তিনি কোথায় বলতে পারেন?

তিনি অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, হাসপাতালে গেছেন।

আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। তা হলে উনিই? আরো ঝামেলা বেড়ে গেল যে!

পরক্ষণেই অবশ্য স্বস্তি ফিরে পেলাম। লোকটি বললেন, আমাদের একজন হাসপাতালে গেছে, পেপারে বেরিয়েছে খবরটা, দেখেননি? এতদিন বাদে

পেপারওয়ালাদের টনক নড়েছে। আমরা ক'জন মানুষ যে এখানে মরতে বসেছি, সেদিকে খেয়ালই নেই কারুর। রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে স্মারকপত্র দিয়ে এলাম... অজিত দাস হাসপাতালে গেছে। এবার একে একে আমরাও সবাই যাব। রমেশদা গেছেন অজিতের খবর আনতে। যদি দেখা করতে চান, ও বেলা আসবেন।

ওঃ, যাক বাঁচা গেল! রমেশ জ্যাঠা হাসপাতালে ভর্তি হননি। এখনো হাঁটাচলার ক্ষমতা রয়েছে।

লোকটির কাছ থেকে রমেশ জ্যাঠার বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেল। সেটা জেনে নিয়ে আমি উঠে পড়লাম।

বেলেঘাটার দিকে আমি বেশি যাইনি। আগে বেলেঘাটা শুনলেই একটা নোংরা ঘিঞ্জি এলাকার কথা মনে আসত। এখন অনেক চওড়া চওড়া রাস্তা হয়েছে, উঠেছে অনেক সুন্দর সুন্দর নতুন বাড়ি। কিন্তু পুরোনো নোংরা গলি আর বস্তিও রয়ে গেছে পাশাপাশি।

রমেশ জ্যাঠার বাড়ি কিন্তু বস্তির মধ্যে নয়, বস্তির পাশের একটা ভাঙা মতন দোতলা বাড়িতে। অর্থাৎ তিনি এখনো ভদ্রলোক শ্রেণীর অন্তর্গত। ঠিকানা মিলিয়ে সে বাড়িতে ঢুকতে গিয়েও আমি থমকে গেলাম। আমার একটু ভয়-ভয় করতে লাগল, কী দেখব বাড়ির মধ্যে? দারিদ্র্য জিনিসটার মুখোমুখি কে আসতে চায়? একজন সিনেমা হলের সামান্য কর্মচারী যদি সাত-আট মাস মাইনে না পায়, তাহলে সে-বাড়ির লোক বেঁচে থাকে কেমন করে?

রমেশ জ্যাঠা হাসপাতালে গেছেন। ওঁর সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো। জ্যাঠাইমার হাতে কোন রকমে টাকাটা দিয়ে পালিয়ে আসতে হবে তাড়াতাড়ি।

রাস্তার পাশের নর্দমা উপচে জল ছড়িয়ে আছে বাড়িটার দরজা পর্যন্ত। আমি দূর থেকে একটা লাফ দিয়ে সেই জল ডিঙ্গিয়ে পৌঁছোলাম সদরে। দরজাটা খোলাই ছিল।

ভেতরে একটা ছোট চাতাল, তারপর উঁচু রকের ওপর দু'খানা ঘর। একজন লোক রকের ওপর বসে গায়ে সর্ষের তেল মাখছে। খুব মলিন ফ্রক-পরা একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে কাছেই দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। লোকটি বলল, এই সন্টি, আমার পিঠটায় একটু তেল মাখিয়ে দে তো। মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটি আবার বলল, দে না, দশটা পয়সা দেব এখন! মেয়েটি তেলের বাটিতে হাত ডোবাল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে...রমেশ মুখার্জি...

লোকটি একবার আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, ডান দিকে সিঁড়ি, ওপরে উঠে যান!

সিঁড়ির ইঁট লোকের পায়ে পায়ে ক্ষয়ে পাতলা হয়ে গেছে। দোতলার সিঁড়ির মুখে একটা চটের পর্দা ঝোলানো। উঠতে উঠতে আমি শুনতে পেলাম, কে যেন একজন লোক বলছে, হারামজাদী, মেরে তোর মুখ ভেঙে দেব! কোন একটা কাজ পারে না। বললাম বিকাশকে একবার ডেকে আন, সে কথা গ্রাহ্য নেই! মর মর, মরতে পারিস না। তা হলে আমার হাড় জুড়োয়!

আমি একটুখানি অপেক্ষা করে রইলাম। বকুনি খানিকটা কমলে আমি শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, জ্যাঠামশাই!

পুরুষ গলায় আওয়াজ এল, কে?

তারপর চটের পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়ালেন স্বয়ং রমেশ জ্যাঠামশাই। আমি একটু অবাক হলাম। এঁর তো এখন হাসপাতালে থাকবার কথা।

তিনিও যথেষ্ট অবাক হলেন আমাকে দেখে। হাঁ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বললেন, কে, নীলু? কী ব্যাপার? আয় আয়—

রমেশ জ্যাঠামশাই একটা ছোট ধুতিকে লুঙ্গির মতন পরে আছেন। খালি গা, বুকের প্রত্যেকটি পাঁজরা স্পষ্ট। যাত্রা-থিয়েটারের ভৌতিক গল্পে ওঁকে অনায়াসে জ্যান্ত কঙ্কালের পার্ট দেওয়া যায়।

বারান্দায় একটি তক্তাপোষ পাতা, রমেশ জ্যাঠামশাই সেখানে আমাকে বসতে দিলেন। একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে কাঁদছিল, সে দৌড়ে ভিতরে পালালো আমাকে দেখে। মেয়েটির মুখ আমি ভালো করে দেখতে পেলাম না। একবার মনে হলো, এই কি কেতকী?

সরমা জ্যাঠাইমা একটা দরজার আড়াল থেকে মুখ বার করে আমাকে দেখলেন। আবার চট করে সরে গেলেন।

রমেশ জ্যাঠা বললেন, এসো, এদিকে এসো, এ তো আমাদের নীলু, এর সামনে আর লজ্জা কী?

সরমা জ্যাঠাইমা একটু পরেই বুকের কাছে একটা গামছা জড়িয়ে এলেন। ওঁর শাড়িটা ছেঁড়া, গায়ে ব্লাউজ নেই। সরমা জ্যাঠাইমা রমেশ জ্যাঠার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। এখনো তাঁর শরীর বিষয়ে লজ্জার ভাবটা যায়নি।

আমি উঠে দু'জনকেই প্রণাম করলাম।

অনেকদিন আগে সরমা জ্যাঠাইমাকে যেরকম দেখেছিলাম, তার চেয়ে উনি বিশেষ কিছু বদলাননি। তবে, সে-সময় মুখখানা ছিল কোমল স্নেহমাখা, এখন সেখানে অনেকগুলো দাগ। কিন্তু দারিদ্র্যে উনি নোংরা হয়ে যাননি, মুখে এখনো খানিকটা আভিজাত্যের ছাপ আছে।

আমি বললাম, মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

সরমা জ্যাঠাইমা মৃদুভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ তোমরা সবাই? তোমার মায়ের শরীর কেমন আছে?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ভালো।

এই বাড়ির পরিবেশে সরমা জ্যাঠাইমাকে যেন একেবারেই মানায় না। টকটকে ফর্সা রং, পিঠ ছড়ানো কাঁচা পাকা চুল, একটু ভারী শরীর, ওঁকে যেন জমিদার বাড়ির গিন্নী হলেই মানাত। শুনেছি এক পড়ন্ত বড় বংশেরই মেয়ে উনি। এখনো ওঁর গলার আওয়াজে কোন রকম অভিমান বা দীনতা নেই। নিজেদের কথা না বলে আগেই আমাদের বাড়ির খবর নিলেন।

রমেশ জ্যাঠা বললেন, আর তো কেউ আমাদের খবরও রাখে না, মরলাম কি বাঁচলাম!

আমি বললাম, আজকের কাগজে আপনাদের খবর বেরিয়েছে দেখে মা বললেন, যা একবার দেখে আয়। আপনাদের একজন হাসপাতালে গেছে, তাই আমরা ভাবলাম—

—ভেবেছো, আমিই বুঝি গেছি? আমার কড়া জান। এই বুড়োর হাড়ে এখনো যা শক্তি আছে, তা অনেকের নেই। আমি যদি মরি তো একেবারে শিবশঙ্কর লাহিড়ীর বাড়ির দোর গোড়ায় গিয়ে মরব! তারপর ভূত হয়ে ওর গলা টিপব। হারামজাদা!

সরমা জ্যাঠাইমা বললেন, থাক, চুপ করো!

—কেন চুপ করব? আমরা ক'টা লোক না খেয়ে খেয়ে মরে যাচ্ছি, আর ও আরামে থাকবে, যা খুশি করে যাবে? ব্যাটা কোন খোঁজও নেয় না। আমাদের সঙ্গে কোন রকম আলাপ-আলোচনা করতেও রাজি নয়! শূয়ার কা বাচ্চা! যেন আমরা সব ক'টা মরে গেলে তারপর ও আবার নতুন লোক এনে রোহিণী খুলবে। এর কোন বিচার নেই? গভর্নমেন্ট দেখে না, ই আই এম পি এ দেখে না, কেউ দেখে না—ওঃ, হুঁ হুঁ।

রাগ দেখাতে গিয়ে রমেশ জ্যাঠা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। এরকম একজন বৃদ্ধ লোককে আমি কখনো কাঁদতে দেখিনি। বৃদ্ধদের কান্না দেখতেও ভালো লাগে না। শিশু বা নারীদের কান্নার মতন এতে কোন করুণ রস বা সৌন্দর্য নেই। বরং দেখলে হাসি পায়! এসব ক্ষেত্রে কীরকম ব্যবহার করা উচিত, তা জানি না। তবু কথা ঘোরাবার জন্য আমি জ্যাঠাইমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এ বাড়িতে কতদিন আছেন?

জ্যাঠাইমা বললেন, তা বছর কুড়িক হবে।

রমেশ জ্যাঠা মুখ তুলে বললেন, তেইশ বছর!

কাঁদতে গিয়ে রমেশ জ্যাঠার শিকনি বেরিয়ে গিয়েছিল। সশব্দে নাক ঝাড়লেন এবার। বাঁ হাতে সেটা মুছলেন। এইরকম নোংরা ব্যাপার দেখলে আমার গা গুলিয়ে ওঠে।

জ্যাঠামশাই হাঁক দিলেন, মণ্টি, এক মগ জল নিয়ে আয়!

যে-মেয়েটি একটু আগে এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল সে এক মগ জল নিয়ে এল। জ্যাঠামশাই তার মধ্যে হাত ডুবিয়ে হাত ধুলেন। তারপর আবার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মেয়েটিকে বললেন, গামছাটা আনতে পারনি, না? হাত মুছব কিসে! মেয়েটি নিঃশব্দে আবার গামছা এনে দিল। জ্যাঠামশাই তো উঠে গিয়ে বাথরুমেও ধুয়ে আসতে পারতেন। যত গরীবই হোক, এক-একজন লোক থাকে, নিজের বাড়িতে ঠিক বাদশার মতন। সব সময় হুকুম চালায়।

—এই মণ্টি, একে প্রণাম করেছিস? তোদের এক রকম দাদা হয়।

মেয়েটি নিচু হয়ে প্রণাম করতে এল, আমি সসঙ্কোচে পা সরিয়ে নিয়ে বললাম, আরে না না, আমাকে প্রণাম করতে হবে না।

কিন্তু সে বারণ শুনল না, পা ছুঁয়ে দিল। ঠাণ্ডা নরম হাত—আমার পা শিরশির করে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ভালো নাম কি কেতকী?

এ বাড়িতে বেশির ভাগ কথা জ্যাঠামশাই-ই বলে থাকেন। অন্যকে কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেন তিনিই। মণ্টি কিছু বলার আগেই জ্যাঠামশাই বললেন, না, ওর নাম ছন্দা। কেতকী আমার বড় মেয়ে, তার বিয়ে হয়ে গেছে। এখনো ঘাড়ের ওপর তিনটে মেয়ে রয়েছে। এদের বিয়ে দেবার সাধ্য আমার নেই। বিয়ে মানেই তো এক কাঁড়ি টাকা। পেটে ভাত জোটে না, পারব না, আমি আর পারব না. সারাজীবন অনেক করেছি...এখন নিজেরা যা পারবে করবে।

আমি ছন্দাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী পড়ো?

এবারও জ্যাঠামশাই উত্তর দিলেন, পড়বে আবার কী? ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়ে ছেড়ে দিয়েছে। পড়ার খরচটা কে চালাবে? আমার তো এখন আয় বলতে বাড়ি ভাড়ার দেড়শোটি টাকা! তাতে এতগুলো পেটের ক্ষিধেই মেটে না!

বাড়ি ভাড়ার কথা শুনে আমি একটু চমকে উঠলাম। সেটা বুঝে জ্যাঠামশাই বললেন, তেইশ বছর আগে এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম পঞ্চান্ন টাকায়। এখন বাড়তে বাড়তে হয়েছে সাতাশি টাকা। আগে রেন্ট কণ্ট্রোলে জমা দিতাম, এখন তাও দিই না। বাড়িওলার সঙ্গে মামলা চলেছে। চলুক মামলা। চার-পাঁচ বছরের আগে তো মিটবে না। তখন যদি হারি তো এক পয়সাও ভাড়া না দিয়ে উঠে যাব!

বাড়িওয়ালা নামক লোকটিকে ঠকাতে পারছেন বলে জ্যাঠামশাইয়ের মুখে বেশ একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

তিনি আবার বললেন, নিচের দু'খানা ঘর সাব-লেট করে দিয়েছি, দেড়শো টাকা পাই। সেটা-ই আমার এখন একমাত্র রোজগার।

কাজটা স্পষ্টতই বে-আইনী। অন্য লোকের বাড়ি তিনি বিনা ভাড়ায় জবর দখল করে রেখেছেন এবং সেই বাড়ি থেকে নিজে টাকা রোজগার করছেন। কিন্তু যে-লোক সাত-আট মাস মাইনে পায় না, তার কাছে আইনের কোন মূল্য আছে কী?

যাই হোক, আমার একটা খটকা মিটল। জ্যাঠামশাই অন্তত সাত মাস মাইনে পান না। সেইজন্যই আমি ভাবছিলাম, এতদিন এঁদের খাওয়া-পরা চলছে কী করে? রমেশ জ্যাঠার যেরকম উড়নচণ্ডী স্বভাব, তাতে জ্যাঠাইমার গয়নাগাঁটির কিছুও এতদিন অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। আর এরকম লোককে ধারই বা কে দেবে? যাক, তবু দেড়শো টাকা রোজগার আছে। অবশ্য, দেড়শো টাকায় এতগুলো লোকের খাদ্য জোটানো যায় আজকাল? আমি বেকার, টিউশানি ইত্যাদিতে যে শ' খানেক টাকা পাই, তাতে আমার হাত-খরচই ঠিক মতন চলে না। মাসের শেষে কম পড়ে যায়। হঠাৎ একটু লজ্জিত বোধ করলাম।

আমি সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়ই আমার বাঁ পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বার করে ডান পকেটের টাকার সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছিলাম। এবার সেই একশো টাকা আস্তে আস্তে বার করে জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমার মাঝামাঝি খাটের ওপর রাখলাম। তারপর খুব নিচু গলায় বললাম, মা এই টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন।

জ্যাঠাইমার হাতেই দেওয়া উচিত ছিল ঐ টাকা। কিন্তু এত অভাবের মধ্যেও সরমা জ্যাঠাইমার আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হয়নি। তাঁর মুখে একটু লজ্জার ছায়া ফুটে উঠল। তিনি মুখটা ফিরিয়ে নিলেন অন্যদিকে।

জ্যাঠামশাই কিন্তু তক্ষুনি খপ করে তুলে নিলেন টাকাগুলো। নির্লজ্জের মতন গুনলেন আমার সামনেই। কোনরকম কৃতজ্ঞতার ভাব না দেখিয়ে বললেন, তোর বড়দা ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি করে না?

এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। আমার দাদা যখন ব্যাঙ্কে চাকরি করেন, তখন মাত্র একশো টাকা না দিয়ে আরো বেশি সাহায্য পাঠানো উচিত ছিল।

জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি এদিকটা সামলাবার জন্য বললেন, তোর মা বড় ভালো মানুষ। মনটা এত নরম, দেখেছি তো কতবার।

জ্যাঠামশাই বললেন, বৌমার ভাগ্যটা কত ভালো। তিন তিনটে ছেলে, সবাই দাঁড়িয়ে গেছে। আর আমার ঘাড়ে জুটেছে চারটে মেয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ছেলে কোথায় থাকে?

জ্যাঠামশাই স্পষ্ট উত্তর দিলেন, জেলে।

জ্যাঠাইমা মুখ ফেরালেন।

আমি একটু চমকে উঠলাম। অবশ্য আজকাল অনেকে নানা কারণে জেলে যায়। কিন্তু এরকম অপ্রিয় প্রসঙ্গ আমার না তোলাই উচিত ছিল। জ্যাঠামশাই আমার চোখের দিকে তীব্র ভাবে তাকিয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন আমার পরবর্তী প্রশ্নের। কিন্তু আমি চঞ্চল ভাবে চোখ সরিয়ে নিলাম।

জ্যাঠামশাই নিজেই আবার বললেন, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই, এ বাড়িতে সে থাকে না অনেকদিন। সে গুণ্ডামি বদমাইসি করে বেড়াত, শুনেছি মাস কয়েক আগে পুলিশ তাকে জেলে ভরে দিয়েছে। ঠিক মতন পুলিশকে ঘুষ দিতে পারেনি বোধহয়!

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবার যেতে হবে।

জ্যাঠামশাই অমনি হা-হা করে উঠলেন। সে কি? এর মধ্যে চলে যাবি? না না, একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে, প্রথম এলি এ বাড়িতে—

এটা একটা অসম্ভব কথা। যে-বাড়িতে হাঁড়ি চড়া দায়, সে-বাড়িতে আমি মিষ্টি খাব? এ তো কল্পনাও করা যায় না!

আমি জোর করে চলে আসবার চেষ্টা করলাম। অনেক করে বোঝালাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জ্যাঠামশাই তাঁর রোগা হাত দিয়ে আমাকে ধরে রইলেন, জ্যাঠাইমা আমার পথ আটকে দাঁড়ালেন। এমনকি ছন্দা নামের মেয়েটি, যে এ পর্যন্ত একটুও কথা বলেনি, সে পর্যন্ত এবার অনুনয় করে বলল, এক্ষুনি যাবেন না, একটু বসুন! মিষ্টি খাওয়াবার জন্য এরকম জোরাজুরি করাটাও একটা বাঙালেপনা!

এই সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল একটি ফ্রক-পরা কিশোরী মেয়ে। একে নিচে দেখেছিলাম, একজন ভাড়াটের পিঠে তেল মাখাচ্ছিল। মেয়েটির পেটের কাছে ফ্রকটা ছেঁড়া, আমাকে দেখে টেনেটুনে ঠিক করবার চেষ্টা করল একটু।

জ্যাঠামশাই আমার দেওয়া টাকা থেকেই একটা দশ টাকার নোট বার করে নিয়ে সেই মেয়েটিকে বললেন, সন্টি, যা তো, দু' টাকার মিষ্টি নিয়ে আয়! দৌড়ে নিয়ে আসবি। এই তোর এক দাদা, প্রণাম করে যা আগে।

তাহলে এ আমার এই জ্যাঠামশাইয়ের আর এক মেয়ে। কেউ কাউকে চিনতে পারিনি।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার আর এক মেয়ে কোথায়?

জ্যাঠামশাই বললেন, সে এক জায়গায় কাজ করতে যায়। সন্ধের পর আসবে।

সে যে কী কাজ করতে যায়, সেটা আর জানতে চাইলাম না। এই কিশোরীটির ঐ ভাড়াটে লোকটির পিঠে তেল মাখানোর দৃশ্যটি চোখে ভেসে উঠল। কী রকম কী রকম যেন লাগে।

যতক্ষণ না মিষ্টি আসে, ততক্ষণ আমাকে বসে থাকতে হবে। এই এক অসহ্য অবস্থা। সময় কাটাবার জন্যই জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের স্ট্রাইকটা কী জন্য হলো?

জ্যাঠামশাই বললেন, আমার জন্য।

জ্যাঠাইমা বললেন, আহা, তোমার জন্য হবে কেন? রমেন আর দীপকই তো গোলমাল পাকাল।

কিন্তু জ্যাঠামশাই নিজের কৃতিত্ব ছাড়তে চান না। বললেন, কেন? প্রথমে তো শুরু হয়েছিল আমাকে নিয়েই। আমার বয়েস হয়ে গেছে বলে আমাকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিল মালিক!

আমি ভাবলাম, মালিকের দিক থেকে এটাকে খুব একটা অন্যায় বলা যায় কি? একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধকে কে কোথায় চাকরিতে রাখতে চায়!

জ্যাঠামশাই বললেন, আমার বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু কাজে কোন গাফিলতি আছে? একদিনও কামাই করি? এককালে আমার নিজের ফটোগ্রাফির শখ ছিল, ক্যামেরা আর ফিলিমের জন্য কত পয়সা খরচ করেছি! এখন ওখানে প্রোজেকশান অপারেটারের কাজ করি, কোনদিন কোন দর্শক বলেনি যে আমার সময় ছবি কাঁপে। তা হলে? কেন ছাঁটাই করবে? একেই তো মাইনে কম দেয়। আর আমাদের বরখাস্ত হওয়া মানে কি জানো? পেনশান নেই, প্রভিডেন্ড ফান্ড নেই, গ্র্যাচুইটি নেই, যাও বললেই খালি হাতে চলে যাও! সেই ছাঁটাই মেনে নেব কেন?

আমি বললাম, ঠিকই তো!

জ্যাঠামশাই বললেন, মালিক আমাকে ঠিক ছাঁটাই করতে চায়নি। একটু টাইট দিতে চেয়েছিল শুধু। মালিকদের কায়দাই হচ্ছে মাঝে মাঝে একবার করে ভয় দেখিয়ে রাখা। আরে, আমি ও ব্যাটাকে ভয় পেতে যাব কেন? আমি তো নিজের দাম বুঝি!

জ্যাঠাইমা বললেন, তুমি বড্ড বেশি কথা বলো বলেই তো—

রমেশ জ্যাঠা বললেন, তুমি চুপ করো। যা উচিত কথা, তা বলতে কক্ষনো ভয় পাই না আমি। এত কম মাইনেয় আমার মতন এত ভালো লোক আর পাবে

শিবু লাহিড়ী? আজকালকার ছেলে-ছোকরারা মন দিয়ে কাজ করে? তাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে আমাদের মতন?

জ্যাঠাইমা বললেন, তুমি কিন্তু বড্ড বেশি কামাই করতে শুরু করেছিলে—

জ্যাঠামশাই তাঁকে এক ধমক দিয়ে বললেন, তুমি চুপ করো! মানুষের কি অসুখ-বিসুখ হয় না? কি রে?

জ্যাঠামশাই শেষ প্রশ্নটা আমাকে করলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, তা তো বটেই!

জ্যাঠামশাই সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, বুঝলি নীলু, মালিক অবশ্য আমার কথাটা মেনে নিয়েছিল। ছাঁটাই রুখে দিয়েছিল। কিন্তু রমেন আর দীপক গেল মাইনে বাড়াবার জন্য দরবার করতে। কিছু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলেছিল—ওরা দু'জনেই কাউণ্টারে বসে তো, তাই বলেছিল, আপনি যে অ্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্স ফাঁকি দেন, সেকথা ফাঁস করে দেব। প্রটেকশান মানির নাম করে প্রত্যেক হপ্তায় ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নেন ব্ল্যাকে...ব্যস আর যায় কোথায়! সাপের মাথায় পা পড়ল। মালিক তখন সবাইকে ডেকে বলল, মাইনে বাড়াব, রমেশ মুখুজ্যেকেও রাখব, কিন্তু রমেন আর দীপককে চলে যেতে হবে। ওরা মালিকের মুখে মুখে কথা বলেছে, ওদের আর কিছুতেই রাখা হবে না। শুরু হয়ে গেল স্ট্রাইক।

—মালিক যাকে খুশি যখন তখন ছাঁটাইয়ের হুমকি দিতে পারে? আপনাদের ইউনিয়ান নেই?

—দশ বারো জন লোকের আবার ইউনিয়ান কি?

—কিন্তু আজকাল শুনেছি, দোকান-টোকানের কর্মচারীরাও—

—আরে রাখ রাখ! ও সব কাগুজে কথা! জোর যার মুল্লুক তার এখনো এই নিয়মই চলছে।

—মালিকের জোর বেশি, না আপনাদের?

—আমাদের! আমরা গেট না ছাড়লে রৌহিণী কিছুতেই খুলবে না।

—কিন্তু মালিক যদি শেষ পর্যন্ত আপনাদের দাবি মেনে না নেয়?

—আলবাৎ মানবে! ওর বাবা মানবে! পূজাটা আসুক না! পূজার সময় হল বন্ধ রাখতে পারবে? মোটা লাভের সময়!

সন্টি বেশ তাড়াতাড়িই মিষ্টি নিয়ে ফিরে এল। একটা মাটির খুরিতে চারটে ছোট ছোট রসগোল্লা। এরই দাম দু' টাকা। অর্থাৎ দুটি টাকা একেবারে জলাঞ্জলি দেওয়া।

জ্যাঠাইমা প্লেট আনতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে আমি আঙুলে একটা রসগোল্লা তুলে নিয়ে বললাম, ব্যস, আর খাব না আমি, কিছুতেই না।

জীবনে এমন অনিচ্ছার সঙ্গে কোনদিন কোন খাবার খাইনি। রসগোল্লাটা যেন তেতো লাগল।

জ্যাঠামশাই বেশি জোর করলেন না আর। নিজেও একটা রসগোল্লা তুলে নিয়ে মুখে পুরলেন।

তাই দেখে আমার মনে হলো, সিনেমা হলের সামনে অবিরাম অনশন করলেও বাড়িতে এসে উনি লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার খান।

কিন্তু উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার সে ভুল ভেঙে দিলেন। আঙুলের রসটা চাটতে চাটতে বললেন, আমরা পালা করে এক-একজন চব্বিশ ঘণ্টা অনশন করি। এগারো দিন পর পর আমার পালা আসে। এবার একদিন কমে গেল। একজন অসুস্থ, দশ দিন পর পর আমার পালা আসবে।

এবার আমি একটানা দুশো সতেরো দিনের অনশনের রহস্যটা বুঝলাম। দুশো সতেরো দিন ধরে সবাই না খেয়ে নেই। কিন্তু তাতেই বা কম কি? এগারো দিন পর পর চব্বিশ ঘণ্টা উপোস। আমি তো কোন একটা দিনও পুরো না খেয়ে থাকার কথা ভাবতে পারি না!

জ্যাঠামশাইয়ের এগারো দিন পর পর উপোস। আর এ বাড়ির সব লোক? তারা বোধহয় সারা বছরই অর্ধাশনে থাকে।

বিদায় নিয়ে সিঁড়িতে পা দিলাম। জ্যাঠামশাই বললেন, আবার আসিস। শিগগির শিগগির আসিস। বেশি দেরি করলে হয়তো আর আমাদের দেখতেই পাবি না।

আমি ঘাড় হেলিয়ে নিপুণ অভিনেতার মতন হাসিমুখে বললাম, আসব, নিশ্চয়ই আসব।

জ্যাঠাইমা কিছুই বললেন না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

ছন্দা নামের মেয়েটি আমার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল নিচে। উঠোনটা পার না হওয়া পর্যন্ত সে কোন কথাই বলল না।

সদর দরজার কাছে এসে সে বলল, ছোড়দা শুনুন!

ও আমাকে ছোড়দা বলল কেন? বোধহয় শুনেছে, আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে আমি ছোট। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম।

ম্লান, বিষণ্ণ মুখ। শাড়িটি অতি ময়লা। তবু ওর চেহারার মধ্যে একটা আলগা লাবণ্য আছে। চোখ দুটো সুন্দর।

—কী?

—ছোড়দা, আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবেন?

আমার একটু হাসি পেল। মেয়েটি জানে না, আমি নিজেই বেকার। আমিও চাকরি খোঁজার দলে, চাকরি দেওয়ার দলের মানুষ নই। কিন্তু সে কথাটা একে এখন বলে লাভ নেই।

—তুমি কী চাকরি করবে?

—যে-কোন চাকরি! আপনাদের তো অনেক জায়গায় চেনাশুনো, যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন, যে-কোন কাজ আমি পারব—আমি এ বাড়ি থেকে চলে যেতে চাই!

মেয়েটি কথা বলছিল তীব্র ব্যাকুলতার সঙ্গে। যেন এই মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত! খানিকটা আগে আমি নিজের কানেই তো শুনেছি, ওর বাবা ওকে মরতে বলেছিল।

ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়া একটি যুবতী মেয়ে কী ধরনের চাকরি পেতে পারে, আমার তা জানা নেই। তাকে স্বাধীন হয়ে ভদ্রভাবে বাঁচবার সুযোগ কি কেউ দেবে?

তবু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আমি দেখব, নিশ্চয়ই খোঁজ করব, যদি কিছু পাই তোমাকে জানিয়ে যাব!

—ঠিক?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!

—আপনি ভুলে যাবেন না?

—না, না।

—ছোড়দা, আমার ভীষণ দরকার, যে-কোন চাকরি, আপনি দয়া করুন, আপনি আমাকে জোগাড় করে দিন।

—আমি খোঁজ করব...পেলেই—

—কবে?

—তা তো জানি না, ইয়ে...মানে...আমার হাতে তো কিছু নেই, চেনাশুনোদের কাছে জিজ্ঞেস করে—

—আমি আর বেশিদিন থাকতে পারব না...এখানে...আপনি জানেন না, এমন অবস্থা...আপনি দয়া করে একটা কিছু—

—পেলেই তোমাকে জানাব।

রাস্তা পেরিয়ে ওপাশে বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়িয়েও দেখলাম, ছন্দা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

৪

পূর্ণিয়ার জমিদারের দার্জিলিং-এর বাড়ি থেকে আমরা মাত্র তিনখানা বই চুরি করেছিলাম। আসল বইটাই রেখে আসতে হয়েছিল। ওঁরা এমন ভালো ব্যবহার করেছিলেন যে চক্ষুলজ্জায় আর বেশি কিছু নিতে পারিনি। যাই হোক, সেবারে আমাদের অভিযান তেমন সার্থক হলো না।

একদিন সকালে দেবরাজ আমার বাড়িতে এসে বলল, চল, ঘুরে আসি।

আমি জানি ও কোথায় যেতে চায়। এটা কলকাতার বাইরে কোথাও নতুন কোন অভিযানের প্রস্তাব নয়। দেবরাজের মঙ্গোলীয়ান ছাঁচের মুখ, তাতে ভাবান্তর বোঝা যায় না। কিন্তু চোখ দুটোতে ঝকঝক করে বুদ্ধির ছাপ।

আমি বললাম, তাহলে আগে সুজিতের কাছে যাই। ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে তো!

দেবরাজ বলল, তার কী দরকার? আমাদের তো যাবার জন্য নেমন্তন্নই করেছে।

—তা করেছেন ঠিকই। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো ভালো করে আলাপ-পরিচয় হয়নি। সুজিত সঙ্গে থাকলে সুবিধে হবে।

—না, না, তুই বুঝিস না। এসব ক্ষেত্রে নিজেরা আলাপ করতে পারলেই বেশি সুবিধে। সুজিতকে আর এর মধ্যে টানবার দরকার নেই!

আর প্রতিবাদ করলাম না। এই ব্যাপারে ট্যাকটিকস দেবরাজ আমার থেকে অনেক ভালো বোঝে।

কয়েকখানা দুর্লভ বই বিক্রি করে দেবরাজের হাতে কিছু টাকা আছে। বাড়ি থেকে বেরিয়েই ও ঝপ করে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে ফেলল। প্রথম গেলাম কলেজ স্ট্রিটের একটা দোকানে। সেখানে মধুবনী পেইন্টিং বিক্রি হচ্ছিল শস্তায়। দু'খানা ছবি কিনে ফেলল দেবরাজ। টাকা চব্বিশেক খরচ হলো এতে। মুচকি হেসে ও বলল, যত বড়লোকই হোক, কিছু উপহার পেলে সবাই খুশি হয়। আমি গিয়ে সুনয়নী দেবীকে বলব, গত সপ্তাহে আমি দারভাঙ্গায় গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আপনার জন্যই এই ছবি দুটো কিনে আনলাম। তুই কিন্তু কিছু ফাঁস করে দিস না!

আমি অবাক হয়ে বললাম, সুনয়নী দেবী কে?

—কেন, সুজিতের শাশুড়ি।

—ওঁর নাম সুনয়নী দেবী কে বলল?

—ভদ্রমহিলার ঐ নাম নয়? কিন্তু ভদ্রমহিলার চোখ দুটো দেখেই মনে হয়,

ওঁর নাম সুনয়নী দেবী হওয়াই উচিত! আমার তো ঐ মেয়েগুলোর বদলে ঐ ভদ্রমহিলারই প্রেমে পড়ে যেতে ইচ্ছে হয়। দেখে বোঝা যায় না কত বয়েস!

—সাবধান দেবরাজ!

ট্যাক্সি যাচ্ছিল শিয়ালদার দিকে। রোহিণী সিনেমার কাছাকাছি আসতেই আমি জানলা দিয়ে মুখ বার করে দেখলাম। ফুটপাথের ওপর অনশনকারীরা আজও বসে আছে। দুশো ছাব্বিশ দিন। আজ রমেশ জ্যাঠামশাইকে দেখলাম, সামনেই বসে আছেন, গলায় একটা ফুলের মালা। আজ বোধহয় ওঁর অনশনের দিন।

—কী দেখছিস?

—কিছু না।

দেবরাজ একটা শুভ কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। এই সময় কোন জটিল সমস্যার কাহিনী ওকে শোনাবার কোন মানে হয় না। তাছাড়া আর তো কেউ এই অনশনকারীদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। নেহাৎ আমার সঙ্গে ওঁদের একজনের চেনা আছে বলেই একটু জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

বাড়ির নম্বর মুখস্থই ছিল দেবরাজের। নিউ সি আই টি রোডে একটা মস্ত বড় বাড়ি। বাড়ির সামনে কোলাপসিবল গেট। দোতলার সব বারান্দাও পুরোপুরি গ্রিল দিয়ে ঢাকা। বাড়িটার চেহারায় একটা দুর্গ দুর্গ ভাব আছে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আমরা গেটের কাছে এগিয়ে গেলাম। ভেতরে টুলের ওপর দারোয়ান বসে আছে। ঠিক অফিস-টফিসের মতন স্লিপে নাম লেখাতে হলো। আমাদের দু'জনের নাম লিখে ব্র্যাকেটে লিখে দিলাম সুজিতের বন্ধু।

নকশাল আন্দোলনের পর আজকাল আর ছেলে-ছোকরাদের কেউ বিশ্বাস করে বাড়িতে ঢুকতে দেয় না।

দারোয়ান গেট খুলে ভেতরের একটা ঘরে আমাদের বসাল।

ঘরের বাইরে দেয়ালে পেতলের প্লেটে অনেকগুলো কোম্পানির নাম লেখা। সুজিতের শ্বশুর তা হলে শুধু একটা সিনেমা হলেরই মালিক নন, আরো অনেক রকম ব্যবসা আছে। অধ্যাপকের পুত্র এখন ছোটখাট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। বাঃ, বেশ ভালো কথা। কে বলে, বাঙালির উন্নতি হচ্ছে না?

দারোয়ান এসে আমাদের অন্য একটি ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে টেবিলের এক পাশে অনেকগুলো চেয়ার। আর এক পাশে চামড়ায় মোড়া একটি চেয়ারে বসে আছেন মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। চিনতে অসুবিধে হলো না, ছবিতে দেখেছিলাম আগে।

এসব ক্ষেত্রে দেবরাজই কথাবার্তা বলে। সে সংক্ষেপে জানাল, দার্জিলিং-এ কীভাবে ওঁর স্ত্রী ও মেয়েদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। এ বাড়িতে অনেক

বই আছে। আমরা সেগুলি একটু দেখতে চাই।

ভদ্রলোক সব শুনে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি বইয়ের ব্যবসা করেন?

উনি ব্যবসায়ী লোক, সুতরাং ঐ কথাটাই ওঁর প্রথম মনে এসেছে।

দেবরাজ অম্লান বদনে বলল, না। পুরোনো বই দেখা আমাদের নেশা। বিশেষত ইতিহাসের বই। আপনার বাবা বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর লেখা একটা বই...বাজারে এখন পাওয়া যায় না...এছাড়া ওঁর নিজের সংগ্রহের বইপত্র যদি একটু দেখা যায়—

শিবশঙ্কর লাহিড়ী এবার সোজা হয়ে বসলেন। মাথার স্বল্প চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, আমার বাবা সারা জীবন পড়াশুনো নিয়েই ছিলেন। টাকা-পয়সা যা পেতেন, সব দিয়ে বই কিনতেন। প্রচুর বই। আজকাল এত বই বাড়িতে রাখাই শক্ত। আমি পাঁচ রকম কাজে ব্যস্ত থাকি, ওদিকে মন দেবার সময় পাই না। চলুন, আপনারা যখন দেখতে চান—

উনি আমাদের নিয়ে উঠে এলেন দোতলায়। সিঁড়ির পাশেই আর একটি বসবার ঘর। তার পাশের ঘরের দরজা খুলে বললেন, এই যে দেখুন!

দেবরাজ বলল, এ কি!

ঘরের মধ্যে বইয়ের পাহাড়! আট-দশটি বড় বড় র‍্যাক ভর্তি বই তো আছেই, তা ছাড়া মেঝের ওপর গাদা করা প্রচুর বই, পা ফেলবার জায়গা নেই। বহু বই উল্টেপাল্টে ছড়িয়ে আছে!

বইয়ের অযত্ন দেখলে দেবরাজ সত্যিই খুব কষ্ট পায়। সে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধভাবে বলল, এ কি! এ যে বইগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব!

শিবশঙ্কর লাহিড়ী বললেন, হুঁ, কিন্তু এত বই রাখবার জায়গা কোথায়? আমাদের দার্জিলিং-এর বাড়ি থেকে আবার আমার স্ত্রী কিছু বই নিয়ে এসেছেন। দুটো ঘরেও আঁটে না। দু'একজন বলেছিল, কিছু বই বিক্রি করে দিতে। কিন্তু আমার বাবার বই, এসব আমি বিক্রি করতে পারব না। অনেক কষ্ট করে তিনি এসব বই জোগাড় করেছিলেন। এখন বিক্রি করলে ক'টা টাকাই বা পাওয়া যাবে!

দেবরাজ বলল, এত বইয়ের দাম খুব কম হবে না...হাজার কয়েক টাকা।

শিবশঙ্কর লাহিড়ী সামান্যক্ষণ চিন্তা করে বললেন, নাঃ, দরকার নেই, বাবার বই আমি বিক্রি করতে চাই না। বরং বাবার স্মৃতিতে কোথাও যদি—

আমি বললাম, কোন লাইব্রেরিতে থাকলে তবু অনেক লোক পড়তে পারবে।

উনি বললেন, সেটা মন্দ না...বাবার নামে আলাদা আলমারি...সব বইতে বাবার নাম লেখা...এসব বই পড়বার মতন লোকই বা ক'জন আছে—

দেবরাজ সতর্কভাবে বলল, আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরির সঙ্গে কথা বলতে পারি। ওরা এত সব বই পেলে লুফে নেবে!

—তা দেখুন না ওদের সঙ্গে কথা বলে। আমার আপত্তি নেই।

—কিন্তু ন্যাশনাল লাইব্রেরি তো এরকম এলোমেলোভাবে বই নেবে না। আগে ক্যাটালগিং করতে হবে। এত বই ক্যাটালগিং করতে মাসখানেক লেগে যাবে!

—সেটা কারা করবে?

—যদি বলেন তো আমরা দু'জনেই এসে করে দিয়ে যেতে পারি।

—আপনারা করবেন? আপনাদের এত সময় আছে! আপনারা এমনিতে কী করেন?

—আমরা দু'জনেই হিস্ট্রিতে এম এ পাশ করে রিসার্চ করছি। আমরা বিকেলের দিকে এসে এ কাজ করে দিয়ে যেতে পারি। শুধু শুধু বইগুলো নষ্ট করার চেয়ে যদি লোকের কাজে লাগানো যায়—

দেবরাজ অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলে। এসব ব্যাপারে আমিও নিখুঁতভাবে ওকে সায় দিয়ে যাই। সুজিত থাকলে অসুবিধে হতো ঠিকই।

উনি কৌতূহলী চোখে আমাদের দু'জনকে দেখতে লাগলেন। টাকা-পয়সার প্রস্তাব না করেও যে কেউ এমনি এমনি কোন কাজের প্রস্তাব দিতে পারে, সেটা যেন উনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। সেই কথাটা মুখে বলেই ফেললেন। আপনারা এক মাস ধরে এসে খাটবেন, এতে আপনাদের স্বার্থ কী?

দেবরাজ বলল, আমাদেরও বই দেখা হবে। আমরা বই দেখতে ভালোবাসি।

—বেশ, ভালো কথা!

জানলাগুলো বন্ধ বলে ঘরটা অন্ধকার। আলো জ্বালা হলো। আমি বাইরের বারান্দায় চোরাভাবে দু'একবার উঁকি দিলাম। বাড়ির অন্য কারুকে তো দেখা যাচ্ছে না। বিশাখার সঙ্গে একবার অন্তত দেখা হবে না? যতদূর মনে হচ্ছে, এই ভদ্রলোক ওঁর স্ত্রী বা মেয়েদের ডাকবেন না!

দেবরাজ আমার অস্থিরতা বুঝেছিল। কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে রেখে বলল, আপনার স্ত্রীর জন্য এই ছবি দুটো উপহার এনেছিলাম।

শিবশঙ্কর লাহিড়ী ছবি দুটি দেখলেন। খুব একটা মুগ্ধ হলেন বলে মনে হলো না। খুব সম্ভবত সাহিত্য বা ছবিটবির সঙ্গে ওঁর কোন সম্পর্ক নেই।

উনি বললেন, ঠিক আছে, আমার স্ত্রীকে ডাকছি।

ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই দেবরাজ কয়েকখানা দামী বই ওর ঝোলার মধ্যে ভরে নিল। তীব্র হিংসার সঙ্গে বলল, ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে! এ বাড়ির সব বই আমি সাফ করে দেব!

আমি বললাম, তুই ন্যাশনাল লাইব্রেরির ভাঁওতাটা ভালো দিয়েছিস। ঐটা আরো চালিয়ে যা। সুজিতকে একটু টিপে রাখতে হবে।

একটু বাদে শিবশঙ্কর লাহিড়ী ফিরে এসে বললেন, উনি আসছেন। আপনারা ততক্ষণে বই-টই দেখুন। আমি নিচে যাচ্ছি, আমার কাছে অন্য লোক এসেছে।

দেবরাজ বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

বিশাখার মা এলেন একটু দেরি করে। চওড়া কাল্লো পাড়ের সাদা শাড়ি পরা। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। মিষ্টি হেসে বললেন, কী খবর? মনে করে ঠিক এসেছ তা হলে? খুব খুশি হয়েছি।

দেবরাজ এগিয়ে গিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, গত সপ্তাহে আমি দারভাঙ্গা গিয়েছিলাম, মধুবনী থেকে আপনার জন্য দুটি ছবি এনেছি।

—আমার জন্য?

—হ্যাঁ। মনে হলো, আপনার হয়তো ভালো লাগবে।

অলকা দেবী সত্যিই খুব অবাক হয়ে গেছেন। সুন্দর ভুরু দুটি তুলে বললেন, দারভাঙ্গা থেকে এনেছো? আমার জন্য? আমার কথা মনে ছিল তোমাদের?

দেবরাজ বলল, নীলু যায়নি। আমি একাই গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, আপনি দার্জিলিং-এ কথায় কথায় একটা পটের ছবির কথা বলেছিলেন...নিশ্চয়ই আপনি এই ধরনের ছবি ভালোবাসেন...

উনি ছবি দুটো খুলে দেখলেন। দুটি ছবিই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। মুগ্ধভাবে বললেন, বাঃ, কী সুন্দর! তারপর চোখ তুলে দেবরাজের দিকে তাকালেন। বেশ কয়েক মুহূর্ত সেই দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল। মনে হলো দেবরাজ আর তার 'সুনয়নী দেবী' যেন দৃষ্টিতে আবদ্ধ। ঠিক যেন প্রেমিক-প্রেমিকা। যদিও দেবরাজের বয়স ওঁর প্রায় অর্ধেক।

বিশাখার পাত্তা নেই। অন্য বোনেরাই বা কোথায়? সেকথা মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করা যায় না।

দেবরাজ বলল, বইগুলো আজ দেখে গেলাম। সামনের সোমবার থেকে সন্ধেবেলা আমরা দু'জনে আসব। বইগুলো এমন অযত্নে রেখেছেন? একটা ক্যাটালগ পর্যন্ত নেই। দেখুন এর মধ্যে এমন সব বই আছে, যার এমনিতে কোন দামই নেই বাজারে। কিন্তু যারা ঐসব সাবজেক্টে পড়াশুনো করে, তাদের কাছে ঐসব বই দারুণ দরকারী! এই সব বই নষ্ট করা অন্যায়।

উনি বললেন, ঠিকই তো! কিন্তু কে দেখবে বলো? আমার পক্ষে কী এত সব করা সম্ভব? চাকর-বাকরের হাতে ছেড়ে দিলে যা হয়! ওদের বলেছি, মাঝে মাঝে ধুলো ঝেড়ে সাফ করবে।

—কেন, আপনার মেয়েরা সাহায্য করতে পারে না?

—মেয়েদের এসব দিকে মনই নেই। ওদের মধ্যে বিশাখাই যা বই-টই পড়ে, মাঝে মাঝে নিয়ে যায় দু'একখানা পড়তে—কিন্তু সব যে গুছিয়ে রাখবে, সে ধৈর্য নেই। অন্য মেয়েরা বই-টইয়ের ধার ধারে না।

—আপনার বড় ছেলে?

উনি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আমার ছেলে এখানে থাকে না।

দেবরাজ তবু আবার জিজ্ঞেস করল, আপনার ছেলে এখানে থাকে না? বিদেশে থাকে?

এবার বিশাখার মা একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন বলে মনে হলো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা গলায় বললেন, আমার ছেলে কলকাতাতেই থাকে। কিন্তু এ বাড়িতে থাকে না। বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া!

এইসব পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে যে নাক গলানো উচিত নয়, সেটা এতক্ষণ বাদে বুঝতে পেরে দেবরাজ চুপ করে গেল। আমি মনে মনে বললাম, আপনার জামাইটিকেও আমি অনেকদিন ধরে চিনি। বইপত্র সম্পর্কে তারও বিশেষ আগ্রহ নেই!

উনি বললেন, সেই জন্যই ওঁকে অনেকবার বলেছি, বইগুলো নষ্ট না করে বিক্রি করে দিতে কিংবা কোথাও দান করে দিতে। তাও উনি দেবেন না। বাবার বই সম্পর্কে সেন্টিমেন্ট আছে।

দেবরাজ বলল, যাকে-তাকে হঠাৎ দান করে দেবেন না। দাঁড়ান, আমি আগে সব সাজিয়ে-টাজিয়ে দিই!

—সে তো খুব ভালো কথা। তোমরা যদি কষ্ট করে সাজাতে পারো—

আমরা কথা বলছিলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে, উনি আমাদের আর একটি ঘরে নিয়ে এলেন। এটাও বসবার ঘর, সোফা-কোচে সাজানো, সমস্ত আসবাবপত্রই অত্যন্ত মূল্যবান। এই নিয়ে এ বাড়িতে তিনটে বসবার ঘর দেখলাম। নিশ্চয়ই ওপরে আরো একটি আছে, যে-ঘরে টেলিভিশান। একই বাড়িতে চারখানা বসবার ঘর, অথচ বইগুলো দুটো ঘরের মধ্যে ডাঁই করা। তা তো হবেই, বই এখন এ বাড়িতে অপ্রয়োজনীয় বস্তু। অধ্যাপকের পুত্র ব্যবসায়ী। দেবরাজ খুব ভালো জায়গার সন্ধান পেয়ে গেছে—আর অনেকদিন বাইরে বাইরে জমিদার বাড়ি খুঁজে খুঁজে ঘুরতে হবে না।

বেয়ারা ট্রেতে সাজিয়ে প্রচুর রকম খাবার ও সরবৎ নিয়ে এল। বিশাখার মা খুব খাওয়াতে ভালোবাসেন লোকজনদের, সেকথা আগেই বুঝেছি। আপত্তি

জানিয়ে লাভ নেই, আমি খাবারে মনঃসংযোগ করলাম। দেবরাজ ভোজনরসিক। সে প্রতিটি খাবারের বেশ তারিফ করতে লাগল। তারপর বলল, দেখুন, সোমবার থেকে যে রোজ সন্ধেবেলা আসব, তখনও কি রোজ আমাদের এরকম খেতে দেবেন?

বিশাখার মা হেসে ফেলে বললেন, আহা, এ আর এমন কী! লোকের বাড়িতে লোকজন এলে কিছু-না-কিছু তো দেয়!

দেবরাজ বলল, বেশ, ভালো কথা! তাহলে প্রত্যেকবার এতগুলো করে মিষ্টি খাওয়াবেন না! কিছু নোনতা খাবার বা মাংসের চপটপও দেবেন।

—তুমি বুঝি মাংস ভালোবাসো।

—শুধু আমি কেন, আমার চেয়েও আমার বন্ধুটি! বাঘের মতন মাংস ভালোবাসে।

—কিসের মতন?

—বাঘের মতন। মাংস দেখলেই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমি দেবরাজের দিকে চোখ পাকালাম। কিন্তু ওরা দু'জনে হাসতে লাগল খুব। যেন ওরা দু'জনে একদলে, আর আমি আলাদা।

—ঠিক আছে, আমি নিজে তোমাদের জন্য চপ বানাবো।

বুঝলাম, দেবরাজ রীতিমতো জমিয়ে নিচ্ছে ওঁর সঙ্গে। কোন মহিলার কিসে দুর্বলতা, সেটা ও ঠিক বুঝে নেয়। যাকে বলে ফিল্ড ক্রিয়েট করা, তার জন্য ওর বেশি সময় লাগে না।

বাড়িতে আর কারুর কোন সাড়া-শব্দ নেই। আমি বেশ নিরাশ হয়ে পড়ছিলাম। দেবরাজের দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বললাম, আজ উঠতে হবে, আজ আমার একটু কাজ আছে।

বিদায় নিয়ে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। বিশাখার মা বললেন, তা হলে তোমরা সোমবার থেকে আসছ? খুব ভালো হবে, সুজিতও থাকবে—ও প্রায়ই সন্ধেবেলা একবার করে আসে...

সুজিত উপস্থিত থাকলে আমাদের কাজের খুব একটা সুবিধে হবে না। দেবরাজ সেইজন্যই সঙ্গে সঙ্গে জানাল, আমরা মাঝে মাঝে দুপুরের দিকেও আসতে পারি, তাহলে একসঙ্গে অনেকক্ষণ কাজ করা যায়।

বিশাখার মা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এস, তোমাদের যখন সুবিধে হয়।

উনি নিচে এলেন না। দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা নেমে এলাম একতলায়। দেবরাজ বলল, ভদ্রলোকের সঙ্গেও একবার দেখা করে যাওয়া উচিত।

ওই ঘরের বাইরে আমরা দাঁড়ালাম। ভেতরে উত্তেজিত কথাবার্তা হচ্ছে। বিশাখার বাবা বেশ জোরে জোরে কথা বলেন। উনি কাকে যেন বলছেন, আরে মশাই, আপনার ছবির রিলিজ হচ্ছে না তো আমি কী করব? ও স্ট্রাইক আমি এখন মেটাব না। এক বছর দু'বছর কতদিন ওরা চালাতে পারে আমি দেখব! ওদের মধ্যে দুটো হারামজাদাকে আমি ছাঁটাই করবই। এমন নিমকহারাম, জানেন, ওদের মধ্যে একজন, রমেন যার নাম, বোনের বিয়ে দিতে পারছিল না, সম্বন্ধ হয়ে গেছে, টাকা নেই, আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল। আমি এক কথায় দু' হাজার টাকা দিয়ে দিলাম, অ্যাডভান্স নয়, এমনিই, বলে দিলাম, বিয়ের যৌতুক! সেই লোকই কিনা বোনাসের দাবি নিয়ে এসে আমার মুখের ওপর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে! কত বড় নিমকহারাম! সেই লোককে আমি রাখব!

—আপনি হলটা কাংকারিয়াকে লীজ দিয়ে দিন না! উনি তো কতবার ইণ্টারেস্ট দেখিয়েছেন।

—কাংকারিয়া চালাতে পারবে?

—ওরা ঠিক পারে। ওদের ব্যবসা চালাবার কায়দাই আলাদা!

—আমার চালু ব্যবসাটা আমি মাড়োয়ারির হাতে তুলে দেব? এই বলতে চান?

কে যেন একজন বলল, কিন্তু এতদিন বন্ধ রেখে আপনার মেশিনপত্তর সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাতে কিন্তু অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

উনি বললেন, হোক ক্ষতি। ঐ হলের টাকায় আমার হাঁড়ি চড়ে না। আমার আর পাঁচটা ব্যবসা আছে। ওরা বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি সিনেমাহলই তুলে দেব। ঐ জমিতে মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং বানিয়ে ভাড়া দেব।

আমরা বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এই সময় ঘরে ঢোকা উচিত কিনা বুঝতে পারছি না। ওপর থেকে বিশাখার মা বললেন, তোমরা ওঁর সঙ্গে কথা বলবে? যাও না, ভেতরে চলে যাও।

আমরা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, আমরা আজ যাচ্ছি, সোমবার থেকে আসব।

বিশাখার বাবার মুখখানা রাগে গনগন করছে। আমাদের দেখে সেই রাগত মুখেই কোনক্রমে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললেন, ও আচ্ছা। ঠিক আছে, আসবেন, ইয়ে এসো, নিশ্চয়ই এসো।

আমরা ওঁর জামাইয়ের বন্ধু তো, তাই আমাদের একটু বিশেষ খাতির দেখাবার জন্য উনি উঠে এসে আমাদের দু'জনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন।

রোহিণী হলের সামনে অনশনের ব্যাপারটা না জানলে আমি হয়তো শিবশঙ্কর লাহিড়ীকে অপছন্দ করতাম না। মানুষটির মধ্যে বেশ একটা উষ্ণ ব্যক্তিত্ব আছে।

নিছক একজন অধ্যাপকের পুত্র হয়েও তিনি যথেষ্ট উন্নতি করেছেন জীবনে। বাঙালিরা ব্যবসা-বাণিজ্যে আজকাল দাঁড়াতে পারে না বলে আমরা দুঃখ করি। এই তো একজন সার্থক বাঙালি!

রাস্তায় বেরিয়ে আসবার পর দেবরাজকে জিজ্ঞেস করলাম, কী কী বই আনলি? দেখি।

দেবরাজ বলল, সব ফাঁক করে দেব। ন্যাশনাল লাইব্রেরিকেও দেব কিছু, বাকিটা আমাদের থাকবে। দেখবি?

দেবরাজ ব্যাগের মুখ খুলে বইগুলো আমাকে দেখাতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নিজেই আবার ব্যাগটা বন্ধ করে আমাকে একটু ঠেলে দিয়ে বলল, চুপ, এখন না, পরে।

উল্টো দিক থেকে রাস্তা পার হয়ে আসছে বিশাখা।

আমি জামার কলার ঠিকঠাক করে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ও প্রথমে আমাদের দেখতে পায়নি। এরকম কিছু মেয়ে আছে, যারা রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটে তখন কোন মানুষকেই দেখতে পায় না। অন্যরা সবাই তাদের দেখে কিন্তু তারা কারুর চোখে চোখ ফেলে না। অনেক মেয়ে চেনা লোকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলেও কথা বলে না। মেয়েদের যে কতরকম কায়দা। বিশাখা যদি আমাকে দেখতে না পায়, তাহলে আমি ওকে ডাকব না।

আমি মনে মনে বললাম, ব্যস্ততার তো কিছু নেই। এখন থেকে তো ওদের বাড়িতে নিয়মিত আসব। দেখা হবেই। আমার প্রত্যেকটি হৃৎস্পন্দন যেন বলছিল, দেখা হবেই, দেখা হবেই।

একেবারে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বিশাখা হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল। অমনি মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে গেল হাসিতে। বলল, আরেঃ, এদিকে কোথায় এসেছিলেন?

দেবরাজ বলল, তোমাদের বাড়িতেই তো গিয়েছিলাম।

উত্তরটা দেবরাজ দিলেও বিশাখা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, সত্যি? সত্যি গিয়েছিলেন?

দেবরাজ আবার বলল, হ্যাঁ, এই তো এইমাত্র এলাম। তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ হলো—তোমাদের বাড়ির বইগুলো দেখলাম—

আমি কথা বলতে পারছিলাম না। আমার বুক কাঁপছিল। সব মেয়েদের দেখেই যে আমার বুক কাঁপে, তা নয়। কিন্তু এই মেয়েটি আমার লেখার প্রশংসা করেছিল। এরকম একটি সুন্দরী মেয়ে আমার লেখা পড়ে। শুয়ে শুয়ে পড়ে? বুকের ওপর আমার বইখানা রেখে? কোনদিন কি ও আমার কোন লেখা পড়ে কেঁদেছে?

বিশাখা বলল, কেন আগে থেকে খবর দেননি। আমি তাহলে থাকতাম। চলুন, আবার চলুন।

আমি বললাম, আজ অনেকক্ষণ ছিলাম। আবার আসব।

দেবরাজ বলল, এই সোমবারেই সন্ধেবেলায় আমরা আবার আসছি।

এবারেও বিশাখা আমার চোখে চোখ রেখে বলল, ঠিক আসবেন তো? আমার কয়েকজন বন্ধুটন্ধুকে বলে রাখব তাহলে। আমার এক বন্ধু তো বিশ্বাসই করতে চায় না যে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে।

আমি বললাম, বেশি লোকজন দেখলে কিন্তু আমি ঘাবড়ে যাই! ঠিক মতন কথাই বলতে পারি না।

বিশাখা বলল, বেশি নয়, দু-তিনজন। ঠিক আসবেন?

হ্যাঁ, আসব।

—আমার এক বন্ধু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছে। সেই যে আপনি একটি ফরাসী মেয়ের কথা লিখেছেন, মার্গারিট, সত্যিই সেরকম কোন মেয়ে ছিল? না বানিয়ে লিখেছেন?

—আমি তো কিছু বানিয়ে লিখতে পারি না।

—সব নিজের অভিজ্ঞতা?

—সব!

বিশাখা মিষ্টি করে হেসে বাড়ির দিকে চলে গেল। লোহার গেট খুলে ভেতরে ঢুকে হাত তুলে হাসলো আর একবার।

আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বড় বড় নিশ্বাস পড়ছে। বিশাখার প্রতি একটা গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ জেগে উঠল আমার মনে। সে আমাকে অগ্রাহ্য করলেও তো বলার কিছু ছিল না। সব মেয়েরাই তো এরকম দয়ালু হলে পারে।

দেবরাজ বলল, মেয়েটা তোকে বেশ পছন্দ করে ফেলেছে মনে হচ্ছে। তাকানো-টাকানোগুলোই অন্যরকম।

আমি বললাম, কেন, তোর হিংসে হচ্ছে নাকি?

—হিংসে হতে যাবে কেন? কিন্তু তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

—কী হবে না!

—তুই ভ্যাবলার মতন দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ভালো করে কথাটথা বলবি তো।

—যা, যা, তোকে আর শেখাতে হবে না মেয়েদের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়!

—তুই মেয়েটাকে এক মাসের মধ্যে চুমু খেতে পারবি? বাজি ধরবি? কত টাকা?

—তোর সামনে, তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে চুমু খেতে হবে নাকি?

—তার দরকার নেই। তোর যেখানে খুশি, একবারও যদি চুমু খেতে পারিস, জোর করে নয়, বেশ প্রেমের সঙ্গে—এসে আমাকে বলবি। আমি ঠিক সত্যি-মিথ্যে বুঝতে পারব—একশো টাকা বাজি রইল।

৫

প্রথম দিন রমেশ জ্যাঠার বাড়িতে গিয়ে গোড়ার দিকে আমার মনে হয়েছিল, উনি জীবনে কখনোই ভালো মতন উপার্জন করতে পারেননি, তবু এতগুলো ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছেন কেন? মানুষ করার সামর্থ্য না থাকলে ছোট ছোট শিশুদের পৃথিবীতে আনা অন্যায়। কিন্তু যারা জন্মে গেছে, তাদের ওপর রাগ করা যায় না। রমেশ জ্যাঠার চার মেয়ে, এক ছেলে। দুটি মেয়েকে সেদিন দেখেছি, বড় দুঃখী মুখ।

বিশাখার চার বোন, এক ভাই। ওরা সবাই সুন্দর। ওদের দেখে একবারও মনে হয় না, শিবশঙ্কর লাহিড়ী কেন ফ্যামিলি প্ল্যানিং মান্য করেননি। বরং মানা করলেই এ পৃথিবীর মহা ক্ষতি হয়ে যেত। বিশাখার মতন একটি মেয়ে হয়তো জন্মাতই না।

অনেকদিন আগে আমি ‘ক্র্যাক ইন দ্যা মীরর’ নামে একটি বিদেশী ফিল্ম দেখেছিলাম। সেখানে ছিল সমাজের খুব উঁচু স্তরের আর খুব নিচু স্তরের দুটি পরিবারের কাহিনী, ঠিক একরকম। আজ সকালে হঠাৎ সেই ফিল্মটার কথা মনে পড়ে গেল। রমেশ জ্যাঠামশাই আর শিবশঙ্কর লাহিড়ীর পরিবার দুটিও কিন্তু একই রকম। কিছু সমস্যাও এক ধরনের। এই মিলটা খুঁজে পেয়ে আমি বেশ কৌতুক বোধ করলাম।

রমেশ জ্যাঠা তাঁর বড় ছেলে সম্পর্কে সঠিক খবর রাখতেন না। তাঁর ছেলে হারাণকে খুব ছেলেবেলায় আমি দেখেছি কিনা মনে নেই, পরবর্তীকালে তার সঙ্গে আমার আর চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেনি। কিন্তু এই কাহিনীতে সে-ই অনেকখানি অতি-নাটকীয় উপাদান এনে দেয়। তার সম্পর্কে অনেক কথা আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে পরে জেনেছি।

স্কুলে পড়ার সময় ক্লাস সিক্স পর্যন্ত হারাণ ছিল একজন অতি নিরীহ, সাধারণ

ছেলে। তার কোনরকম বৈশিষ্ট্য কারুর নজরে পড়েনি। সে ছিল একটি রোগা-পাতলা বালক। প্রায়ই তার সারা গায়ে পাঁচড়া হতো। এমনকি তার মাথার মধ্যে পাঁচড়া হতো বলে, তার মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হতো মাঝে-মধ্যেই। তখন স্কুলের ছেলেরা বেশি মার খেত। রোগা আর ন্যাড়া মাথা ছেলেরা আরো বেশি মার খেত।

ক্লাস এইট-এ উঠে সে পর পর দু'বার ফেল করে। এমনকি বেলেঘাটার রিফিউজি স্কুলেও পর পর দু' বছর ফেল করা ছাত্রকে রাখবার নিয়ম নেই। তার বাবার কাছে চিঠি যায়, ছেলেকে অন্য স্কুলে ট্রান্সফার নেবার জন্য। কিন্তু ঐ স্কুলের চেয়েও খারাপ কোন স্কুল সেই এলাকায় ছিল না। তার বাবা অবশ্য তাকে অন্য কোথাও ভর্তি করবার চেষ্টাও করেনি। বরং ছেলের পড়াশুনোয় অমনোযোগের খবর হঠাৎ একদিন জানতে পেরে পায়ের চটি খুলে বেধড়ক পেটালেন। হারাণের মা বাধা দিতে এসেও মার খেলেন কয়েক ঘা। মার খেয়ে হারাণ প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল।

এই মার খাবার ফলেই কিনা কে জানে, হারাণের টাইফয়েড হলো দু'দিন বাদে। সেই অসুখে ভুগলো দেড় মাস। পাড়ার একজন এল-এম-এফ ডাক্তার তাকে দেখেছিলেন মাত্র তিনবার! হারাণের বেঁচে ওঠার কোন কথাই ছিল না, তাকে ঠিক মতন ওষুধ খাওয়ানো হয়নি, সে নানারকম কুখাদ্য গিলেছে, তবু কোন এক অদ্ভুত জীবনীশক্তি-বলে একদিন সে ঠিক সেরে উঠল এবং ভাতের জন্য ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল।

শুধু তাই নয়, টাইফয়েডের পর থেকে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এল হারাণের মধ্যে। হঠাৎ সে লম্বা ও চওড়া হতে লাগল। ঠিক যেন একটা রবারের পুতুলকে ফুঁ দিয়ে ফোলানো হচ্ছে। দেখতে দেখতে সেই রোগা-পাতলা, গায়ে পাঁচড়াওয়ালা ছেলেটি হারিয়ে গেল কোথায়। ঠিক সেই সময়েই বিক্রি হয়ে গেল রমেশ জ্যাঠার ক্যামেরার দোকানটি। হাতে কিছু কাঁচা পয়সা আসায় বাড়িতে কিছুদিন বেশ ভালো খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল। আবার একটা কিসের ব্যবসা করবেন, এই কথা ভাবতে ভাবতেই ফুরিয়ে গেল রমেশ জ্যাঠার হাতের সব টাকা।

লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্য নিয়ে হারাণ নিজেই তার পুরোনো স্কুলে গিয়েছিল আবার ভর্তি হতে। বিনা আপত্তিতে তাকে ভর্তি করে নেওয়া হয়, স্পোর্টসম্যান হিসেবে। প্রতিবার ফেল করেও সে ক্লাস টেনে ওঠে। তারপর স্কুলটাই উঠে যায়। বেলেঘাটায় অনেক নাগরিকের এখনো মনে আছে যে, হেমনলিনী বিদ্যাভবনটি একদিন আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। স্কুলটি ছিল ভাড়া বাড়িতে। পরে সেখানে আবার নতুন বাড়ি ওঠে কিন্তু সেটি ভাড়া দেওয়া হয় একটি ব্যাঙ্ককে।

ব্যাঙ্কটি সগৌরবে এখনো বিরাজমান।

ক্লাস টেনের ছেলেদের কাছাকাছি বিভিন্ন স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দেওয়ানো হয়। সেইবারই প্রথম আমাদের হারাণচন্দ্র আর তিন চারজন ছেলের সঙ্গে মিলে পরীক্ষার হলে গার্ডকে ছুরি দেখায়।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে সে আর বসেনি, কারণ সামনেই ছিল ইলেকশান। হারাণ ভিড়ে গেল এক দলে। তখন হারাণের বয়েস উনিশ। সে একদিন অত্যাশ্চর্য কাণ্ড করল, সে তার দুঃখিনী মায়ের হাতে একশো টাকা তুলে দিল। তার নিজের রোজগার।

ভোট উপলক্ষেই হারাণের মাথা ফাটে। ফলে পাড়ার ছেলেদের মধ্যে তার নাম রটে যায়। মাথায় পেট্টি বাঁধা অবস্থায় সে একটা জিপ গাড়িতে চেপে ঘোরে। চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সে সগর্বে বলে, আমার মাথা ফাটাবার আগে, শালা, আমি ওদের দুটো লাশ ফেলে দিয়েছি। তারপর থেকে ছেলেরা সম্মান করে তাকে ডাকে হ্যারাণদা।

শেষের দিকে দু'বছর হারাণ বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকতে শুরু করে। বাবা-মায়ের আন্ডারে বেশিদিন থাকলে দলের ছেলেদের কাছে প্রেস্টিজ থাকে না। তা ছাড়া ছাব্বিশ বছর বয়েসেই তার দু-দুটো বাঁধা মেয়েছেলে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে কোন অ্যাংলো মেয়ের ঘরে গিয়ে সে এক রাতে দুশো-আড়াইশো টাকা খরচা করার হিম্মৎ রাখে।

হারাণের বোনেরা ক্বচিৎ কখনো রাস্তায় দাদাকে দেখতে পেলেও কথা বলে না। মুখ নিচু করে চলে যায়। একদিন মাতাল অবস্থায় বাড়ি এসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল বলে রমেশ জ্যাঠামশাই হারাণকে জুতো পেটা করেছিলেন। হারাণ তখন নিজের বাবাকে ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিল হারামী। এদিকে রমেশ জ্যাঠা তো অনবরত হারাণকে শুয়োরের বাচ্চা বলছিলেনই। ফলে, নানা রকম গোলমালের সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়াল। হারাণ অনেকবার রুখে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত গায়ে হাত তোলেনি। নেহাৎ বাবা বলেই ছেড়ে দিয়েছে। নইলে অমন বুড়ো ফুড়ো লোককে সে এক ঝটকায় শেষ করে দিতে পারত। যাই হোক, রমেশ জ্যাঠা সেই থেকে ঘোষণা করেছিলেন, আর কোনদিন ঐ ছেলেকে বাড়িতে দেখতে পেলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। তবু মাঝে-মাঝে স্যাঙাতদের হাত দিয়ে হারাণ তার মায়ের কাছে কিছু টাকা পাঠিয়েছে। বছরখানেক ধরে অবশ্য তার দিক থেকে কোন সাড়া-শব্দ ছিল না। যে পার্টির হয়ে সে বেশি কাজ করত, রাজনৈতিকভাবে সেই পার্টির খুবই বে-কায়দা অবস্থা। মাস চারেকের মধ্যেই সে পার্টি বদলে ফেলে অবশ্য।

রমেশ জ্যাঠামশাই আমাকে বলেছিলেন, তাঁর ছেলে জেলে রয়েছে। কিন্তু সেকথা সত্যি নয়। তিনি সঠিক খবর জানতেন না। হারাণ আট মাসের বেশি জেলে থাকেনি। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে যখন নকশালবন্দীরা একদিন পালাল, সেদিন কিছু সাধারণ কয়েদীও টুকটাক করে সরে পড়েছিল। হারাণ ছিল সেই দলে। নকশালবন্দীদের জেল ভাঙার খবর তখন কোন কাগজেই ছাপা হয়নি, সুতরাং হারাণের পালাবার কথাও কারুর জানার কথা নয়। পালাতে গিয়ে হারাণ ডান পায়ে বেশ জোরে চোট খায়। সেই অবস্থায় সে ঝাঁপিয়ে পড়ে আদিগঙ্গায়। একটুর জন্য সে গুলি খেয়ে মরেনি। ওপারে এসে, নকশালদের জন্য অপেক্ষমান ট্যাক্সিগুলির একটিতে সে জোর করে উঠে পড়ে, চলে যায় ডায়মণ্ডহারবার। সেখানে নকশালপন্থীরা তাকে পরিত্যাগ করল। কারণ, জেলের মধ্যেও সে নকশালদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে বেশ কয়েকবার। পালাবার সময় সে ওদের দলে ভিড়বার জন্য কাকুতি মিনতি করলেও ওরা পছন্দ করেনি তাকে।

এইবার হারাণ একটু অসুবিধেয় পড়ল। আহত গুণ্ডার হাতে যদি বেশ কিছু টাকা-পয়সা না থাকে তাহলে তার অবস্থা খুব করুণ হয়। হারাণ কোন পরিকল্পনা করে জেল থেকে পালায়নি, সে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে এবং ডায়মণ্ডহারবারে তার বিশেষ কোন যোগাযোগও নেই। তাছাড়া গুণ্ডাদের এলাকা ভাগ করা থাকে। এক পাড়ার গুণ্ডা বিনা নোটিসে অন্য পাড়ায় যেতে পারে না। বনে-জঙ্গলে যেখানে মোষের পাল থাকে, সেখানে একটা তাগড়া মোষ থাকে, যাকে বলে ব্রিডিং বাফেলো, সে নিজস্ব এলাকা ছেড়ে সহজে যায় না, আর সেই এলাকায় অন্য কোন ব্রিডিং বাফেলোকে ঢুকতেও দেয় না। গুণ্ডাদের মধ্যেও সেই নিয়ম।

রাত্তিরটা হারাণ ঘাপটি মেরে পড়ে রইল গঙ্গার ধারে। গরম কাল। গঙ্গার ধারে শুয়ে বেশ আরাম পাবারই কথা, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয়ে সে কাঁপছিল ঠকঠক করে। তার ডান পায়ে এত ব্যথা যে সম্ভবত হাড়ই ভেঙেছে, দৌড়োবার ক্ষমতা নেই। আর যে-গুণ্ডা দৌড়োতে পারে না, তার দাম কানাকড়ি। পুলিশের হাতে আবার ধরা পড়লে যে প্রচণ্ড মার খেতে হবে, সেই চিন্তাটাই তার প্রবল।

পরদিন দুপুরের দিকে সে প্রায় মরিয়া হয়ে খুঁজে বার করল স্থানীয় এক আধা পরিচিত মাস্তানকে। এবং তার পা জড়িয়ে আশ্রয় চাইল কয়েক দিনের জন্য। মাস্তানটি বলল, জায়গাটা খুব 'গরম' হয়ে আছে। এখানে থাকলেই হারাণ ধরা পড়ে যাবে। সে হারাণের হাতে পঁচিশটা টাকা গুঁজে দিয়ে তুলে দিল কাকদ্বীপের বাসে। এবং একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিল হারাণকে। হারাণ এই অবস্থায় বেশিদিন পালিয়ে থাকতে পারবে না। এখন তার উচিত হচ্ছে, কাকদ্বীপ বা

নামখানার দিকে গিয়ে কোন মেয়ের গলার হার ছিনিয়ে নেওয়া কিংবা মিষ্টির দোকানের ক্যাশ বাক্স তুলে নেওয়ার মতন কিছু একটা পেটিকেস করে ইচ্ছে করে পুলিশের হাতে ধরা দেওয়া। সেখানে নাম ভাঁড়িয়ে হাজতে থাকুক কিছুদিন। তাহলে কলকাতার পুলিশ আর কিছুতেই তাকে খুঁজে পাবে না।

হারাণ এ পরামর্শ শুনল না। তার পা ভাঙা বলেই সে পুলিশের হাতে মার খাওয়ার ভয় পাচ্ছে সাঙ্ঘাতিক। কাকদ্বীপে গিয়ে সে খুঁজে পেল হীরুচাঁদকে। এর সঙ্গে একবার সোনারপুরে হারাণ একটা মিটিং ভাঙার কেস করেছিল। হীরুচাঁদ আশ্রয় দিল একটা চায়ের দোকানের পেছনের অন্ধকার ঘরে। সেখানে প্রচণ্ড খিদে, জ্বর, পায়ের ব্যথা নিয়ে প্রায় বেহুঁস অবস্থায় সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, মা, মা, মা!

সেই টাইফয়েডের পর আবার এই প্রথম হারাণ অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। এবারেও সে ছেলেমানুষের মতন যন্ত্রণার ঘোরে মায়ের নাম ধরে কাঁদতে লাগল।

আট ন' মাস জেলে থাকার জন্য হারাণ তার বাড়ির খবর কিছুই জানে না। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে অনেক কয়েদীর কাছেই মাসে একবার অন্তত কোনো-না-কোন আত্মীয়স্বজন আসত। হারাণের কাছে কেউ কখনো আসেনি। হারাণ জানতেও পারেনি, তার বাবা রোহিণী সিনেমা হলের সামনের ফুটপাতে না খেয়ে বসে থাকে।

হারাণ জেল থেকে পালাবার তিনদিন পর রাত দুটোর সময় তিন গাড়ি পুলিশ বেলেঘাটায় রমেশ মুখার্জির বাড়ির সামনে এসে থামল। রমেশ মুখার্জি তখন বাড়ি নেই, তাঁর সেদিন চব্বিশ ঘণ্টা অনশনের ডিউটি। পুলিশ একতলার ভাড়াটেদের ভীতচকিত করে, দোতলায় উঠে এক শীর্ণ মধ্যবয়স্কা মহিলা ও তিনটি কুমারী মেয়েকে ঘুম থেকে তুলে অনেক রকম মস্করা করল। লাথি মেরে দুটো মাটির কলসী ভাঙল, কুমারী মেয়ে তিনটিকে জেরা করার নামে চোখ দিয়ে চাটতে লাগল তাদের গা। অনাবশ্যকভাবে রূঢ় হয়ে তাদের ধাক্কাধাক্কি করল খানিকক্ষণ।

জেল ভেঙে পালিয়ে কেউ যে কলকাতার বাড়িতে এসে লুকিয়ে থাকবে না, একথা পুলিশেও জানে। তবু এসব হলো নিয়মরক্ষা।

এরও পাঁচদিন বাদে একদিন দুপুরবেলা কড়া নড়ে উঠল ও-বাড়ির। সন্টি যদিও নিচেই ছিল, কিন্তু সে দরজা খুলতে পারবে না। একতলার যে ভাড়াটিয়াটি সন্টিকে দিয়ে পিঠে তেল মাখায়, সে মাঝে মাঝে অফিস যায় না। সেই সব দুপুরে সে তেরো বছরের সন্টিকে কোলে বসিয়ে আদর করে। তারপর দুটো একটা টাকা দেয়। সেই দুপুরেও লোকটি সন্টিকে ব্যস্ত রেখেছিল বলে সে দরজা খুলতে এল

না। তিনবার কড়া নাড়ার শব্দ হবার পর দোতলা থেকে নেমে এলো ছন্দা। তার শাড়িটি শতচ্ছিন্ন। বোনেদের মধ্যে একমাত্র সে-ই কিছু টাকা-পয়সা রোজগার করতে পারে না। গরীব ঘরের অশিক্ষিতা কুমারী মেয়ের অর্থ উপার্জনের যে একটি মাত্র পথ, সে পথে সে যেতে চায় না কিছুতে। এক-একজনের মধ্যে একটা ভালো হবার বীজ থাকে। তারা যে পরিবেশেই থাকুক, ভালো আর মন্দ চিনে নেয় চট করে। তারা প্রাণপণে ঝুঁকে থাকে ভালোর দিকে। তারাই বেশি কষ্ট পায়। এ-বাড়ির মধ্যে এই মেয়েটা একদম আলাদা।

দরজা খুলে সে দেখল, একটা অত্যন্ত রোগা, শুকনো চেহারার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীরে চামড়া-মোড়া হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। তার বয়েস সতেরো থেকে সাতচল্লিশ যা হোক হতে পারে, যেন একটি মানুষ 'বনসাই' অথবা বাংলায় একেই বলে বোধহয় 'পুঁয়ে-পাওয়া'! চোখ দুটি অবিকল মৃত মাছের মতন।

ছন্দা জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

লোকটি অদ্ভুত কর্কশ গলায় বলল, এটা হ্যারাণদার বাড়ি?

ছন্দা সন্দিগ্ধভাবে বলল, না, এটা হারাণদার বাড়ি নয়। ও নামে কেউ এখানে থাকে না।

—এটা আটচল্লিশ নম্বর?

—হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে!

—একটা চিঠি আছে।

—কার চিঠি? কে আপনাকে পাঠিয়েছে? আমরা কিছু জানি না।

ছন্দা দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, লোকটা তার আগেই চিঠিটা ঠেসে দিল ছন্দার হাতে। বলল, চিঠিটা এক্ষুণি একবার পড়ে দেখুন। ছন্দা ভয় পেয়ে একটু পেছিয়ে এল। উঠোনে দাঁড়িয়ে কম্পিত হাতে খুলল চিঠিটা।

ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়া হারাণ ক্লাস সিক্সের ছেলের মতন হাতের লেখায় চিঠিটা লিখেছে।

মা, আমি মর-মর। যে করিয়াই হোক আড়াইশো টাকা পাঠাও। এর হাতে। এ খুব বিশ্বাসী। আমি টাকা পরে শোধ দিব। দিব, দিব, দিব। ইতি হারাণ।

এর মধ্যে বিশ্বাসী কথাটা তিন-চারবার কেটে অত্যন্ত বিকট একটা বানানে লেখা।

চিঠিটা পড়ে ছন্দার চোখে জল এসে গেল। এটা ক্রোধের অশ্রু। সে ঠোঁট কামড়ে ধরে কোনরকমে বলল, আপনি চলে যান।

লোকটি সেরকম ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় আবার জিজ্ঞেস করল, মালটা? যেটা নিয়ে যাবার কথা ছিল?

—হবে না। কিচ্ছু হবে না! চলে যান!

ছন্দা দরজা বন্ধ করে দিল লোকটার মুখের ওপর। তারপর সে ভাবল, চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু ছিঁড়ল না। সেটা হাতে নিয়ে উঠে এল ওপরে।

ছন্দার মা দুপুরে ঘুমোন না। দেয়ালে পিঠ দিয়ে শূন্যে চোখ মেলে বসে থাকেন।

ছন্দা ওপরে এসে বলল, মা, তোমার ছেলে চিঠি লিখেছে। বাড়িতে যদি আবার পুলিশ আসে?

মা ভয় পেলেন না বা উত্তেজিত হলেন না। নির্লিপ্ত গলায় বললেন, কী লিখেছে?

ছন্দা ফিসফিস করে চিঠিটা পড়ে শোনাল।

মা একটাও কথা বললেন না। হঠাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ে কাদতে লাগলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে! এই কান্নাটা কিসের জন্য? তাঁর ছেলে, তার প্রথম সন্তান মৃত্যুশয্যায়, এই খবর পেয়ে? অথবা ঐ আড়াই শো টাকা চেয়েছে বলে?

এবার, শিবশঙ্কর লাহিড়ীর ছেলের সম্পর্কেও কিছু তথ্য জানানো যেতে পারে।

এর নাম রণদেব লাহিড়ী। একে আমি কয়েকবার দেখেছি, সুজিতের মারফত পরিচয়ও হয়েছে।

সুজিতের সঙ্গে আমার কলেজ-জীবনের পর খুব একটা দেখাসাক্ষাৎ হতো না। দার্জিলিং-এর সেই হঠাৎ সাক্ষাতের পর যোগাযোগটা আবার বেড়ে গেল। ওর শ্বশুরবাড়িতে আমি আর দেবরাজ যাই, সেখানে দেখা হয়। মাঝে মাঝে ও আমার বাড়িতেও আসে।

একদিন সুজিতই আমাকে নিয়ে গেল হাজরা রোডের একটা ফ্ল্যাটে। দরজার বাইরে নাম লেখা রণদেব লাহিড়ী। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে সে এখানে ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। শিবশঙ্কর লাহিড়ী তাঁর ছেলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখলেও বাড়ির লোকজনেরা গোপনে এখানে আসে। আমি সেদিন বিশাখা আর তার পরের বোন জয়ন্তীকে ওখানে দেখলাম।

রণদেবের স্ত্রীর নাম কৃষ্ণা। তার এই নাম সার্থক। কালো রঙের এমন রূপসী মেয়ে, হাজার জনের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও সবাই ওকে দেখবে। মুখে কোমলতা ও বুদ্ধির ছাপ সমানভাবে মিশে আছে। এই মেয়েটিকে উপলক্ষ করেই পিতা-পুত্রের ঝগড়ার সূত্রপাত। বিয়ের আগে কৃষ্ণার পদবী ছিল দাস এবং সে

সাধারণ একজন স্কুলমাস্টারের মেয়ে। কফি হাউসে আড্ডা দেবার সময় আমাদের মনেই থাকে না যে, এখনো জাতের ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়। কিন্তু এই নিয়ে এখনও রাগ, অভিমান, গৃহবিচ্ছেদ এমনকি হত্যা বা আত্মহত্যাও চলেছে।

কৃষ্ণা ইংরিজিতে এম এ, কাছাকাছি একটি মেয়ে-কলেজে পড়ায়।

রণদেব আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট হবে। খড়গপুর আই আই টি থেকে পাশ করা এনজিনিয়ার। বাবার অমতে বিয়ে করে না ফেললে, এতদিনে তার বিলেত বা আমেরিকায় থাকার কথা ছিল। এখন ফিলিপস কোম্পানিতে চাকরি করে।

রণদেব আমাকে দেখে বলল, আমি বিশাখার মুখে আপনার কথা শুনেছি। আপনি তো কাছেই থাকেন, চলে আসবেন মাঝে মাঝে। সন্ধের পর আমরা বাড়িতেই থাকি।

আমি বিশাখার দিকে তাকালাম। ঘরের কোণে একটা ছোট বেতের চেয়ারে বসে আছে বিশাখা। হাতে একখানা বই। যেন ও একাই আলো করে আছে সমস্ত ঘরখানা। রণদেবের কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব। এখানে এলে বিশাখার সঙ্গে দেখা হবে। ওদের বাড়িতে গেলেও ওর সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু ওকে একা পাই না। ওর মা গল্প করতে খুব ভালোবাসেন, তিনি সব সময় কাছাকাছি থাকেন আমাদের। এখান থেকে বিশাখা যখন বেরুবে, তখন ওকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব। সঙ্গে ওর ছোট বোন থাকবে, তা থাক না!

রণদেবের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলেই আমি বুঝলাম, শুধু বিয়ের ব্যাপারই নয়, তার বাবার সঙ্গে তার মতভেদ আরো অনেক গভীর কারণে। রণদেব সীরিয়াস ধরনের মানুষ, সাধারণ হালকা কথাবার্তা সে পছন্দ করে না। সে ধনী পরিবারের সন্তান হলেও বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করার দিকে তার ঝোঁক নেই। সে চায় নিজেই কিছু একটা করতে। সে রাজনৈতিক বিশ্বাসে উগ্র ধরনের বামপন্থী। এবং এক হিসেবে সে খুব সৎ। বাবার টাকায় আরামে থেকে সে বামপন্থী বুলি কপচায় না। এমনকি তার অফিস থেকে ট্রেনিং-এর জন্য তাকে আমেরিকায় পাঠাবার কথা হচ্ছে, কিন্তু সে চায় চেকোশ্লোভাকিয়া বা ইস্ট জার্মানিতে যেতে। সম্ভব হলে সে চীনে যেতে চাইত।

আমাকে ও-বাড়িতে বসিয়ে রেখে সুজিত কাছেই আর কার সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘুরে আসতে গিয়েছিল। সুতরাং রণদেবের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে হচ্ছিল আমাকে একা।

আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে হঠাৎ একসময় রণদেব বলল, শিয়ালদার কাছে

রোহিণী বলে যে সিনেমা হলটা আছে, সেটা দেখেছেন? ওটা কার জানেন? আমার বাবার!

আমি কিছু না-জানার ভাব করে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে রইলাম।

রণদেব আবার বলল, ওখানকার কর্মচারীরা আজ প্রায় দুশো পঁচিশ দিন ধরে অনশন ধর্মঘট করে আছে! ভাবতে পারেন, ঐ সাধারণ গরীব লোকরা এতদিন মাইনে না পেয়েও কী করে বেঁচে আছে?

আমি চুপ।

বিশাখা বই মুড়ে রেখে আমাদের দিকে তাকাল। তার মুখে স্পষ্ট দেখা দিল একটা দুঃখের ছায়া। সে তার বাবাকে ভালোবাসে, দাদাকেও ভালোবাসে। সে চায় না, তার দাদা তার বাবার বিরুদ্ধে কিছু বলুক!

রণদেব বলল, ক্রিমিনাল! স্ট্রাইকটা কেন হচ্ছে জানেন, স্রেফ আমার বাবার জেদের জন্য। একজন ক্যাপিট্যালিস্টের জেদ! তাতেই কিছু লোক না খেয়ে মরতে পারে! এদেশে কোন ব্যবস্থা নেই সেটা আটকাবার!

বিশাখা করুণ গলায় শুধু বলল, দাদা!

কৃষ্ণা আর জয়ন্তী এই সময় চায়ের কাপ ভর্তি ট্রে নিয়ে এসে ঢুকল। কৃষ্ণা বলল, তুমি আবার ঐসব কথা শুরু করেছো! ভদ্রলোক আজ প্রথম এসেছেন।

রণদেব বলল, কেন, এতে দোষের কী আছে? এটা আমাদের দেশের একটা প্রবলেম। এ নিয়ে আলোচনা করা যায় না? আমার বাবা হোক আর যেই হোক।

রণদেব এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে, আমার একটা কিছু উত্তর দিতেই হয়। আমি বললাম, ধর্মঘট জিনিসটা কার্ল মার্কসের অবদান। আর অনশনটা গান্ধীজীর। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তার কোনটাই কাজে লাগছে না। একটা সিনেমা হল বা কারখানা যাই হোক, কোন মালিক যদি জেদ করে সেটা বন্ধ করে রাখে, শ্রমিকরা সেখানে কী করবে? মালিককে না খেয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু শ্রমিকরা কতদিন না খেয়ে থাকবে?

—সিনেমা হলটা মালিকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে শ্রমিকদের হাতে দিয়ে দিতে হবে!

—কিন্তু প্রাইভেট প্রপার্টি বিষয়ে আমাদের দেশে যে আইন আছে! পুলিশ এসে মালিক পক্ষের পাশে দাঁড়াবে।

—সেইখানেই তো গোড়ায় গলদ! এই বুর্জোয়া সিস্টেমে...

কৃষ্ণা বলল, ঠিক আছে, চা খাও। এবার অন্য কথা বলো!

রণদেব বলল, অন্য কথা! জানো, আজ দুপুরে আমি রোহিণীর সামনে গিয়েছিলাম। ট্রামে যেতে-যেতে কী খেয়াল হলো, নেমে পড়লাম অমনি!

এবার আমি একটু নড়েচড়ে সিধে হয়ে বসলাম। মালিকের বিদ্রোহী পুত্র গেছে ধর্মঘটীদের সামনে। এর মধ্যে বেশ খানিকটা নাটকীয়তা আছে।

কৃষ্ণা সামান্য ভুরু কুঁচকে বলল, কেন গিয়েছিলে?

রণদেব তীব্র স্বরে বলল, ওদের এই কথাটা বলবার জন্য, আপনারা এই হলটায় আগুন লাগিয়ে দিতে পারছেন না?

বিশাখা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জয়ন্তী, চল। বৌদি, আমরা যাচ্ছি!

কৃষ্ণা বলল, দাঁড়াও, সুজিত আসুক। ও তোমাদের নিয়ে যাবে। তোমার দাদা মাঝে মাঝে বড্ড বাজে কথা বলে।

রণদেব তার বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবাকে বলিস, আমি আজ রোহিণীতে গিয়েছিলাম!

আমার মনে হলো বিশাখাকে একটু সমর্থন করা উচিত। অর্থাৎ মালিক পক্ষের সমর্থনে কিছু বলি। তাই বললাম, হলটায় আগুন লাগালে কী লাভ হবে? ওটা নিশ্চয়ই ইনসিওর করা আছে। কোনই ক্ষতি হবে না। বরং কর্মচারীদের নামে ক্রিমিনাল কেস আনা যাবে।

—তা হোক। ওটাই একটা প্রতিবাদ!

—এরকম প্রতিবাদে লাভ কী? এর বদলে তারা তো কিছুই পাবে না, বরং আরো ক্ষতি হবে! সম্পত্তিতে আগুন লাগালে মালিক কখনো শ্রমিকের দাবি মেনে নেয়?

—এতে মালিক ভয় পেয়ে যাবে। এই ঘটনা চারদিকে ছড়াবে, তাতে আন্দোলন আরো দানা বাঁধবে। শিবশঙ্কর লাহিড়ীর মতন লোকদের বোঝাতে হবে যে শ্রমিকরা তাদের দয়ার দান চায় না। তারা চায় তাদের ন্যায্য অধিকার। পৃথিবীতে শ্রমিকের টাকা ছাড়া আর কোন টাকাই নেই!

এই সব কথা আমি আগে অনেকবার শুনেছি এবং পড়েছি। তবু এক-একজন লোক এমনভাবে উত্তেজিত হয়ে এইসব কথা উচ্চারণ করে যেন এগুলো তাদেরই নিজস্ব বক্তব্য। শুনতে অবশ্য মন্দ লাগে না!

আমি আবার বললাম, আচ্ছা, মালিক যদি কিছুতেই দাবি মেনে না নেয়, তা হলে এই গরীব কর্মচারীরা কতদিন আন্দোলন চালাতে পারবে?

—এক বছর! দু' বছর! যতদিন না মালিক মাথা নিচু করে?

—কিন্তু ততদিন চালানো কি এদের পক্ষে সম্ভব?

—নিশ্চয়ই! আমি আমার বাবাকে তো চিনি, ঐ কর্মচারীদের মধ্যে দু' একজন যদি গিয়ে ওঁর পায়ের ওপর কেঁদে পড়ে, অমনি উনি ওদের সব দাবি মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু ওরা যদি একবার হারে, তবে চিরকালই হারবে! তার বদলে ওদের

মধ্যে একজন দু'জন যদি অনশন করতে গিয়ে মরে যায়, সেটাও অনেক ভালো। এখন তো গভর্নমেন্টের টনক নড়ছে না, কিন্তু অনশনকারীদের একজন অন্তত যদি মরে যায়, অমনি হৈ-চৈ পড়ে যাবে। গদি বাঁচাবার জন্যই তখন কিছু ব্যবস্থা করতে হবে এই সরকারকে। যে মরবে, সে অন্যদের জিতিয়ে দিয়ে যাবে।

আমি চুপ করে রইলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কে মরবে? আমার রমেশ জ্যাঠাই বয়সে সবচেয়ে বড়, তাঁরই হঠাৎ মরার সম্ভাবনা বেশি। রমেশ জ্যাঠা যদি মরে যায়, তাহলে জ্যাঠাইমা আর তাঁর তিন মেয়ে...। রণদেব কি এসব বুঝবে? মৃত্যুর কথা মুখে উচ্চারণ করা সহজ। কিন্তু যে মরে, সে-ই শুধু জানে, মৃত্যু মানে কত ভয়ংকর শেষ! আর টের পায় তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারের লোকেরা।

বিশাখা অধৈর্য হয়ে উঠেছে! সে আর থাকতে চাইছে না! সুজিত না এলেও সে চলে যেতে চায়। আমি বললাম, চলো, আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।

কৃষ্ণা তার স্বামীকে ভর্ৎসনা করে বলল, তোমার বাবার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে বলেই যে তুমি অমনি একজন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট হয়ে গেলে, এটা কিন্তু হাস্যকর!

—মোটেই না!

এমন সময় সুজিত এসে গেল। ঘরে ঢুকেই বলল, কী ব্যাপার, এত চ্যাঁচামেচি কিসের?

কৃষ্ণা বলল, আপনার দাদা আজ এক মস্ত কীর্তি করে এসেছেন।

—কী?

—রোহিণী হলে গিয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন।

—তাই নাকি? তারপর কী হলো?

রণদেব বলল, ওদের কয়েকজন আমাকে চিনতে পেরেছিল। ভাবল আমি বাবার হয়ে দালালি করতে এসেছি। আওয়াজ দিল!

হো হো করে হেসে উঠল সুজিত।

রণদেব বলল, তাতে কিছু আসে যায় না। আস্তে আস্তে ওদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে।

সুজিত বলল, বাবা যে কেন হলটাকে শুধু-শুধু এতদিন ফেলে রেখেছেন! অত ভালো পোজিশন। আমি হলে ঐ সবক'টা লোককে ছাঁটাই করে নতুন স্টাফ দিয়ে হলটা চালাতাম। তেরো জন কর্মচারীর আবার ইউনিয়ন হয় নাকি! দরকার হলে পুলিশ প্রোটেকশান নিতাম।

আমি যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি। বিশাখাও বলল, সুজিতদা, আমি এবার বাড়ি যাব। আপনি উঠবেন?

সুজিত বলল, আরে, একটু বসো না! আমাকেও বলল, উঠলি কেন নীলু? বোস না! দাদার সঙ্গে এরকম তর্ক আমার প্রায়ই হয়। হেলদি ডিসকাশন!

সুজিত আর রণদেব আরো তর্ক করল মিনিট দশেক। আমি নির্বাক রইলাম। মনের মধ্যে একটা জিনিস খচখচ করছিল। যে ব্যাপার নিয়ে ওরা আলোচনা করছে, তার মধ্যে আমার একজন আত্মীয়ও যে জড়িত, সে কথা ওদের বলিনি। পরে জানতে পারলে ওরা আমায় অন্য কিছু ভাববে? অনশনকারীদের সঙ্গে আমিও যে একদিন ফুটপাথে বসেছিলাম, সে কথাও ওরা জানে না। পরে শুনলে ভাববে কি, আমি একজন গুপ্তচর?

তবু কিছু বললাম না। রমেশ জ্যাঠা আমার পিসিমার সৎছেলে, সুতরাং ভারী তো আত্মীয়তা! এ আর বলার মতন কিছু নয়।

একটু বাদে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। সুজিত বিশাখা আর জয়তীকে পৌঁছে দেবে, ট্যাকসি ডাকল। আমি মনে মনে সুজিতের মুণ্ডুপাত করলাম। ও আর একটু দেরি করে আসতে পারত না? তাহলে আমিই বিশাখাদের পৌঁছে দিতাম। এখনো একদিন বিশাখার সঙ্গে ভালো করে কথাই হলো না!

ওরা ট্যাকসিতে উঠল, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বিশাখা যখন গাড়িতে উঠছিল, আমি দেখলাম ওর লাল রঙের চটি, পরিষ্কার তকতকে গোড়ালি, আর শায়ার চিকন লেস। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিশাখা উজ্জ্বলভাবে হাসলো ঠিক যেন সোনালি রঙের সেই হাসিটা। বেরিয়ে আছে একটা হাত, তার পাঁচটা আঙুল যেন মাখনে তৈরি।

ট্যাকসিটা চলে যাবার পরও আমি একটুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, বিশাখার সেই সোনালি রঙের হাসি, মাখনের তৈরি পাঁচটা আঙুল, তার লাল চটি, পরিষ্কার গোড়ালি, শায়ার লেস—সব মিলিয়ে যে রূপ, তা যেন তখনো সেখানে রয়ে গেছে। পৃথিবীতে দুঃখ, দারিদ্র্য, অবিচার সবই আছে, তবু এই সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারি না। এটা কি অন্যায়? এতেই কি আমার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র প্রকট হয়ে ওঠে?

৬

দুই দাদা বেরিয়ে গেছে অফিসে, বিল্টু কলেজে, বড় বৌদি বাপের বাড়ি, মেজবৌদি তার দিদির মেয়েকে দেখতে গেছে নার্সিং হোমে, বাড়িতে শুধু মা আর আমি। বেলা এগারোটা। মা রান্নাঘরে, আমি নিজের ঘরে বসে দু' একখানা চিঠিপত্র লিখছিলাম, এই সময় ছন্দা এল আমাদের বাড়িতে। সোজা উঠে এল তিনতলায়; সিঁড়ির কাছটায় দাঁড়িয়ে ডাকল, ছোড়দা, ছোড়দা!

আমার আগেই মা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। একটি যুবতী মেয়েকে দেখেই তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কে?

মা চিনতে না পারলেও ছন্দা মাকে ঠিক চিনেছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নিচু হয়ে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর বলল, কাকীমা, ভালো আছেন? আমি ছন্দা। বেলেঘাটা থেকে আসছি।

ছন্দা নামটাও মায়ের জানবার কথা নয়, কিন্তু বেলেঘাটার উল্লেখেই তিনি বুঝে গেলেন। তাঁর মুখখানা অপ্রসন্ন হয়ে গেল। শুকনোভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী খবর? তোমার মা ভালো আছেন?

এই সব কথার উত্তরে কেউ কোনদিন অন্য কিছু বলে না। যদিও ভালো থাকার কোন প্রশ্নই নেই, তবু ছন্দা ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

আর কোন কথা না বলে মা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলেন। অর্থাৎ হঠাৎ এলে কেন?

ছন্দা বলল, ছোড়দার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে।

আমি উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। ওকে বললাম, এসো ছন্দা, ঘরের মধ্যে এসো।

আমার ঘরে একটিই মাত্র চেয়ার। সেটাতে ওকে বসতে বলে আমি বসলাম খাটে। মা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। এই যুবতী মেয়েটি আমার কাছে কোন্ প্রয়োজনে এসেছে, সেটা তিনি জানতে চান। ছন্দা বসল খুব আড়ষ্টভাবে।

আমি বললাম, মা, একটু চায়ের জল বসাও না? দু' কাপ।

ছন্দা বলল, আমি চা খাব না, চা খাই না!

মা বললেন, রোদ্দুরের মধ্যে এসেছে, চা না খাওয়াই ভালো। বরং একটু মিষ্টি নিয়ে আয়। বাড়িতে তো কিছু নেই, তুই নিয়ে আয়, নীলু।

মায়ের সঙ্গে আমার একটা খেলা শুরু হলো। মা চান আমাকে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে সেই সময়টুকুতে মেয়েটিকে জেরা করে জেনে নেবেন, সে কেন এসেছে। কিন্তু আমিই বা হারব কেন?

এবার আমি বললাম, দোকানের মিষ্টি খাইয়ে কী হবে! মেজবৌদি কাল বিল্টুর জন্মদিনের পায়েস রেঁধেছিল, তাই একটু দাও বরং!

ছন্দা করুণ মুখে বলল, না, আমি খাব না।

মা আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। পায়েস নেই একথাও বলতে পারবেন না। কারণ, সকালেই আমাকে এক বাটি দেওয়া হয়েছিল, আমি বলেছিলাম, এখন রেখে দাও, দুপুরে খাব!

ফলে, বাধ্য হয়েই মাকে পায়েস আনতে যেতে হলো। কোন যুবতী মেয়ের সঙ্গে মা আমাকে কিছুতেই নিরালায় থাকতে দিতে চান না। যদি আমার চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়! মায়ের চোখে অবশ্য আমি অতি নিষ্পাপ, ভালোমানুষ, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানি না—কিন্তু কোন মেয়ে যদি আমাকে প্রলোভন দেখায় কিংবা মায়াজাল বিস্তার করে, তা হলে আমার মাথা ঘুরে যেতে পারে! সেইজন্যই মা পায়েস নিয়ে ফিরে এলেন দু' মিনিটের মধ্যে।

সেই ফাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী খবর, ছন্দা?

ছন্দা কোন কথা বলতে পারল না। চেয়ারের হাতলের ওপর আঙুল দিয়ে অদৃশ্য ছবি আঁকতে লাগল আপন মনে।

—কী খবর? আমায় কী যেন বলবে বলছিলে?

ছন্দা তবু চুপ।

—তোমার বাবার স্ট্রাইক মিটেছে?

এবার সে মৃদু গলায় বলল, না।

—তুমি আমাদের বাড়ি চিনলে কী করে?

—খুব ছোটবেলায় একবার এসেছিলাম।

এই সময় মা পায়েসের বাটি আর জলের গেলাস নিয়ে এলেন। এসে দেখলেন, আমরা চুপ করে বসে আছি। বেশ সন্দেহজনক স্তব্ধতা।

ছন্দা লজ্জায় পায়েস খেতে চাইছে না। তাকে জোর করে খাওয়ানো হলো। এরপর ঠিক আমি যা-যা প্রশ্ন করেছিলাম ওকে, মা-ও সেই প্রশ্নগুলোই করলেন। সেই রকম সংক্ষিপ্ত উত্তর। মা বুঝতে পেরেছেন, তাঁর সামনে ও আর বিশেষ কিছু বলবে না। ওর কোন গোপন কথা আছে। মা'র চোখ দু'টি আরও খরশান হলো।

এই সময় দোতলায় সিঁড়ির মুখে দরজায় খট খট শব্দ হলো। কে যেন এসেছে। মায়ের মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এবার তার জয়। নিশ্চয়ই আমাকে কেউ ডাকতে এসেছে। এই রকম সময় আমার বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কেউ আসে না। এরপর আর আমি একলা একটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে ঘরের মধ্যে বসে গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করতে পারব না।

আমি উঠে গেলাম দেখতে। দোতলার সিঁড়ির দরজা খুলে দেখে নিয়েই আবার চট করে ওপরে উঠে এলাম। এবার আমার জয়ের পালা। আমি হাসিমুখে মায়ের দিকে তাকালাম।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কে?

আমি বললাম, ধোপা!

মায়ের মুখখানা আবার নিভে গেল। ধোপাকে জামা-কাপড় দেওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণই মায়ের ডিপার্টমেন্ট। এবং ঐ ব্যাপারে অনেকক্ষণ সময় লাগে। একটাও জামা-কাপড় ফেঁসে গেছে কিনা বা বদলাবদলি হয়ে গেছে কিনা, তা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হবে তো।

মাকে এবার যেতেই হবে। প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি বললেন, তুই যে পা-জামাটা পরে আছিস, ওটা ছেড়ে দে! ওটা এবার কাচতে দিতে হবে।

ঘরে একটি মেয়ে বসে আছে। এর মধ্যে আমি পা-জামা ছাড়ি কি করে? এই প্রসঙ্গটা এখন না তুললে হতো না? পরের সপ্তাহে দিলেও তো চলত। যাই হোক, বাথরুমে গিয়ে অন্য একটা পা-জামা পরতে হলো। ফিরে এসে দেখি ছন্দা দু' হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদছে।

আমি একটু চমকে গিয়ে বললাম, কী হলো, ছন্দা?

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে ও বলল, কিচ্ছু না।

আমি এগিয়ে গিয়ে একটা হাত ওর কাধে রেখে অন্য হাতে ওর থুতনিটা উঁচু করে তুলে ধরে বললাম, কী হয়েছে?

ওর শরীরটা কাঁপছে। আমি ওর গালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, কী হয়েছে, বলো তো?

এই অবস্থায় মা আমাকে দেখে ফেললে ভাবতেন, আমি সুযোগ পেয়েই অসভ্যতা শুরু করে দিয়েছি। একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য তার গালে হাত দেবার দরকার কী? কিন্তু আমি স্পর্শে বিশ্বাস করি। অনেক কথা যা মুখে বলে বোঝানো যায় না, তা আঙুলের ডগায় স্বচ্ছভাবে প্রবাহিত হয়ে যায়। মানসিক সংযোগ অনেক দ্রুত হয়। আমি ছন্দাকে ছুঁয়ে বুঝিয়ে দিলাম, দেখো, আমি সুযোগ-সন্ধানী নই। দেখো, আমি তোমার প্রতি অমনোযোগী নই। দেখো, আমি তোমার দুঃখে অংশ নিতে চাই!

ছন্দা চোখ মুছে ফেলতেই আমি খাটে গিয়ে বসলাম।

ছন্দা বলল, আমি শুধু-শুধু আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি, আমি আসতে চাইনি, কিন্তু আমি কোথায় যাব? আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমি কী করে মরব বলুন তো?

আমি একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, যাঃ, এসব কথা কী? মরার কথা উঠছে কেন?

—আমার বাবা আমাদের রোজ মরে যেতে বলেন। কিন্তু এমনি এমনি কি কেউ মরে যেতে পারে?

—ওটা তো রাগের কথা।

—আমি আর ও-বাড়িতে একটুও থাকতে চাই না। আর বেশিদিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব! সবাই আমাকে এমন জ্বালাতন করে।

—কেন, নতুন কিছু হয়েছে?

—আমাদের বাড়িতে রোজ পুলিশ আসে।

—পুলিশ? সে কি?

—হ্যাঁ, রোজ রাত্তিরে পুলিশ আসে। আর দিনের বেলা একজন করে লোক আসে, আমার দাদার নাম করে টাকা চায়। টাকা না পেলে তারা দাদাকে ধরিয়ে দেবে বলেছে।

এই সময়ই আমি ছন্দার কাছ থেকে তার দাদা সম্পর্কে কিছু কিছু খবর পেলাম। ব্যাপারটা বীভৎস রকমের অদ্ভুত! পুলিশ নাকি এর মধ্যে রমেশ জ্যাঠাকে একদিন মেরেছে। মেয়েদের প্রায়ই ধরে নিয়ে যায় থানায়। একজন বুড়ো লোক, যে প্রায় খেতেই পায় না, তাকেও পুলিশ মারতে পারে? পুলিশদের কি বাবা নেই?

অবশ্য এক্ষেত্রে পুলিশদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। রমেশ জ্যাঠার অনশন-ধর্মঘটের ব্যাপারে পুলিশের কোন মাথাব্যথা নেই। অনশন বা ধর্মঘট তো গণতান্ত্রিক আন্দোলন, তাতে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে কেন? কিন্তু জেল থেকে পালানো একটা সাঙ্ঘাতিক অপরাধ। পুলিশের ধারণা, হারাণ কোথায় লুকিয়ে আছে, তা তার বাবা-মা এবং বোনেরা জানে। সুতরাং ওদের ওপর খানিকটা চাপ দিলেই খবরটা বেরিয়ে আসবে। দু'চারটে চড়-চাপড়, মেয়েদের একটু অপমানের ভয় দেখানো, এই আর কি! হারাণের মতন একজন চুনোপুঁটি অপরাধীকে ধরবার জন্যই বা পুলিশের এত তোড়জোড় কেন? পরে জেনেছি, পুলিশের শুধু ধারণা নয়, দৃঢ় বিশ্বাস যে, হারাণকে ধরতে পারলেই পলাতক নকশালদের ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া যাবে। সেইটাই সবচেয়ে জরুরি।

ছন্দাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমি বললাম, ঠিক আছে, আমার এক বন্ধুর দাদা পুলিশের একজন বড় অফিসার, আমি তাঁকে গিয়ে বলব, যাতে তোমাদের ওপর আর—

ছন্দা সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলল, আমি ও-বাড়িতে আর যাব না! আমাকে অন্য কোথাও একটু থাকার ব্যবস্থা করে দিন!

—অন্য কোথায় তুমি থাকবে?

—তা আমি জানি না! যে-কোন জায়গায়!

এই মেয়েটিকে আমি কোথায় থাকতে দেব? আমার কতটুকু সাধ্য। সবচেয়ে সহজ অবশ্য আমাদের বাড়িতেই থাকতে দেওয়া! একটি মেয়ে আমাদের বাড়িতে থাকলে এমন কী অসুবিধে হবে? খরচও তেমন কিছু বাড়বে না! কিন্তু আমি জানি, মা কিছুতেই রাজি হবেন না। হুট করে একটি কুমারী মেয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে চাইলে মা-মাসী-পিসীরা সেটা সুনজরে দেখেন না। আমার পক্ষে জোর করারও উপায় নেই। আমি বাড়ির মালিক নই, আমি এ বাড়ির বেকার ছেলে!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ছন্দা বলল, আপনাকে বলেছিলাম, আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে—

—চেষ্টা করছি! কয়েক জায়গায় বলে রেখেছি। একটু সময় লাগবে!

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ছন্দা বলল, আমি যাই!

আমি বললাম, আর একটু বসো!

—আমি জানি, আপনাকে আমি বিরক্ত করছি। কিন্তু আমি কাকে গিয়ে এ-সব কথা বলব? আমার যে আর কেউ নেই। আচ্ছা আমি যাচ্ছি, দেখি কী হয়। বোধহয় আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না!

আমি আবার উঠে এসে ছন্দার কাঁধে হাত রেখে বললাম, লক্ষ্মীটি, হঠাৎ পাগলের মতন কিছু করে বসো না। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই!

এর পরক্ষণেই মা এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি অপরাধীর মতন তাড়াতাড়ি আমার হাতটা সরিয়ে নিলাম। ছন্দা পাগলাটে গলায় বলল, কাকীমা, আমি যাই!

মা ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, কথা হয়ে গেছে?

উত্তর না দিয়ে ছন্দা ঝুঁকে আবার মাকে প্রণাম করল। আমি দেখলাম, এই ক'দিনে সে আরো রোগা হয়ে গেছে, তাকে দেখাচ্ছে একটা শীর্ণ শালিকের মতন। কণ্ঠার হাড় প্রকট, হাতগুলো সরু সরু, ব্লাউজটা ঢলঢলে, তার শাড়িটা তিন-চার জায়গায় শেলাই করা। মাত্র উনিশ কিংবা কুড়ি বছর বয়েস মেয়েটার। রমেশ মুখার্জির মেয়ে না হয়ে ও অন্য কারুর মেয়ে হলে হয়তো এখন কলেজে পড়ত, ওর স্বাস্থ্যে দেখা দিত জৌলুস, আধুনিকতম ডিজাইনের শাড়ি পরে ও অনায়াসে কফি হাউসের আড্ডায় বসে নানারকম ঝকঝকে আলোচনায় যোগ দিতে পারত।

মা বিরক্ত হবেন জেনেও আমি ছন্দাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ল। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি ওকে জিজ্ঞেস

করলাম, আচ্ছা, তোমার ঠিক ওপরের বোন, যাকে আমি সেদিন দেখিনি, সে কি কোথাও চাকরি-টাকরি করে?

আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে ছন্দা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, বেশ্যা! সে বেশ্যা হয়ে গেছে। সেইজন্যই তো বাবা চান আমরা সবাই মরে যাই!

কথাটা সে এমন তীব্র ঝোঁক দিয়ে বলল যে, আমি থমকে গেলাম। সে তার মলিন শাড়ি ও শীর্ণ শরীর নিয়ে হঠাৎ অত্যন্ত অহংকারী হয়ে চলে গেল গটগটিয়ে।

আমার জিভের তলায় একটা নিমপাতার স্বাদ। ফিরে এলাম আস্তে আস্তে। বাড়ি ফেরা মাত্রই মা জিজ্ঞেস করলেন, ক' টাকা দিলি?

তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ল, সত্যিই তো, ছন্দাকে কয়েকটা টাকা দেওয়া উচিত ছিল আমার। নিশ্চয়ই ওরা একটা মরিয়া অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। হয়তো কয়েকদিন ধরে ওদের একদমই খাওয়া জুটছে না। সেই জন্যই মুখটা অত শুকনো দেখাচ্ছিল। ছিঃ, ছিঃ, কেন আমি ওকে টাকার কথাটা জিজ্ঞেস করলাম না!

মা বললেন, একবার দিয়েছিস তো, এখন বারবার আসবে! সেই জন্যই তখন বারণ করেছিলাম। কত টাকা দিলি, বল না আমাকে! লুকোচ্ছিস কেন?

আমি ঝাঁজের সঙ্গে উত্তর দিলাম, আমি কোথা থেকে টাকা দেব, আমার কাছে কি টাকা থাকে? তাছাড়া, আমার কাছে টাকা চায়ওনি।

—তাহলে তোর কাছে এসেছিল কেন?

—চাকরির খোঁজ করতে।

—চাকরি? ও আবার কী চাকরি করবে? লেখাপড়া শিখেছে কিছু?

—না, বিশেষ শেখেনি।

—তাহলে? ওকে কে চাকরি দেবে?

—ঠিকই! ওকে কেউ চাকরি দেবে না। সুতরাং হয় ও না খেয়ে মরবে অথবা আত্মহত্যা করবে। তাই না?

—শেলাই-ফোঁড়াই-এর কাজ কিছু করলেই পারে? আজকাল কত মেয়েই তো ওসব জোগাড় করে নেয়। তুই তার কী করবি? তোর কাছে আসে কেন?

আমি মায়ের মুখের দিকে স্পষ্ট করে তাকালাম। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, মা, শোনো। ঐ ছন্দা যে শাড়িটা পরে এসেছিল, সেটা দেখেছিলে? তিন-চার জায়গায় ছেঁড়া। ওর বয়সী কোন ভদ্র-পরিবারের মেয়ে ঐ রকম শাড়ি পরে কখনো রাস্তায় বেরোয় না। তোমার একবারও মনে হলো না, ঐ মেয়েটিকে একটা শাড়ি দেওয়া উচিত?

—পৃথিবীতে কি গরীব-দুঃখীর অভাব আছে? ক'জনকে আমরা শাড়ি দিতে পারব? এই তো সেদিন আমাদের ঠিকে ঝি-র মেয়েকে একটা শাড়ি দিলাম।

—বৌদিদের আমি দেখেছি, এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক আস্ত শাড়ি বদলে বাসনপত্র রাখে। একটা স্টিলের বাটি বা গেলাশ না রেখে সেই রকম একটা শাড়ি এই মেয়েটিকে দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?

—তুই চুপ কর তো, বেশি বড়-বড় কথা বলিস না। ওর বাবা নিজের ছেলেমেয়েদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে পারে না? সারাটা জীবন গায়ে ফুঁ দিয়েই কাটাল। অকর্মার গোঁসাই একটা!

—মা, দুশো পঁচিশ দিন ধরে অনশন ধর্মঘট করাটাকে ঠিক গায়ে ফুঁ দিয়ে কাটানো বলে না। হয়তো প্রথম জীবনে কিছু ভুল করেছেন—

—মোট কথা, ওরা এ বাড়িতে বেশি আসা-আসি করুক, এটা আমি পছন্দ করি না। পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে। তুই তো ছেলেমানুষ, কিছু বুঝিস না; দেখবি, যাদের উপকার করতে যাবি, তারাই উল্টে তোর নামে বদনাম দেবে। যুগটাই এ-রকম। কোন মেয়ের জন্য তুই কিছু করতে গেলে দেখবি লোকে বলবে, নিশ্চয়ই তোর কোন বদ মতলব আছে।

—ঠিক আছে, সে আমি বুঝব!

—আমার কথা না শুনতে চাস, শুনিস না। কিন্তু আমি এখনো বলে রাখছি, অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

মা বেরিয়ে গেলেন আমার ঘর থেকে। আমি দরজা ভেজিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। আর কিছুর জন্য নয়, নিজের অসহায়তার কথা ভেবে। আমি কী সাহায্য করতে পারি? কিছুই না। মেয়েটিকে মিথ্যে স্তোকবাক্য দিলাম।

একদিকে রণদেব, আর একদিকে আমার মা। রণদেব চায় নিজের পৈতৃক সম্পত্তিতে আগুন ধরিয়ে দিতে। আর আমার মা নিজের সংসার আর ছেলেমেয়েদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখতে চান না। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর কোনটাতেই কিছু উপকার হয় না এই সমাজের। আর আমিই বা কী করছি? শুধু লোকের সমালোচনা করতে পারি—সকলেই এই সমালোচনার কাজ ভালো পারে, কারণ এতে কোন পরিশ্রম নেই।

মা আবার ঘরে ঢুকলেন। হাতে তিনখানা পুরোনো শাড়ি। এগুলো তাঁর যৌবনকালের। মায়ের মুখ-চোখ আর কণ্ঠস্বর হঠাৎ বদলে গেছে।

নরম গলায় মা বললেন, নীলু, এই তিনখানা শাড়ি আর আমার তরফ থেকে পঁচিশটা টাকা তুই ওদের বাড়িতে দিয়ে আয়। সরমা বৌদির কথা ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছে। সারা জীবন শুধু কষ্ট পেয়ে গেলেন। এখন এত বিপদের মধ্যে...

এবার আমার সত্যিকারের রাগ হলো। আমি দপ্ করে জ্বলে উঠে চেঁচিয়ে

বললাম, একটু আগে এ-কথা মনে পড়েনি? মেয়েটি যখন ছিল, তখন দিতে পারোনি তার হাতে! এখন এগুলো আমাকে বয়ে নিতে যেতে হবে? আমি কি এ-বাড়ির চাকর? সব কাজ করতে হবে আমাকে? না, আমি পারব না!

রাগ করে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। কোথায় যাব? হঠাৎ মনে হলো, নিউ আলিপুরে ছোট মাসীর বাড়িতে যাই। দুপুরটা ওখানেই কাটিয়ে দেব।

বাস থেকে নেমে আবার আর একটা কথা মনে পড়ল। মা একটা উপকার করেছেন। মা যে বললেন, ছন্দা শেলাই-ফোঁড়াই-এর কাজ জোগাড় করতে পারে, সেটা থেকে একটা সূত্র পাওয়া গেছে। ছন্দা কোন চাকরি পেতে পারে, সেটা আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না। কিন্তু শেলাইয়ের কাজ...। ছোট মাসীরই এক বান্ধবী কোন এক মহিলা আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত শুনেছিলাম! গরীব মেয়েরা সেখানে নানা রকম শেলাইয়ের কাজ করে কিছু উপার্জন করে।

তক্ষুনি ছোট মাসীর কাছে গিয়ে বললাম, তোমার বান্ধবী সেই যে মিসেস চৌধুরী, তাঁর সঙ্গে আমি একটু আলাপ করতে চাই। কেন, কী বৃত্তান্ত সে-কথা ছোট মাসীকে বুঝিয়ে বলতে অনেক সময় লাগবে। বললাম, ওদের আশ্রমটা একটু ঘুরে দেখব, ওঁর একটা ইন্টারভিউ নেব। একটা পত্রিকা থেকে আমাকে এ সম্পর্কে লিখতে বলেছে।

ছোট মাসী জিজ্ঞেস করলেন, লিখলে তুই টাকা পাবি?

—বাঃ, পাব না কেন? বিনা টাকায় কেন লিখতে যাব?

—তাহলে যা টাকা পাবি, তার অর্ধেক দিতে হবে ঐ মহিলা আশ্রমকে। ওদের ঐ নিয়ম।

—ঠিক আছে। পাব টাকা গোটা তিরিশেক, তার অর্ধেক পনেরো টাকা দিয়ে দেব স্বচ্ছন্দে। আমার ট্যাক্সি ভাড়াটা তুমি দিয়ে দিয়ো!

ছোট মাসীকে দিয়ে ফোন করিয়ে জেনে নিলাম, মিসেস চৌধুরী তখন বাড়িতে আছেন। ওঁর বাড়ি যোধপুর পার্কে। ছোট মাসী বললেন দুপুরবেলা খেয়ে যেতে। এ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালোই হয়। কিন্তু আমি সে লোভ সংবরণ করলাম। আমার শরীরটা কেমন জ্বালা জ্বালা করছে। বেরিয়ে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে।

রু আফজা সরবৎ খেতে-খেতে মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে কথা হলো অনেকক্ষণ। এঁর স্বামী আর্মির একজন কর্নেল, হাতে প্রচুর সময়, তাই সমাজসেবা করেন। ব্যাপারটা বেশ ভালোই। সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহায্য আদায় করেছেন আশ্রমের জন্য। তাছাড়া মাঝে মাঝে চ্যারিটি-শো করে টাকা তোলেন। দুঃস্থ মেয়েরা ঐ আশ্রমে নানা রকম হাতের কাজ শেখে। কেউ কেউ ওখানে থাকে, অনেকে বাড়ি থেকেই আসে। ওদের তৈরি করা জিনিসপত্র কটেজ ইন্ডাস্ট্রির

দোকান থেকে বিক্রি হয়। মেয়েরা মাসে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা স্টাইপেন্ড পায়। কিংবা, যদি ওখানেই থাকে, তাহলে খাওয়া-থাকা বাদ দিয়ে চল্লিশ টাকা হাত-খরচ পাবে।

এবার বলে ফেললাম আমার আসল কথাটা। আমার চেনা একটি মেয়েকে ওখানে কাজ দিতে হবে।

মিসেস চৌধুরী সোফায় মাথা হেলান দিয়ে বললেন, এ বছর হবে না। সামনের বছর সেপ্টেম্বর মাসের দিকে চেষ্টা করবেন—

আমি বললাম, কেন, হবে না কেন?

—কোনো উপায় নেই।

—উপায় একটা বার করতেই হবে।

—অসম্ভব। আমরা মোট পঞ্চাশটি মেয়ে নিই। তার জন্য কত অ্যাপ্লিকেশন আসে জানেন? আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার। তার মধ্যে অনেক বি-এ পাশ, এম-এ পাশ মেয়েও থাকে। এদের মধ্যে থেকে বাছাই করা কত শক্ত বলুন! তাই আমাদের খানিকটা কঠোর হতেই হয়—

—শুনুন, আমি যে মেয়েটির কথা বলছি, সে এমন বিপদে পড়েছে...

আমাকে থামিয়ে দিলেন মিসেস চৌধুরী। খানিকটা দুঃখিত হাসির সঙ্গে বললেন, দেখুন, সবাই ঐ কথাই বলে। ঠিক মিথ্যেও বলে না। কোন বিপদে বা অসহায় অবস্থায় না পড়লে ভদ্রঘরের মেয়েরা সামান্য একশো পঁয়তিরিশ টাকার জন্য এই কাজ করতে আসবেই বা কেন? আমরা সকলের প্রয়োজনটাই সমানভাবে দেখি।

মিসেস চৌধুরীর পুরো নাম প্রতিভা চৌধুরী। আমি এবার গলায় খানিকটা করুণ রস মিশিয়ে বললাম, প্রতিভা দেবী, তবু এই মেয়েটির জন্য একটা কিছু করতেই হবে আপনাকে।

প্রতিভা চৌধুরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হাত দিয়ে শাড়ির পাড় প্লেন করতে করতে বললেন, এ বছরের লিস্ট প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। এখন কারুর কথা শুনে আর একজনকে নেওয়া মানেই আগের একজনকে বাদ দেওয়া। সেটা অন্যায়। সেরকম অন্যায় আমি করব কেন? আপনিই বা সেরকম অন্যায় অনুরোধ জানাবেন কেন আমাকে?

—তার কারণ, এটাকে খুব একটা অন্যায় বলে মনে হচ্ছে না আমার। এই মেয়েটির চেয়ে নিশ্চয়ই আরো অসহায় আরো বিপন্ন মেয়ে অনেক আছে, অনেকের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশি, কিন্তু আমরা চোখের সামনে যাকে কষ্ট পেতে দেখি, তার কষ্টটাই আমাদের বেশি মনে হয়, তার কষ্টটাই আমরা

প্রথমে দূর করতে চাই। রাস্তায় একজন লোককে গাড়ি চাপা পড়ে আহত হতে দেখলে আমরা কি বলব, এই মুহূর্তে কত লোক না খেয়ে মরছে, সুতরাং এ আর এমন কথা কি? সেই আহত লোকটির দিকে না তাকিয়ে চলে যাব?

প্রতিভা চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটি আপনার কে হয়?

আমি দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম। বলতে পারতাম, আমার এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো বোন। কিন্তু সেটা কী রকম বোকা-বোকা শোনায়। নিজের বা আত্মীয়স্বজনদের জন্য কখনো কারুর কাছে করুণা ভিক্ষে চাইনি। পরোপকার করা আমার নেশা নয়। নেহাৎ মেয়েটিকে একটা মিথ্যে স্তোকবাক্য দিয়ে ফেলেছি।

বললাম, কেউ হয় না। এমনিই চেনা।

মনে হয়েছিল প্রতিভা চৌধুরী অনেকটা নরম হয়ে এসেছেন। কিন্তু হঠাৎ আবার বললেন, আমি দুঃখিত, এখন আর কিছু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। সকলের কাছে চিঠি চলে গেছে। আপনি ওকে আগামী বছর পাঠাবেন।

এতখানি চেষ্টা করেও হেরে যেতে কারুর ভালো লাগে না। কিন্তু কর্নেল সাহেবের স্ত্রী একেবারেই অনমনীয়া। আর কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না। হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, আপনি যদি আমার এই অনুরোধটুকু রাখতেন, তাহলে ভবিষ্যতে আমিও কখনো না কখনো আপনার কোন উপকার করতাম।

তিনি তাঁর ভ্রমরকালো দুই চোখে কৌতূহল এবং বেদানা রঙের পাতলা ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার কী উপকার করবেন?

আমি তাঁর ঘরের চারপাশে তাকালাম। ঐশ্বর্যের সঙ্গে রুচি মিশে আছে। সিনেমায় সাহেব-মেমদের ঘরও এই রকমই সাজানো থাকে। সত্যিই তো, আমি এঁর কী উপকার করতে পারি! এই কথাটা বলাই আমার ধৃষ্টতা হয়েছে।

আমি বললাম, তা জানি না, কিন্তু কিছু একটা উপকার করার ইচ্ছে আমার ভেতরে ভেতরে থেকে যেত।

উনি আবার সমাজসেবিকার মতন আদর্শবাদী মুখ করে বললেন, এটা আমার কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। উপকার-টুপকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে নিয়মকানুন মেনে চলতেই হয়।

আমি বললাম, হ্যাঁ, সে তো ঠিকই। আচ্ছা নমস্কার।

বাইরে বেরিয়ে এসে ফুটপাথের বাসস্টপে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালাম। ছোট মাসীর বান্ধবী হিসেবে এতক্ষণ ধরে শ্রীমতী প্রতিভা চৌধুরীকে সমীহ করে সিগারেট না খেয়ে দম বন্ধ করে থাকার কোন কারণ ছিল না। অবশ্য আমি প্রতিভা চৌধুরীর নামে কোন দোষ দিতেও পারছি না। উনি কঠোর ন্যায়ের পথে থাকতে চান! উনি যদি আমার কাছে ঘুষ চাইতেন, আমি ওঁর আড়ালে গিয়ে প্রচুর গালাগাল

করে গায়ের জ্বালা মেটাতাম। কিন্তু উনি সে সুযোগ দেননি। মানুষের সভতাও এক এক সময় দুঃসহ হয়ে ওঠে।

আমি বিড়বিড় করে বললাম, ছন্দা, আমি তোমাকে সত্যিই মিথ্যে কথা বলেছি। আমার সাধ্য কিছুই নেই! তা হলে তুমি মরো। মরা এমন কিছু শক্ত নয়, বেঁচে থাকাটাই শক্ত। লণ্ঠনের কেরোসিনটুকু শাড়িতে ঢেলে তারপর সামান্য একটা দেশলাই কাঠির আগুন। অথবা তুমি বেশ্যা হয়ে যাও না! তোমার অন্য বোনদের মতন শরীরের বিনিময়ে পয়সা আনো। ভালো খাও-দাও, বেঁচে থাকো! যে খেতে পায় না, তার কাছে সতীত্বের দাম কানাকড়ি, কানাকড়ি। মৃত্যুর মতন অশ্লীল জিনিস আর কিছুই হতে পারে না।

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা আমি একটা কুকুরের গায়ে ছুঁড়ে মারলাম।

৭

শিবশঙ্কর লাহিড়ীর কাছে ন্যাশনাল লাইব্রেরির প্রসঙ্গটা তোলা আমাদের পক্ষে একটা কাঁচা কাজ হয়ে গিয়েছিল। উনি একদিন কথায় কথায় ওঁর এক পিতৃবন্ধুকে বলে ফেললেন যে, বাবার পুস্তক-সংগ্রহ উনি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দান করছেন। পিতৃবন্ধুটি এক থুড়থুড়ে বুড়ো, তবু প্রতিদিন টুকটুক করে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরোনো বইয়ের পোকা খাচ্ছেন। তাঁর নবলব্ধ জ্ঞান পৃথিবীর কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু তাঁর মুখে একটা টুসটুসে পাকা ফলের মসৃণতা আছে।

শিবশঙ্করের মুখে খবর পেয়েই তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরির দু'জন কর্মীকে নিয়ে সটান চলে এলেন সে-বাড়িতে। আমরা তখন সেখানে উপস্থিত। আমাদের যদিও চোর বলে ধরবার উপায় নেই, আমরা তো ক্যাটালগ তৈরি করছি। আমরা মনে মনে সেই বুড়োটির মুণ্ডুপাত করতে লাগলাম। ন্যাশনাল লাইব্রেরির কর্মী দু'জন অবশ্য আমাদের লেখা ক্যাটালগ দেখে অবজ্ঞায় ভুরু কুঁচকোলেন। ওসব নাকি অনেক বৈজ্ঞানিক রীতিতে করতে হয়! ফলে আমাদের বেগারের চাকরিটি গেল। ও-বাড়িতে প্রতি সন্ধেবেলা যাওয়ার আর কোন ছুতো রইল না আমাদের।

যাই হোক, ইতিমধ্যে দেবরাজ আর আমি মোটামুটি বেশ দামি দেড়শো খানা বই সরিয়ে ফেলতে পেরেছি। শেষ দিনে বেশ ঝুঁকি নিয়ে আমরা আরো তেরোখানা বই সঙ্গে নিয়ে এলাম।

বাইরে এসে দেবরাজ বলল, তুই একটা অপদার্থ।

আমি ভুরু তুললাম।

দেবরাজ বলল, তোকে বলেছিলাম এ-বাড়ির কোন একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে নিতে। তাহলে সেই মেয়েটিকে দিয়ে বলানো যেত যে, বইগুলো কোন লাইব্রেরিতে দেবার দরকার নেই, বাড়িতেই থাক।

—তুই-ই তো প্রথম লাইব্রেরির কথা বলেছিলি।

—ওরকম একটা প্রথমে আওয়াজ তুলে দিতে হয়। নইলে সে-বাড়ির লোক আমাদের বিশ্বাস করবে কেন? তারপর বাড়ির মধ্যেই এমন-এমন জনমত গড়ে তুলতে হয়, যাতে বইগুলো লাইব্রেরিতে না যায়। একটু সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিলেই কাজ হয়। তোকে যে বলেছিলাম, সেজো মেয়েটার সঙ্গে লড়ে যেতে, যে-মেয়েটা তোর দিকে আধো-আধো চোখে তাকিয়েছিল, তোর লেখার প্রশংসা করেছিল—তুই সেই মেয়েটার সঙ্গে কিছু পারলি না? একশো টাকা বাজি ফেলেছিলি মনে আছে? টাকাটা দিয়ে দিস।

আমি দুর্বলভাবে বললাম, এখনো এক মাস হয়নি।

দেবরাজ ধমক দিয়ে বলল, তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না!

আমি একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। বিশাখার সঙ্গে বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল আমার। সন্ধেবেলা স্নান করে সারা গায়ে পশ্চিমী সভ্যতার সুগন্ধ মেখে ও এক-একদিন এসেছে লাইব্রেরিতে আমার সঙ্গে গল্প করতে। আমাকে বেশ কয়েকবার বলেছে, আমি আপনাকে একটা ঘটনা বললে সেটা আপনি লিখতে পারবেন? সাধারণত এই রকম অনুরোধ কেউ করলে আমি উত্তর দিই, আমি তো ভাই অন্যের মুখে শোনা গল্প লিখতে পারি না। আমি লিখি নিজের জীবনের গল্প।

কিন্তু বিশাখাকে সে কথা বলিনি। আমি বিশাখার ঘটনাটা শুনতে চেয়েছিলাম। কারণ, হয়তো, বিশাখার সঙ্গে আমার নিজের জীবন খানিকটা জড়িয়ে যাবে। এরকম একটা আশা পোষণ করছিলাম গোপনে।

আমি বলেছিলাম, নিশ্চয়ই! একদিন বেশ ভালো করে বসে শুনতে হবে।

ঘটনাটা এখনো শোনা হয়নি। মনে মনে ঠিক করেছিলাম, কোন একদিন গঙ্গার ধারে সন্ধেবেলা অল্প জ্যোৎস্না মেশানো অন্ধকারে বিশাখার কোলে মাথা রেখে আমি তার জীবনের গল্প শুনব।

এসবই আমার অতিরিক্ত কল্পনা। হঠাৎ যে-কোন মুহূর্তে ঘোর ভেঙে যায়।

সেই ঘোর ভেঙেছে মাত্র কয়েকদিন আগে। সন্ধের দিকে কোন কাজ ছিল না, ভেবেছিলাম একবার রণদেবের বাড়িতে গিয়ে একটু আড্ডা দিয়ে আসব। আমি হেঁটেই যাচ্ছিলাম, রণদেবের বাড়ির কাছাকাছি যখন পৌঁচেছি, সেই সময়

আমার সামনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল। চমকে তাকিয়ে দেখলাম, ট্যাক্সিতে বসে আছে, বিশাখা আর একটি সুদর্শন যুবক। ওরা কোন অসমীচীন ভঙ্গিতে ছিল না, সামান্য দূরত্ব রেখে দু'জনে পাশাপাশি। দু'জনের দিকে তাকিয়ে। দু'এক পলকের জন্য দেখেও বুঝেছিলাম, সেই দৃষ্টিতে সম্মোহন আছে। পরস্পর যেন চুম্বকের টানে বাঁধা।

ট্যাক্সিটা থামল রণদেবের বাড়ির সামনে। বিশাখা নামল, কিন্তু যুবকটি রয়ে গেল! বিশাখা নেমে যেতেও যুবকটি ঝুঁকে পড়ে তার একটি হাত চেপে ধরল। বিশাখাকে সে যেতে দিতে চায় না। বিশাখা নরমভাবে ছাড়িয়ে নিল নিজের হাত। হেসে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চলে গেল। রণদেবের বাড়ির সিঁড়িতে পা দেবার আগে সে পেছন ফিরে তাকাল তিনবার। ট্যাক্সিটা তখনো থেমে। রাস্তার ওপার থেকে দেখে আমার বুক মুচড়ে উঠেছিল। এর প্রতিটি টুকরো টুকরো দৃশ্যের মর্ম আমি জানি। সাধারণ কোন বন্ধুর দিকে কোন মেয়ে এমনভাবে তাকায় না।

কিন্তু এজন্য আমার দুঃখ পাবার কারণ কী? আমি তো বিশাখার কেউ নয়। আমি তো সামান্য একজন লেখক। একজন লেখকের কাছে কোন কোন মেয়ে মনের কথা বলে, কিন্তু মন দেয় না। দেবেই বা কেন? লেখক তো একজন অশরীরী পুরুষ, যাকে দেখতে পাওয়া যায় শুধু ছাপা অক্ষরের মধ্যে।

বিশাখার কোলে মাথা রেখে শোওয়া আমার আর হবে না। তার ওষ্ঠ চুম্বনের আকাঙ্ক্ষা আমায় তৃষ্ণার্ত রেখে দেবে বহুকাল, কিন্তু ঐ ওষ্ঠের জন্য আমি আর কখনো লোভ করব না। আমি সুন্দর দৃশ্য ভালোবাসি। ট্যাক্সি থেকে ঐ ছেলেটির ঝুঁকে হাত বাড়াবার দৃশ্য এবং বিশাখার কোমলভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া, এই দৃশ্যটির মধ্যে যে মাধুর্য আছে, তা একটি বাঁধানো ছবির মতো দুলতে থাকে আমার চোখের সামনে। আমি এই দৃশ্যটি জমিয়ে রেখে দেব। বিশাখার বন্ধুটিকেও আমি পছন্দ করে ফেললাম।

ট্যাক্সিটা চলে যাবার পর আমি রাস্তা পেরিয়ে এলাম। রণদেবের বাড়ির সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠছি, দেখলাম বিশাখা নেমে আসছে তরতর করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হলো?

বিশাখা আমাকে দেখে একটু চমকে উঠল কিন্তু অন্যদিন আমার দিকে যে বিশেষ মনোযোগ দেয়, সেদিন তা দিতে পারল না। তার শরীরে দারুণ ব্যস্ততা।

—চলে যাচ্ছ যে?

—ওরা নেই।

—কেউ নেই?

—না, দাদা অফিসের কাজে বাইরে গেছে, বৌদিও তাই ক'দিনের জন্য গেছে

বাপের বাড়ি। পাশের ফ্ল্যাটের লোকদের কাছে শুনলাম।

আমি বোধহয় বিশাখার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বিশাখা চঞ্চলভাবে বলল, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে—আমি এক জায়গায় একটা জিনিস ফেলে এসেছি।

বিশাখা নিশ্চয়ই ভাবছে, এখনো তাড়াতাড়ি গেলে সে তার বন্ধুকে ধরতে পারবে। কিন্তু আমি তো ট্যাক্সিটা চলে যেতে দেখেছি।

বললাম, তুমি কোথায় যাবে, বিশাখা? আমি তোমায় পৌঁছে দেব?

বিশাখা তাড়াতাড়ি বলল, না, না, তার দরকার নেই।

আমি দেয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়ালাম, বিশাখা ছটফটিয়ে নেমে গেল। একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়ে একবার মুহূর্তের জন্য ফিরে ও বলল, আর একদিন!

কেন বিশাখা বলল, আর একদিন? কী আর একদিন? আমি নিচে নেমে আর বিশাখাকে দেখতে পেলাম না। ওর বন্ধু কি ট্যাক্সি নিয়ে সত্যিই দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে? কিংবা বিশাখাই আর একটি ট্যাক্সি নিয়ে অনুসরণ করেছে এরই মধ্যে? বিশাখা যেন একটা রঙীন পাখি, ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেছে কোথায়!

বিশাখাদের বাড়িতে কিন্তু এরপরেও একদিন যাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। তিনদিনের মধ্যেই। অলকা দেবী লোক পাঠিয়ে নেমন্তন্ন করেছিলেন আমাকে আর দেবরাজকে। ওঁদের বিবাহের তিরিশ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে উৎসব। খাওয়া-দাওয়া তো আছেই, সেই সঙ্গে গানের আসর।

দেবরাজ জিজ্ঞেস করল, কী উপহার দিবি?

আমি মুচকি হেসে বললাম, বই! বই দিলে কেমন হয়?

দেবরাজ বলল, আবার কেউ বই দিলে শিবশঙ্কর লাহিড়ী মারতে তাড়া করে আসবেন।

—ইস, মধুবনীর ছবি দুটো তুই আগেই কেন দিয়ে দিলি? এখন দিলে কাজ হয়ে যেত।

—তা হলে গিয়ে কাজ নেই। বিবাহ বার্ষিকীর ফাংশনটাই আমার অতি বাজে লাগে। লোককে ঘটা করে দেখানো, দেখো দেখো, বিয়ের তিরিশ বছর পরেও আমরা কত সুখে আছি!

আমি তবু জোর করে বললাম, না, তবু চল, ঘুরে আসি। গিয়েই ভিড়ের মধ্যে মিশে যাব, কেউ বুঝতে পারবে না উপহার এনেছি কিনা।

দেবরাজ সরু চোখে তাকাল আমার দিকে। আমি আবার অনুনয় করে বললাম, চল, চল, আর বোধহয় ও-বাড়িতে কোনদিন যাওয়া হবে না, একবার অন্তত ঘুরে আসি। তা ছাড়া, নিশ্চয়ই খুব ভালো খাওয়াবে।

যতই দূর সম্পর্কের হোক, তবু জ্যাঠামশাই বলে ডাকি এমন একজন মানুষ

একটি সিনেমা হলের সামনে বসে অনশন করছেন, আর সেই সিনেমা হলের মালিকের বাড়ির উৎসবে আমি যেতে চাইছি ভালো ভালো খাদ্যের লোভে, এটা একটা নিষ্ঠুর বা বীভৎস ব্যাপার মনে হতে পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে হয়েছিল ঠিকই, শুধু বিশাখাকে আর একবার দেখার জন্য। খাবারের কথাটা তুলেছিলাম দেবরাজকে আকৃষ্ট করতে।

শেষ পর্যন্ত আমরা কিনে নিয়ে গেলাম পাচ টাকার ফুল। কিন্তু ওদের বাড়িতে উপস্থিত হয়েই বুঝলাম, আমাদের পাঁচটা টাকাই গচ্চা গেছে। এইসব উৎসব-বাড়িতে ফুলের বড় অপমান হয়। বহুলোক গাদা গাদা ফুল নিয়ে গেছে, অত ফুল সাজাবারও সময় নেই কারুর, ঘরের কোণে ফুলগুলো ডাই করা আছে। সেই ফুলের স্তূপে মিশে গেল আমাদেরটাও। না নিয়ে গেলেও কোন ক্ষতি ছিল না।

এই সামান্য উপলক্ষে এক এলাহী কারবার। ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে, নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা তিন-চার শো। এই একদিনেই নিশ্চয়ই অন্তত চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ। কিংবা আরও বেশি! এত ভিড়ের মধ্যে আমরা পাত্তাই পেলাম না। বিশাখার সঙ্গে দেখা হলো মাত্র এক ঝলক। বিশাখার প্রচুর বন্ধু-বান্ধবী এসেছে, তার সেই ট্যাক্সির বন্ধুটিকেও দেখলাম। সিঁড়ি দিয়ে সিল্কের কাপড় শপশপিয়ে নামছিল বিশাখা, আমাদের দু'জনকে দেখে জিজ্ঞেস করল, খেয়েছেন তো? আমরা ঘাড় হেলালাম। বিশাখা নেমে গেল। বরং বিশাখার মা অলকা দেবীর সঙ্গে দেবরাজ গল্প করল পনেরো মিনিট। কী নরম, মিষ্টি করে হাসেন মহিলা, মনেই হয় না পাঁচটি সন্তানের জননী, মনে হয় প্রেমিকার মতন।

বিশাখার চার বোনই আজ এক সঙ্গে উপস্থিত। প্রত্যেকে নতুন শাড়ি পরেছে। বাবা-মায়ের বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে তারা উপহার পেয়েছে নতুন শাড়ি। শুধু অনুপস্থিত বাড়ির বড় ছেলে। কেউ উচ্চারণও করছে না তার কথা। রণদেব কি এই কারণেই এই সময় কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে?

কেটে পড়বার তালে ছিলাম, সুজিত ধরে ফেলে বলল, গান শুনবি না? এক বড় ওস্তাদ গাইবেন, উনি এসে গেছেন। চল—

গানের ব্যবস্থা হয়েছে ছাদে। তখন তবলা ঠোকাঠুকি চলছে। কয়েকজন সমবয়সী লোকের সঙ্গে শিবশঙ্কর লাহিড়ী বসে আছেন সেখানে। আমাদের দিকে তাকিয়ে শুধু চেনার ভঙ্গি করলেন তিনি। আমরা এককোণে বসে পড়লাম।

গান শুরু হবার পর খানিক বাদে, আমি শুধু চেয়ে রইলাম শিবশঙ্কর লাহিড়ীর দিকে। তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে চোখ বুজে মাথা দোলাচ্ছেন। মানুষটি প্রকৃত সঙ্গীতরসিক যে, তা বোঝা যায়। এই লোকটির জন্য আজ বারো-তেরোটি পরিবার ধ্বংসের মুখে, কিন্তু সেদিকে এঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। ইনি পাঁচ-সাত হাজার টাকা খরচ

করে এক সন্ধেবেলা লোকদের ডেকে খাওয়াতে পারেন। শুনেছি, বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ইনি উদার হাতে চাঁদা দেন, গানবাজনা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ! এঁর মেয়েরা সরল, সুন্দর। এঁর স্ত্রী মমতা ও লাবণ্যের প্রতিমূর্তি। যে-কোন লোক দেখে বলবে, এটি একটি চমৎকার পরিবার। অথচ এই পরিবারটিই আরো দশ-বারোটি পরিবারের সর্বনাশের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। শহরের তিনশো চারশো জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে অভিনন্দন জানিয়েছেন শিবশঙ্কর লাহিড়ীকে। কিন্তু ইনি অঙ্গুলি হেলন করেননি বলে ছন্দা নামে একটি মেয়ে হয় আত্মহত্যা করবে, নয় বেশ্যা হয়ে যাবে।

ওস্তাদ তাঁর ঐশ্বরিক কণ্ঠে গান গেয়ে চলেছেন। কিন্তু আমার আর গান শুনতে ভালো লাগল না। সত্যিই, যত মহৎ শিল্পীই হোক, তা সব সময় মানুষের সব সমস্যা ভুলিয়ে দিতে পারে না। যে-কোন কারণেই হোক, ছন্দার বিষণ্ণ মুখটা আমার বারবার মনে পড়ছিল। আমি দেখতে এসেছি বিশাখাকে, কিন্তু মনে পড়ছে ছন্দার কথা।

ঠিক সেই মুহূর্তে, সেই জায়গা থেকে অনেক দূরে একটি ঘটনা ঘটল। ঘটনাটি অতিনাটকীয় বা একে প্রকৃতির পরিহাসও বলা যেতে পারে। ঘটনাটির কথা জানতে পেরেছিলাম কয়েকদিন পরে, কিন্তু সেটি এখানে বর্ণনা করাই মানানসই হবে।

অফিসের কাজে রণদেব গিয়েছিল হলদিয়া। সেখান থেকে কুঁকড়াহাটি এসে সে নদী পার হয়। শেষ ফেরিতে আসায় তার বেশ রাত হয়েছিল। তখনো সে ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরতে পারত, কিন্তু ফেরার খুব ইচ্ছে ছিল না। কারণ, সে জানে, সেদিনই তার বাবা-মা নির্লজ্জভাবে বিবাহ বার্ষিকীর উৎসবে দু-পাঁচশো লোককে খাওয়াচ্ছে। কথাটা ভাবলেই তার রাগ হয়। সে ঠিক করল, সাগরিকায় থেকে যাবে এক রাত। এই সামান্য সিদ্ধান্তের জন্য তার জীবনটা বদলে গেল পুরোপুরি। সাগরিকার রিসেপশান কাউন্টারে দেখা হয়ে গেল তার কোম্পানির এক স্থানীয় ডিলারের সঙ্গে। সেই লোকটি বেশ জাঁহাবাজ ধরনের, নিজের গাড়ি আছে। সে বলল, মিঃ লাহিড়ী, আপনি এখানে থাকবেন কেন? আমার সঙ্গে চলুন না, আমরা মাছ ধরতে যাচ্ছি। একেবারে সুন্দরবনের ভেতরের দিকে চলে যাব। লঞ্চ ঠিক করা আছে। এখন গিয়ে লঞ্চে থাকব রাতটুকু, তারপর বেরিয়ে পড়ব ভোরবেলা।

রণদেবের পছন্দ হয়ে গেল প্ল্যানটা। মন্দ নয়, বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে! সাগরিকা থেকে খাবার-দাবারের কিছু প্যাকেট নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল একটু বাদেই।

গাড়িতে রণদেব ছাড়া আর রয়েছে ডিলার ঘোষ আর তার এক বন্ধু সামন্ত।

গাড়ি কাকদ্বীপের কাছাকাছি এসেছে, কুচকুচে অন্ধকার রাস্তায় হঠাৎ হেডলাইটের আলোয় চোখে পড়ল, খুব সামনে দিয়ে সাঁৎ করে ছুটে গেল একটি ছায়ামূর্তি। মানুষ না প্রেত? মুখখানা বালকের মতন, কিন্তু মুখখানায় বালকত্ব একটুও নেই, বহুকালের একটা শুকনো মুখ। তারপরই একটা আর্তনাদ।

ঘোষ প্রাণপণে ব্রেক চেপে ধরেছে, বিপজ্জনকভাবে টাল খেয়ে গাড়িটা থেমে গেল। রণদেব ফ্যাকাসে মুখে বলল, লোকটা চাপা পড়েছে? ঘোষ ঝট করে নেমে গেল গাড়ি থেকে। রণদেবও এল তার পিছু পিছু। অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায় রাস্তার পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে মানুষের মতন একটা কিছু। ঘোষ বিড়বিড় করে বলল, কিন্তু আমার গাড়ির সঙ্গে তো কিছু লাগে নি, তা হলে টের পেতাম। এই সামন্ত, টর্চটা নিয়ে আয় তো?

সামন্ত টর্চ নিয়ে দৌড়ে এল। রাস্তায় শুয়ে আছে একজন পুঁয়ে-পাওয়া লোক, সমস্ত শরীরটা শুকনো, বালকের আকৃতিতে এক বয়স্ক, কিন্তু কোন আঘাতের চিহ্ন বা রক্ত নেই। রণদেব নিচু হয়ে লোকটিকে ধরে তুলতে গেল, তারপর আর সময় পেল না।

রাস্তার পাশের অন্ধকার থেকে নিঃশব্দে উঠে এসেছে তিনজন লোক, তাদের হাতে লোহার ডাণ্ডা। এক সঙ্গে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল, এরা প্রতিরোধ করার বিন্দুমাত্র সুযোগও পেল না।

আক্রমণকারীদের মধ্যে একজনের পা খোড়া, তার মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, সে হাতের ডাণ্ডাটা ঘুরিয়ে মারল রণদেবের মুখে। দু'হাতে মুখ চেপে ধরার আগের মুহূর্তে রণদেব দেখল তার আততায়ীর হিংস্র মুখখানা। কেউ কারুকে চিনতে পারল না।

রক্তে ভাসানো শরীরে তিনজন রাস্তার ওপর চিৎপাত হবার পর ডাকাতেরা চটপট ওদের পকেট খালি করতে লাগল। তারপর তছনছ করতে লাগল গাড়ির জিনিসপত্র। খোঁড়া ডাকাতটি পেয়ে গেল খাবারের প্যাকেটগুলো। একটু পরে, মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়ে পালাতে পালাতে তার আর তর সইলো না, সেই ছুটন্ত অবস্থাতেই সে গপ্‌গপ করে গিলতে লাগল প্যাকেট-খোলা খাদ্য।

রণদেব মরেনি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটা জিপ এসে পড়ায় ওরা বেঁচে গেল। কিন্তু রণদেবের একটা চোখকে কিছুতেই রক্ষা করা গেল না এবং দুটি পাঁজরা ভেঙে যাওয়ায় সে আর সারাজীবনে কখনো স্বাভাবিকভাবে সিঁড়ি ভেঙে দোতলা-তিনতলায় উঠতে পারেনি।

হারাণ ধরা পড়ে এর ন'দিন বাদে। পুলিশের হাতে মার খেয়ে তার হাড়-পাঁজরাও কিছু আস্ত থাকেনি। এবং তার আট বছর কারাদণ্ড হয়েছিল।

৮

রোহিণী সিনেমা হলের ধর্মঘট মিটে গেছে। শিবশঙ্কর লাহিড়ী নত হননি, ধর্মঘটীদের মধ্যেই দু' তিনজন লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পা জড়িয়ে ধরে। এতে অবশ্য তাদের হীন মনে করার কারণ নেই। ধর্মঘটীদের অনেকের বাড়িতেই তিন-চার বছরের শিশু আছে। শিশুর কষ্ট সহ্য করা এমনকি মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। ওটা অ্যানিম্যাল ইনসটিংক্ট। রোহিণীর কর্মীদের সমর্থনে একদিন সারা কলকাতার সমস্ত সিনেমা হলে ধর্মঘট হয়ে গিয়েছিল। তাতেও শিবশঙ্কর লাহিড়ী জব্দ না হওয়ায় এরা ভেঙে পড়েছিল একেবারে।

কর্মীরা এসে একবার ক্ষমা চাইবার পর শিবশঙ্কর লাহিড়ী আবার উদার হয়ে উঠেছেন। তিনি একজনকেও ছাঁটাই করেননি, সকলকেই মাইনে দিয়ে দিয়েছেন তিন মাসের! তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আগামী বছর পে-স্কেল রিভাইজ করবেন।

যথারীতি একটি ফাটাফাটি হিন্দী ছবি মুক্তি গেল সেখানে। উদ্বোধনের দিন প্রচুর ফুল দিয়ে সাজানো হলো গেট, অনেকদিন পর রোহিণী হলে ঝলমল করল আলো। বোম্বাই-এর এক নায়িকার দৈত্যকন্যার মতো বিরাট ছবি জুড়ে রইল সামনের দেয়াল। মালিকের পয়সায় সন্দেশ ও সরবৎ খেল কর্মচারীরা। শুধু একজন সেখানে অনুপস্থিত। আমার রমেশ জ্যাঠা।

রমেশ জ্যাঠা চিরকাল হেরে যাওয়ার দলে। যখন সবাই জেতে, তখনও তিনি হারেন। প্রায় আট মাস ধরে ধর্মঘট চালিয়ে এসে, যখন বিনাশর্তে মিটে গেল, সবাই জানল, কর্মীদেরই জয় হয়েছে, সেই সময় রমেশ জ্যাঠা চাকরিটি হারালেন।

মালিকের কাছ থেকে তিন মাসের মাইনে একসঙ্গে পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে রমেশ জ্যাঠা মস্ত বড় এক ভাঁড় কষা মাংস কিনলেন পাঞ্জাবীর দোকান থেকে। বেলেঘাটা বাজারের সামনে থেকে কিনলেন পাচ টাকার ল্যাংড়া আম। তারপর খানিকটা চলে এসে, আবার ফিরে গিয়ে বাজারের মধ্যে ঢুকে কিনে ফেললেন একটা আস্ত ইলিশ। দু'হাতে সেগুলো নিয়ে সগর্বে হাঁটতে লাগলেন রাস্তা দিয়ে।

বাড়ি ফিরেই চাল-ডাল, তেল-নুন আনানো হলো ছোট মেয়েকে দিয়ে। বিভিন্ন পদ রান্নার দেরি সইবে না বলে খিচুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হলো। ইতিমধ্যে রমেশ জ্যাঠামশাই একাই দুটি ল্যাংড়া শেষ করে ফেললেন। সেদিন সন্ধে-রাত্রে ঐ বাড়িতে রীতিমতন একটা ভোজ হলো। নিচতলায় যে ভাড়াটে ভদ্রলোকটির পিঠে সরষের তেল মাখার বাতিক আছে, সে একবার ওপরে উঠে এসেছিল

জ্যাঠামশাইকে শুভেচ্ছা জানাতে। সরমা জ্যাঠাইমা তাকেও দিলেন এক বাটি খিচুড়ি।

সেইদিন শেষরাত্রে রমেশ জ্যাঠামশাইয়ের সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস হলো। সত্তর বছর বয়সেও যে-মানুষ রাস্তার ওপর বসে দাপটে অনশন চালিয়ে গেছেন, তিনি সহ্য করতে পারলেন না পেট ভরে খাওয়ার সুখ। বিছানার ওপরে হঠাৎ দাপিয়ে উঠে ফাটা গলায় চিৎকার করলেন, ওঃ! ওরে, মা, গেলাম, গেলাম, মা, তুমি কোথায়?, মা—।

রমেশ জ্যাঠার মা মারা গেছেন প্রায় তাঁর ছেলের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই। তবু এতকাল পরে রমেশ জ্যাঠা কেন মাকে ডাকতে লাগলেন, কে জানে!

সেটাই রমেশ জ্যাঠার শেষ কথা।

না, তিনি মারা গেলেন না। মরে গেলে তো ব্যাপারটা অনেক সরল হয়ে যায়। তা ছাড়া, তিনি যদি অনশন চলাকালীন মরতে পারতেন, তাহলে সেটাই হতো তাঁর পক্ষে সবচেয়ে সুযোগ্য মৃত্যু। একটা হৈ-চৈ পড়ে যেত নিশ্চয়ই, রমেশ জ্যাঠা পেতেন বীরের সম্মান, এমনকি খবরের কাগজে ছবি বেরিয়ে যেতেও পারত। তাঁর মূর্তি তৈরি না হলেও তাঁর একটা বাঁধানো ছবি অন্তত ঝুলত রোহিণী হলে। বলা যায় না, সহানুভূতির বন্যায় কিছু টাকা-পয়সাও ভেসে আসতে পারত তাঁর পরিবারের দিকে। কিন্তু রমেশ জ্যাঠা চিরকালের হতভাগা। এ গৌরবও তিনি পেলেন না। একজন সত্তর বছরের বুড়ো লোকের যদি বাড়িতে শুয়ে-শুয়ে করোনারি থ্রম্বোসিস হয়, তার মধ্যে আর বিশেষত্ব কী আছে?

তিনি মরলেন না। সেই রাত্রে তাঁর মেয়েরা বেশ কয়েক ঘটি জল ঢেলে মাথা ধুইয়ে দিল, স্ত্রী হাত বুলিয়ে দিল বুকে। তাঁর নিশ্বাস পড়ছে অথচ তিনি আর কথা বলছেন না দেখে সবাই ভাবল, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরদিন সকালে ডেকে আনা হলো পাড়ার একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে। তিনি গম্ভীরভাবে পাঁচ পুরিয়া ওষুধ দিয়ে যাবার সময় বললেন, একে হাসপাতালে পাঠালে ভালো হয়। বিকেলে ডাকা হলো একজন অ্যালোপ্যাথকে, কারণ সারাদিনের মধ্যে জ্যাঠামশাই চোখ চেয়ে থেকেও আর একটিও কথা বলেননি। অ্যালোপ্যাথটি রোগীর সামনেই বেশ জোরে জোরে বললেন, এঁর সারা শরীরে প্যারালিসিস হয়ে গেছে, ইনি আর কথা বলতেও পারবেন না, কিছু শুনতেও পাবেন না। ইচ্ছে করলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেন, তবে আমার মনে হয়, যে-ক'টা দিন আছেন বাড়িতেই শান্তিতে থাকতে দিন।

রমেশ জ্যাঠার বাড়িতে আমার আর যাবার প্রয়োজন ছিল না কোনদিন। তাঁর এই অবস্থার কথা আমি হয়তো জানতেও পারতাম না। কাগজে দেখেছি, রোহিণী

হলের ধর্মঘট মিটে গেছে, ব্যস নিশ্চিন্ত, সব শান্তি। মায়ের দেওয়া সেই পুরনো শাড়ি আর টাকা এর আগেই আমাদের বাড়ির চাকরের হাত দিয়ে, মায়ের বয়ানে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তবু আমাকে যেতে হয়েছিল আরো দু'বার।

আমাকে বিপদে ফেললেন, ছোট মাসীর বান্ধবী সেই কর্নেল-পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা চৌধুরী। তিনি হঠাৎ আমাকে একটি চিঠি পাঠালেন। তিনি যে ক'টি মেয়েকে সিলেক্ট করেছিলেন, তাদের মধ্যে একটি মেয়ে হঠাৎ বিয়ে করে পাঞ্জাব চলে গেছে বলে সে কাজ নেবে না, সেই জায়গায় আমার চেনা মেয়েটিকে তিনি নিতে পারেন। আরো অনেক প্রার্থিনী রয়েছে, কিন্তু আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলাম বলেই তিনি এই সুযোগ দিচ্ছেন। আমি যেন অবিলম্বে মেয়েটিকে নিয়ে তাঁদের মহিলা আশ্রমে দেখা করি।

চিঠিটা পেয়ে আমি বিরক্তই বোধ করলাম প্রথমে। ও-ব্যাপারে আমার আগ্রহ কমে গেছে। অন্য লোকদের ব্যাপার নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামানো আমার স্বভাব নয়। তা ছাড়া তখন অবস্থাটা ছিল অন্যরকম।

তবু ভাবলাম, রমেশ জ্যাঠা চাকরি ফিরে পেলেও পরিবারটা অনাহার থেকে বাঁচবে কিন্তু দারিদ্র্য তো ঘুচবে না। ছন্দা মেয়েটি যদি আলাদা স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে!

খানিকটা অনিচ্ছা নিয়েই যেতে হলো এক সন্ধেবেলা। সেদিনও দেখলাম, রমেশ জ্যাঠার ছোট মেয়ে নিচতলার ভাড়াটের ঘরে বসে আছে। আমাকে দেখে সে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বহু লোকের গলার আওয়াজ পেলাম। কয়েকটা বাচ্চা হুটোপুটি করছে। রমেশ জ্যাঠার কণ্ঠস্বর না পেয়ে ভেবেছিলাম, তিনি নিশ্চয়ই সিনেমা হলে ডিউটি দিতে গেছেন। ওপরে এসে আমি প্রকৃত দৃশ্যটি দেখলাম।

ভেতরের ঘরের খাটে বিসদৃশভাবে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে সেই বৃদ্ধের কঙ্কাল। চোখ দুটি ড্যাবডেবে। আমাকে দেখে মনে হলো চিনতে পেরেছেন, একটি হাত তোলবার চেষ্টা করলেন, একটু উঠেই ধপ করে পড়ে গেল।

আজ রমেশ জ্যাঠার সব মেয়ে উপস্থিত। বড় মেয়ে কেতকীকে দেখলাম, রোগা জিরজিরে, ঠিক মনে হয় সূতিকার রুগী, তার তিনটি ছেলেমেয়ে ঐটুকু জায়গার মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করছে। এই কেতকীর সঙ্গে আমি ছেলেবেলায় খেলা করেছিলাম। দারুণ গাট্টা-গোট্টা স্বাস্থ্য ছিল, মনে আছে। চোর-চোর খেলার সময় ছাদে আমি ওকে চেপে জড়িয়ে ধরেছিলাম, আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে পালিয়েছিল। এখন ওর বয়েস কত হবে, পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি নয়, কিন্তু ওর দিকে

তাকাতেই ইচ্ছে করে না। এর কারণ কী, শুধু দারিদ্র্য? বাঙালি মেয়েরা অনেকেই জানে না, কী করে স্বাস্থ্য রাখতে হয়।

কেতকী চি চি করা গলায় বলল, নীলুদা ভালো আছ?

আমি সংক্ষেপে দু' কথায় আলাপ সেরে ফেললাম। কেতকীর স্বামী রাইটার্স বিল্ডিংসে রেকর্ড সাপ্লায়ারের কাজ করে, অর্থাৎ কেরানীর চেয়েও ছোট চাকরি। এর মধ্যেই তিনটি সন্তান, আরো হবে নিশ্চয়ই।

কেতকীর পরের বোন দীপ্তির চেহারায় খানিকটা চাকচিক্য আছে, ব্যবহারও বেশ সপ্রতিভ। রমেশ জ্যাঠা বলেছিলেন, ও যেন কোথায় কাজ করতে যায়। ছন্দা বলেছিল, বেশ্যা! তার দিকে আমি ভালো করে তাকাতে পারলাম না। সেও বিশেষ আমল দিল না আমাকে।

এমনকি ছন্দাও আমাকে বিশেষ কোন অভ্যর্থনা জানাল না। এ-বাড়ির চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেছে। বদলে গেছে ছন্দাও। সে একটা নতুন লাল রঙের শাড়ি আর নতুন ব্লাউজ পরে আছে। একবার সে আমার চোখের দিকে তাকাল। জ্বলন্ত দৃষ্টি। বুঝলাম, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমি কথা রাখতে পারিনি ; ছন্দাও মরতে পারেনি, বোধহয় বেছে নিয়েছে অন্য পথ।

পরক্ষণেই আমি ভাবলাম, যদি ছন্দা একজন দু'জনের কাছে তার শরীর বিক্রি করে থাকে, তাতেই বা ক্ষতি কী? এখনো তো সে ইচ্ছে করলে অন্যরকম জীবন পেতে পারে। অন্য লোকের সঙ্গে দু-একবার শুলে কী আসে-যায়! যত সব মধ্যবিত্ত সংস্কার!

আমি ছন্দাকে ডেকে প্রতিভা চৌধুরীর চিঠিটা দিয়ে বললাম, তুমি এখানে গিয়ে দেখা করতে পার। একটা কাজ হয়ে যাবে, মাইনে অবশ্য খুব বেশি নয়!

ছন্দা ঈষৎ ব্যঙ্গের সঙ্গে বলল, এজন্য আপনাকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে বুঝি?

আমি ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললাম, না না! ভেবে দেখ, যদি তোমার ইচ্ছে হয়—

ছন্দা চিঠিটা খুলেও দেখল না। অবহেলার সঙ্গে রাখল খাটের ওপর।

আমি বললাম, ওখানে থাকবারও ব্যবস্থা আছে। অবশ্য তুমি বাড়ি থেকেও যাতায়াত করতে পার।

ছন্দা ভালো করে শুনলই না আমার কথা। উঠে চলে গেল ঘরের বাইরে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

ঘরের মধ্যে আরো দু'জন অপরিচিত যুবক বসে চা খাচ্ছে। তারা আড়চোখে দেখছে আমাকে। এ-বাড়িতে দু'টি যুবতী মেয়ে আছে, ছোট মেয়েটিও শিগগিরই

তৈরি হয়ে যাবে, সুতরাং এরকম শুভার্থীর আনাগোনা এখন হতেই থাকবে। রমেশ জ্যাঠামশাইয়ের যখন উপার্জন ছিল না, তখনও বাড়িতে ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ, কেউ তাঁর মুখের ওপর কথা বলতে পারত না। এখন তাঁর সামনেই তাঁর মেয়েরা পাড়ার দাদাদের চা খাওয়াচ্ছে। জ্যাঠামশাইয়ের চোখের তারা দুটি এদিক-ওদিক করছে মাঝে মাঝে, তিনি একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারছেন না। মানুষের এত অসহায় মুখ আমি দেখিনি কখনো।

জ্যাঠামশাইয়ের বালিশের পাশে ছড়ানো কয়েকটা ছবির অ্যালবাম। এক সময় ওঁর ফটোগ্রাফির শখ ছিল, নিজে ক্যামেরার দোকান করেছিলেন, আমার মনে পড়ল। অ্যালবামের কয়েকটি পাতা উল্টে-উল্টে দেখলাম। সত্যি, বেশ ভালো ছবি তুলতেন উনি। অধিকাংশই জলের ছবি। গঙ্গা, অন্যান্য নদী, সমুদ্র। শুধু এই রকম ছবি তুলেই আজকাল কত লোক বিখ্যাত হয়। জ্যাঠামশাই পারলেন না। পুরোনো সব ছবি দেখে যদি জ্যাঠামশাইয়ের মুখে হঠাৎ কথা ফোটে, সেইজন্য অ্যালবামগুলো এখানে রাখা হয়েছে।

একটি ছবিতে আমার চোখ আটকে গেল। কোন এক নদীর ধারে মাথায় আধো ঘোমটা দেওয়া এক রমণী, মুখে আভিজাত্যের ছাপ। তাঁর দু'পাশে দাঁড়ানো কয়েকটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটির মাথা ন্যাড়া। তিনটি ফুটফুটে কচি মুখের বালিকা। নদীর তরঙ্গে ঝকঝকে আলো। একটু চেষ্টা করেই চিনতে পারলাম। সরমা জ্যাঠাইমা, হারাণ আর তার তিন বোন। ছোট মেয়েটি বোধ হয় তখনো জন্মায়নি। আমি মুখ তুলে সেই তিনটি মেয়ের জীবন্ত মুখ দেখলাম। ঐ ছবির মেয়েরা কোথায় হারিয়ে গেছে!

আর জ্যাঠাইমা? দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন তিনি। মুখখানা ঠিক পাথরের মতন, এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। গান্ধারীর মতন উনিও বোধহয় অনুসরণ করছেন স্বামীকে।

এখানে আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করল না। উঠে গিয়ে জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করলাম, ওর বসে-থাকা অবস্থায় ছড়ানো পায়ে। মনে মনে বললাম, জ্যাঠাইমা, আপনি বরং আগেই মরে যান। আর কত নোংরা দৃশ্য দেখবেন? এই ঘরে আপনাকে একেবারেই মানায় না!

৯

বিশাখার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। মানিকতলার কাছে, বিকেলের দিকে। রাস্তায় তখন দারুণ ভিড়, তার মধ্যেও বিশাখাকে দেখে মনে হলো, সমস্ত রাস্তাটা নীল রঙের আলোয় ভরে গেছে। আমার কখনো কখনো এরকম মনে হয়।

আমি নিজেই হনহন করে এগিয়ে বিশাখার কাছে গিয়ে বললাম, কোথায় যাচ্ছ?

বিশাখা সামান্য চমকে উঠল। তারপর অনুযোগের সুরে বলল, দেখুন না, এখানে এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলাম, তারপর বাসে উঠতে পারছি না, ট্যাক্সি ধরতে পারছি না, এই সময় না এলেই হতো!

আমি বললাম, দাড়াও, আমি ট্যাক্সি ধরে দিচ্ছি।

দু-একটা ট্যাক্সির পেছনে ছোটাছুটি করেও কোন লাভ হলো না। বাসেও অসম্ভব ভিড়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দাদা কেমন আছে?

রণদেব গুরুতরভাবে আহত হলেও একটা সুসংবাদ আছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর রণদেবকে তার বাবা নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছেন। রণদেবের আর প্রাণের আশঙ্কা নেই। বিশাখার কাছেই জানলাম, আরো ভালো চিকিৎসার জন্য তাকে রাশিয়া পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বিশাখা বলল, চলুন, আমাদের বাড়ি যাবেন? দাদাকে দেখে আসবেন?

আমি বললাম, আর একদিন।

তারপর একটু হাসলাম।

বিশাখা জিজ্ঞেস করল, হাসলেন কেন?

—তোমার মনে আছে, রণদেবের ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়িতে তোমার সঙ্গে একদিন দেখা হলো, তুমি খুব ব্যস্ত ছিলে, একদম সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে গিয়ে তুমি বলেছিলে, আর একদিন!

—ও, সেদিন! সেদিন একজনের সঙ্গে দেখা করার খুব দরকার ছিল।

—তুমি বলেছিলে, তুমি একটা জিনিস হারিয়েছ।

—ঠিক হারায়নি, মানে জিনিসটা একজনের কাছে ছিল, সেটা নেবার জন্যই...

—সেই একজনকে আমি দেখেছি। খুব সুন্দর ছেলে।

ভেবেছিলাম, বিশাখা একটু লজ্জা পাবে। কিন্তু ও সম্পূর্ণ চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল। আগেকার দিনের উপন্যাসে

আয়ত চোখ মেলে তাকানোর কথা দেখেছি অনেকবার। কথাটার ঠিক মানে জানি না। এই কি সেই আয়ত চোখ?

—দেখেছেন ওকে? ওর নাম প্রদীপ্ত।

—তোমার খুব বন্ধু?

—হ্যাঁ। জানেন, ওরা ব্রাহ্ম!

বিশাখা এমনভাবে বলল, যেন এটা একটা দারুণ ঘটনা! আমিও ছদ্মকৌতুকে বললাম, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আপনি কোন ব্রাহ্মকে চেনেন?

—ঠিক মনে করতে পারছি না। আজকাল তো ব্রাহ্মদের আলাদা করে চেনা যায় না!

—খুব যায়। ওদের বাড়িতে গেলে বুঝতেন। দারুণ গোড়া, নিয়মিত প্রার্থনা হয়।

আর একটি ট্যাক্সিকে ধরবার জন্য আমি ছুটে গেলাম। ট্যাক্সিটি যাত্রীহীন ছিল, তবু কোন দুর্বোধ্য কারণে যেতে চায় না।

বিশাখা বলল, কতক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে হবে কী জানি! তার চেয়ে বরং হেঁটে গেলে...আপনি একটু হাটবেন আমার সঙ্গে? আপনার কাজ আছে?

বিশাখাই প্রস্তাবটা দিল বলে আমি খুশি হয়ে উঠলাম। হাজার কাজ থাকলেও তুচ্ছ করতে পারতাম আমি।

বললাম, তা হলে চলো, বাঁ দিক দিয়ে যাই, কাঁকুড়গাছি, ফুলবাগান হয়ে?

—ওদিক দিয়ে গেলে তো অনেকটা ঘোরা হয়ে যাবে.

—তা হোক না, ওদিকের রাস্তা ভালো। তা হলে শুধু হাঁটা হবে না, বেড়ানোও হবে। তোমার খুব তাড়া আছে কি?

—না, চলুন।

বিশাখার সঙ্গে একদিন আমার বেড়াবার শখ ছিল, এই তো মিটে গেল। চুম্বন কিংবা কোলে মাথা দিয়ে শোওয়া নাই-বা হলো।

এখন রাস্তায় চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা না হলেই বাঁচি! কারুর কারুর সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তারা আর কিছুতেই পিছু ছাড়ে না।

বিশাখা বলল, সেদিন আপনার সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হলো, আমি বিশেষ কোন কথা না বলে চলে যাচ্ছিলাম, তাই হঠাৎ মনে হলো, আপনি নিশ্চয়ই মনে কিছু করবেন। তাই বলেছিলাম, আর একদিন আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করব। আপনাকে আমার জীবনের কয়েকটা ঘটনা বলব বলেছিলাম না একদিন? সে তো বলাই হলো না!

বিশাখার বয়েস কুড়ি কিংবা একুশ। এর মধ্যেই ওর জীবনের কয়েকটা ঘটনা জমে গেছে? মেয়েদের জীবনে ঘটনা মানেই সম্ভবত প্রণয় সম্পর্কিত জটিলতার ঘটনা।

জিজ্ঞেস করলাম, প্রদীপ্তরা ব্রাহ্ম তো কী হয়েছে? সেজন্য তোমার এত চিন্তা কেন?

বিশাখা দ্বিধাহীন, জড়তাহীন পরিষ্কার গলায় বলল, আমি তো ওকে বিয়ে করব ঠিক করেছি, এখন নয় অবশ্য, আমার মেজদির বিয়ে হয়ে যাবার পর। কিন্তু প্রদীপ্তর বাবা এমন গোঁড়া যে, ব্রাহ্ম মতে ছাড়া অন্য কোন মতে বিয়েতে রাজি নয়। পুরুত-টুরুত ডেকে বিয়েতে দারুণ আপত্তি। এই নিয়ে নিশ্চয়ই আমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া লেগে যাবে। দাদার বেলায় যেমন হয়েছিল।

—এক কাজ করো না, তোমরা দু'জনেই বাড়ির কারুকে কিছু না বলে একদিন রেজিস্ট্রি বিয়ে করে ফেলো! তারপর বাড়ির লোক যখন জানতে পারবে, তখন একবার তোমাদের বাড়িতে পুরুত ডেকে হিন্দুমতে বিয়ে হবে, আর একবার ওদের বাড়িতে ব্রাহ্ম মতে।

—তা হলে বাবা ভীষণ দুঃখ পাবেন!

—কিছুদিন বাদেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বাবাকে আমি কিছুতেই দুঃখ দিতে পারব না। জানেন, এ পৃথিবীতে আমি বোধহয় বাবার চেয়ে আর কারুকেই বেশি ভালোবাসি না। বাবাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় রাগী, কিন্তু ভেতরটা এত নরম—আজ পর্যন্ত আমাদের কোন রকম ইচ্ছেতে কোন দিন বাধা দেননি!

আমি মনে মনে বললাম, শিবশঙ্কর লাহিড়ী, তুমি ধন্য! তুমি এমন চমৎকার মেয়ের ভালোবাসা পেয়েছ। তারপরই আবার একটা কথা মনে পড়ল।

—বিশাখা, তোমার বৌদি এখন কোথায়?

—কেন, আমাদের বাড়িতে! বাবা তো এখন সব সময় বৌমা বৌমা করছেন। নিজে গিয়ে বৌদির বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছেন বৌদিকে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা ফুলবাগান ছাড়িয়ে ডান দিকে বেঁকে অনেকটা এসে পড়েছি। এ রাস্তায় চেষ্টা করলে ট্যাক্সি পাওয়া যায়, কিন্তু বিশাখা আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে। ওর আর খেয়াল নেই।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা অন্য চিন্তা এল। এ সম্পর্কে আমার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। থমকে দাঁড়িয়ে আমি বিশাখার দিকে চেয়ে রইলাম। একটা হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে আছে বিশাখা। গা থেকে ভেসে আসছে মৃদু বিদেশী পারফিউমের সৌরভ। ঝকঝকে তকতকে শরীর, ওর চেহারায় বা চরিত্রে কোন

মালিন্য নেই। চাঁদের উজ্জ্বল দিকটার মতন এরা শুধু পৃথিবীর সুখের দিকটাই জানে।

হয়তো বিশাখার সঙ্গে আমার আর কোনদিন দেখা হবে না। কিংবা হঠাৎ এরকম ভাবে রাস্তায় দেখা হয়ে যেতে পারে। ততদিনে ওর সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা এসে যাবে। তখন দেখা হলে, বড় জোর সামান্য হেসে ঘাড় হেলিয়ে বলবে, ভালো? আমিও ঠিক সেই একই রকম ভঙ্গিতে বলব, ভালো?

আমি কি আজ বিশাখার মনে একটা দাগ কেটে দিতে পারি না?

বিশাখা জিজ্ঞেস করল, কী হলো, থেমে পড়লেন কেন?

—বিশাখা, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে?

—কোথায়?

—কাছেই একটা জায়গায়!

বিশাখার মুখে একটু ছায়া পড়ল। ভালো করে একবার দেখল আমাকে। তারপর আমার চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে মুখ নিচু করে বলল, না, আমি এখন বাড়ি যাব।

—চলো না, খুব কাছে, বেশিক্ষণ লাগবে না।

বিশাখা এবার একটু দৃঢ় গলায় বলল, না, আমি আর কোথাও যাব না। আমি বাড়ি ফিরব। এখান থেকে ট্যাক্সি ভাড়া পাওয়া যায় না?

—যায়। তোমাকে আমি পৌঁছে দেব। তার আগে চলো, একটা জায়গা থেকে ঘুরে যাই।

—কেন?

—বিশাখা, তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ? আমি তো খারাপ লোক নই, আমি ভালো লোক।

—কিন্তু আমি যে বাড়ি যেতে চাই এখন!

—যাবে, দশ মিনিটের বেশি দেরি হবে না। যদি আমায় বিশ্বাস করতে পারো, তা হলে চলো।

—আপনি আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চাইছেন?

—বললাম তো, ভয় নেই!

—চলুন।

এবার বিশাখা হাঁটছে অনিশ্চিত পায়ে। ঘন ঘন তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমাকে বুঝবার চেষ্টা করছে। মনের অস্থিরতা চাপা দেবার জন্য একবার সে কথা ঘোরাবার জন্য বলল, দেখুন, দেখুন ঐ ছেলেটাকে।

একটি ভিখিরি-ছেলের দু'টি হাতের পাঞ্জাই কাটা। তবু সেই ঠুঁটো দু' হাতে একটি মাটির হাড়ি বাজাচ্ছে কায়দা করে।

বিশাখা বলল, ইস!

আমি একটু নিষ্ঠুরভাবে বললাম, শুনেছি, কিছু লোক ইচ্ছে করে এইসব ছেলেদের হাত-পা কেটে দিয়ে ভিখিরি বানায়!

বিশাখা চোখ বুজে ফেলল. তারপর বলল, এইসব খারাপ লোক, এদের ধরে ধরে গুলি করে মেরে ফেলে না কেন?

—কে মারবে বলো? তুমি কিংবা আমি মারতে পারব না। কারণ আমাদের সময় নেই, তাই না?

বিশাখা বলল, তবু কিছু একটা করা উচিত। যারা মানুষকে এভাবে কষ্ট দেয়, তারা নিজেরা কি মানুষ?

আমি উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেলাম। সব কথা বিশাখা বুঝবে না। ওর মনটা বড্ড নরম। এরকম নরমই থাকুক না। কী দরকার আঘাত দিয়ে! তা হলে কি ওকে নিয়ে যাব সেখানে? আমি কি নিষ্ঠুরতা করছি?

আবার মনে হলো, যে সুন্দর, তাকে কি দুর্বল হতেই হবে? এই পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে বিশাখাকেও তো দেখতে হবে অনেক কিছু। বরং ওর সুন্দর মনের কিছুটা অংশ অন্যকে দিক।

আমি বিশাখাকে ভুলিয়ে-ভালিয়েই নিয়ে আসছিলাম। আগে থেকে বললে বিশাখা কিছুতেই আসত না। বাড়িটার সামনে এসে বিশাখা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, এখানে যাব কেন? এটা কার বাড়ি?

আমি নরম গলায় বললাম, ভয় পেয়ো না, এসো!

হাত দিয়ে দরজাটা ঠেলে খুলে দিলাম। উঠোনে অল্প অল্প আলো। একতলার দুটো ঘরেরই দরজা বন্ধ। দোতলার সিঁড়ির দিকটা অন্ধকার। এরকম বাড়িতে বিশাখা বোধহয় জীবনে কখনো ঢোকেনি। সিঁড়িতে পা দিয়ে ও প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় জিজ্ঞেস করল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

এবার আমি ওর হাত চেপে ধরে বললাম, আমি কথা দিচ্ছি বিশাখা, তোমার কোন ভয় নেই। এস লক্ষ্মীটি, এক্ষুনি ফিরে যাব।

বিশাখাকে হাত ধরেই নিয়ে এলাম। দোতলায় চটের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলাম, ভেতরটা একেবারে নিস্তব্ধ। আমার বুকটা ধক করে উঠল। একটা আলো পর্যন্ত জ্বলছে না। তবে কি সব শেষ হয়ে গেছে?

আমি ডাকলাম, জ্যাঠাইমা! জ্যাঠাইমা!

একটা আলো জ্বলে উঠল। ডান দিকের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন সরমা জ্যাঠাইমা। সেই রকম পাথরের মতন মুখ। লালপাড় শাড়ি দেখে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম, জ্যাঠামশাই কেমন আছেন?

জ্যাঠাইমা বললেন, এসো!

ঘরের মধ্যে খাটের ওপর ঠিক সেই একই রকমভাবে শুয়ে আছেন রমেশ জ্যাঠামশাই। সেইরকম হাত-পা এদিকে সেদিকে ছড়ানো, চোখ দুটো বিস্ফারিত। কঙ্কাল বুকটা একটু একটু ওঠানামা করছে দেখে বোঝা যায়, এখনো বেঁচে আছেন। আরো কতদিন বেঁচে থেকে এই সংসারটাকে একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবেন, কে জানে!

—মেয়েরা কোথায়?

—কেউ বাড়িতে নেই!

আমার মনে হলো, এরপর থেকে মেয়েরা কেউই আর কোনদিন সন্ধের সময় বাড়ি থাকবে না। তাদের ফিরতে রাত হবে।

—ছন্দাকে আমি যেখানে দেখা করতে বলেছিলাম, সেখানে গিয়েছিল?

—জানি না!

অর্থাৎ ছন্দা সেখানে যায়নি। ছন্দা কোন চাকরি পেলে সেকথা সে তার মাকে কি অন্তত জানাত না?

বিশাখা কাঠের মতন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মধ্যে একটা স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ, মাঝে মাঝে জ্যাঠামশাইয়ের নিশ্বাসের একটা ঘড়ঘড় শব্দ।

ফুলবাগানের মোড় পেরোবার সময় বিশাখার মুখের এক পাশ দেখে ছন্দার কথা মনে পড়েছিল। কোথায় যেন একটু ছন্দার সঙ্গে মিল আছে। আমাদের বাড়ি গিয়ে ছন্দা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কীভাবে মরব, বলতে পারেন? আজ সন্ধ্যায় বিশাখার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সেই কথা মনে পড়েছিল। ছন্দাও একটি একুশ-বাইশ বছরের মেয়ে। সে কি বিশাখার মতন একটি সুন্দর জীবন পেতে পারত না?

রমেশ জ্যাঠার চোখ দেখেই বোঝা যায় তিনি বিশাখাকে চিনতে পেরেছেন। তার চোখের তারা দুটো ঘুরছে। তিনি কিছু বলতে চান। মালিকের মেয়ে সব কর্মচারীকে চেনে না, কিন্তু সব কর্মচারীই চেনে মালিকের মেয়েকে।

বিশাখা অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকাল। সে যেন একটি জালে-পড়া হরিণী। সে আমার কাছে উদ্ধার চাইছে। সে নিজেই এবার আমার এক হাত চেপে ধরল। কী কোমল, সুন্দর সেই হাত!

আমি ফিসফিস করে বললাম, পাঁচ মিনিটের জন্য আমি তোমাকে জীবনের অন্য একটা দিক দেখাতে নিয়ে এলাম। ইনি রোহিণী সিনেমা হলে কাজ করতেন। তুমি জানো কি, এঁরা দুশো একচল্লিশ দিন ধরে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। সেই

আটমাস এঁরা কেউ মাইনে পাননি। এখন ধর্মঘট মিটে গেছে অবশ্য, কিন্তু ইনি আর...

আমার কথাটা বেশ নাটকীয় শোনাল আমার নিজেরই কানে। এই ধরনের কাজ আমি নিজেও আগে করিনি। জ্যাঠামশাইয়ের চেহারাটা সত্যি অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। আমি নিজেই তাকিয়ে থাকতে পারছি না। এত দুঃখকষ্টের দৃশ্য আমি নিজেই সহ্য করতে পারি না, বিশাখার তো এরকম কিছুই দেখার অভ্যেস নেই। সে সহ্য করতে পারবে কেন?

সরমা জ্যাঠাইমা চোখ দিয়ে আমায় প্রশ্ন করলেন, মেয়েটি কে? আমি কাছে গিয়ে ফিসফিস করে ওর পরিচয় জানালাম। সরমা জ্যাঠাইমার চোখে খানিকটা কৌতূহল ফুটে উঠল, কিন্তু সেই কৌতূহলী চোখ নিয়ে তিনি বিশাখার বদলে আমার দিকেই তাকিয়ে রইলেন বেশিক্ষণ।

তারপর কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। মনে হলো, শুধু সেই ঘরটা নয়—সারা পৃথিবীই যেন এখন নিস্তব্ধ হয়ে আছে।

বিশাখার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে এল। ওর নরম মন। এই বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে পারবে কেন? তবু আমার মনে হলো, এই বিশ্রী নোংরা ঘরে অন্তত একজন সুখী মানুষের চোখের জলের প্রয়োজন ছিল!

আমি বিশাখার কাঁধে হাত ছুঁয়ে বললাম, চলো।

হঠাৎ বিশাখা ফুঁপিয়ে খুব জোরে কেঁদে উঠল। খাটটার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে প্রবল কান্নায় কেঁপে কেঁপে বলতে লাগল, আপনি আমার বাবাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। বাবা বুঝতে পারেননি। আপনি ক্ষমা করুন, আমি ক্ষমা চাইছি।

আমি জানি, জ্যাঠামশাই কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। তবু তিনি একটি হাত তোলার চেষ্টা করলেন, একটুখানি উঠেই হাতখানা ধপ করে পড়ে গেল।

রমেশ জ্যাঠামশাই বিশাখাকে আশীর্বাদ করতে চাইলেন, না অভিশাপ দিলেন, সেটা বুঝতে পারলাম না।